পদ্যানুবাদ ও ব্যাখ্যা।

শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় বসু।

"য ইদং পরমং গুহ্যং মদ্ভক্তেষ্বভিধাস্যতি।
ভক্তিং ময়ি পরাং কৃত্বা মামেবৈষ্যত্যসংশয়ঃ॥"

*　　　*　　　*

"অধ্যেষ্যতে চ য ইমং ধর্ম্ম্যং সংবাদমাবয়োঃ।
জ্ঞানযজ্ঞেন তেনাহমিষ্টঃ স্যামিতি মে মতিঃ॥"

—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—১৮।৬৮,৭০।

উৎসর্গ।

যিনি

তপোযুক্ত, ভক্ত, জিজ্ঞাসু,

ঈশ্বর-বিশ্বাসী,

ভগবদ্‌বাক্যে শ্রদ্ধাবান্‌,

ভগবদ্‌বাক্যার্থ জানিবার জন্য

উৎসুক ও প্রযত্নবান্‌,

তাঁহার করে

শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতার

এই অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

অর্পিত হইল।

শ্রীভগবান্‌ বলিয়াছেন,—

"ইদন্তে নাতপস্কায় নাভক্তায় কদাচন।

ন চাশুশ্রূষবে বাচ্যং ন চ মাং যোঽভ্যসূয়তি ॥"

এই কর্ম্মফল

সর্ব্বহৃদিস্থিত, সর্ব্বনিয়ন্তা, সর্ব্বান্তর্য্যামী, সর্ব্ববুদ্ধির

প্রচোদক, সর্ব্বকর্ম্মফলদাতা

শ্রীভগবানে

সমর্পিত হইল,—

'ওঁ তৎসৎ'

ইতি।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা
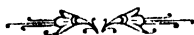
শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় বসু-

প্রণীত

পদ্যানুবাদ ও ব্যাখ্যা সমেত।
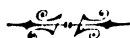
প্রথম ভাগ,

প্রথম ষট্‌ক, প্রথম খণ্ড,—

প্রথম হইতে তৃতীয় অধ্যায়।

প্রিণ্টার—শ্রীযোগেশচন্দ্র অধিকারী।
মেট্‌কাফ্ প্রেস্,
৭৬ নং বলরাম দে ষ্ট্রীট্—কলিকাতা।

প্রকাশক—শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার বসু
দানধাম, ৩০।৩ মদন মিত্রের লেন, কলিকাতা।

মূল্য,—১৷৹ টাকা, ভাল বাঁধা ২৲ টাকা।
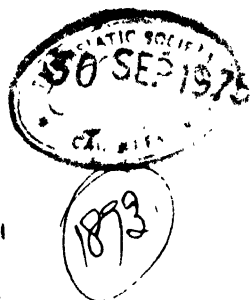
নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্ ।
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥
ব্যাসং বশিষ্ঠনপ্তারং শক্তেঃ পৌত্রমকল্মষম্ ।
পরাশরাত্মজং বন্দে শুকতাতং তপোনিধিম্ ॥

বিজ্ঞাপন।

—:o:—

মূল ও পদ্যানুবাদ সহ গীতা-ব্যাখ্যার প্রথমভাগ প্রকাশিত হইল। এই ভাগে প্রথম ষট্কের প্রথম অংশ অর্থাৎ প্রথম হইতে তৃতীয় অধ্যায় পর্য্যন্ত সন্নিবেশিত হইয়াছে। আট খণ্ডে এই গ্রন্থ সমাপ্ত হইবে। প্রথম ষট্কে দুই খণ্ড, দ্বিতীয় ষট্কে দুই খণ্ড, তৃতীয় ষট্কে তিন খণ্ড ও পরিশিষ্ট খণ্ড—এই আট ভাগ হইবে। দ্বিতীয় খণ্ড শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

এই ব্যাখ্যার নাম বিজয়া ব্যাখ্যা রাখা হইল,—বস্তু নির্দ্দেশের জন্য অনেক স্থলে নামের প্রয়োজন।

প্রতি শ্লোকের অনুবাদ অবলম্বন করিয়া এই ব্যাখ্যা লিখিত হইয়াছে। এই অনুবাদ সম্বন্ধে অধিক কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। মূল শ্লোকের বাক্যার্থ বুঝিবার জন্য এ অনুবাদ অক্ষরানুবাদ মাত্র। ছন্দ অধিক হৃদয়গ্রাহী এবং আবৃত্তির পক্ষে বিশেষ উপযোগী, এ কারণ মূলের ন্যায় এ অনুবাদও ছন্দে গ্রথিত। এ ছন্দ প্রধানতঃ অমিত্রাক্ষরচ্ছন্দ,—মিত্রাক্ষরচ্ছন্দে অক্ষর[illegible] সর্ব্বথা সুসাধ্য নহে।

এই ব্যাখ্যা বিস্তৃত। [illegible]তে কোন প্রাচীন ভাষ্য বা টীকা কিংবা তাহার অনুবাদ না থাকিলেও,—শাঙ্করভাষ্য, রামানুজভাষ্য, শ্রীধরস্বামিকৃত টীকা, আনন্দগিরির ভাষ্য-টীকা, মধুসূদনের ব্যাখ্যা, বলদেবের ব্যাখ্যা প্রভৃতির সার সার অংশ প্রয়োজন মত গৃহীত হইয়াছে। প্রত্যেক প্রয়োজনীয় পদের বিভিন্ন ব্যাখ্যাকারগণের অর্থ, এবং বিভিন্ন শ্লোকের এই সকল ব্যাখ্যাকারগণের ভাবার্থ, এ ব্যাখ্যায় সন্নিবেশিত হইয়াছে; এবং এই সকল বিভিন্ন অর্থ সমালোচনা করিয়া যে অর্থ যে স্থানে সঙ্গত বোধ হইয়াছে, তাহা গৃহীত হইয়াছে। শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি ব্যাখ্যাকারগণের ভাষ্য ও টীকা না পড়িয়াও যাহাতে এই ব্যাখ্যা হইতেই তাঁহাদের

ব্যাখ্যার সমুদায় প্রয়োজনীয় অংশ জানিতে পারা যায়, তাহার জন্য চেষ্টা করা হইয়াছে।

সর্ব্বোপনিষদ্-সার গীতায় উল্লিখিত মূল-তত্ত্ব সকল বুঝিতে হইলে, সেই সকল তত্ত্ব উপনিষদে কিরূপ উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা জানিতে হয়। এই ব্যাখ্যায় সর্ব্বত্র প্রয়োজন-মত উপনিষদ-মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়া গীতোক্ত তত্ত্ব সকল বুঝিতে চেষ্টা করা হইয়াছে। গীতাতে বেদান্ত ও সাংখ্যদর্শন-প্রতিপাদিত মূল তত্ত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে, এবং বিভিন্ন দর্শনের আপাত-বিরোধী মতের সামঞ্জস্য এবং সিদ্ধান্ত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত দর্শন-শাস্ত্রের অনেক দুর্ব্বোধ্য তত্ত্ব গীতায় উক্ত হইয়াছে। গীতায় এই সকল তত্ত্ব অনেক স্থলে সূত্ররূপে, অনেক স্থলে বার্ত্তিক বা কারিকা গ্রন্থের ন্যায়, অতি সংক্ষেপে উল্লিখিত হইয়াছে। তাহা বুঝিতে হইলে সেই সকল দর্শনোক্ত মত, বিশেষতঃ বেদান্ত ও সাংখ্যদর্শনে প্রতিপাদিত তত্ত্ব সকল ভাল করিয়া বুঝিতে হয়। এই ব্যাখ্যায় এ জন্য উক্ত বেদান্ত ও সাংখ্যদর্শনের মূল তত্ত্ব সকল বিশেষভাবে বিবৃত হইয়াছে, এবং গীতায় বিভিন্ন বিরোধী দার্শনিক মত কিরূপে সামঞ্জস্য করা হইয়াছে, তাহাও নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। গীতোক্ত দুর্ব্বোধ্য দার্শনিক তত্ত্ব সকল যাহাতে এরূপ বুঝিতে পারা যায়, তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টা করা হইয়াছে এবং এ কারণ, অনেক স্থলে সে সম্বন্ধে পাশ্চাত্য দর্শনের সিদ্ধান্তও উদ্ধৃত হইয়াছে। গীতোক্ত দার্শনিক তত্ত্বের সম্যক্ আলোচনা এ ব্যাখ্যার এক বিশেষত্ব।

ইহা ব্যতীত প্রতি অধ্যায়-শেষে—সেই অধ্যায়োক্ত তত্ত্ব সকল শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাবে বুঝিতে চেষ্টা করা হইয়াছে। অধ্যায়ের সার মর্ম্ম যাহাতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়, তাহার জন্য যত্ন করা হইয়াছে। গীতা সর্ব্ব শাস্ত্রের সার, সর্ব্ব দর্শনের সার, সর্ব্ব উপনিষদের সার। গীতা পরাবিদ্যারূপিণী। এ জন্য গীতার গূঢ় অর্থ গ্রহণ করা অতি দুঃসাধ্য। এই অর্থ গ্রহণ করিবার চেষ্টা ও প্রযত্নের ফল এই ব্যাখ্যায় লিপিবদ্ধ

হইয়াছে। আশা করি, যাঁহারা গীতার প্রকৃত অর্থজিজ্ঞাসু, এই বিস্তৃত ব্যাখ্যা কতক পরিমাণে তাঁহাদের সহায় হইবে।

প্রায় ত্রিশ বৎসর অতীত হইল, আমরা এই গীতানুবাদে প্রবৃত্ত হই। তখন এ দেশে 'শিক্ষিত' সম্প্রদায় মধ্যে গীতার সেরূপ প্রচলন ছিল না। তখন গীতার ভাল সংস্করণও পাওয়া যাইত না। তখন কেবল পণ্ডিত হিতলাল মিশ্রের অনুবাদ সহ গীতা আদিব্রাহ্মসমাজ কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহা সংগ্রহ করিতে পারি নাই। বট-তলার ছাপা গীতা মাত্র অবলম্বন করিয়া, এবং পণ্ডিত ত্র্যম্বক তেলাং প্রণীত পদ্যানুবাদ উপলক্ষ্য করিয়া এই অনুবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। তখন আমাদের দেশে 'শিক্ষিত' যুবকগণ গীতার নামও জানিতেন কি না সন্দেহ। তাহার পর 'হিন্দু ধর্ম্মের' 'পুনরুত্থান' হয়, অর্থাৎ 'শিক্ষিত' সম্প্রদায় মধ্যে সনাতন ধর্ম্ম-চর্চ্চা আরব্ধ হয়, এবং তাহার সহিত গীতার আলোচনাও আরব্ধ হয়। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়, কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেনের সহিত এই ধর্ম্মগ্লানির যুগে ধর্ম্ম-সংস্থাপন জন্য প্রবৃত্ত হন। 'বঙ্গবাসী' তাঁহার চেষ্টার সহায় হন,—এবং বঙ্কিমবাবু, চন্দ্রনাথবাবু, অক্ষয়বাবু প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ লোক তাঁহার অনুবর্ত্তী হন। 'নব-জীবন' ও 'প্রচার' এই উদ্দেশে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। তাহার ফলে অধিকাংশ শিক্ষিত সম্প্রদায়, সনাতন ধর্ম্মের আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। এই সময় হইতেই বাঙ্গালায় গীতাযুগের আরম্ভ। অনেকগুলি গীতার সংস্করণ প্রকাশিত হয়। তাহাদের মধ্যে কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের শাঙ্করভাষ্য স্বামিকৃত ও গিরিকৃত টীকা এবং অনুবাদ সহ গীতা প্রথম ও প্রধান। সেই সময়ে বঙ্কিমবাবু 'প্রচারে' গীতা-ব্যাখ্যা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। আমরাও তখন 'দৈনিক' পত্রে বঙ্কিমবাবুর এই ব্যাখ্যার ধারা-বাহিক সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। যাহা হউক, এই সময়ে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের অনুবাদ সহ গীতাও বঙ্গবাসী

কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত হয়। এই সময়েই পণ্ডিত নীলকণ্ঠ মজুমদার মহাশয় কথোপকথন-চ্ছলে গীতার উপদেশ প্রকাশ করেন। এইরূপে বাঙ্গালায় গীতাচর্চ্চার আরম্ভ হয়। এই কারণে আমার সেই অনুবাদ আর প্রকাশ করা আবশ্যক বলিয়া মনে করি নাই। তাহার পর সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা সহ গীতার অনুবাদ প্রকাশের কল্পনা করি এবং সে জন্য নূতন করিয়া অনুবাদও আরম্ভ করি। নব্যভারত পত্রিকায় সেই অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতে থাকে। আট অধ্যায় পর্য্যন্ত নব্যভারতে এইরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহার পর গৌর-গোবিন্দ উপাধ্যায় মহাশয়ের 'সমন্বয়' ভাষ্য সহ গীতা প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। তখন নব্যভারতে তাঁহার সে ব্যাখ্যার সমালোচনাও করিয়াছিলাম। যাহা হউক, ইহার পর আমাদের এই অনুবাদ ও ব্যাখ্যা প্রকাশ করা আর প্রয়োজন মনে করি নাই, এবং প্রধানতঃ সেই কারণেই নব্যভারতে গীতার প্রকাশও বন্ধ হয়।

যাহা হউক, উপাধ্যায় মহাশয় যে ভাবে গীতার ব্যাখ্যা ও সমন্বয় করিয়াছেন, এই ব্যাখ্যা ও সমন্বয় প্রণালী তাহা হইতে ভিন্ন। এ পর্য্যন্ত কোন ব্যাখ্যায় গীতোক্ত দার্শনিক-তত্ত্বের উপযুক্ত আলোচনা হয় নাই, এবং দ্বৈত বা অদ্বৈতবাদ প্রভৃতি অবলম্বনে ও বিভিন্ন সাধনপ্রণালী সম্বন্ধে যে সকল বিভিন্ন ভাষ্য ও টীকা প্রচলিত আছে, তাহাদের প্রকৃত সামঞ্জস্য প্রদর্শন করিতে পূর্ব্বে কেহ চেষ্টা করেন নাই। এই জন্য এ ব্যাখ্যা প্রকাশে প্রবৃত্ত হইয়াছি। বিশেষতঃ অনেকে আগ্রহ প্রকাশ করায় এই অনুবাদ ও ব্যাখ্যা সহ গীতা প্রকাশ করা প্রয়োজন বোধ হইয়াছে। এই ব্যাখ্যা নব্যভারতে প্রকাশিত ব্যাখ্যা অপেক্ষা প্রায় চতুর্গুণ বিস্তৃত হইয়াছে।

এই ব্যাখ্যা ব্যতীত, প্রতি খণ্ডে বিস্তৃত বিষয়-ব্যবচ্ছেদক সূচী, প্রকাশিত হইবে। পরিশিষ্ট খণ্ডে গীতোক্ত শব্দ সূচী ও ব্যাখ্যার বিষয়-সূচী এবং গীতা সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় জ্ঞাতব্য তত্ত্ব সকল সন্নিবিষ্ট হইবে।

সর্ব্বনিয়ন্তা শ্রীভগবানের প্রবর্ত্তনায়, তিনি যে বুদ্ধি-যোগ দিয়াছেন, তাহার অনুবর্ত্তী হইয়া, আমি এই দুরূহ 'জ্ঞানযজ্ঞে' প্রবৃত্ত হইয়াছি। এ কর্ম্ম ও কর্ম্মফল তাঁহারই, আমি নিমিত্ত মাত্র।

পুস্তক-মুদ্রণ কার্য্যে মেট্‌কাফ্‌ প্রেসের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় বিশেষ সাহায্য করিতেছেন। তিনি প্রুফ্‌ দেখিবার ভার লইয়াছেন। তাঁহার সাহায্য না পাইলে এ ভাবে গীতা ছাপান হইত না। তাঁহার ঋণ শোধ হইবার নহে।

এই ব্যাখ্যায় প্রায় প্রত্যেক শব্দের অর্থ বুঝিবার জন্য যে সকল ভাষ্য ও টীকা উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা সাঙ্কেতিক চিহ্ন দ্বারা, বন্ধনীমধ্যে, দেখান হইয়াছে। সে সাঙ্কেতিক চিহ্ন এই,—

ভাষ্য বা টীকার নাম	সাঙ্কেতিক শব্দ।
শঙ্করাচার্য্যকৃত ভাষ্য	শাঙ্কর বা শঙ্কর
রামানুজাচার্য্যকৃত ভাষ্য	রামানুজ
আনন্দগিরিকৃত শাঙ্কর-ভাষ্যের টীকা ..	গিরি
মধুসূদন সরস্বতীকৃত 'গূঢ়ার্থ দীপিকা' ভাষ্য ...	মধু
শ্রীধরস্বামিকৃত 'সুবোধিনী' টীকা .	স্বামী
হনূমান্‌-কৃত 'পৈশাচ' ভাষ্য .	হনূ
বলদেবাচার্য্যকৃত 'গীতাভূষণ' ভাষ্য ...	বলদেব
বল্লভাচার্য্য মতানুযায়ী 'অমৃত-তরঙ্গিণী' টীকা ...	বল্লভ

ইহা ব্যতীত স্থানে স্থানে নীলকণ্ঠের টীকা, বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা প্রভৃতির উল্লেখ করিতে হইয়াছে। বাঙ্গালা ব্যাখ্যামধ্যে শ্রীযুক্ত শশধর তর্ক-চূড়ামণি মহাশয়ের অনুবাদ, শ্রীকৃষ্ণানন্দস্বামীর গীতার্থসন্দীপনী টীকা, বঙ্কিম বাবুর ব্যাখ্যা প্রভৃতির সাহায্য গ্রহণ করিতে হইয়াছে। অলমতিবিস্তরেণ।

দেবধাম, ডিঃ $\frac{১০}{১০৭}$ ৮ বারাণসী, মহালয়া, ১৩২০। } শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় বসু।

প্রথম অধ্যায় হইতে তৃতীয় অধ্যায়।

বিষয়-ব্যবচ্ছেদক সূচী।

প্রথম অধ্যায়,—অর্জ্জুন-বিষাদ।

বিষয় ও শ্লোকাঙ্ক। পত্রাঙ্ক।

দ্বিতীয় অধ্যায়,—সাংখ্যযোগ।

স্বধর্ম্মপালন কর্ত্তব্য (৬১-৬৮)

নিষ্কাম কর্ম্মযোগ (৩৯-৫৩)

দ্বিতীয় অধ্যায়োক্ত তত্ত্ব

তৃতীয় অধ্যায়,—কর্ম্মযোগ।

তৃতীয় অধ্যায়োক্ত তত্ত্ব,—

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

ব্যাখ্যা-ভূমিকা।

"অদ্বৈতামৃতবর্ষিণীং ভগবতীমষ্টাদশাধ্যায়িনীম্।
অম্ব ত্বামনুসন্দধামি ভগবদ্গীতে ভবদ্বেষিণীম্॥"

সর্ব্বোপনিষদের সার, সর্ব্বজ্ঞানের সার, সর্ব্বধর্ম্মের সার, গূঢ়-রহস্যময় মোক্ষশাস্ত্র গীতার মাহাত্ম্য ও প্রকৃত অর্থ বুঝিবার জন্য বহুবর্ষ-ব্যাপী প্রযত্নের ফল এই বিস্তৃত ব্যাখ্যা, গীতার্থজিজ্ঞাসু পাঠকের জন্য প্রকাশিত হইতেছে। এই বিস্তৃত ব্যাখ্যার বিষয় কি, ইহাতে কি আছে, তাহা ইতিপূর্ব্বে বিজ্ঞাপনে সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। এক্ষণে এ ব্যাখ্যা সম্বন্ধে অন্য কথা বলিব।

অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, এই ক্ষুদ্রায়তন—সপ্তশত-শ্লোকময়ী গীতার ভাষা ত প্রাঞ্জল,—যাঁহারা সামান্য সংস্কৃত জানেন, তাঁহারা ত চেষ্টা করিলেই গীতার বাক্যার্থ বুঝিতে পারেন,—তবে গীতা বুঝিবার জন্য ব্যাখ্যার প্রয়োজন কি? আর যদি প্রয়োজনই থাকে, তবে গীতার ত অনেক ভাষ্য অনেক টীকা প্রচলিত আছে। এই ব্যাখ্যার আবার প্রয়োজন কি? অনেকে পণ্ডিত মোক্ষমূলারের কথা অনুসারে বলিয়া থাকেন যে, গীতাই গীতার ভাষ্য (Gita is its own commentary), ইহার জন্য কোন ভাষ্যের বা টীকার প্রয়োজন নাই। যাঁহারা গীতার বাক্যার্থ মাত্র বুঝিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন, তাঁহারাই এই কথা বলিয়া থাকেন। কিন্তু যাঁহারা গীতার প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিবার জন্য চেষ্টা করেন, তাঁহারা কখন এরূপ কথা বলিতে পারেন না।

গীতাশাস্ত্র দুর্ব্বোধ্য। গীতার ন্যায় এমন কঠিন—এমন দুর্ব্বোধ্য গ্রন্থ বুঝি আর নাই। ইহার ক্ষুদ্র আয়তনমধ্যে একাধারে সমুদায় ধর্ম্মতত্ত্ব, সমুদায় দার্শনিক তত্ত্ব, সমুদায় উপনিষদের সার তত্ত্ব সংক্ষেপে—প্রায়ই সূত্রাকারে কি বৃত্তিরূপে গ্রথিত হইয়াছে। গীতামাহাত্ম্যে আছে—

> "সর্ব্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ।
> পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ॥"

যাঁহারা সুধী—প্রকৃত পণ্ডিত, যাঁহারা সর্ব্বদর্শনশাস্ত্রের সর্ব্বধর্ম্মশাস্ত্রের পারদর্শী, যাঁহাদের নিকট গীতার অর্থ সুবোধ্য হইতে পারে, তাঁহারা মহৎ গীতামৃত পান করিয়া কৃতার্থ হইতে পারেন। কিন্তু অন্যের পক্ষে গীতার অর্থ গ্রহণ দুঃসাধ্য—একরূপ অসাধ্যও বলা যায়। যাঁহারা অতি বড় পণ্ডিত, তাঁহাদের মধ্যেও গীতার অর্থ-সম্বন্ধে মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। যখন শঙ্করাচার্য্য, রামানুজ, বলদেব প্রভৃতি মহাত্মা পণ্ডিতগণ গীতার অনেক স্থলে বিভিন্নরূপ অর্থ করিয়াছেন—দেখিতে পাওয়া যায়, তখন গীতার প্রকৃত অর্থ বুঝিবার চেষ্টায় একরূপ হতাশ হইতে হয়। অবশ্য যাঁহারা শঙ্করের মতাবলম্বী, তাঁহারা শঙ্করের অর্থ গ্রহণ করিতে পারিলে সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন। সেইরূপ যাঁহারা রামানুজ প্রভৃতি বৈষ্ণব পণ্ডিতগণের অনুবর্ত্তী, তাঁহারা রামানুজ প্রভৃতি আচার্য্যগণের অর্থ গ্রহণ করিয়া পরিতৃপ্ত থাকেন। কিন্তু যাঁহারা প্রকৃত তত্ত্বজিজ্ঞাসু, কোন মতবিশেষের পক্ষপাতী বা অন্ধের ন্যায় অনুবর্ত্তী নহেন,—প্রকৃত সিদ্ধান্ত কি, তাহা নিরপেক্ষভাবে জানিতে চাহেন, তাঁহারা ব্যাখ্যাকারগণের এই পরস্পর-বিরোধী অর্থের মধ্যে কোন্ অর্থ গ্রাহ্য, কোন্ অর্থ ত্যাজ্য, তাহা সহজে স্থির করিতে পারেন না। অনেকে হয়ত গীতার প্রকৃত অর্থগ্রহণের চেষ্টায় একরূপ হতাশ হইয়া পড়েন।

যাঁহারা গীতার কোন ভাষ্য বা ব্যাখ্যা না পড়িয়া নিজের জ্ঞানবুদ্ধির

উপর নির্ভর করিয়া গীতার অর্থ বুঝিতে চাহেন, তাঁহারা ত পদে পদে বাধা প্রাপ্ত হন। তাঁহারা অনেক স্থলে পরস্পর-বিরোধী ভাব—বিপরীত অর্থ দেখিতে পান, তাহার মীমাংসা করিতে পারেন না। তাঁহারা অনেক স্থলে গীতার গূঢ়রহস্য (esoteric অর্থ) আদৌ বুঝিতে পারেন না। দৃষ্টান্তস্বরূপ দাক্ষিণাত্যের পণ্ডিত ত্র্যম্বক তেলাং-এর কথা বলা যাইতে পারে। তিনি এক স্থানে (Sacred Books of the East Series এ গীতার অনুবাদের উপক্রমণিকায়) বলিয়াছেন যে, গীতা অনেক পরস্পর-বিরোধী কথায় পরিপূর্ণ। যেমন,—ভগবান্ এক স্থলে বলিয়াছেন যে, আমার প্রিয় বা দ্বেষ্য কেহ নাই, অথচ অর্জ্জুনকে অন্য স্থানে বলিয়াছেন, তুমি আমার প্রিয় ভক্ত ও সখা। ভগবান্ অন্যত্রও বলিয়াছেন, ভক্তগণ আমার প্রিয়। কোথাও ভগবান্ আপনাকে অকর্ত্তা আপ্তকাম বলিয়াছেন, অথচ বলিয়াছেন যে, তিনি তাঁহার দ্বেষকারী ক্রূর লোকদের পুনঃ পুনঃ আসুরী যোনিতে নিক্ষেপ করেন, দুষ্কৃতগণকে বিনাশ করেন, কালরূপে লোকক্ষয় করিতে প্রবৃত্ত হন। ভগবান্ কোন স্থলে কর্ম্মের প্রশংসা করিয়াছেন, কোথাও বা কর্ম্মত্যাগের প্রশংসা করিয়াছেন। এজন্য অর্জ্জুনকে পুনঃপুনঃ প্রশ্ন করিয়া কোন্‌টি শ্রেয়ঃ তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিতে হইয়াছে। তথাপি তাহা যে স্পষ্ট উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা বলা যায় না। কেননা, তাহা হইলে বিভিন্ন ব্যাখ্যাকারগণের মধ্যে এ সম্বন্ধে এত মতভেদ থাকিত না। গীতাতে এইরূপ পরস্পরবিরুদ্ধ ও আপাত অসংলগ্ন কথা অনেক স্থলে পাওয়া যায়। সহজে ইহার সামঞ্জস্য ও সঙ্গত অর্থবোধ হয় না। অনেক স্থলে কোন অর্থই পাওয়া যায় না। যেখানে সর্ব্ববিরোধের মীমাংসা বা সামঞ্জস্য হয়, তাদৃশ দাঁড়াইবার স্থান না পাইলে কেহ এ সকল বিরোধের মীমাংসা করিতে পারে না।

শাস্ত্র উপদেশের প্রণালী।—যাঁহারা নিজের বুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া গীতা বুঝিতে চাহেন, যাঁহারা তর্ক ও যুক্তি দ্বারা গীতার অর্থ

সমালোচনা করেন, তাঁহারা এইরূপে পদে পদে বাধাপ্রাপ্ত হন। গীতায় কোথাও যুক্তি দেওয়া নাই। নানা বিরোধী মত বিচার করিয়া, কোন্ মত গ্রাহ্য তাহার মীমাংসা নাই। গীতায় যাহা সিদ্ধান্ত, তাহাই উপদিষ্ট হইয়াছে। শাস্ত্রে সর্ব্বত্র এই প্রণালীই অবলম্বিত হইয়া থাকে। শ্রুতিস্মৃতিশাস্ত্রের ইহাই নিয়ম। শাস্ত্রে কোন তর্ক যুক্তি থাকে না। পিতা যেমন পুত্রকে উপদেশ দেন, গুরু যেমন শিষ্যকে উপদেশ দেন, সেইরূপ শাস্ত্রেও উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। 'ইহা কর' বা 'ইহা করিও না', এই বিধি বা নিষেধ-বাদ, অথবা 'ইহা এই বা ইহা নহে'—এই অর্থবাদ শাস্ত্রে যুক্তির দ্বারা স্থাপিত হয় নাই। কেন ইহা করিতে হইবে বা ইহার এই অর্থ জানিতে হইবে,—ইহা শাস্ত্র যুক্তি দ্বারা বুঝান নাই। পিতা যখন পুত্রকে উপদেশ দেন বা আদেশ করেন—ইহা কর, তখন তিনি সুযুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা দ্বারা কর্ত্তব্য-অকর্ত্তব্য-তত্ত্ব সে যুক্তি বুঝিবার অনধিকারী পুত্রকে বুঝাইয়া দেন না। শাস্ত্রের উপদেশও সেইরূপ। পরমকরুণাময়ী মাতৃরূপিণী শ্রুতি অধিকারী শ্রোতাকে এইভাবেই উপদেশ দিয়াছেন। কোথাও 'বাব' অর্থাৎ বাবা বা বৎস বলিয়া শ্রোতাকে সম্বোধন করিয়া সে উপদেশ দিয়াছেন,—যেমন 'অশরীরং বাব সন্তং প্রিয়াপ্রিয়ে ন স্পৃশত ইতি।' কোথাও গুরু-শিষ্য কল্পনা করিয়া বা কথোপকথনচ্ছলে কোথাও রূপকে কি দৃষ্টান্ত দ্বারা এই সকল উপদেশ বিধিবদ্ধ হইয়াছে। গীতাতেও সেই ভাবে উপদেশ দেওয়া আছে। গীতায় সর্ব্বোপনিষৎসার—এজন্য ইহা শ্রুতি। আর গীতা বেদব্যাস কর্ত্তৃক মহাভারতে সন্নিবিষ্ট বলিয়া স্মৃতি। * সর্ব্বোপনিষৎসারও উক্ত গীতায় উপদেশ প্রণালী রূপ।

শাস্ত্র যুক্তি-তর্কের অনধিগম্য।—আজকাল এই তর্কযুক্তির দিনে, এই স্বাধীনতার যুগে, এরূপ ভাবে কেহ উপদেশ গ্রহণ করিতে

* বেদান্তদর্শনে "স্মৃতিশ্চ" 'অপি চ স্মর্য্যতে" :প্রভৃতি (১।২।৩,২।৩।২৯,২।৩।৪৫, ৩।২।১৭,৪।১।১০) সূত্র দ্বারা সর্ব্বত্র গীতাই উপলক্ষিত হইয়াছে।

প্রস্তুত নহে। অথচ গীতায় যে সকল তত্ত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা যুক্তি-তর্কের দ্বারা অধিগম্য নহে। যে বিষয় অদৃষ্ট,অতীন্দ্রিয় বা অলৌকিক, সেখানে প্রত্যক্ষ বা প্রত্যক্ষমূলক অনুমান প্রমাণের দ্বারা কোন সিদ্ধান্ত করা চলে না,—করিতে গেলে নাস্তিক বা জড়বাদী হইতে হয়। বাহ্য জ্ঞেয় বিষয় সম্বন্ধে আমাদের যে প্রমা জ্ঞান, তাহার মূল প্রত্যক্ষ বা প্রত্যক্ষ-মূলক অনুমান। শাস্ত্রপ্রমাণের কথা স্বতন্ত্র। শাস্ত্রপ্রমাণ যাঁহারা বিশ্বাস করেন না, তাঁহাদের কথাই এস্থলে বলিতেছি। সুতরাং এস্থলে শাস্ত্রপ্রমাণ উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই। পরে ইহা বুঝিতে চেষ্টা করিব। সাধারণ প্রমাণ এক অর্থে এই প্রত্যক্ষ। প্রত্যক্ষজ অনুমান প্রত্যক্ষেরই অন্তর্গত। যাহা কিছু প্রত্যক্ষ বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইতে পারে, সেই সকল বিষয় আমরা এই প্রত্যক্ষ ও অনুমান প্রমাণ দ্বারা জানিতে পারি। ইন্দ্রিয় দ্বারা গ্রহণ না করিয়াও অনেক বিষয় অনুমান প্রমাণ —পূর্ব্ববৎ শেষবৎ ও সামান্যতঃ দৃষ্ট অনুমান, উপমান ও সম্ভব (probability) এই প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে। কিন্তু এই সকল প্রমাণগম্য বিষয়ই লৌকিক। এ সংসারে যাহা কিছু অলৌকিক—অসাধারণ, তাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে—হইতেও পারে না। তাহা প্রত্যক্ষ বা প্রত্যক্ষমূলক অনুমান বা তন্মূলক কোন প্রমাণ দ্বারা জ্ঞেয় হয় না। আমাদের জন্মান্তর আছে কি না, স্বর্গ আছে কি না, স্বর্গে দেবতা আছেন কি না, ঈশ্বর আছেন কিনা—এ সকল তত্ত্ব আমরা এই সকল প্রমাণ দ্বারা জানিতে পারি না। কোনরূপঃ যুক্তিতর্ক দ্বারা তাহা অধিগম্য হয় না।—সাংখ্য-কারিকায় আছে—

"সামান্যতস্তু দৃষ্টাৎ অতীন্দ্রিয়াণাং প্রতীতিঃ অনুমানাৎ।
তস্মাদপি চাসিদ্ধং পরোক্ষম্ আপ্তাগমাৎ সিদ্ধম্ ॥" (৬)।

সুতরাং যাহা পরোক্ষ,—প্রত্যক্ষ বা অনুমান দ্বারা জানা যায় না, তাহা আপ্ত-আগম বা শাস্ত্রপ্রমাণ হইতেই কেবল জানা যায়।

শাস্ত্রোপদিষ্ট বিষয়।—স্বর্গ অন্তরীক্ষ ও মর্ত্ত্য বা ভূর্ভুবঃ স্বঃ এই ত্রিলোককে সংসার বলে। এই সংসারের যাহা কিছু অলৌকিক বিষয়, তাহা আমাদের প্রত্যক্ষ বা অনুমান প্রমাণের দ্বারা জ্ঞানের বিষয়ীভূত হয় না। তাহা জানিতে হইলে, বাধ্য হইয়া শাস্ত্রে বিশ্বাস করিতে হয়—শাস্ত্রকে প্রমাণস্বরূপ গ্রহণ করিতে হয়। আমাদের বেদ বা শ্রুতি এবং বেদানুযায়ী স্মৃতিই মূল শাস্ত্র-প্রমাণ। কিন্তু যাঁহারা শ্রুতিস্মৃতির প্রামাণ্য স্বীকার না করেন, তাঁহারা কোনরূপ যুক্তি বা প্রমাণ দ্বারা সেই বেদোপদিষ্ট অতীন্দ্রিয় তত্ত্ব জানিতে পারেন না, বা তাহাতে বিশ্বাস করিতে পারেন না। বেদে বা আপ্তবাক্যে বিশ্বাস করিলে, তবে আমরা এই ত্রিলোকের তত্ত্ব জানিতে পারি। ভগবান্ বলিয়াছেন যে, বেদ "ত্রৈগুণ্য-বিষয়,—মুমুক্ষুকে নিস্ত্রৈগুণ্য হইতে হয়।" এই ত্রিলোকী বা সংসার—সান্ত, সীমাবদ্ধ, পরিণামী, পুনঃপুনঃ আবর্ত্তনশীল। এই সংসারকে যখন এইরূপ সান্ত বলিয়া ধারণা হয়, তখন ইহার অনন্ত, অসীম, অপরিণামী, অনাদি নিত্য যে আধার আছে, ইহাও জ্ঞানে প্রতিভাত হয়। কিন্তু এই সংসার-রাজ্যের অতীত সেই লোকাতীত অনন্তের রাজ্যের কথা কোন যুক্তিতর্ক দ্বারা জানা যায় না। তাহা প্রত্যক্ষের বিষয় নহে, অনুমানের বিষয় নহে, অর্থাৎ প্রত্যক্ষমূলক কোনরূপ অনুমানের বিষয় হইতে পারে না।

পরমার্থশাস্ত্র গীতোপদিষ্ট বিষয়। সেই সংসারাতীত অজ্ঞেয় রাজ্যের কথা যে শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—তাহার নাম বেদান্ত। তাহাকে পরাবিদ্যা বা মোক্ষশাস্ত্র বলে। গীতা এই মোক্ষশাস্ত্রের মধ্যে প্রধান। গীতা সেই অনন্ত অজ্ঞেয় অমৃত রাজ্যের কথা বলিয়াছেন,—সে রাজ্যে প্রবেশের পথ দেখাইয়া দিয়াছেন,—এই সংসার রাজ্য হইতে পার হইয়া,—দৃঢ় অসঙ্গ শস্ত্রের দ্বারা এই অব্যয় সংসার-অশ্বত্থ ছেদন করিয়া, যাহাতে সেই সংসারাতীত অমর রাজ্যে প্রবেশ করা যায় তাহার উপদেশ দিয়াছেন।—

"অশ্বত্থমেনং সুবিরূঢ়মূলম্
অসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্ত্বা।
ততঃ পদং তৎ পরিমার্গিতব্যং
যস্মিন্ গতা ন নিবর্ত্তন্তি ভূয়ঃ" ॥ (১৫।৩-৪)

গীতায় প্রধানতঃ সেই 'তৎপদ' পরমধাম বা পরমপদ-অন্বেষণকারীকে সেই অব্যয় পদ উপদেশ দিয়াছেন এবং সে পদ প্রাপ্তির উপায় বলিয়া দিয়াছেন। তাহা যুক্তি-তর্কের দ্বারা বা কোনওরূপ প্রত্যক্ষ বা অনুমান-প্রমাণের দ্বারা জানা সম্ভব নহে।

সুতরাং যাহারা প্রত্যক্ষ ও অনুমান-প্রমাণ লইয়া যুক্তি-তর্ক, বাদ-বিতণ্ডা, জল্পনা প্রভৃতিকে সহায় করিয়া গীতার অর্থ গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিবেন, তাঁহাদের চেষ্টা ব্যর্থ হইবে। বাদ (thesis) বিবাদে (anti thesis এ)- পরিণত হইবে, কেহই প্রকৃত সংবাদ (synthesis) দিতে পারিবেন না।

দর্শনের ও শাস্ত্রের প্রণালীভেদ।—সাধারণ শাস্ত্র দ্বারা পরমজ্ঞান অনধিগম্য। আমরা দর্শনশাস্ত্র হইতে এ কথা বুঝিতে পারি। দর্শনশাস্ত্র প্রধানতঃ প্রত্যক্ষ ও অনুমান প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত; বাদ, বিবাদ, তর্ক, যুক্তির উপর স্থাপিত। দর্শনশাস্ত্র দ্বারাই এই দৃষ্ট-বিষয়ক প্রমাজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। যাহা অদৃষ্ট অথচ দর্শনযোগ্য বা যুক্তির দ্বারা অধিগম্য, সেই বিষয়ই দর্শনশাস্ত্র দেখাইয়া দিতে পারে। যাহা অনুমানরূপ প্রমাণ-চক্ষু দ্বারা দর্শন করা যায়, দর্শন তাহাই দেখাইয়া দেয়। যাহা এরূপ দর্শনযোগ্য নহে, বুদ্ধিজ্ঞানের জ্ঞেয় নহে, তাহা দর্শন দেখাইতে পারে না। আমাদের দেশের দর্শনশাস্ত্র হইতে একথা জানা যাইতে পারে। নাস্তিক-দর্শনের কথা বলিবার প্রয়োজন নাই। আমরা জানি যে, কেবল প্রত্যক্ষ বা অনুমান-প্রমাণের উপর এবং তদনুযায়ী

যুক্তিতর্কের উপর নির্ভর করিয়া নাস্তিক-দর্শন অধিকদূর অগ্রসর হইতে পারে নাই—তাহারা অপ্রত্যক্ষ বা অতীন্দ্রিয় বিষয়ের রাজ্যে যাইতে পারে নাই—তাহাতে প্রবেশের পথ পায় নাই। আস্তিক-দর্শন বেদকে প্রামাণ্য ধরিয়া লইয়াছেন সত্য, কিন্তু তাঁহারা প্রধানতঃ প্রত্যক্ষ ও অনুমান-প্রমাণ অবলম্বন করিয়াছেন বলিয়া, অধিকদূর অগ্রসর হইতে পারেন নাই। বেদান্তদর্শনের কথা স্বতন্ত্র; তাহা পরে বলিতেছি। বৈশেষিক দর্শন যুক্তিতর্কের দ্বারা, দ্রব্যগুণকর্ম্মাদির সাধর্ম্ম্য-বৈধর্ম্ম্য-বিচার দ্বারা এবং ন্যায়দর্শন প্রমাণ-প্রমেয় প্রভৃতি তত্ত্ববিচার দ্বারা অধিকদূর যাইতে পারেন নাই, বাহ্য প্রমেয়বিষয় বা যাহাকে মূল পদার্থ বলা যাইতে পারে, তাহাই আমাদের বুদ্ধিগ্রাহ্য করিয়া দিয়াছেন মাত্র। ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনে আত্মতত্ত্ব প্রমেয় হইলেও, তাহাতে যে আত্ম-তত্ত্বের উপদেশ আছে, তাহাও অনুভবগ্রাহ্য অহং প্রত্যয় আর সামান্য আত্মজ্ঞান মাত্র। আত্মার প্রকৃত স্বরূপ তাহাতে প্রমাণিত হয় নাই।

সাংখ্য পাতঞ্জলদর্শনের—বিশেষতঃ সাংখ্যদর্শনের কথা আরও বিশেষ ভাবে এস্থলে উল্লেখ করিতে হইবে। সাংখ্যশাস্ত্র অনুমানমূলক, প্রধানতঃ সামান্যতঃ দৃষ্ট অনুমানমূলক। প্রত্যক্ষমূলক অনুমান-প্রমাণ দ্বারা সাংখ্যের যাবতীয় তত্ত্ব স্থিরীকৃত হইয়াছে। এই অনুমান-প্রমাণ অবলম্বনে যুক্তিতর্কের দ্বারা আমাদের বুদ্ধি যতদূর অগ্রসর হইতে পারে, সাংখ্য-দর্শন ততদূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছেন। কেবল আত্মজ্ঞান-প্রমাণ সাংখ্য-স্বীকৃত হইলেও, তাহা স্বতন্ত্র গৃহীত হয় নাই। সুতরাং যেখানে প্রত্যক্ষ ও অনুমান-প্রমাণ যাইতে পারে নাই, সেখানে সাংখ্যদর্শনও অগ্রসর হন নাই। সাংখ্যদর্শন 'জ্ঞ'-স্বরূপ পুরুষকে কেন্দ্র করিয়া তদবলম্বনে এই জগত্তত্ত্ব পর্য্যালোচনা করিয়া, প্রকৃতি-পুরুষ-তত্ত্ব সিদ্ধান্ত করিয়াছেন,—জড় প্রকৃতি হইতে এবং জড় প্রকৃতির পরিণাম বুদ্ধি ইন্দ্রিয় স্থূলভূত প্রভৃতি ত্রয়োবিংশতি-তত্ত্বযুক্ত প্রকৃতি হইতে 'জ্ঞ'-স্বরূপ চেতন পুরুষের

পার্থক্য সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। সাংখ্যদর্শন পুরুষকে, এই প্রকৃতির সংসার হইতে পৃথক্ করিয়া দেখাইয়াছেন, প্রকৃত আত্মতত্ত্ব সিদ্ধান্ত করিয়াছেন; কিন্তু সেই পুরুষকে তাহার স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করেন নাই, সে সংসারাতীত রাজ্যের তত্ত্ব বুঝাইতে পারেন নাই। পাতঞ্জল দর্শন সাংখ্যশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত অবলম্বনে, কিরূপে যোগ দ্বারা পুরুষ আপনাকে প্রকৃতি হইতে পৃথক্ জানিয়া দ্রষ্টৃরূপে প্রকৃতিমুক্তভাবে অবস্থান করিতে পারে, তাহা দেখাইয়া দিয়াছেন। সাংখ্য বা পাতঞ্জল দর্শন উহার অধিক অগ্রসর হন নাই, হইতে পারেনও নাই। অনুমান-প্রমাণ দ্বারা—যুক্তি তর্কের দ্বারা ইহার অধিক আর যাওয়া যায় নাই। সাংখ্যদর্শন 'Philosophy of the Spirit' এবং 'Philosophy of Nature' বুঝাইয়া দিয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন; ঈশ্বর আছেন কি না, ব্রহ্ম আছেন কি না, পরকাল আছে কি না, এ সংসারের অতীত—প্রকৃতির অধিকারের অতীত রাজ্য আছে কি না, বা তাহা কিরূপ, তাহার সংবাদ দর্শনের শ্রেষ্ঠ সাংখ্যদর্শনও আবিষ্কার করিবার চেষ্টা করেন নাই। প্রমাণাভাবে ঈশ্বর অসিদ্ধ—ইহা বলিয়াই সাংখ্যদর্শন ক্ষান্ত হইয়াছেন। আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনে সংসারাতীত রাজ্যের তত্ত্ব বিবৃত হয় নাই। এই সকল তত্ত্ব কোন দর্শনশাস্ত্রেরই বিষয় নহে, বলিতে পারা যায়। প্রসিদ্ধ জর্ম্মাণ পণ্ডিত ক্যাণ্টও তাঁহার বিখ্যাত পুস্তকে (Critique of Pure Reason গ্রন্থে) সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, কেবল যুক্তি তর্কের দ্বারা—সাধারণ প্রমাণ দ্বারা আমাদের প্রকৃত জিজ্ঞাসার (Ideals of Reason) মীমাংসা হয় না, ঈশ্বরতত্ত্ব, আত্মতত্ত্ব, পরকালতত্ত্ব, জগতের মূলতত্ত্ব,—কিছুই জানা যায় না; সুতরাং যে সকল দর্শনশাস্ত্র এই সকল অপ্রমেয় তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহাদের চেষ্টা প্রায় ব্যর্থ হইয়াছে। তবে যাঁহারা প্রত্যক্ষ ও প্রত্যক্ষমূলক অনুমান-প্রমাণ ত্যাগ করিয়া, আত্মার স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানের উপর ও সেই ভিত্তিমূল অনুমানের উপর নির্ভর করিয়াছেন,

তাঁহারা কতকটা অগ্রসর হইয়াছেন। কিন্তু যে উপায় সাধারণ-বুদ্ধিগ্রাহ্য নহে, তাহা এই বিজ্ঞানের যুগে বড় গ্রাহ্য হয় না।

শাস্ত্রই শাস্ত্রের প্রমাণ।—বলিয়াছি ত, ইহার প্রথম উপায় শাস্ত্র-প্রমাণ। সাংখ্য-কারিকা এই প্রমাণকে "আপ্তাগম" বলিয়াছেন। শাস্ত্রে বিশ্বাস করিলে—শ্রদ্ধা করিলে, তবে আমাদের জ্ঞানপথ বা শ্রেয়োমার্গ উন্মুক্ত হয়। ভগবান্ বলিয়াছেন,—

"তস্মাৎ শাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ।"

শুধু কার্য্যাকার্য্য সম্বন্ধেই যে শাস্ত্রকে প্রামাণ্য মনে করিতে হইবে, তাহা নহে। শাস্ত্রের কেবল বিধি-নিষেধ-বাদ মাত্র যে প্রামাণ্য, তাহা নহে। ইহার অর্থবাদও প্রামাণ্য। ইহা বেদান্তদর্শনের ভাষ্যের উপক্রমণিকায় শঙ্করাচার্য্য বুঝাইয়াছেন। এই জন্য শাস্ত্রে সর্ব্বত্র বিশ্বাস করিতে হয়। শাস্ত্রে— বা শাস্ত্রজ্ঞানী গুরু বা উপদেষ্টার বাক্যে শ্রদ্ধা থাকিলে, তবে এই পরম জ্ঞান লাভ হয়। ভগবান্ বলিয়াছেন,—

"শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।"

যে শ্রদ্ধাবান্ নহে, যাহার সংশয় দূর হয় নাই, তাহার জ্ঞান লাভ হয় না; সে বিনষ্ট হয়। ভগবান্ বলিয়াছেন,—

"সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।"

অতএব আমাদের যদি এই ত্রিলোকের অন্তর্গত অতীন্দ্রিয় বিষয়ের জ্ঞান লাভ করিতে হয়, তবে বেদ ও বেদমূলক শাস্ত্রের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে হয়—বেদকে প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়। আর যদি এই ত্রিলোকের অতীত—এ সংসারের অতীত সেই প্রপঞ্চাতীত রাজ্যের সংবাদ জানিতে হয়, সে রাজ্যে প্রবেশের মার্গ অনুসন্ধান করিতে হয়, তবে বেদান্ত (উপনিষদ্) ও গীতা—এই পরা-বিদ্যারূপিণী মোক্ষশাস্ত্রের শরণ লইতে হয়—তাহাই প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়। শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে,—

"দ্বে বিদ্যে বেদিতব্য ইতি...পরা চৈবাপরা চ। তত্র অপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ। শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি। অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে।" (মুণ্ডক, ১।১।৪-৫)

শাস্ত্রার্থ-বিচার।—এই পরাবিদ্যা লাভের জন্য যে উপনিষদ্ ও গীতা প্রামাণ্যস্বরূপ গ্রহণ করিতে হয়, তাহা আমরা বেদান্তদর্শন হইতে জানিতে পারি। বেদান্তদর্শন এই উপনিষদ্ শ্রুতি ও স্মৃতি (বা) গীতা প্রমাণের উপর স্থাপিত। ইহাতে অন্য প্রমাণ গৃহীত হয় নাই। ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসায় বেদান্তদর্শনের আরম্ভ। ইহার প্রথম সূত্র 'অথাতো ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা।' জিজ্ঞাসার অর্থ—জানিতে ইচ্ছা—জানিবার জন্য ঔৎসুক্য, আগ্রহ। উপযুক্ত অধিকারী হইলে, এই আগ্রহ হয়। এই জিজ্ঞাসার ইংরাজী প্রতিশব্দ Philosophy; কারণ, এই শব্দের ধাতুগত অর্থ জ্ঞানের (sophia) প্রতি ভালবাসা (philos) অতএব ব্রহ্মজিজ্ঞাসার ইংরাজী দর্শন অনুসারে প্রতিশব্দ philosophy of Brahma or the Absolute. সে যাহা হউক, বেদান্তদর্শনের তৃতীয় সূত্র এই,—

"শাস্ত্রযোনিত্বাৎ।"

অর্থাৎ শাস্ত্রপ্রমাণ হইতেই এই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়; অন্য কোন প্রমাণের দ্বারা ইহা অধিগম্য নহে। কিন্তু শাস্ত্রে আপাততঃ অনেক বিরোধী কথা পাওয়া যায়। সুতরাং শাস্ত্রপ্রমাণ কিরূপে গ্রাহ্য হইতে পারে? বেদান্তদর্শন এই প্রশ্ন উপলক্ষ করিয়া তৃতীয় সূত্রে বলিয়াছেন,—

"তৎ তু সমন্বয়াৎ।"

শাস্ত্র-সমন্বয় দ্বারা, সমুদায় আপাত-বিরোধী কথার সামঞ্জস্য করিয়া তাহার প্রকৃত অর্থ নির্ণয় করিতে হয়। এই স্থলে যুক্তিতর্কের স্থান আছে। সুতরাং এই স্থলেও দর্শনশাস্ত্রের প্রয়োজন আছে। শাস্ত্র হইতে ব্রহ্মতত্ত্বমূলক সমুদায় তত্ত্বের মীমাংসার জন্যই বেদান্তদর্শনের

প্রয়োজন। এইজন্য ইহার নাম উত্তরমীমাংসা দর্শন। দর্শনশাস্ত্রে সিদ্ধান্ত জন্য এই প্রণালী অবলম্বনই বেদান্তদর্শনের বিশেষত্ব।

গীতার্থ-বিচার।—এই মোক্ষশাস্ত্র গীতাতেও সেইরূপ অনেক আপাত-বিরোধী কথা পাওয়া যায়, বলিয়াছি। এইজন্য অনেক স্থলে সহজে তাহার প্রকৃত অর্থ বুঝিতে পারা যায় না। যাঁহারা গীতা-শাস্ত্রে শ্রদ্ধাবান্, তাঁহাদের গীতার প্রকৃত অর্থ বুঝিতে হইলে অনেক স্থলে তর্ক ও যুক্তি দ্বারা বিচারপূর্ব্বক সমুদায় গীতাশাস্ত্র সমন্বয় করিয়া গীতার অর্থ বুঝিতে হয়—গীতার প্রাতপাদ্য ব্রহ্মতত্ত্ব ঈশ্বরতত্ত্ব সাধনাতত্ত্ব প্রভৃতি মূলতত্ত্বের অর্থ বুঝিতে হয়। এইজন্য গীতার্থ-জিজ্ঞাসু শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তির জন্য গীতার ব্যাখ্যাপুস্তকের প্রয়োজন। এক অর্থে এরূপ ব্যাখ্যাকে গীতার মীমাংসা-দর্শন বলা যাইতে পারে। এইজন্য শাঙ্করভাষ্য প্রভৃতি ভাষ্যের সার্থকতা আছে। যাঁহারা গীতা প্রামাণ্যরূপে গ্রহণ করিয়া, ইহার প্রকৃত অর্থ গ্রহণ করিতে চাহেন, তাঁহাদের এই সকল ভাষ্য বা ব্যাখ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু ইহাই যথেষ্ট নহে।

গীতার প্রকৃত অর্থ।—ইহার উপদেশের মর্ম্ম বুঝিতে হইলে, নির-পেক্ষভাবে এই সকল বিভিন্ন ব্যাখ্যাকারগণের বিভিন্ন অর্থ বিচার করিয়া, সামঞ্জস্য করিয়া, যাহা সমগ্র গীতাশাস্ত্রের তাৎপর্য্যের সহিত সঙ্গত, তাহা স্থির করিতে হয়। প্রত্যেক ভাষ্যকার বা টীকাকার গীতার কোন না কোন মূল সূত্র অবলম্বন করিয়া গীতা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শঙ্করাচার্য্য অদ্বৈতবাদ অবলম্বন করিয়া গীতা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অনেক ব্যাখ্যাকার তাঁহার অনুবর্ত্তী হইয়াছেন। এ সকল কথা পরে উল্লিখিত হইবে। রামানুজ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ অনুসারে গীতা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বল্লভসম্প্রদায় দ্বৈতাদ্বৈতবাদ অবলম্বন করিয়া গীতা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বলদেব প্রভৃতি দ্বৈতবাদ অবলম্বন করিয়া গীতা

বুঝাইয়াছেন। কেহ জ্ঞানযোগের প্রাধান্য দিয়া তদনুসারে গীতোক্ত সাধনাতত্ত্ব বুঝাইয়াছেন। কেহ ভক্তিযোগের প্রাধান্য স্বীকার করিয়াছেন, কেহ বা কর্ম্মযোগের প্রাধান্য অঙ্গীকার করিয়া গীতার যোগতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এইরূপ বিভিন্ন মূল সূত্র ধরিয়া বিভিন্ন ব্যাখ্যাকারগণ গীতার সমন্বয় করিয়াও বিভিন্নরূপ অর্থ করিয়াছেন। এইরূপে গীতার অর্থ সম্বন্ধে মতভেদ হইয়াছে। সুতরাং যতক্ষণ এই সকল বিভিন্ন অর্থের মধ্যে সমন্বয় করিবার কোন মূল সূত্র না পাওয়া যায়,—ইংরাজীতে যাহাকে Master Key বলে, সেই মূল চাবিটি যতক্ষণ না পাওয়া যায়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত প্রকৃত জিজ্ঞাসুর নিকট গীতা দুর্ব্বোধ্য থাকে। তিনি কাহার অর্থ কোথায় গ্রহণ করিবেন, তাহা স্থির করিতে পারেন না।

গীতার মীমাংসা।—বলিয়াছি ত, গীতার ভাষা সুবোধ্য ও প্রাঞ্জল হইলেও, গীতার প্রকৃত অর্থ বড় দুর্ব্বোধ্য। ইহার আরও এক কারণ আছে। সংস্কৃত ভাষার এক বিশেষত্ব এই যে, প্রত্যেক শব্দ, প্রত্যেক শ্লোক স্বতন্ত্রভাবে গ্রহণ করিলে, তাহার নানারূপ অর্থ হইতে পারে। শ্রীমদ্ভাগবতের একটি এ শ্লোকের কতরূপ অর্থ হইতে পারে, তাহা শ্রীচৈতন্যদেব মহাপণ্ডিত বাসুদেব সার্ব্বভৌমকে বুঝাইয়াছিলেন, ইহা অনেকে অবগত আছেন। সেইরূপ গীতার বিভিন্ন শ্লোকের যে বিভিন্ন অর্থ হইতে পারে, ইহা সহজে অনুমান করা যাইতে পারে। সমগ্র গীতার ভাবার্থ না গ্রহণ করিয়া, পৃথগ্‌ভাবে কোন শ্লোকের অর্থ বুঝিতে গেলে, এই সকল বিভিন্ন অর্থেরমধ্যে কোন্ অর্থ সঙ্গত, তাহা স্থির করা যায়না। ইহা ব্যতীত অনেক তত্ত্ব এরূপ সাধারণভাবে উক্ত হইয়াছে যে, তাহার ভাবার্থ গ্রহণ করা কঠিন। যেমন,—গীতোক্ত কর্ম্মে অকর্ম্ম দর্শন ও অকর্ম্মে কর্ম্ম দর্শন কিরূপে হইতে পারে, তাহা সহজে বুঝিতে পারা যায় না। আমরা আরও বলিয়াছি যে, গীতার যাহা গূঢ়ার্থ, যাহা গুহ্যতম (যাহা

Esoteric), তাহা বুঝিতে পারা যায় না। সুধু তাহাই নহে ; বিভিন্ন 'বাদ' অনুসারে সমগ্র গীতার ভাবার্থও বিভিন্নভাবে গ্রহণ করা যায়, তাহা আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। এজন্য সমগ্র গীতার ভাবার্থ কোন বিশেষ 'বাদ' অনুসারে গ্রহণ করিলে, তদনুসারে অনেক শ্লোকের সঙ্গত অর্থ পাওয়া যায় না। এইজন্য এই সকল বিভিন্ন বাদের সামঞ্জস্যের প্রয়োজন। বিভিন্ন মত অনুসারে অনেক শ্লোকেরই বিভিন্ন অর্থ হইতে পারে। এইজন্য অদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রভৃতি বিভিন্ন বাদাবলম্বনে গীতার বিভিন্ন অর্থ হইয়াছে, তাহা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। সে অর্থের মধ্যে অনেক সময় বিরোধ দৃষ্ট হয়, তাহা বলিয়াছি। সুতরাং যতক্ষণ এই সকল বিভিন্ন 'বাদ' সামঞ্জস্য করিয়া, গীতার্থ বুঝিবার প্রকৃত মূল'সূত্র না পাওয়া যায়, ততক্ষণ গীতার প্রকৃত অর্থবোধ হয় না। গীতায় অদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, কি দ্বৈতাদ্বৈতবাদ, অথবা দ্বৈতবাদ উপদিষ্ট হইয়াছে, গীতায় সাধনামার্গে জ্ঞানের প্রাধান্য, কি কর্ম্মের প্রাধান্য, কি ভক্তির প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে, অথবা এ সমুদায়ের সমন্বয় আছে, তাহা প্রথমে স্থির করিতে না পারিলে, গীতার প্রকৃত অর্থ গ্রহণ করিতে পারা যায় না। আমরা এই ব্যাখ্যায় গীতার্থ বুঝিবার জন্য যে মূলসূত্র অন্বেষণ করিয়াছি এবং যে মূলসূত্র পাইয়াছি, তদনুসারে ব্যাখ্যাকারগণের বিভিন্ন অর্থের মধ্যে কোন্ অর্থ কোথায় সঙ্গত, তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। শঙ্করাচার্য্যের কথায়, "বিবেকতঃ গীতার প্রকৃত অর্থ" নিদ্ধারণ করিতে যে চেষ্টা করিয়াছি, তাহার ফল এই ব্যাখ্যায় সন্নিবেশিত হইয়াছে। যাহা হউক, যে মূলসূত্র অবলম্বনে গীতার এই ব্যাখ্যা করিয়াছি, তাহা পরে উল্লিখিত হইবে।

গীতার্থবিজ্ঞানলাভের উপায়।—এই দুর্ব্বোধ্য গীতাশাস্ত্রের অর্থ গ্রহণ সম্বন্ধে আর এক কথা জানিতে হইবে। বলিয়াছি ত, গীতাশাস্ত্র যিনি প্রামাণ্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারেন, যিনি ভগবদ্বাক্যে

শ্রদ্ধাবান্, তাঁহারই গীতার প্রকৃত অর্থ জানিবার জন্য আগ্রহ হইতে পারে, তাঁহারই নিকট গীতার প্রকৃত অর্থ প্রকাশিত হইতে পারে। কিন্তু গীতার অর্থজ্ঞানই যথেষ্ট নহে। জ্ঞান যাহাতে বিজ্ঞানে পরিণত হয়, যাহাতে এই জ্ঞান অপরোক্ষ হয়, তাহা করিতে হইবে। বেদান্তশাস্ত্রানুসারে প্রথমে শ্রবণ, পরে মনন, তাহার পর নিদিধ্যাসন বা ধ্যান দ্বারা এই অপরোক্ষ জ্ঞান বা বিজ্ঞান লাভ হয়। গীতা শ্রবণের পর যেরূপে তাহার মনন করিতে হয়, যেরূপে বিচার করিয়া তাহার অর্থ নিশ্চয় করিতে হয়, তাহা এ ব্যাখ্যায় উল্লিখিত হইয়াছে। গীতার সমস্ত ভাষ্য টীকা প্রভৃতি এই মননের অনুকূল। তাহার পর নিদিধ্যাসন বা ধ্যান দ্বারা যেরূপে সে অর্থ দর্শন করিতে হয়—তাহা অপরোক্ষানুভবসিদ্ধ করিতে হয়, এক্ষণে তাহা বুঝিতে হইবে। তাহা বুঝিতে হইলে, আমাদের জ্ঞানলাভের যে সকল বিভিন্ন উপায় (methods) প্রচলিত আছে, তাহা সংক্ষেপে বুঝিতে হইবে।

বৈজ্ঞানিক উপায় অর্থাৎ বাহ্য বিষয় সম্বন্ধে পর্যবেক্ষণ (observation) এবং পরীক্ষা (experiment) সেই বিষয় সম্বন্ধে বিজ্ঞান লাভের উপায়। বাহ্য বিষয়জ্ঞান লাভের মূল প্রমাণ প্রত্যক্ষ। তথাপি সে সকল বিষয়ের তত্ত্ব বা বিজ্ঞান লাভ করিতে হইলে, অনুমান-প্রমাণের উপর নির্ভর করিতে হয়। কিন্তু দর্শনশাস্ত্রের মূল প্রমাণ অনুমান। অনুমানপ্রমাণ প্রধানতঃ তিনরূপ; তাহাদের মধ্যে কারণ হইতে কার্য্যের অনুসন্ধান (পূর্ব্ববৎ) ও কার্য্য হইতে কারণের অনুসন্ধান (শেষবৎ) প্রধান। শেষবৎ অনুমানকে ইংরাজীতে Inductive বা *a posterior* method এবং পূর্ব্ববৎ অনুমানকে ইংরাজীতে Deductive বা *a prior* method বলে। অন্যরূপ অনুমানের নাম সামান্যতঃ দৃষ্ট। তাহার ইংরাজী নাম analogy। দর্শনশাস্ত্রে প্রায়শঃ এই তিনরূপ অনুমানই গৃহীত হইয়া থাকে। সামান্যতঃ দৃষ্ট অনুমান এক অর্থে উক্ত

Inductive methodএর অন্তর্গত। এই প্রমাণ অবলম্বন করিয়া দর্শনশাস্ত্র অজ্ঞেয়তত্ত্ব সিদ্ধান্ত করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু বলিয়াছি ত, এই উপায়ে দর্শনশাস্ত্র অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারেন নাই। তত্ত্বজ্ঞানার্থ দর্শনের জন্য এ সকল উপায় ব্যতীত অন্যরূপ উপায়ও গৃহীত হইয়া থাকে। তাহার মধ্যে এক উপায়ের নাম Dielectic বা method আর এক উপায়ের নাম ইংরাজীতে Comparative বা Historico-comparative method। ইহাও প্রত্যক্ষ ভূয়োদর্শন ও অনুমানমূলক। বলিয়াছি ত, এই সকল উপায়ের মধ্যে কোন উপায়েই প্রকৃত পরমার্থ-তত্ত্বজ্ঞান সিদ্ধ হয় না। আধুনিক দর্শন যে Principles of Identity and Contradiction অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হন, তাহাতেও এই অজ্ঞেয় রাজ্যে অধিক দূর অগ্রসর হওয়া যায় না। অনেক বুদ্ধির বা বৃত্তিজ্ঞানের স্বতঃসিদ্ধ ধারণার উপর বা categories অর্থাৎ কতকগুলি মূলতত্ত্বের উপর নির্ভর করিয়া অগ্রসর হইতে চাহেন। কিন্তু তাঁহারাও যুক্তিতর্কের সহায়ে কখন বা কল্পনার লঘুত্বের উপর নির্ভর করিয়া অগ্রসর হন। তাই তাঁহারাও অধিক দূর যাইতে পারেন না।

অতএব জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, গীতার্থ সম্বন্ধে শাস্ত্রপ্রমাণজনিত জ্ঞান ব্যতীত কি তাহার বিজ্ঞান বা অপরোক্ষ জ্ঞান অসম্ভব? না, তাহা অসম্ভব নহে। বলিয়াছি ত, যে, অজ্ঞেয় অগম্য অপ্রমেয় বিষয়ে প্রত্যক্ষ বা অনুমান-প্রমাণের স্থান নাই, সেখানে একমাত্র শাস্ত্রপ্রমাণই মূল ভিত্তি। শাস্ত্রকে Revelation বা ঈশ্বরোক্তি বা অপৌরুষেয় জ্ঞানের অভিব্যক্তিরূপে বিশ্বাসই তাহার একমাত্র মূল ভিত্তি। ইহাকে ইংরাজীতে faith বা belief বলে। ইহার উপর পাশ্চাত্য faith philosophy কতকটা প্রতিষ্ঠিত। অজ্ঞেয় অপ্রমেয় বিষয়ে শাস্ত্রের উপদেশে দৃঢ় বিশ্বাস, শ্রদ্ধা বা নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিই এই জ্ঞানের ভিত্তি। তাহার পর যোগের দ্বারা সেই শাস্ত্রোপদিষ্ট জ্ঞেয় বিষয়কে প্রত্যক্ষ করিতে

পারিলে যে পরম জ্ঞান লাভ হয়, তাহা দ্বারাই সে জ্ঞান বিজ্ঞানে পরিণত হয়, শাস্ত্রদৃষ্টি যোগদৃষ্টিতে বা অপরোক্ষানুভূতিতে পরিণত হয়।

যোগজ প্রত্যক্ষ।—ঋষিদের যোগজ প্রত্যক্ষের ফল বলিয়া বেদাদি শাস্ত্র প্রমাণ। এই ধ্যানজ সিদ্ধির ইংরাজী নাম Illumination, Inspiration বা Divination। যাঁহারা আপ্তঋষি, সেই মহাপুরুষগণই পূর্ণরূপে এই যোগদৃষ্টি লাভ করিয়া "ত্রিকালদর্শী" সর্ব্বতত্ত্ববিৎ হইয়াছিলেন। তাঁহারাই পূর্ণরূপে inspired বা illuminated ছিলেন। পাশ্চাত্য দেশে এরূপ মহাপুরুষদিগকে Prophet, Seer প্রভৃতি আখ্যায় অভিহিত করে। আমরা তাঁহাদিগকে আপ্তঋষি বলি। ইঁহারাই শাস্ত্রদ্রষ্টা। বেদ অপৌরুষেয় হইলেও, এই সর্ব্বদর্শী ঋষিগণই মন্ত্রদ্রষ্টা হইয়া বেদমন্ত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন। যাহা সত্য, যাহার উপর এ জগৎ প্রতিষ্ঠিত, ঋষিগণ সেই সত্য আবিষ্কার করিয়া বেদমন্ত্ররূপে অভিব্যক্ত করিয়াছেন। যে অনন্ত জ্ঞান 'বহু হইব' কল্পনা করিয়া নামরূপ দ্বারা সে কল্পনার অভিব্যক্তি করেন, ও বাক্ বা শব্দরূপে সেই নাম প্রকাশ করেন, ও এই নামরূপময় জগৎ প্রকাশ করিয়া তাহা ধারণ করেন ও তাহাতে ওতপ্রোত থাকেন, যে অনন্ত জ্ঞান বেদ নামে শাস্ত্রে প্রধানতঃ অভিহিত, সেই অনন্ত জ্ঞান, ঋষিগণের নির্ম্মল অন্তঃকরণে প্রতিবিম্বিত হইয়া বেদমন্ত্ররূপে বা শ্রুতিরূপে আমাদের নিকট প্রকাশিত (revealed) হইয়াছে। এইরূপে revelation বলিয়াই বেদাদি শাস্ত্রের প্রামাণ্য। *

---

* প্রসিদ্ধ ফরাসিদেশীয় পণ্ডিত কুঁজে (Cousin) তাঁহার History of Philosophy গ্রন্থে বলিয়াছেন—

"Inspiration is distinct from reflection. It is the perception of truth, without the intervention of will, and without mixture of personality. It is revelation, and it is characterised by enthusiasm. It comes directly from God—the Eternal Reason.

"The spontaneous and intuitive thought begins to act by its

গীতাশাস্ত্রের প্রামাণ্য। গীতা শ্রেষ্ঠ Revelation।— এইরূপে বেদাদি শাস্ত্রের প্রামাণ্য হইলেও গীতার প্রামাণ্য কেন, তাহা প্রমাণরূপে গ্রহণ করিতে হইবে কেন, আর কেনই বা তাহাতে শ্রদ্ধা বা দৃঢ় বিশ্বাস করিতে হইবে, তাহা জিজ্ঞাস্য হইতে পারে। যাঁহারা গীতাকে ভগবানের

---

own power and gives to us at first ourselves the world and God, which little by little becomes clear by reflection and analysis

"Spontaneous reason comes directly by inspiration from God—the Absolute Reason of which we are part.

"Truth is distinct from Reason, and Reason is distinct from ourselves. The reason is not subjective . . .The character of the spontaneity in Reason is the demonstration of the independence of Truth perceived by Reason... without doubt there are natures more fortunately endowed, in which inspiration manifests itself more brilliantly .. . but thought developes itself spontaneously in all thinking beings.

"All thought implies a spontaneous faith in God", says Leibtneitz "Reason developes itself in two ways—Spontaneity or Reflection. Spontaneity scarcely admits of any essential difference. Therefore the striking differences which are seen in the human race must spring from reflection.

* * *

"By laying hold of Spontaneity, reflection places itself at the source, and on the limit of religion and philosophy, thereby it makes thus a kind of compromise, between religion and philosophy. This compromise is *mysticism.*

"The character of inspiration is, (1) it is primitive that is anterior to reflection, (2) it is accompanied by unbounded faith, (3) it is vivifying, and sanctifying, and it diffuses the soul with sentiment of love

"Inspiration has only a place in the silent operation of the understanding. Ratiocination kills inspiration. So for fired inspiration, it is necessary to suspend other faculties. Turn this into a principle and habit, and soon you arrive at the disdain of all other faculties

উক্তি বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারেন, তাঁহাদের এ প্রশ্ন হইতে পারে না। শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন,—

"তং ধর্ম্মং ভগবতা যথোপদিষ্টং বেদব্যাসঃ সর্ব্বজ্ঞো ভগবান গীতাখ্যৈঃ সপ্তভিঃ শ্লোকশতৈঃ উপনিববন্ধ।"

---

of human nature. We then care very little for the gross senses which hinder and obscure inspiration,"

বিলাতী দার্শনিক পণ্ডিত H. G. Atkinson ও H. Martineau তাঁহাদের কৃত 'Laws of Man's Nature and Development' গ্রন্থে বলিয়াছেন,—

"Bacon classified Divination as artificial and natural. Natural divination is again divided into primitive (yoge) and reflectional (illumination by God-wisdom).

"Emerson speaking of Divination says that this is ecstacy of the ancients, and trance of the saints of beatitude, the flight, the alone to the alone (Plotinus). The trance of Socrates, Plotinus, Porpyary, Brehmanu, Bunyan, Fox, Pascal, Guiox, Swedenborg are facts.

"Emerson in his Discourse on Plato quoting Supreme Krishna's words to Arjuna says--"You are fit to apprehend that you are not distenct from me. That which I am thou art, and that also is the world with its gods heroes and mankind. Man contemplates distinction because they are stupefied with ignorance."

বেদমন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণ যে অমানুষী প্রতিভাবলে, অদ্ভুত যোগজ প্রত্যক্ষবলে গূঢ়তত্ত্ব সকল দর্শন করিয়া বেদমন্ত্র সকল প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেই ঋষিগণ সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ জর্ম্মাণ পণ্ডিত সপেনহর যাহা বলিয়াছেন, তাহা এস্থলে উদ্ধৃত হইল,—

"Yet in the early ages, those who stood nearer to the beginning of the human race, had both greater energy of the intuitive faculties and a truer disposition of the mind, so that they were capable of a purer, more direct comprehensions of the inner Being of Nature and were thus in a position to satisfy the metaphysical need in a more worthy manner. Thus originated in the primitive ancestors of the Brahmans, *Rishis*, the almost superhuman conceptions, which were afterwards set down in the Upanishads of the Vedas."

Schopenheauer's World as Will and Idea, Vol. II. p. 362.

অর্থাৎ সেই ধর্ম্ম ভগবান্ বাসুদেব—নারায়ণ যেরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন, সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ বেদব্যাস তাহা সপ্তশতশ্লোকযুক্ত গীতায় উপনিবদ্ধ করিয়াছেন। মহাভারতে গীতাপর্ব্বাধ্যায়ে প্রত্যেক অধ্যায়-শেষে গীতাকে 'উপনিষদ্' বা শ্রুতি বলা হইয়াছে। ইহা সর্ব্বোপনিষৎ-সার, এবং গীতা মহাভারতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া ইহাকে স্মৃতিও বলা হইয়াছে, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। গীতা, শ্রুতি বা স্মৃতি এবং ইহা শ্রুতির ন্যায় প্রামাণিক; ইহার একমাত্র কারণ, ইহা সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বজ্ঞানের উৎস, সত্যস্বরূপ শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক উক্ত, এবং বেদব্যাস সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া, তাহা যোগবলে জানিয়া, সেই 'যথোপদিষ্ট' শাস্ত্র এই সপ্তশতশ্লোকময়ী

পণ্ডিত সপেন্‌হর্ অন্য স্থলে বলিয়াছেন,—

"To those sublime authors of the Upanishads of the Vedas, who can scarcely be thought of as mere men, we must ascribe this immediate illumination of their mind, to the fact, that these wise men standing nearer the origin of our race in time, comprehended the nature of things more clearly and profoundly than the already deteriorated race ...is able to do."

Schopenheauer's World as Will and Idea, Vol. III. p, 265.

পণ্ডিত সপেন্‌হর্ বেদ সম্বন্ধে উক্ত পুস্তকে বলিয়াছেন,—

"Vedas the fruit of the highest human knowledge and wisdom."

সপেন্‌হর্ উপনিষদ্ সম্বন্ধেও বলিয়াছেন,—

"How thoroughly does the Upanishat (উপনিষৎ) breathe the holy spirit of the Vedas, and how does every one who by diligent perusal has familiarised himself with ..this incomparable book, feel himself stirred to his innermost by that spirit. And Oh! how the mind is here washed clean of all its early engrafted Jewish superstition, and all philosophy servile to that superstition! It is the most profitable, and the most elevating reading, which is possible in the world. It has been the consolation of my life, and will be the consolation of my death."

Schopenheauer's Paregra, Vol. II. Sec, 185.

গীতায় উপনিবদ্ধ করিয়াছেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যোগস্থ হইয়া সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বগুরু, অনাদিকাল-প্রবর্ত্তিত সর্ব্বজ্ঞানের আকর, পরমেশ্বর পুরুষোত্তম ভাবে যে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহাই গীতায় নিবদ্ধ হইয়াছে। এজন্য গীতা শ্রেষ্ঠ revelation।

ভগবান্ পূর্ব্বে বেদমন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি দ্বারা প্রচারিত ও অন্য ঋষি কর্ত্তৃক উক্ত সার সত্য গীতায় 'সমাসতঃ' বা সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়াছেন, এবং যে তত্ত্ব পূর্ব্বে কোন ঋষি দর্শন করেন নাই, তাহাও মুমুক্ষুর জন্য উপদেশ দিয়াছেন। ব্রহ্মতত্ত্ব, পুরুষতত্ত্ব, ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞতত্ত্ব প্রভৃতি পূর্ব্বে পূর্ব্বে যেরূপে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা ভগবান্ অতি সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন,—

"ঋষিভির্বহুধা গীতং ছন্দোভির্বিবিধৈঃ পৃথক্।
ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব হেতুমদ্ভির্বিনিশ্চিতৈঃ॥"

আর যে তত্ত্ব পূর্ব্বে উপদিষ্ট হয় নাই, তাহা 'নিজের মত' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বিশেষতঃ পরম জ্ঞান, পরম পদ লাভের জন্য যে 'যোগ' বা সাধনা, সেই মার্গ শ্রীভগবান্ই গীতায় প্রথম দেখাইয়া দিয়াছেন। ভগবান্ বলিয়াছেন,—

"ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্।
* * *
স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরন্তপ॥
স এবায়ং ময়া তেঽদ্য যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ।
ভক্তোঽসি মে সখা চেতি রহস্যং হ্যেতদুত্তমম॥"

(গীতা ৪।১-৩)

এই পরম উত্তম যোগ-রহস্য—এই পরমপদ লাভ করিবার মার্গ অব্যয়, পরমেশ্বর শ্রীভগবান্ কর্ত্তৃকই উপদিষ্ট (revealed) হইয়াছে। সে যোগপথ প্রাপ্ত না হইলে, পূর্ব্ব-ঋষিগণ কর্ত্তৃক প্রকাশিত

ব্রহ্মতত্ত্ব, আত্মতত্ত্ব প্রভৃতি মূল তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াও মুক্তিপথে যাওয়া যায় না, পরমপদলাভ হয় না। ঋষিগণ সেই পরমপদে যোগস্থ বা একীভূত হইয়া, সেই তত্ত্ব দর্শন করিয়া যে উপদেশ দিয়াছেন, তাহার পরোক্ষ জ্ঞান দ্বারা মুক্তি হয় না। তাহা যেরূপে প্রত্যক্ষ করিয়া সেই পদ লাভ করিতে হয়, ভগবান্ তাহা প্রকাশ না করিলে, মানব নিজ জ্ঞানে তাহা আবিষ্কার করিতে পারিত না। ইহাই গীতার শ্রেষ্ঠ revelation।

অতএব শ্রুতি স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্র প্রত্যক্ষ সত্য প্রকাশ করে বলিয়া—তাহা revelation বলিয়া আমাদের প্রামাণ্য। তাহার মধ্যে গীতা প্রপঞ্চাতীত তত্ত্ব ও পরমপদপ্রাপ্তির উপায় উপদেশ সম্বন্ধে স্বয়ং ভগবানের উক্তি বলিয়া শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। শাস্ত্র যুক্তিতর্কের উপর স্থাপিত নহে বলিয়াই প্রামাণ্য। তাহা ব্যক্তিবিশেষের নিজের মত নহে বলিয়াই প্রামাণ্য। *

---

* এস্থলে অনেকে বলিতে পারেন যে,—শাস্ত্র যখন নানারূপ, যখন তাহাতে নানারূপ উপদেশ আছে, তখন শাস্ত্রের কোন্ কথা প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইবে? মহাভারতে বক যুধিষ্ঠির-সংবাদে যুধিষ্ঠির বলিয়াছেন,—

> বেদা বিভিন্নাঃ স্মৃতয়ো বিভিন্না নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্।
> ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ॥"

অতএব যখন বেদ বিভিন্ন, স্মৃতি বিভিন্ন, যখন নানা মুনির নানা মত, তখন কাহাকে বিশ্বাস করিব? কিন্তু উক্ত শ্লোকের প্রকৃত অর্থ বুঝিলে, আর এ আপত্তি থাকে না।

বেদ বিভিন্ন ও নানা কথায় বিভক্ত সত্য; কিন্তু সে বিভেদের অর্থ স্বতন্ত্র। কর্ম্মকাণ্ড-মূলক বেদে বিভিন্ন অধিকারীর উপযুক্ত বিভিন্নফলপ্রদ বিভিন্ন কর্ম্ম উপদিষ্ট হওয়ায় বিভিন্ন যজ্ঞাদি ব্যাপারে হোতা উদ্গাতা অধ্বর্যু প্রভৃতির বিভিন্ন কার্য্য ঋক্ প্রভৃতি বিভিন্ন বেদে বিবিবদ্ধ থাকায়, এবং বিভিন্ন হওয়ায় বেদের এই বিভেদ হইয়াছে। অধিকারী অনুসারে, কর্ম্মবিভেদ অনুসারে বেদমূলক স্মৃতিরও বিভেদ হইয়াছে। যাহারা এই সকল শাস্ত্রার্থ সমন্বয় করিবার মূলসূত্র পাইয়াছেন, তাঁহাদের নিকট কোন বিরোধ থাকে না।

মুনিগণের মতভেদের কারণ সহজে বুঝা যায়। মিনিঃমুনি—তিনি মননশীল, তিনি Philosopher মাত্র। তিনি নিজের বুদ্ধির উপর—যুক্তিতর্কের উপর নির্ভর করিয়া

যোগজ প্রত্যক্ষ দ্বারা শাস্ত্রার্থ বিজ্ঞান লাভ।—যাহা হউক, শাস্ত্র-প্রমাণ হইতে আমরা যে জ্ঞান লাভ করিতে পারি, তাহা পরোক্ষ জ্ঞান। তাহা বিজ্ঞান নহে। পরোক্ষ জ্ঞান যতক্ষণ অপরোক্ষ না হয়, যতক্ষণ সত্য প্রত্যক্ষ না হয়, যতক্ষণ তাহাকে প্রত্যক্ষ (Realization) দ্বারা সম্পূর্ণ আপনার করিয়া লওয়া না যায়, ততক্ষণ জ্ঞান-সিদ্ধি হয় না। বলিয়াছি ত, তাহার উপায়—তর্ক যুক্তি নহে, তাহার উপায়—বাদ বিবাদ বিতণ্ডা নহে,—সাধারণ প্রত্যক্ষ অনুমানাদি প্রমাণ দ্বারা তাহা প্রমেয়

তত্ত্বমীমাংসা করিতে চেষ্টা করেন। যখন মুনিগণ যোগরূপ উপায়ে প্রকৃত তত্ত্বদর্শন করিতে পারেন, তখন আর এই পারমার্থিক-তত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁহাদের নানা মত থাকে না। ভগবান্ বলিয়াছেন,—

"আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং কর্ম্ম কারণমুচ্যতে।
যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে॥"

অর্থাৎ যে মুনি (বা যে Philosopher,) যোগরূপ উপায়ে বিজ্ঞান লাভ করিতে চাহেন, তাঁহাকে যোগের প্রথম সোপান নিষ্কাম কর্ম্মযোগ অনুষ্ঠান করিতে হইবে। তাহা দ্বারা যোগপথে অগ্রসর হইতে পারিলে—'শম-দমাদি'-সাধন-সম্পত্তি-যুক্ত হইতে পারিলে, তবে তিনি নির্ম্মলচিত্তে হৃদয়-গুহায় প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিতে পারিবেন, এবং তাহার পর ধ্যানযোগ দ্বারা সে জ্ঞানে সিদ্ধ হইতে পারিবেন। তাহা হইলে আর নানা মুনির নানা মত থাকে না।

তাই মহাভারতে উক্ত শ্লোকে উপদিষ্ট হইয়াছে যে, প্রকৃত ধর্ম্মতত্ত্ব হৃদয়-গুহায় নিহিত। (এই হার্দ্দবিদ্যা বা দহরবিদ্যা পরে ব্যাখ্যায় বিবৃত হইবে)। যিনি যোগবলে সেই হৃদয় গুহায় অবস্থিত হইতে পারেন, তিনি প্রকৃত ধর্ম্ম-তত্ত্ব—প্রকৃত বিজ্ঞান সহিত জ্ঞান লাভ করিতে পারেন। মহাজন বা মহাপুরুষগণ (মহাপুরুষ অর্থে বহুজন নহে) এই যোগপথে হৃদয়-গুহায় যোগস্থ হইয়াই পরমতত্ত্ব লাভ করিয়াছিলেন। তাহাই প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানলাভের—তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনের একমাত্র পন্থা।

অতএব নানা মুনির নানা মত ততদিন,—যতদিন যোগ সংসিদ্ধি দ্বারা তাঁহারা বিজ্ঞান সহিত তত্ত্বজ্ঞান লাভ না করেন, তত্ত্বজ্ঞানার্থ দর্শন না করেন। বলা বাহুল্য যে, এই শ্লোকে যে পন্থা ইঙ্গিতে উক্ত হইয়াছে, তাহা গীতাতেই বিবৃত হইয়াছে। সে যাহা হউক, আমরাও এইরূপে বুঝিতে পারি যে, এই বিরোধের আপত্তি হেতু শাস্ত্রকে প্রামাণ্যরূপে গ্রহণ না করিবার কোন কারণ নাই।

নহে। তাহার একমাত্র উপায় 'যোগ'। তাহার জন্ম যোগ-দৃষ্টি লাভ করিতে হয়। তাহা অতীন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ দ্বারা জানিতে হয়। বেদান্ত-বিজ্ঞান লাভের জন্য এই প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ। বেদান্ত-পরিভাষায় ইহা বিবৃত হইয়াছে। এস্থলে তাহার উল্লেখের প্রয়োজন নাই।

অতএব যদি আমাদের শাস্ত্রার্থ প্রকৃতরূপে জানিতে হয়, তবে শাস্ত্রার্থ প্রত্যক্ষ করিতে হয়,—'তত্ত্বজ্ঞানার্থ' দর্শন করিতে হয়। তাহার জন্য 'যোগজ' প্রত্যক্ষ লাভ করিতে হয়। যে যতদূর এই যোগজ প্রত্যক্ষ লাভ করিতে পারে, সে ততদূর শাস্ত্রার্থ দর্শন করিতে সমর্থ হয়। ঋষিগণ যে যোগজ প্রত্যক্ষ লাভ করিয়া ত্রিকালদর্শী হইয়াছিলেন, সাধনা দ্বারা আমরা সে যোগজ প্রত্যক্ষ কতক লাভ করিতে পারি। আমরা যদি চিত্তকে উপযুক্তরূপে নির্ম্মল করিতে পারি, তবে আমরাও এই দর্শন (এই Illumination বা Inspiration) লাভ করিতে পারি।

শ্রুতি বলিয়াছেন, ইহার জন্য ব্রহ্মচর্য্য ও মননের প্রথম প্রয়োজন। ছান্দোগ্য উপনিষদে ইন্দ্র-বিরোচন-সংবাদে (৮।৭-১১ খণ্ডে) ইহার ইঙ্গিত আছে। এস্থলে তাহার উল্লেখের প্রয়োজন নাই। তত্ত্ববিজ্ঞান লাভের পথ—এই যোগ। গীতায় এই যোগ-পথ দেখাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

গীতোপদিষ্ট যোগপথ।—যদি আমরা এ যোগপথ অবলম্বন করিতে পারি, তবে আমরা ক্রমে সেই ত্রিকালদর্শী ঋষিদের জ্ঞান,—তাঁহাদের সেই ত্রিকালব্যাপী দৃষ্টি—লাভ করিতে পারি; এবং ক্রমে যোগ-সংসিদ্ধ হইলে, ঈশ্বরভাব প্রাপ্ত হইয়া ঈশ্বরে বা ব্রহ্মে যোগযুক্ত হইতে পারি। যিনি শ্রেয়ঃপ্রার্থী, জ্ঞানপ্রার্থী এবং জ্ঞানদ্বারা মুক্তিপ্রার্থী তাঁহাকে এই যোগপথ অবলম্বন করিতে হইবে। ইহাই নিঃশ্রেয়স সিদ্ধির উপায়।

শ্রেয়ঃপ্রার্থী, জ্ঞানপ্রার্থী দৈবী-সম্পদ্‌যুক্ত সাধককে প্রথমে নিষ্কাম

কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠান করিতে হইবে। তাহা দ্বারা ক্রমে ক্রমে চিত্তের মলা দূর হইতে থাকিবে। তিনি ক্রমে কাম-ক্রোধ, রাগ-দ্বেষ-বিমুক্ত হইবেন। তাঁহার মান, দম্ভ, দর্প, অহঙ্কার, ক্রমে দূর হইতে থাকিবে। তখন তাঁহার বুদ্ধি জ্ঞানস্বরূপ হইবে। ভগবান্ বলিয়াছেন,—

"অমানিত্বমদম্ভিত্বমহিংসা ক্ষান্তিরার্জ্জবম্।
আচার্য্যোপাসনং শৌচং স্থৈর্য্যমাত্মবিনিগ্রহঃ॥
ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যমনহঙ্কার এব চ।
জন্মমৃত্যুজরাব্যাধি দুঃখদোষানুদর্শনম্॥
অসক্তিরনভিষঙ্গঃ পুত্রদারগৃহাদিষু।
নিত্যঞ্চ সমচিত্তত্বমিষ্টানিষ্টোপপত্তিষু॥
ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী।
বিবিক্তদেশসেবিত্বমরতির্জনসংসদি॥
অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্।
এতজ্‌জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোঽন্যথা॥"

(গীতা ১৩।৭-১১)

ইহা হইতে চিত্তের 'অজ্ঞান' কাহাকে বলে, এবং 'জ্ঞান' কাহাকে বলে, তাহা আমরা জানিতে পারি। অমানিত্বাদি জ্ঞানসাধন দ্বারা চিত্ত নির্ম্মল জ্ঞানস্বরূপ হইলে, ভগবানে অব্যভিচারিণী ভক্তি, অধ্যাত্ম-জ্ঞানে নিত্য স্থিতি ও তত্ত্বজ্ঞানার্থ-দর্শনরূপ বিজ্ঞান আপনিই প্রকাশিত হয়। তখন বুদ্ধি আপনার শুদ্ধ সাত্ত্বিক নির্ম্মল স্বচ্ছ স্বরূপে অবস্থান করিতে পারে। নিষ্কাম কর্ম্মযোগ সাধন দ্বারা বুদ্ধি ক্রমে নির্ম্মল হইয়া এই জ্ঞানরূপ হয়। তখন পরম জ্ঞান বা পরম জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম সেই নির্ম্মল চিত্তে আপনি প্রকাশিত বা বিম্বিত হন। ভগবান্ বলিয়াছেন—

"জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মনঃ।
তেষামাদিত্যবজ্‌জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎপরম্॥ (গীতা, ৫।১৬)

এইরূপে নিষ্কাম কর্ম্ম সাধনা দ্বারা চিত্ত নির্ম্মল হইলে, তাহাতে জ্ঞান-সূর্য্য আপনিই প্রকাশিত হয়। অতএব নিষ্কাম কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠান তাহার প্রধান সাধন। কর্ত্তব্য কর্ম্ম যে অনুষ্ঠেয়, তাহা যুক্তি দ্বারা বুঝাইতে হয় না। তবে কোন্ কর্ম্ম কর্ত্তব্য ও কোন্ কর্ম্ম অকর্ত্তব্য, তাহা অনেক স্থলে শাস্ত্র হইতে জানিতে হয়। ('তস্মাৎ শাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্য্যাকার্য্য ব্যবস্থিতৌ'—গীতা ১৩।২৪।) কর্ত্তব্য কর্ম্ম যে অনুষ্ঠেয়, তাহা আমাদের অন্তরে (I ought) এই 'বিবেক' বাণী যিনি শুনিতে পান, তাঁহাকে বুঝাইয়া দিতে হয় না। চিত্ত নিষ্কামকর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা ক্রমে নির্ম্মল হইলে, তখন অধিকারী হইয়া জ্ঞান লাভের জন্য আগ্রহ হয়, প্রকৃত জিজ্ঞাসার উদয় হয়। তখন 'জ্ঞান-যজ্ঞ' অনুষ্ঠান করিতে হয়। সেই 'জ্ঞান-যজ্ঞ' কি, তাহা এ স্থলে বলিতে হইবে না। ভগবান্ বলিয়াছেন,—জ্ঞান-যজ্ঞের মধ্যে গীতাপাঠ ও গীতার অর্থ গ্রহণ জন্য প্রযত্নও অন্যতম। তাহার পর যোগানুষ্ঠান দ্বারা যোগসংসিদ্ধি হইলে প্রকৃত পক্ষে এই জ্ঞান লাভ হয়,—জ্ঞান অপরোক্ষ জ্ঞানে বা বিজ্ঞানে পরিণত হয়। ভগবান্ বলিয়াছেন,—

"ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।
তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি॥" (গীতা, ৪।৩৮)

অতএব যোগসংসিদ্ধ হইলে যথাকালে এই জ্ঞান চিত্তে আপনি প্রতিভাত হয়, তত্ত্বজ্ঞানার্থ-দর্শন সিদ্ধ হয়। তাহার জন্য আর অন্য পথ নাই। ভগবান্ সপ্তম হইতে দ্বাদশ অধ্যায়ে ঈশ্বরতত্ত্ব বুঝাইয়াছেন, কিন্তু বলিয়াছেন যে, বিজ্ঞান সহিত এই জ্ঞান লাভের উপায়—যোগ, বিশেষতঃ ভক্তিযোগ।

"ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুঞ্জন্ মদাশ্রয়ঃ।
অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যসি তৎ শৃণু॥ (গীতা, ৭।১)

অতএব এই যোগপথই গীতোক্ত জ্ঞান বা পরাবিদ্যা লাভের উপায়। অপরোক্ষ জ্ঞান লাভের আর অন্য পন্থা নাই। (পাশ্চাত্য দর্শনের কথায় ইহাই একমাত্র method)। এই যোগতত্ত্ব পরে বিবৃত হইবে।

যোগ দ্বারা গীতার্থ বিজ্ঞান লাভ।—অতএব এই বিজ্ঞানলাভের জন্য প্রথমে নিষ্কাম কর্মযোগানুষ্ঠান দ্বারা চিত্তকে নির্ম্মল করিতে হয়। তখন প্রকৃত অধিকারী হওয়া যায়। চিত্ত নির্ম্মল হইলে জ্ঞানযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে হয়, গীতা পাঠ ও গীতার্থ গ্রহণ করিবার জন্য প্রযত্ন করিতে হয়। গীতাপ্রমুখ মোক্ষ-শাস্ত্রের প্রকৃত অর্থ প্রথমে না বুঝিতে পারিলে, তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শন সম্ভব হয় না, প্রকৃত জ্ঞান লাভও হয় না—যে জ্ঞান হইতে মুক্তি হয়, তাহা সিদ্ধ হয় না। এই জন্য গীতার আবৃত্তিমাত্র যথেষ্ট নহে, এবং গীতার কেবল বাক্যার্থ গ্রহণও যথেষ্ট নহে। প্রথমে গীতার প্রকৃত তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে হয়। গীতোপদিষ্টমার্গে সাধন করিতে হয়। সাধনায় সিদ্ধ হইলে গীতার্থ-বিজ্ঞান লাভ হয়। গীতার প্রকৃত অর্থ গ্রহণ করিতে পারিলে, তবে ধ্যানযোগ অবলম্বনপূর্ব্বক সেই জ্ঞানার্থ দর্শন করিয়া, তাহাতে নিত্য স্থিতি লাভ করিবার জন্য যে সাধনাপথ তাহা শ্রেয়ঃপ্রার্থী সাধকের নিকট উন্মুক্ত হয়।

গীতার্থ জ্ঞানের অধিকারী।—কিন্তু প্রকৃত অধিকারী না হইলে গীতা পাঠ বা গীতার্থ গ্রহণ চেষ্টা সকলই বিফল হয়। গীতা পাঠ করিয়া যাহার কর্ম্মযোগানুষ্ঠানে প্রবৃত্তি না হয়, তাহার গীতাপাঠ বা গীতার অর্থ জানিবার চেষ্টা বিফল। কেন না, নিষ্কামকর্ম্মযোগের অনুষ্ঠানদ্বারা চিত্ত যত নির্ম্মল হইতে থাকে, ততই গীতা পাঠ করিতে করিতে তাহার অর্থ চিত্তে প্রকাশিত হইতে থাকে। ভগবান্ যাহাকে অনুকম্পা করেন, তাহার নিকট গীতার্থ ক্রমে প্রতিভাত হয়। যাহারা ভগবান্‌কে বিশ্বাস করিয়া তাঁহার শরণ লয়, প্রীতিপূর্ব্বক তাঁহাতে সতত অভিযুক্ত হইয়া ভজনা করে, ভগবান্ তাহাদিগকে বুদ্ধিযোগ প্রদান করেন, তাই সেই সকল ভক্ত জ্ঞানী গীতার্থ ক্রমে বুঝিতে পারে। ভগবান্ বলিয়াছেন,—

"তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা॥" গীতা (১০।১১)

ভগবান্ সর্ব্বহৃদয়ে অবস্থিত। তিনি সকলকে পরিচালিত করেন। তাঁহার পরিচালনায় সকলেই কর্ম্মে প্রেরিত হয়। তাঁহারই পরিচালনায় যে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক জ্ঞান লাভার্থ যত্ন করে, সে অধিকারী হইয়া গীতার্থ ক্রমে বুঝিতে পারে।

যিনি এইরূপে গীতার অর্থজ্ঞানলাভের প্রকৃত অধিকারী হইতে পারেন, তাঁহার নিকট গীতার্থ প্রকাশিত হইতে থাকে। যিনি যতটুকু অধিকারী, তাঁহার নিকট গীতার অর্থ ততটুকু প্রতিভাত হয়। যিনি যেরূপ সাধক, যেরূপ জ্ঞানী, যেরূপ ধ্যানী, ভগবান অনুকম্পা করিয়া তাঁহার নিকট গীতার অর্থ সেইরূপ প্রস্ফুটিত করেন। প্রকৃত অধিকারী ব্যতীত গীতার অর্থ কেহই গ্রহণ করিতে পারে না। ভগবান্ অনধিকারীর সম্বন্ধে গীতার পাঠ বা শ্রবণও নিষেধ করিয়াছেন। ভগবান্ বলিয়াছেন,—

"ইদং তে নাতপস্কায় নাভক্তায় কদাচন।
ন চাশুশ্রূষবে বাচ্যং ন চ মাং যোঽভ্যসূয়তি॥" (গীতা, ১৮।৬৭)

যাঁহারা অনধিকারী তাঁহারা গীতা পাঠ করিলে, বা গীতার অর্থ গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিলেও কোন ফল হয় না। যিনি গীতার প্রকৃত মর্ম্ম জানিয়া গীতার উপদেশ অনুসরণ করিতে না পারেন, ও তদনুসারে আপনার জ্ঞান ভক্তি কর্ম্মবৃত্তি প্রভৃতি নিয়মিত করিতে না পারেন,—এক কথায় যিনি গীতায় উপদিষ্ট শ্রেয়োমার্গে বা যোগমার্গে প্রবেশ পূর্ব্বক, তাহাতে অগ্রসর হইতে না পারেন, তাঁহার পক্ষে গীতা পাঠ বা তাহার অর্থগ্রহণচেষ্টা বৃথা। যাহারা অজ্ঞানী, কর্ম্মসঙ্গী, যাহারা রজস্তমঃ প্রকৃতিযুক্ত, কামক্রোধাদি বৃত্তির বশীভূত, স্বার্থচালিত, সংসারের সুখভোগই যাহাদের একমাত্র পুরুষার্থ, যাহারা ঈশ্বরে অবিশ্বাসী, ঈশ্বরবাক্যে অশ্রদ্ধাবান্ বা সংশয়যুক্ত, তাহাদের গীতা পাঠে কোন ফল নাই,—তাহাদের পক্ষে গীতার অর্থগ্রহণচেষ্টা বৃথা। যাঁহারা অনধিকারী, তাঁহারা এই গীতাযুগে গীতা পাঠ করেন বটে, কিন্তু তাঁহারা গীতার প্রকৃত অর্থ গ্রহণ

করিতে পারেন না, অথবা তাঁহারা কদর্থ করেন। ইহা দৃষ্টান্ত দিয়া এখানে বলিতে হইবে না। ইঁহাদের গীতা পাঠে উপকার হওয়া দূরে থাকুক, বরং অপকারই হইয়া থাকে। ভগবান্ বলিয়াছেন,—

"ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্।" (গীতা, ৩।২৩)

অনধিকারীর গীতা পাঠে কুফল বই সুফল হয় না। তাহারা ত গীতার প্রকৃত অর্থ বুঝিতেই পারে না, বরং তাহারা গীতার বিপরীত অর্থ বুঝিয়া কুপথে নীত হয়,—অধোগতি লাভ করে।

গীতার্থ-জ্ঞানলাভ জন্য সাধনা।—অতএব যিনি প্রকৃত অধিকারী, তিনিই গীতোক্ত সাধন দ্বারা শুদ্ধচিত্ত হইয়া নির্ম্মল সাত্ত্বিক অমানিত্বাদিরূপ জ্ঞানে অবস্থান পূর্ব্বক, উপযুক্ত ধ্যান ও সাধনা-বলে ভগবানের কৃপা লাভ করেন, ও গীতার প্রকৃত অর্থ কতক বুঝিতে পারেন। গীতার প্রকৃত অর্থ বুঝিতে হইলে, তাঁহাকে একাগ্রমনে নিত্য গীতা পাঠ করিতে হইবে, ভগবান্‌কে একান্ত অনন্যভক্তিযোগে অনুধ্যান করিতে হইবে, এবং গীতার প্রতি শ্লোকের অর্থ ভাবনা করিতে হইবে। যখন কোন শ্লোকের অর্থ প্রতিভাত না হয়, যখন সন্দেহ উপস্থিত হয়, তখন ভগবানের শরণাপন্ন হইয়া ধ্যানস্থ হইতে হয়। কথিত আছে যে, সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ প্রভুপাদ অদ্বৈত গোস্বামী গীতার কোন শ্লোকের অর্থ বুঝিতে না পারিলে, এইরূপে আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া ধ্যানস্থ হইতেন, তবে সে শ্লোকের অর্থ বুঝিতে পারিতেন। শ্রীধরস্বামীও "যোগক্ষেমং বহাম্যহম্" এই ভগবদুক্তির সত্যতা পরীক্ষা দ্বারা জানিয়াছিলেন। সে যাহা হউক, যিনি এইরূপ নিত্য নিত্য গীতাপাঠরূপ জ্ঞানযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহার নিকটই গীতার অর্থ ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতে থাকে। এইরূপে যিনি যত অধিক গীতা পাঠরূপ জপ ও তাহার অর্থ ভাবনা করিবেন, ততই তিনি ক্রমে ক্রমে নূতন নূতন তত্ত্ব-জ্ঞান পাইবেন, ততই জ্ঞানালোক তাঁহার অন্তরে প্রস্ফুটিত হইতে

থাকিবে, ততই তাঁহার অজ্ঞানান্ধকার দূর হইতে থাকিবে। প্রতিবার পাঠে তিনি প্রতি শ্লোকের নূতন নূতন অর্থ পাইবেন, প্রতিবার নূতন নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করিতে পারিবেন। তথাপি গীতার সমগ্র অর্থ কাহারও জ্ঞানে প্রতিভাত হয় না। গীতোক্ত জ্ঞান অনন্ত, মানব-জ্ঞান সান্ত। সান্ত সীমাবদ্ধ জ্ঞানে কখন সে অনন্ত জ্ঞানের ধারণা হয় না। শ্রুতিতে আছে, এক-বিজ্ঞানে সর্ব্ব-বিজ্ঞান লাভ হয়। সেই এক বিজ্ঞান—ব্রহ্ম-বিজ্ঞান। সেই 'এক'ই 'সর্ব্ব'। সেই ব্রহ্মবিজ্ঞানই গীতায় প্রধানতঃ উপদিষ্ট হইয়াছে। মানুষের সান্ত সীমাবদ্ধ জ্ঞানে কিরূপে সেই অনন্ত ব্রহ্ম-বিজ্ঞান লাভ সম্ভব হইতে পারে?

সে যাহা হউক, গীতার প্রকৃত অর্থ যাহাতে আমাদের জ্ঞানে প্রকাশিত হয়, তাহার জন্য প্রতিদিন বা নিত্য ইহার পাঠ বিহিত হইয়াছে। * ভগবান্ গীতা-শেষে বলিয়াছেন,—

"অধ্যেষ্যতে চ য ইমং ধর্ম্ম্যং সংবাদমাবয়োঃ।
জ্ঞানযজ্ঞেন তেনাহমিষ্টঃ স্যামিতি মে মতিঃ॥ (গীতা, ১৮।৭০

শাস্ত্রে এই গীতা নিত্য নিত্য মন্ত্ররূপে পাঠ বা জপ করিবার বিধান উক্ত হইয়াছে। শ্রুতি মন্ত্রের যেমন দেবতা ঋষি ছন্দ বিনিয়োগ বিহিত আছে, গীতা সম্বন্ধেও সেইরূপ উক্ত হইয়াছে,—

"অস্য শ্রীভগবদ্গীতা-শাস্ত্র-মন্ত্রস্য শ্রীভগবান্ বেদব্যাস ঋষিঃ, প্রায়েণানুষ্টুপ্ ছন্দঃ, শ্রীকৃষ্ণঃ পরমাত্মা দেবতা, 'অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বম্' ইতি বীজম্, 'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য' ইতি শক্তিঃ, 'ঊর্দ্ধমূলমধঃশাখম্' ইতি (অথবা 'অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি' ইতি) কীলকম্, মম মোক্ষার্থে জপে (অথবা শ্রীকৃষ্ণপ্রীত্যর্থং পাঠে) বিনিয়োগঃ……।"

---

* এইরূপ গীতা পাঠের ফল বরাহ-পুরাণোক্ত গীতামাহাত্ম্যে এবং বৈষ্ণবীয় তন্ত্রসারোক্ত গীতামাহাত্ম্যে বিবৃত হইয়াছে। এস্থলে তাহার উল্লেখের প্রয়োজন নাই।

এইরূপে গীতা পাঠ বা জপ এবং তাহার অর্থ গ্রহণরূপ যোগ বা জ্ঞানযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে পারিলে গীতার অর্থ ক্রমশঃ প্রতিভাত হইতে থাকে। এইজন্য গীতা-মাহাত্ম্যে উক্ত হইয়াছে,—

"যোঽষ্টাদশজপো নিত্যং নরো নিশ্চলমানসঃ।
জ্ঞানসিদ্ধিং স লভতে ততো যাতি পরং পদম্॥"

এইরূপে যাঁহারা প্রযত্নপূর্ব্বক একাগ্রমনে নিত্য নিত্য গীতাপাঠ করিতে পারেন, গীতার প্রকৃত অর্থ তাঁহারই জ্ঞানে ক্রমে ক্রমে প্রতিভাত হইতে থাকে। এইরূপে এই জ্ঞানযজ্ঞ ফলে এবং শেষে ধ্যানযোগ-সিদ্ধি দ্বারা তাঁহাদের সে জ্ঞান সংসিদ্ধ হয়, এবং সেই বিজ্ঞান হইতে পরিশেষে পরমপদ লাভ হয়।

গীতা-মাহাত্ম্য।—বলিয়াছি ত, গীতা মোক্ষশাস্ত্র। ইহা দ্বারা অক্ষর অধিগম্য হয়, পরমেশ্বরের পরম পদ লাভ হয়। এজন্য ইহা পরাবিদ্যারূপিণী! জ্ঞান হইতে মুক্তি হয়, জ্ঞান বিনা মুক্তি নাই, ইহাই আমাদের শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। গীতা সেই পরম জ্ঞানের আকর। আমাদের মোক্ষশাস্ত্র মধ্যে তিনখানি শাস্ত্রগ্রন্থ প্রধান ও মূল,—উপনিষদ্, গীতা ও বেদান্তদর্শন। সকল সম্প্রদায়েরই এই তিন 'প্রস্থান' অবলম্বনীয়। শঙ্করাচার্য্য, রামানুজ প্রভৃতি সকলে এই তিন শাস্ত্রগ্রন্থাবলম্বনে, তাঁহাদের ভাষ্য প্রণয়ন করিয়া স্ব স্ব সাম্প্রদায়িক মত স্থাপন করিয়াছেন। এই তিন প্রস্থানের মধ্যে এক অর্থে গীতাই শ্রেষ্ঠ। কেননা, গীতা সর্ব্বোপনিষৎসার,—গীতা ভগবানের নিজের উক্তি। বলিয়াছি ত, ইহা শ্রেষ্ঠ Revelation। ইহাতে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞানার্থ, সর্ব্বরূপ সাধনতত্ত্ব সংক্ষেপে সূত্ররূপে উপদিষ্ট হইয়াছে। বেদান্তদর্শনের আরম্ভ 'ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা'য়। বেদান্তদর্শনে ব্রহ্মতত্ত্বই প্রধানতঃ বিবৃত হইয়াছে। গীতায় মুমুক্ষুর সমুদয় জ্ঞাতব্য তত্ত্বই উপদিষ্ট হইয়াছে। গীতা—

"বেদত্রয়ী পরানন্দা তত্ত্বার্থজ্ঞানসংযুতা।"—গীতা-মাহাত্ম্য।

গীতা-মাহাত্ম্যে অন্যত্র উক্ত হইয়াছে,—

"তস্মাদ্ধর্ম্মময়ী গীতা সর্ব্বজ্ঞানপ্রয়োজিকা।
সর্ব্বশাস্ত্রসারভূতা বিশুদ্ধা সা বিশিষ্যতে॥"

গীতায় যে জ্ঞান উক্ত হয় নাই, তাহা ত্রৈগুণ্যবিষয়ক জ্ঞান, তাহা লৌকিক জ্ঞান। শাস্ত্র তাহাকে আসুর-সম্মত জ্ঞান বলিয়াছেন,—

"গীতাগীতং ন যজ্জ্ঞানং তদ্বিদ্ধ্যাসুরসম্মতম্।
তন্মোঘং ধর্ম্মরহিতং বেদবেদান্তগর্হিতম্॥"—গীতা-মাহাত্ম্য।

সুতরাং শাস্ত্র অনুসারে যাঁহারা শ্রেয়ঃ-প্রার্থী মুমুক্ষু, ঈশ্বরে বা ব্রহ্মে যোগযুক্ত হইতে চাহেন, পরম গতি লাভ করিতে চাহেন, তাঁহাদের পক্ষে গীতা-জ্ঞান লাভ করা একান্ত পয়োজন,—এমন কি, অন্য শাস্ত্র জানিবারও আবশ্যক নাই। গীতা-মাহাত্ম্যে আছে,—

"সংসার-সাগরং ঘোরং তর্ত্তুমিচ্ছতি যো নরঃ।
গীতানাবং সমাসাদ্য পারং যাতি সুখেন সঃ॥"

গীতা-মাহাত্ম্যে গীতা সম্বন্ধে ভগবানের মত এইরূপে উক্ত হইয়াছে,—

"গীতা মে হৃদয়ং পার্থ গীতা মে সারমুত্তমম্।
গীতা মে জ্ঞানমত্যুগ্রং গীতা মে জ্ঞানমব্যয়ম্॥
গীতা মে চোত্তমং স্থানং গীতা মে পরমং পদম্।
গীতা মে পরমং গুহ্যং গীতা মে পরমো গুরুঃ॥
গীতাশ্রয়েহহং তিষ্ঠামি গীতা মে পরমং গৃহম্।
গীতাজ্ঞানং সমাশ্রিত্য ত্রিলোকীং পালয়াম্যহম্॥
গীতা মে পরমা বিদ্যা ব্রহ্মরূপা ন সংশয়ঃ।
অৰ্দ্ধমাত্রাক্ষরা নিত্যমনির্ব্বাচ্যপদাত্মিকা॥"

ইহার অর্থ এ স্থলে বুঝিবার প্রয়োজন নাই। এ স্থলে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, ব্রহ্ম বহু হইবার কল্পনা করিয়া নামরূপ দ্বারা এই সমুদায় ব্যক্ত করেন, এবং তাহাতে আত্মস্বরূপে

অনুপ্রবিষ্ট হন। সুতরাং এই সৃষ্টি ব্রহ্মের জ্ঞানমূলক বা সঙ্কল্পমূলক। প্রসিদ্ধ জর্ম্মাণ পণ্ডিত হেগেল্ প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, "Thought is Being,'—ব্রহ্মজ্ঞানে (Absolute Reason) যাহা কল্পিত, তাহাই ব্রহ্মে সৎরূপে বিবর্ত্তিত। অতএব ব্রহ্মের (বা মায়াশক্তিযুক্ত পরমেশ্বরের) জ্ঞানে এই জগৎ যেরূপ কল্পিত হয়, তদনুসারে অব্যক্ত ব্রহ্মস্বরূপ কারণে এই জগৎ অভিব্যক্ত হয়, এবং এই জগতের সৃষ্টি স্থিতি লয় সংসাধিত হয়। সুতরাং যে জগতের মূল এই পরমেশ্বরের জ্ঞান, তাহাই গীতামাহাত্ম্য অনুসারে এই গীতায় অভিব্যক্ত হইয়াছে। এজন্য ভগবান্ বলিয়াছেন যে, তিনি এই জ্ঞানকে আশ্রয়পূর্ব্বক অবস্থান করেন, এবং এই জ্ঞান আশ্রয়পূর্ব্বক ত্রিলোক প্রতিপালন করেন। শুধু তাহাই নহে, এই গীতোক্ত জ্ঞান পরাবিদ্যাস্বরূপ, ইহা সনাতন ব্রহ্মজ্ঞান, ইহা সার্দ্ধ ত্রিমাত্রাযুক্ত ওঁকারাখ্য ব্রহ্মের অর্দ্ধ অনির্ব্বাচ্য মাত্রা বা অমাত্রারূপ পদ—অদ্বয়জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মেরই পরম পদ বা চতুর্থপাদবাচক। (ইহা কোন কোন পাশ্চাত্য আচার্য্যের ভাষায় "Logos, sleeping in the bosom of the Father.")।

আত্মা বা ব্রহ্ম যেমন চতুষ্পাদ, ব্রহ্মের বাচক ওঁকার যেমন চতুষ্পাদ (মাণ্ডূক্য উপনিষদ), সেইরূপ আমাদের জ্ঞানও চতুষ্পাদ। বলিয়াছি ত, প্রত্যক্ষ (বা ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান) ইহার এক পাদ, অনুমানমূলক বিচার-বিতর্কজনিত জ্ঞান ইহার দ্বিতীয় পাদ, শাস্ত্রপ্রমাণজ জ্ঞান ইহার তৃতীয় পাদ, আর যোগপ্রত্যক্ষজ জ্ঞান ইহার চতুর্থ পাদ। এই চারি পাদের উপর আমাদের জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত। যাহা পরমার্থজ্ঞান, তাহা প্রধানতঃ শাস্ত্রপ্রমাণ ও যোগজ প্রত্যক্ষের উপর স্থাপিত। পরমার্থ জ্ঞানের আকর গীতা-জ্ঞান এই যোগজ প্রত্যক্ষের উপর স্থাপিত। এইজন্য উক্ত হইয়াছে যে, গীতা ব্রহ্মরূপা পরমা-বিদ্যা, অনির্ব্বাচ্যপদাত্মিকা অর্দ্ধমাত্রা নিত্যা অক্ষররূপিণী।

গীতা দুর্ব্বিজ্ঞেয় কেন?—অতএব আমাদের জ্ঞানে গীতা দুর্ব্বিজ্ঞেয় কেন, গীতা-প্রতিপাদ্য পরমতত্ত্ব আমাদের জ্ঞানে অনধিগম্য কেন, তাহা আমরা ইহা হইতে কতক বুঝিতে পারি। মানুষের সাধারণ জ্ঞান সীমাবদ্ধ। তাহা প্রধানতঃ প্রত্যক্ষ ও অনুমানমূলক। আমাদের শাস্ত্রজ্ঞানও পরোক্ষ। আমাদের অজ্ঞানবদ্ধ জ্ঞান,—অহং-ইদং-দ্বৈতাত্মক, দেশকালনিমিত্ত-পরিচ্ছিন্ন, রাগদ্বেষকামক্রোধাদি রজোগুণবৃত্তি দ্বারা মলিন, তমোমোহ-আবরণযুক্ত। কাজেই আমাদের জ্ঞানে গীতোপদিষ্ট পরমতত্ত্ব—অপ্রমেয় দেশকালনিমিত্ত দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন পরমপদ প্রকাশিত হইতে পারে না। যোগজ প্রত্যক্ষ দ্বারাও আমরা সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বদ্রষ্টা হইতে পারি না। যিনি যোগেশ্বর, তিনিই সর্ব্বজ্ঞানের আকর। আর তাঁহার কৃপায় যাঁহার হৃদয়ে সেই জ্ঞান যতটুকু প্রত্যক্ষ হইতে পারে, তিনি সেই জ্ঞান ততটুকু লাভ করিতে পারেন। সে জ্ঞান তাঁহার হৃদয়ে সেই পরিমাণে অজ্ঞানমেঘমুক্ত হইয়া প্রকাশিত হয়। শ্রীভগবান্ ব্যতীত আর কেহই সমগ্র গীতাতত্ত্ব সম্যক্ জানিতে পারেন না। কোন মানুষ সমুদায় গীতার্থ-বিজ্ঞানের অধিকারী নহে। গীতামাহাত্ম্যে সেই জন্য উক্ত হইয়াছে,—

> "কৃষ্ণো জানাতি বৈ সম্যক্ কিঞ্চিৎ কুন্তীসুতঃ ফলম্।
> ব্যাসো বা ব্যাসপুত্রো বা যাজ্ঞবল্ক্যোঽথ মৈথিলঃ॥
> অন্যে শ্রবণতঃ শ্রুত্বা লেশং সংকীর্ত্তয়ন্তি চ।"

অনেকে এ সকল অতিশয়োক্তি বা প্রশংসাবাদমাত্র মনে করিতে পারেন। কিন্তু আমাদের দেশের অতি শ্রেষ্ঠ দার্শনিক পণ্ডিত তত্ত্বদর্শী জ্ঞানাবতার শঙ্করাচার্য্য গীতাভাষ্যের উপক্রমণিকায় বলিয়াছেন,—"তদিদং গীতাশাস্ত্রং সমস্তবেদার্থসারসংগ্রহভূতং দুর্বিজ্ঞেয়ার্থম। তদর্থাবিষ্করণায়ানেকৈ বিবৃতপদপদার্থবাক্যার্থন্যায়মপি অত্যন্তবিরুদ্ধানেকার্থত্বেন লৌকিকৈর্গৃহ্যমাণমুপলভ্য অহং বিবেকতোঽর্থনির্দ্ধারণার্থং সংক্ষেপতো বিবরণং

করিষ্যামি।” অর্থাৎ “এই গীতাশাস্ত্র সমস্ত বেদার্থসারসংগ্রহভূত। ইহার অর্থ দুর্বিজ্ঞেয়। যদিও অনেক পণ্ডিত ইহার অর্থ আবিষ্কার জন্য চেষ্টা করিয়াছেন এবং ইহার পদ, বাক্য, পদের অর্থ ও বাক্যের অর্থ ও তাৎপর্য্য অর্থ ন্যায় বা যুক্তি অনুসারে প্রকাশ করিয়াছেন তথাপি, এই সকল ব্যাখ্যা অনেক স্থলে বহুপ্রকার বিরুদ্ধার্থে পরিপূর্ণ। তাহাতে গীতার্থ-জিজ্ঞাসুর নিকট নানারূপ বিরুদ্ধার্থ প্রকাশিত হইয়া থাকে। এজন্য আমি বিবেকতঃ ইহার প্রকৃত অর্থ নির্দ্ধারণ জন্য সংক্ষেপে এই বিবরণ বা ব্যাখ্যা করিতেছি।”

এইরূপে শঙ্করাচার্য্য প্রাচীন ব্যাখ্যাকারগণের বিরুদ্ধ মত খণ্ডন করিয়া স্বমত স্থাপন করিবার জন্য তাঁহার ভাষ্য লিখিয়াছিলেন। তাঁহার ভাষ্য তখন সর্ব্বত্র আদৃত হইয়াছিল, এবং তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী ব্যাখ্যাকারগণের ব্যাখ্যা একরূপ উঠিয়া গিয়াছিল। এক্ষণে আর তাঁহাদের নামও পাওয়া যায় না। তাহার পর রামানুজাচার্য্য, বল্লভাচার্য্য, বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভৃতি, সম্ভবতঃ পূর্ব্ব ব্যাখ্যাকার-গণের মতানুসারে, দ্বৈত বা দ্বৈতাদ্বৈত মত ও ভক্তিবাদ স্থাপন করিবার জন্য শঙ্করের অদ্বৈতবাদ-মূলক ব্যাখ্যা অনেক স্থলে খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। যাহা হউক, এইরূপে শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি জ্ঞানের অবতার আচার্য্যগণ গীতারূপ অমৃতসাগর মন্থন করিয়া যিনি যে যে রত্ন সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন, তাহা জ্ঞানার্থী ও মুমুক্ষু ব্যক্তির হিতার্থ ভাষ্য ও টীকারূপে প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা যে অনন্ত জ্ঞানরত্নপূর্ণ গীতারূপ অমৃতসাগরের সকল রত্ন আবিষ্কার করিতে পারিয়াছিলেন তাহা বলা যায় না। তাহা হইলে পরে এই বিভিন্ন ব্যাখ্যাকারগণের অনেক স্থলে অত্যন্ত বিরুদ্ধ অর্থের স্থান থাকিত না। বলিয়াছি ত, যিনি জ্ঞানী অর্থাৎ যাঁহার অজ্ঞানমোহ দূর হইয়াছে, যিনি ভক্ত, সাধক, শ্রদ্ধাবান্, গীতার্থ জ্ঞানের জন্য ভগবানে ভক্তিপূর্ব্বক

একান্তমনে একাগ্রচিত্তে গীতাপাঠরূপ জ্ঞানযজ্ঞ করেন, তাঁহার সাধনা অনুসারে তাঁহার নিকট গীতার্থ প্রতিভাত হয়।

তথাপি, উপযুক্ত উপায়ে সাধনা করিলেও, মানুষের জ্ঞানে যে গীতোক্ত সমগ্র তত্ত্ব সমগ্র অর্থ প্রকাশিত হইতে পারে, তাহা বলা যায় না। পূর্ব্বে 'কৃষ্ণো জানাতি বৈ সম্যক্' শ্লোক হইতে দেখা গিয়াছে যে, গীতার প্রকৃত অর্থ শ্রীভগবান্ই জানেন। ব্যাস প্রভৃতি ঋষিগণও তাহার কিঞ্চিন্মাত্র জানিতেন। সুতরাং গীতার্থ জিজ্ঞাসুর পক্ষে সমুদায় গীতার্থ-জ্ঞান অসম্ভব। সর্ব্বহৃদিস্থিত, সর্ব্বজ্ঞানের আধার, সকলের গুরু, সর্ব্ববুদ্ধির প্রচোদক শ্রীভগবান্ যাহার বুদ্ধিতে যেরূপ গীতার্থ প্রকাশ করেন, তাহার কাছে সেইরূপ অর্থই প্রকাশিত হয়। যাহার চিত্ত যেরূপ নির্ম্মল, যাহার যেরূপ ধারণাশক্তি, তাহার নিকট ভগবান্ সেইরূপ অর্থই প্রকাশ করেন। ধারণাশক্তির প্রভেদ অনুসারে, সাধনার প্রভেদ অনুসারে, বিভিন্নভাবে সর্ব্বজ্ঞানস্বরূপ ভগবানের কৃপায় গীতার অর্থ প্রকাশিত হয়।

গীতা-জ্ঞানের বিরাট্ রূপ।—ভগবান্ অর্জ্জুনকে দিব্য চক্ষু দিয়াছিলেন, তাই অর্জ্জুন ভগবানের ক্ষুদ্র মানুষী দেহে তাঁহার ঐশ্বরীয় যোগ—তাঁহার বিরাট্ রূপ দেখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। অর্জ্জুন সেই অব্যয় আত্মার যোগৈশ্বর্য্য—সেই বিশ্বরূপ দেখিতে চাহিলে, ভগবান্ বলিয়াছিলেন,—

> ইহৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং পশ্যাদ্য সচরাচরম্।
> মম দেহে গুড়াকেশ যচ্চান্যদ্ দ্রষ্টুমিচ্ছসি॥
> ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টুমনেনৈব স্বচক্ষুষা।
> দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্॥"

(গীতা ১১।৭-৮)

সেইরূপ যিনি অত্যন্ত আগ্রহের সহিত ভগবানের শরণাপন্ন হন, ভগবান্ অনুগ্রহ করিয়া তাঁহাকে দিব্যচক্ষু প্রদান করেন, এবং তাহার ফলে তিনি দিব্যজ্ঞানে এই ক্ষুদ্র সপ্তশতশ্লোকময়ী গীতাতে সর্ব্ব

জ্ঞানের অনন্ত বিশ্বরূপ দেখিতে পান ;—ভগবান্ যে বলিয়াছেন,—"গীতা মে হৃদয়ং পার্থ গীতা মে জ্ঞানমুত্তমম্'—সেই সর্ব্বজ্ঞ ভগবদ্-জ্ঞানের বিরাট্ দিব্য বিশ্বরূপ এই গীতাতেই দেখিতে পান। ভগবান্ তাঁহার সেই অনন্ত জ্ঞানরাজ্যের যতটুকু যাহাকে দেখিতে দেন, তিনি ততটুকু দেখিতে পান,—তিনি এই অনন্ত সুধাসাগর গীতা হইতে তত রত্নই সংগ্রহ করিতে পারেন। তাহার অধিক তিনি দেখিতে পান না, তাহার অধিক গীতার্থ তিনি গ্রহণ করিতে পারেন না। যিনি আপনার জ্ঞানভাণ্ডে সেই অনন্ত জ্ঞানরূপ সুধাসাগরের যতটুকু অমৃত গ্রহণ করিতে পারেন, তিনি সেই পরিমাণে তাহা গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হন।

যাহা হউক, গীতাজ্ঞানের এই অনন্ত বিরাট্ বিশ্বরূপ গীতায় যে প্রচ্ছন্ন আছে, ইহাই আমাদের আশ্বাসের বিষয়। আমরা ইহাকে ক্ষুদ্রায়তন দেখিতে পাই—ইহাই সৌভাগ্য। সেজন্য গীতার সহিত আমরা খেলা করিতে পারি, গীতাকে সখার ন্যায়—পরম আত্মীয়ের ন্যায় গ্রহণ করিয়া বিশ্রব্ধ আলাপ করিতে পারি। কিন্তু যখনই এই বিরাট্ রূপের আভাস পাই, তখন অর্জ্জুনের ন্যায় সভয়ে বলি,—

"সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং
হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি।
অজানতা মহিমানং তবেদং
ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি ॥

*　　　*　　　*

তৎ ক্ষাময়ে ত্বামহমপ্রমেয়ম ॥' (গীতা, ১১।৪১-৪২)

তখন অর্জ্জুনের ন্যায় ভয়ে প্রব্যথিত হই এবং গীতার সহিত যে আমারা খেলা করিয়াছি, তাহার জন্য বার বার ভগবানের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি।

গীতা শ্রীভগবানের বিগ্রহরূপ।—যিনি গীতাতে শ্রীভগবানের

জ্ঞানরূপ দেখিতে পান, গীতাতেই শ্রীভগবানের বিগ্রহরূপ প্রত্যক্ষ করেন, তাঁহার নিকট গীতার অর্থ ক্রমে প্রকাশিত হয়। যিনি 'নামে' 'নামী'র রূপ দেখিতে পান, জ্ঞানে জ্ঞাতার স্বরূপ উপলব্ধি করেন, যিনি জ্ঞাতা জ্ঞেয় ও জ্ঞান এই 'ত্রিপুট'কে এক জানিয়া জ্ঞানেই জ্ঞাতাকে প্রত্যক্ষ করেন, যিনি Thought is Being—এই বাক্যের প্রকৃত অর্থ বুঝিতে পারেন, তিনিই এই পরম জ্ঞান (Absolute Thought)-রূপী গীতায় গীতাবক্তা সচ্চিদানন্দ শ্রীভগবান্‌কে (Absolute Being) সাধনা-বলে দেখিতে পান। সেই ঈশ্বরে পরম ভক্তিমান্ সাধক গীতারূপে নিত্য-স্থিত শ্রীভগবান্‌কে, অর্জ্জুনের ন্যায় সখারূপে-সারথিরূপে বরণ করিয়া, নিত্য গীতাপাঠ ও গীতার্থবোধ জন্য প্রযত্ন দ্বারা সেই গীতারূপী শ্রীভগবানের নিত্য-সহচর ও সেবক হইয়া শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার সহিত সর্ব্বদা রহস্য আলাপে নিরত থাকেন। সে যাহা হউক, সুকৃতি-বলে ও ভগবানের অনুগ্রহে, যদি কেহ কখন দিব্য চক্ষু লাভ করিয়া পরম জ্ঞানরূপ গীতাতে জ্ঞানের বিরাট্ বিশ্বরূপ দেখিতে পান, যদি ইহাতে "কৃৎস্ন জ্ঞান একস্থ" দেখিয়া কৃতার্থ হন, তথাপি তিনি তাঁহার পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানে ধারণার অতীত সেই সুদুর্দ্দর্শ বিরাট্ রূপ অধিকক্ষণ দেখিতে পারেন না। তিনি সে অদ্ভুত আশ্চর্য্য রূপের আভাসমাত্র পাইয়া ভয়ে প্রব্যথিত হইয়া অর্জ্জুনের ন্যায় গীতায় আমাদের পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানে ধারণাযোগ্য রূপ দেখিবার জন্য শ্রীভগবানের শরণাপন্ন হইতে বাধ্য হন। সুতরাং গীতোক্ত জ্ঞানের সে অনন্ত, অপরিমেয়, অপরিচ্ছিন্ন বিরাট্ বিশ্বরূপ দেখিবার জন্য অনধিকারী আমাদের প্রয়াসের প্রয়োজন নাই। তাহার কথা আর এখানে উল্লেখেরও আবশ্যক নাই।

গীতাব্যাখ্যা।—সুতরাং আমরা আমাদের এই পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানে ধারণাযোগ্য গীতার অর্থ বুঝিতে চেষ্টা করিব মাত্র। শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া গীতা শ্রবণ পূর্ব্বক 'মনন' দ্বারা আমাদের এই মলিন চিত্তে তাহার অর্থ

যতদূর প্রতিভাত হয়, তাহাই বুঝিতে কেবল চেষ্টা করিব। আমাদের এই সান্ত সীমাবদ্ধ পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানে ধারণাযোগ্য গীতার্থ বুঝাইবার জন্য শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি মনীষিগণ যে ভাষ্য করিয়াছেন, গীতার্থ মননের জন্য তাহাই আমাদের প্রধান অবলম্বন। গীতার্থ মনন বা ভাবনা করিতে হইলে, সেই সকল ভাষ্যই আমাদের প্রধান সহায়। সেই সকল ভাষ্য ও টীকা অবলম্বন করিয়া গীতার অর্থ যেরূপে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি, এক অর্থে এই গীতাব্যাখ্যা সেই চেষ্টার ফল। কিন্তু কেবল এই সকল ভাষ্য ও টীকা অবলম্বনেই এই ব্যাখ্যা লিখিত হয় নাই। গীতার্থ বুঝিবার জন্য যে প্রযত্ন করিয়াছি, তাহা এস্থলে বলিবার কোন প্রয়োজন নাই। শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি বিভিন্ন ব্যাখ্যাকারগণের ভাষ্য ও টীকা সমালোচনা করিয়া কিরূপে সঙ্গত অর্থ গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিয়াছি, তাহাই এস্থলে উল্লেখ করিব মাত্র।

গীতাব্যাখ্যায় মূলসূত্র।—পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষ্যকারগণ বিভিন্নভাবে মূলসূত্র অবলম্বন করিয়া গীতার বিভিন্নরূপ অর্থ করিয়াছেন। তাহাতে গীতার্থ-জিজ্ঞাসুর পক্ষে গীতার অর্থ বুঝিতে অনেক স্থলে অনেক গোলযোগ হয়। গীতার প্রকৃত মূলসূত্র দৃঢ়রূপে ধরিতে না পারিলে, গীতার অর্থ বুঝিতে পারা যায় না। গীতাব্যাখ্যা সম্বন্ধে বিভিন্ন ব্যাখ্যাকারগণ বিভিন্নভাবে মূলসূত্র অবলম্বন করায়, গীতার্থ-জিজ্ঞাসু সেই মূলসূত্র সহজে দৃঢ়রূপে ধরিতে পারেন না, এবং প্রকৃত মূলসূত্রের অর্থ কি, তাহাও স্থির করিতে পারেন না।

আমরা এই ব্যাখ্যায় সেই গোলযোগ মীমাংসার চেষ্টা করিয়াছি, এবং এই মূল সূত্র কি ভাবে অবলম্বন করিলে গীতার সর্ব্বত্র সঙ্গত অর্থ হয়, কোথাও বিরোধ থাকে না, আমূল সর্ব্বত্র সামঞ্জস্য হয়, তাহা অনুসন্ধান করিতে চেষ্টা করিয়াছি। এই মূলসূত্র বুঝিতে হইলে, শঙ্করাচার্য্যপ্রমুখ বিভিন্ন ব্যাখ্যাকারগণ যে বিভিন্নভাবে এই মূলসূত্র অবলম্বনে

গীতা ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা প্রথমে সংক্ষেপে বুঝিতে হইবে। ব্যাখ্যাকার-গণের বিভিন্ন মত সমালোচনা করিয়া, গীতা হইতে আমরা সেই মূলসূত্র কি ভাবে গ্রহণ করিয়াছি, তাহাও এস্থলে বুঝিতে হইবে, এবং এই ব্যাখ্যায় যে ভাবে সেই মূলসূত্র অবলম্বিত হইয়াছে ও তাহা দ্বারা বিভিন্ন ব্যাখ্যাকারগণের অঙ্গীকৃত মূলসূত্রের বিভিন্ন অর্থ কিরূপে সামঞ্জস্য করা হইয়াছে, তাহাও দেখিতে হইবে।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, গীতা মোক্ষশাস্ত্র—পরাবিদ্যারূপিণী। গীতা সর্ব্বমোক্ষশাস্ত্রমধ্যে শ্রেষ্ঠ। শঙ্করাচার্য্য গীতাভাষ্যের উপক্রমণিকায় বলিয়াছেন যে, সংক্ষেপে এই গীতাশাস্ত্রের প্রয়োজন "পরং নিঃশ্রেয়সং সহেতুকস্য সংসারস্য অত্যন্তোপরমলক্ষণম্।" সেই নিঃশ্রেয়স কি,—যে পরমপদ প্রাপ্তিতে সংসারের অত্যন্ত উপরমরূপ নিঃশ্রেয়স সিদ্ধি হয়, পরম মুক্তি হয়, সেই সংসারাতীত পরমপদ কি, এবং তাহা প্রাপ্তির উপায় কি, তাহাই গীতায় উপদিষ্ট হইয়াছে। অর্থাৎ এই পরমপদতত্ত্ব এবং এই পরমপদপ্রাপ্তির উপায়ভূত যোগতত্ত্ব—এই মূলতত্ত্ব গীতায় প্রধানতঃ উপদিষ্ট হইয়াছে। এই মূলতত্ত্ব যিনি যে ভাবে বুঝিয়াছেন, তদনুসারে তিনি গীতা বুঝিবার মূলসূত্র পাইয়াছেন, এবং সেই মূলসূত্র অবলম্বনেই গীতা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহাদের ব্যাখ্যায় মূলসূত্র উক্ত মূলতত্ত্বের ধারণা হইতেই পাওয়া যায়। এইখানেই গীতা বুঝিবার মূলসূত্র অনুসন্ধান করিতে হয়। আমরাও গীতোক্ত উক্ত মূলতত্ত্ব হইতেই গীতার মূলসূত্রের অনুসন্ধান করিব।

গীতায় যে পরমার্থতত্ত্ব উক্ত হইয়াছে, যে ঈশ্বরতত্ত্ব ও ব্রহ্মতত্ত্ব উক্ত হইয়াছে, তাহা দুই তত্ত্ব নহে, সে তত্ত্ব একই। তাহাই পরমার্থতঃ সংসারাতীত সেই 'পরমপদের' তত্ত্ব। সেই প্রপঞ্চাতীত অব্যয় পরম-তত্ত্বজ্ঞানই সমগ্র গীতার মূলসূত্র। সেই মূলসূত্র, সেই অভিধেয়—পরমব্রহ্ম। এই ব্রহ্মতত্ত্ব যে ব্যাখ্যাকার যে ভাবে যতদূর ধারণা করিয়াছেন, তদনুসারে

তিনি গীতাব্যাখ্যা করিয়াছেন। ধারণার প্রভেদ অনুসারে গীতার মূল-সূত্র ব্যাখ্যাকারগণের নিকট ভিন্নরূপে প্রতিভাত হইয়াছে, এবং গীতাব্যাখ্যারও প্রভেদ হইয়াছে। গীতা হইতে এই ব্রহ্মতত্ত্ব ও ঈশ্বরতত্ত্ব বুঝিতে পারিলে, গীতার প্রকৃত মূলসূত্র পাওয়া যায়,—গীতারও প্রকৃত অর্থের আভাস পাওয়া যায়। সর্ব্বত্র পরমার্থজ্ঞানের মূলসূত্র ব্রহ্ম। শ্রুতি অনুসারে সেই এক ব্রহ্মবিজ্ঞানেই সর্ব্ববিজ্ঞান লাভ হয়। সেই ব্রহ্মবিজ্ঞানেই সমুদায় প্রতিষ্ঠিত। সেই ব্রহ্মই সূত্র। শ্রুতিতে আছে, "সূচনাৎ সূত্রমিত্যাহুঃ সূত্রং নাম পরং পদম্" (ব্রহ্মোপনিষদ্)। "তৎসূত্রং যেন অয়ঞ্চ লোকঃ পরশ্চ লোকঃ সর্ব্বাণি চ ভূতানি সংদৃব্ধানি ভবন্তি" (বৃহদারণ্যক,—৩৭।১)। 'যিনি পরমব্রহ্ম, তিনিই পরমেশ্বরের পরম ধাম' পরম স্বরূপ। তাহা আমাদের জ্ঞানে অনধিগম্য। তিনিই পরমসূত্র পরমাত্মারূপে ঈশ্বররূপে সেই সূত্র আমাদের জ্ঞানগম্য।

পরমেশ্বরই ব্রহ্মের সগুণভাব। পরমেশ্বর ভাবে ব্রহ্মই সর্ব্ব জগতের সূত্র। ভগবান্ বলিয়াছেন,—

"ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব।" (গীতা, ৭।৭)

অতএব এই ব্রহ্মরূপ সূত্রে বা পরমেশ্বররূপ সূত্রেই সমুদায় গীতার্থ ওতপ্রোত। তাই বলিয়াছি যে, এই সূত্র প্রকৃতরূপে দৃঢ় করিয়া ধরিতে পারিলে, সমুদায় গীতার্থের আভাস পাওয়া যায়। সেই সূত্র যদি আমরা পাই, তবে সেই সূত্র দ্বারা গীতোক্ত সমুদায় তত্ত্ব আমাদের নিকট কতকটা প্রতিভাত হইতে পারে। "স যথা শকুনিঃ সূত্রেণ প্রবদ্ধো দিশং দিশং পতিত্বান্যত্রায়তনমলব্ধ্বা বন্ধনমেবোপাশ্রয়তে" (ছান্দোগ্য ৬।৮।২)—অর্থাৎ সূত্রবদ্ধ পক্ষী যেমন ঘুরিয়া ঘুরিয়া শেষে সেই সূত্রের আশ্রয়ে আসিয়া উপস্থিত হয়, সেইরূপ যদি এই মূলসূত্র দ্বারা গীতাজ্ঞানকে কেহ বদ্ধ করিতে পারেন, তবে গীতার প্রতি শ্লোকার্থ ও সমস্ত গীতার্থ ঘুরিয়া ঘুরিয়া শেষে তাঁহার নিকট আপনিই আসিয়া উপস্থিত হয়।

কিন্তু সে সূত্র দৃঢ় ধারণ করিতে কে সমর্থ? পরমব্রহ্মতত্ত্ব স্বরূপতঃ অজ্ঞেয়। তবে অধ্যাত্মজ্ঞানে নির্গুণ অক্ষর ব্রহ্মরূপে তিনি অধিগম্য হন। বুদ্ধি নির্ম্মল জ্ঞানস্বরূপ হইলে, অমানিত্বাদি জ্ঞানস্বরূপে (গীতা ১৩।৭—১১) প্রতিষ্ঠিত হইলে, তবে অক্ষর ব্রহ্ম জ্ঞেয় হন সত্য, তথাপি পূর্ণরূপে সে ব্রহ্মতত্ত্ব আমাদের পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানে প্রতিভাত হয় না, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় সে জ্ঞানে একীভূত হয় না। কাজেই সেই ব্রহ্ম-সূত্র আমরা এ পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানে বিভিন্নভাবে ধারণা করিতে বাধ্য হই। এই নির্গুণ অদ্বয় প্রপঞ্চাতীত অক্ষর ভাবে ব্রহ্ম আমাদের পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানে সম্পূর্ণ জ্ঞেয় না হইলেও, ব্রহ্মের সগুণ পরমেশ্বর ভাব আমাদের 'সমগ্র' জ্ঞেয় হইতে পারে। কিন্তু সমগ্র ঈশ্বরতত্ত্ব সম্বন্ধে বিজ্ঞান-সহিত জ্ঞানও সহজে সম্ভব নহে। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, ঈশ্বরে আসক্তমনা হইয়া ঈশ্বরকে অবলম্বন করিয়া যোগযুক্ত হইলে, তবে সেই জ্ঞান লাভ হয়। এই যোগজ দৃষ্টি না থাকায়, আমরা সমস্ত ঈশ্বরতত্ত্বও প্রত্যক্ষ করিতে পারি না। ঈশ্বরতত্ত্ব সম্বন্ধে যদি পরোক্ষ জ্ঞান লাভ করা যায়, সে জ্ঞান অপূর্ণ অস্পষ্ট থাকে। কাজেই পরমেশ্বররূপ সূত্রও আমরা এই অজ্ঞানজড়িত জ্ঞানে প্রকৃতরূপে ধরিতে পারি না,—ধরিলেও সে সূত্র আমরা বিভিন্নভাবে গ্রহণ করিয়া থাকি। তাই বলিয়াছি যে, গীতার এই মূলসূত্র প্রকৃত অর্থে দৃঢ়ভাবে ধারণ করিতে কে সমর্থ? সে যাহা হউক, এই মূলসূত্র কি ভাবে কোন্ ব্যাখ্যাকার গ্রহণ করিয়া গীতার্থ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা আমরা এক্ষণে অতি সংক্ষেপে বুঝিতে চেষ্টা করিব।

শাঙ্করভাষ্যের শ্রেষ্ঠত্ব।—গীতার সমুদায় ভাষ্য ও টীকার মধ্যে শাঙ্করভাষ্যই প্রধান। তাঁহার ভাষ্য সমুদায় গীতাভাষ্য ও টীকার শীর্ষস্থানীয়। আমাদের দেশে জ্ঞানের অবতার শ্রীশঙ্করাচার্য্য শঙ্করের অবতার বলিয়া পূজিত। তাঁহার জীবনী—অলৌকিক রহস্যময়। যখন

বৌদ্ধধর্ম্মের অধঃপতনের সহিত আমাদের দেশে ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হইয়াছিল, তখন তিনি সনাতন ধর্ম্মের পুনঃ স্থাপন জন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি বাল্যকালেই সন্ন্যাসাশ্রমে প্রবেশ করেন। তিনি অল্প বয়সেই সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শী হন। যাহা হউক, তাঁহার জীবনী এ স্থলে আলোচ্য নহে। তাঁহার কর্ম্ম অলৌকিক। আমরা তাহাই সংক্ষেপে উল্লেখ করিব মাত্র।

শ্রীশঙ্করাচার্য্য অল্প বয়সেই সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শী হইয়া শাস্ত্রাধ্যাপনা-কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন। তাঁহার শিষ্যগণকে এরূপ আশ্চর্য্য শিক্ষা দেন যে, তাঁহাদের অনেকেই সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শী হইয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায় এরূপ আচার্য্য আর আমরা দেখিতে পাই না। তিনি উপনিষদ্, গীতা ও বেদান্তদর্শন—এই তিন মোক্ষশাস্ত্রের বিস্তৃত ভাষ্য প্রণয়ন করেন। সে ভাষ্যের তুলনা নাই। তিনি ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র পর্য্যটন করিয়া মোক্ষধর্ম্ম প্রচার করেন। সংসারমুক্তিপ্রার্থিগণের জন্য শ্রেয়োমার্গানুসরণের সাহায্য করে তিনি সন্ন্যাসি-সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত করেন, এবং ভারতের চারিদিকে 'মঠ' সংস্থাপন করেন। আজি পর্য্যন্ত ভারতে যত সন্ন্যাসি-সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত আছে, এক অর্থে সে সমুদয়ই শ্রীশঙ্করাচার্য্যের প্রবর্ত্তিত। আজি পর্য্যন্ত শতকরা পঁচাত্তর জন সন্ন্যাসী, তাঁহার প্রতিষ্ঠিত দশনামী সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়ের কোন না কোন সম্প্রদায়ভুক্ত। শ্রীচৈতন্যদেবের গুরুও এই সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। শ্রীশঙ্করের প্রভাবেই আজি পর্য্যন্ত আমাদের দেশে মোক্ষ-মার্গ প্রবর্ত্তিত আছে। তাঁহার এই সকল অলৌকিক কর্ম্মের কোন দেশে কোন কালে তুলনা মিলে না। শ্রীশঙ্কর বত্রিশ বৎসর বয়সেই দেহত্যাগ করিয়াছেন। এই অল্প বয়সে কিরূপে তিনি এইরূপ অদ্ভুত কর্ম্ম করিয়াছিলেন, তাহা আমরা ধারণা করিতেও পারি না। এই সর্ব্বজ্ঞানসিদ্ধ মহাপুরুষ লোকহিতার্থ—লোককে শ্রেয়োমার্গে প্রতিষ্ঠিত

করিবার জন্ত যে নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, বলিয়াছি ত, তাহার তুলনা মিলে না, তাহা সাধারণ মানবের পক্ষে অসাধ্য। আমাদের দেশে জ্ঞানের অবতার শ্রীশঙ্কর যে সর্ব্বত্র পূজ্য, তাহার কারণ আমরা ইহা হইতে বুঝিতে পারি।

শ্রীশঙ্কর যে কেবল আমাদের দেশে সর্ব্বপূজ্য, তাহা নহে। তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য, তাঁহার অদ্ভুত বিচার-শক্তি, অতি বড় প্রতিপক্ষ, পণ্ডিতের মত খণ্ডবিখণ্ড করিয়া স্বমত দৃঢ় ভিত্তিতে সংস্থাপনের অদ্ভুত ক্ষমতা—পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণও স্বীকার করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ জর্ম্মাণ পণ্ডিত পাল্‌ ডুসেন তাঁহার Philosophy, the Vedant প্রবন্ধে বলিয়াছেন।

"Sankara's commentaries···equal in rank to Plato and Kant."

পণ্ডিত মোক্ষমূলরও বলিয়াছেন,—

"But I must warn you that his (Sankara's) style, though much more like the style of an ordinany book is difficult to follow, and requires the same effort of atten- tion, which we have to bestow on the intricate argu- ments of Aristotle and Kant." Vedant Philosophy, p. 62.

পণ্ডিত মোক্ষমূলর অন্য স্থলে বলিয়াছেন,—

'But while in the Upanishads these various guesses at truth seem thrown out at hap-hazard, they were afterwards woven together with wonderful patience and ingenuity. The uniform purposes running through all of them was clearly brought out and a system of phi- losophy was erected out of such diverse materials, which is not only perfectly coherent, but quite clear and distinct in almost every point of doctrine. Though here and

there Sutras admit of divergent interpretations, no doubt is left on any important point of Sankara's philosophy which is more than can be said of any system of philosophy, from the days of Plato to the days of Kant."

Vedant philosophy. p. 35

পণ্ডিত মোক্ষমূলর অন্যস্থানে বলিয়াছেন,—

"Sankara the author of the great commentary, knows how to reason accurately and logically, and would be able to hold his own, against any opponent whether Indian or European."

Vedant Philosophy. p. 45.

শাঙ্করভাষ্যে মতভেদ।—এই সকল কথাই গীতার শঙ্করাচার্য্য-কৃত ভাষ্য সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। যাহা হউক, আমরা বলিতে পারি যে, শঙ্করের এই অদ্ভুত পাণ্ডিত্য, এই জ্ঞানগরিমা, এই একনিষ্ঠত্ব—সর্ব্ববাদি-সম্মত। তিনি জ্ঞানের হিমালয়। তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইলে ক্ষুদ্র আমরা সম্ভ্রমে অবনত-মস্তক হই, কুণ্ঠিত সঙ্কুচিত হই। তাঁহার বিরুদ্ধে কোন যুক্তি তর্ক করিবার সাহস থাকে না। তিনি গীতার মূলসূত্র যে ভাবে গ্রহণ করিয়া সমগ্র গীতা ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সে ব্যাখ্যার কোন বিরোধ নাই, সর্ব্বত্র তাহার সঙ্গতি আছে। তবে তিনি সেই মূলসূত্র যে ভাবে স্বতঃসিদ্ধ রূপে গ্রহণ করিয়াছেন, সেখানে মতভেদ থাকিতে পারে। কেন থাকিতে পারে, পূর্ব্বেই তাহার আভাস দিয়াছি। মানুষ যত বড় পণ্ডিত হউন, যত বড় জ্ঞানী হউন, তাঁহার জ্ঞান অপরিচ্ছিন্ন হইতে পারে না। এজন্য কোন মানুষ ব্রহ্মতত্ত্ব পূর্ণরূপে ধারণা করিতে পারে না। যে যেভাবে সেই ব্রহ্মতত্ত্ব দেখিতে পায়, সে সেইভাব মাত্র

গ্রহণ করিতে পারে। বলিয়াছি ত, সে তত্ব যুক্তিতর্কের বিষয়ীভূত নহে, প্রত্যক্ষ বা প্রত্যক্ষমূলক অনুমান প্রমাণগম্য নহে; তাহা অপ্রমেয়, অবাচ্য অনির্দ্দেশ্য। এজন্য যিনি যুক্তি দ্বারা ব্রহ্মতত্ব স্থাপন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, তাঁহার যুক্তি যতই গভীর—যতই ন্যায়সঙ্গত হউক, তাহার বিরোধী যুক্তি (Antethesis) সম্ভব। তবে শঙ্করের যুক্তি যেস্থলে শাস্ত্রমূলক, ও শাস্ত্রের সমন্বয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত, সেস্থলে সেরূপ বিরোধী যুক্তি বড় থাকিতে পারে না; তথাপি সেযুক্তি সম্বন্ধেও মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীশঙ্কর যেভাবে শাস্ত্র সমন্বয় করিয়াছেন, অপরে অন্যভাবেও তাহার সমন্বয় করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। যাহার যোগদৃষ্টি যতদুর উন্মিষিত তিনি ততদুর দেখিতে পান, এবং তিনি এই শাস্ত্র-সমন্বয়ে ততদুর সমর্থ হন। শ্রীশঙ্কর অনেকস্থলে এই যোগদৃষ্টি অপেক্ষা, অন্য প্রমাণের উপর অধিক নির্ভর করিয়াছেন। এজন্য সেপ্রমাণ ও তদবলম্বিত মূলসূত্র সম্বন্ধে তাঁহার যে ধারণা বা সিদ্ধান্ত, তাহা খণ্ডিত হইতে পারে। অর্থাৎ তিনি যেভাবে সেই মূল সূত্র গ্রহণ করিয়াছেন, অপরে আপনার জ্ঞান ও বিশ্বাস মত সে মূলসূত্র অন্যভাবে দেখিতে পারে। যাহা শ্রীশঙ্কর স্বতঃসিদ্ধরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা অপরে অন্যভাবে গ্রহণ করিতে পারে। কেননা সে স্বতঃসিদ্ধ সত্য, শাস্ত্রপ্রমাণমূলক, জ্ঞানপ্রমাণ-মূলক,—তাহা প্রকৃত যোগজ প্রত্যক্ষমূলক বলা যায় না।

এইজন্য যাঁহারা শ্রীশঙ্করের অনুবর্ত্তী, তাঁহারাও অনেক স্থলে শঙ্করের মতের অনুসরণ করিতে পারেন নাই। মধুসূদন সরস্বতী যেখানে ভিন্ন অর্থ করিয়াছেন, সেখানে প্রায়ই সম্ভ্রমের সহিত বলিয়াছেন "যে ন অত্র ভাষ্যকারেণ তুল্যতা শুশ্রূষাঃ কিং নু হেতৈকতুল্যবোধেঽপি তুল্যতা।" (৬।১৪ শ্লোকের ব্যাখ্যা) কিন্তু কোন কোন স্থলে তিনি সেরূপ সংযত হইতে পারেন নাই। ষষ্ঠ অধ্যায়ের বিংশ শ্লোকের ব্যাখায় শঙ্কর 'যত্র' শব্দের অর্থ করিয়াছেন,—'যস্মিন্ কালে'। মধুসূদন বলিয়াছেন,—

"যত্র কাল ইতি তু ব্যাখ্যানম্ অসাধু তচ্ছব্দাবয়াৎ।" সুতরাং মধুসূদন শঙ্করের এ ব্যাখ্যাকে 'অসাধু' পর্য্যন্ত বলিতে সাহস করিয়াছেন। যাউক, সে কথার এস্থলে প্রয়োজন নাই। অন্য কোন ব্যাখ্যাকার যে সর্ব্বত্র শঙ্করের অনুবর্ত্তী হইতে পারেন নাই, তাহার কারণ আমরা পূর্ব্বে নির্দ্দেশ করিয়াছি।

শাঙ্করভাষ্যের বিশেষত্ব।—সে যাহা হউক, শঙ্করের ব্যাখ্যার ন্যায় সর্ব্বাবয়ব-সম্পন্ন ব্যাখ্যা গীতার আর নাই।* অন্য কোন ব্যাখ্যায় এরূপ প্রাঞ্জল ও বিশদ যুক্তিতর্ক দ্বারা পর-মত খণ্ডিত ও স্ব-মত স্থাপিত হয় নাই। এরূপ ভাবে অন্য কোন ব্যাখ্যাকার নিজমত স্থাপনের জন্য প্রযত্ন করেন নাই। অন্য ব্যাখ্যাকারগণ প্রায়ই শাস্ত্রপ্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া শঙ্করের মত খণ্ডন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহারা অন্য যুক্তি বা তর্কের বড় অবতারণা করেন নাই। শঙ্কর গীতাভাষ্যে উপক্রমণিকায় বলিয়াছেন,—"যতস্তদর্থবিজ্ঞানেন সমস্তপুরুষার্থসিদ্ধিঃ অতস্তদ্বিবরণে যত্নঃ ক্রিয়তে ময়া।" শ্রীশঙ্কর অলৌকিক প্রতিভাবলে বুঝিয়াছিলেন যে, গীতার অর্থবিজ্ঞান দ্বারা সমস্ত পুরুষার্থসিদ্ধি হয়। এজন্য তিনি সেই গীতার্থ বিবরণে যত্ন করিয়াছেন। তিনি গীতার্থ-বিজ্ঞান জন্য বিবেকতঃ যত্ন করিয়াছেন বটে, কিন্তু তিনি নিজেই বলিয়াছেন যে, সে বিবরণ সংক্ষেপ। "অহং বিবেকতোঽর্থনির্দ্ধারণার্থং সংক্ষেপতো বিবরণং করিষ্যামি।"

অতএব শাঙ্করভাষ্যও সংক্ষেপ। এজন্য তাহার টীকা প্রয়োজন হইয়াছিল এবং তাঁহার শিষ্য আনন্দগিরি তাহার বিস্তৃত টীকা লিখিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতেও গীতার্থ উপযুক্তরূপে বিবৃত হয় নাই।

---

* "পদচ্ছেদঃ পদার্থোক্তির্বিগ্রহবাক্যযোজনা।
আক্ষেপস্য সমাধানং ব্যাখ্যানং পঞ্চলক্ষণম্।"

আমরা এস্থলে প্রসঙ্গক্রমে বলিতে পারি যে, গীতায় এক একটি তত্ত্ব এরূপ সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে যে, তাহার অতি বিস্তৃত ব্যাখ্যা ব্যতীত আদৌ বোধগম্য হয় না। যদি গীতার এক একটি তত্ত্ব বুঝাইবার জন্য এক একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ শঙ্করের ন্যায় তত্ত্বদর্শী পণ্ডিত লিখিতেন, তাহা হইলে হয়ত গীতার্থ-বোধ অপেক্ষাকৃত সহজে হইত। আমরা ইহার দৃষ্টান্তস্বরূপ বলিতে পারি যে, প্রসিদ্ধ জর্ম্মাণ পণ্ডিত পল্‌ডুসেন্ তাঁহার Elements of metaphysics নামক দর্শন গ্রন্থের প্রথমে গীতার—

"সমং সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্।
বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি॥
সমং পশ্যন্ হি সর্ব্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্।
ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিম্॥"
(গীতা ১৩।২৭-২৮)।

এই দুই শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন যে, তাঁহার উক্ত পুস্তকের সমুদায়ই এই দুই শ্লোকের অর্থবিস্তৃতি মাত্র। প্রসিদ্ধ জর্ম্মাণ পণ্ডিত সপেনহর্ তাঁহার লিখিত বিস্তৃত তিন ভাগে সম্পূর্ণ "World as Will and Idea নামক পুস্তকেও ঐরূপ গীতার শ্লোক ও শ্রুতির 'তত্ত্বমসি' মহাবাক্য উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন যে, তাঁহার পুস্তক ইহারই কতক সম্প্রসারণ মাত্র। আমরা এস্থলে আরও উল্লেখ করিতে পারি যে, সূত্ররূপে উক্ত গীতার অনেক তত্ত্ব, জর্ম্মাণ পণ্ডিত সেলিং, ফিক্‌টে, হেগেল্ প্রভৃতি বিস্তৃত পুস্তক লিখিয়া ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তথাপি সে সকল তত্ত্ব অতি দুর্ব্বোধ্য রহিয়া গিয়াছে।

অতএব শ্রীশঙ্কর তাঁহার বিস্তৃত ব্যাখ্যাকেও যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ বলিয়াছেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারি। এস্থলে প্রসঙ্গক্রমে বলা যাইতে পারে যে, আমাদের এই ব্যাখ্যা আপাততঃ বিস্তৃত বোধ হইলেও, ইহা

সংক্ষিপ্ত। যাঁহারা প্রাচীন ও আধুনিক দর্শনশাস্ত্রের বিবৃত মূল তত্ত্ব সকল আয়ত্ত করিয়াছেন, তাঁহাদের উদ্দেশেই এ ব্যাখ্যা লিখিত। এজন্য গীতায় সেই সকল দুর্বোধ্য দার্শনিক তত্ত্ব কোথাও বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যাত হয় নাই, তাহার আভাস দেওয়া হইয়াছে মাত্র।

যাহা হউক, এ অবান্তর কথা এস্থলে বলিবার প্রয়োজন নাই। এস্থলে যাহা বলা হইল, তাহা হইতে এই দুর্বিজ্ঞেয়ার্থ গীতার শাঙ্কর-ভাষ্যই যে শ্রেষ্ঠ অথচ সংক্ষিপ্ত, তাহা বুঝিতে পারা যাইবে।

শাঙ্করভাষ্যোপক্রমণিকা।—এক্ষণে শাঙ্কর-ভাষ্যে গীতার মূলসূত্র যে ভাবে গৃহীত হইয়াছে, তাহা অতি সংক্ষেপে বুঝিতে চেষ্টা করিব। ইহার জন্য শঙ্করের গীতাভাষ্যের উপক্রমণিকা প্রথম বুঝিতে হইবে। শঙ্কর এই উপক্রমণিকায় মঙ্গলাচরণে নারায়ণকে স্মরণ করিতেছেন,—

"ওঁ নারায়ণঃ পরোঽব্যক্তাদণ্ডমব্যক্তসম্ভবম।
অণ্ডস্যান্তস্ত্বিমে লোকাঃ সপ্তদ্বীপা চ মেদিনী॥"

তাহার পর শঙ্কর বলিয়াছেন,—

"সেই ভগবান্ নারায়ণ (অব্যক্ত হইতে) এই জগৎ সৃষ্টি করিয়া তাহার স্থিতির অভিপ্রায়ে মরীচি প্রভৃতি প্রজাপতিগণকে সৃষ্টি করিয়া তাঁহাদিগকে বেদোক্ত প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম্ম গ্রহণ করান। তদনন্তর সনক-সনন্দনাদি অন্য সকলকে উৎপাদন করিয়া তাঁহাদিগকে জ্ঞান-বৈরাগ্য-লক্ষণ নিবৃত্তিধর্ম্ম গ্রহণ করান।

"বেদোক্ত ধর্ম্ম দ্বিবিধ—প্রবৃত্তিলক্ষণ ও নিবৃত্তিলক্ষণ। এই উভয়ের মধ্যে একটি (প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম্ম) জগতের স্থিতি-কারণ। যাহা প্রাণিগণের সাক্ষাৎ অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়সের হেতু, তাহা ধর্ম্ম (বৈশেষিক দর্শন)। তাহা ব্রাহ্মণাদি বর্ণদ্বারা ও বিভিন্ন আশ্রমীর দ্বারা শ্রেয়ঃপ্রাপ্তির জন্য অনুষ্ঠেয়। দীর্ঘকালবশে সেই ধর্ম্মানুষ্ঠানকারিগণের কাম (বিষয়ভোগ বাসনা) দ্বারা বিবেকবিজ্ঞান অভিভূত হওয়াতে, অধর্ম্মের প্রবৃদ্ধি ও ধর্ম্ম

অধর্ম্মের দ্বারা অভিভূত হইয়াছিল। তাহাতে সেই আদি কর্ত্তা নারায়ণাখ্য বিষ্ণু, জগতের স্থিতি ও পরিপালনের অভিপ্রায়ে এবং ব্রহ্ম (বা বেদ) ও ব্রাহ্মণত্ব রক্ষার জন্য অংশরূপে বসুদেব হইতে দেবকী-গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ব্রাহ্মণত্ব রক্ষণেই বৈদিক-ধর্ম্ম রক্ষিত হয়। কেননা, বর্ণাশ্রমভেদে বিবিধ ধর্ম্ম তাহারই অধীন। জ্ঞান-ঐশ্বর্য্য-শক্তি-বল-বীর্য্য-তেজ দ্বারা সদা সম্পন্ন সেই ভগবান্ স্বীয় ত্রিগুণাত্মিকা বৈষ্ণবী মায়া—মূল প্রকৃতিকে বশীভূত করিয়া, অজ অব্যয় সর্ব্বভূতের ঈশ্বর নিত্যশুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত-স্বভাব হইয়াও, লোকানুগ্রহ জন্য স্বীয় মায়া দ্বারা দেহবান্ ও জাত মনুষ্যের ন্যায়, লক্ষিত হইয়া থাকেন। তাঁহার স্বপ্রয়োজন না থাকিলেও, জীবগণকে অনুগ্রহ করিবার অভিপ্রায়ে, শোকমোহরূপ মহাসাগরে নিমগ্ন অর্জ্জুনকে এই বৈদিক ধর্ম্মদ্বয় উপদেশ দিয়াছিলেন। অধিক গুণশালী ব্যক্তি যে ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া অনুষ্ঠান করেন, তাহাই লোকমধ্যে সম্পূর্ণভাবে প্রচারিত হয়। (অর্জ্জুন সত্ত্বগুণে শ্রেষ্ঠ দৈবীসম্পদ্‌যুক্ত আদর্শ পুরুষ, তাই ভগবান্ অর্জ্জুনকেই এ ধর্ম্মের উপদেশ দিয়াছিলেন)।

"সেই ধর্ম্ম ভগবান্ যেরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন, সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ বেদব্যাস গীতাখ্য সপ্তশত শ্লোকে তাহা উপনিবদ্ধ করিয়াছেন।"

অতএব এই গীতাশাস্ত্র সমস্ত বেদার্থসারসংগ্রহভূত। * * * *

"সেই এই গীতাশাস্ত্রের সংক্ষেপতঃ প্রয়োজন—সহেতুক সংসারের অত্যন্ত উপরম-লক্ষণ পরম নিঃশ্রেয়স। তাহা সর্ব্বকর্ম্ম সন্ন্যাসপূর্ব্বক আত্মজ্ঞাননিষ্ঠারূপ ধর্ম্ম হইতে সিদ্ধ হয়। সেই এই গীতার্থ ধর্ম্ম উদ্দেশ করিয়া ভগবান্ অনুগীতাতে বলিয়াছেন,—

"স হি ধর্ম্মঃ সুপর্য্যাপ্তো ব্রহ্মণঃ পদবেদনে।"

ভগবান্ অনুগীতাতে অন্যত্র বলিয়াছেন,—

"নৈব ধর্ম্মী ন চাধর্ম্মী ন চৈব হি শুভাশুভী।
যঃ স্যাদেকাসনে লীনস্তূষ্ণীং কিঞ্চিদচিন্তয়ন্॥"...

"অনুগীতাতে ভগবান্ আরও বলিয়াছেন,—জ্ঞান সন্ন্যাসলক্ষণ।"

এই গীতাতেও শেষে ভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন,—

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।"

"অভ্যুদয়ার্থও যে বর্ণ ও আশ্রম উদ্দেশপূর্ব্বক প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম্ম বেদে বিহিত হইয়াছে, তাহা দেবাদিস্থানপ্রাপ্তির হেতুভূত হইলেও, ঈশ্বরার্পণবুদ্ধিতে অনুষ্ঠিত হইলে এবং ফলাভিসন্ধিবর্জ্জিত হইলে, সত্ত্বশুদ্ধির কারণ হয়। আর সত্ত্বশুদ্ধ হইলে, তাহাতে জ্ঞাননিষ্ঠা-যোগ্যতা-প্রাপ্তি হয়। এই জ্ঞান-নিষ্ঠার যোগ্যতা প্রাপ্তি দ্বারা তাহা জ্ঞানোৎপত্তির হেতু হয়, এবং সেই কারণ তাহা নিঃশ্রেয়স লাভের হেতু হয়। ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে। এইরূপ অর্থ লক্ষ্য করিয়া উক্ত হইয়াছে,—

"ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি যতচিত্তা জিতেন্দ্রিয়াঃ।
যোগিনঃ কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে॥"

"এই দুই প্রকার ধর্ম্ম, নিঃশ্রেয়স বা পরমমোক্ষার্থ প্রয়োজন এবং পরমার্থ-তত্ত্ব বাসুদেবাখ্য পরব্রহ্ম—এই অভিধেয় বা প্রতিপাদ্য এই গীতাশাস্ত্রে বিশেষভাবে অভিব্যঞ্জিত হইয়াছে। ইহাই প্রয়োজনসম্বন্ধ ও অভিধেয়-বিশিষ্ট গীতাশাস্ত্র। ইহার অর্থ-বিজ্ঞান দ্বারা সমুদায় পুরুষার্থসিদ্ধি হয়।"

এইরূপে গীতাভাষ্যের উপক্রমণিকায় গীতার প্রতিপাদ্য বিষয়, প্রয়োজন সম্বন্ধ ও অভিধেয় সংক্ষেপে উক্ত হইয়াছে। বাসুদেবাখ্য পরমব্রহ্ম ইহার অভিধেয়। কেননা, তাহাই পরমমোক্ষপদ। সেই পরমপদ প্রাপ্তিতেই পরম বা অত্যন্ত পুরুষার্থরূপ মোক্ষ বা পরম নিঃশ্রেয়স সিদ্ধি হয়। এই নিঃশ্রেয়স সিদ্ধিই গীতাশাস্ত্রের প্রয়োজন। এই পরমপদ-প্রাপ্তিরূপ নিঃশ্রেয়স সিদ্ধির উপায়—নিবৃত্তিধর্ম্মের অনুষ্ঠান, এবং গীতোক্ত উপায়ে প্রবৃত্তিধর্ম্মের অনুষ্ঠান। নিঃশ্রেয়স লাভ জন্য এই উভয়রূপ ধর্ম্মের সম্বন্ধ আছে বলিয়া এই প্রবৃত্তিধর্ম্ম ও নিবৃত্তিধর্ম্ম গীতার প্রতিপাদ্য বিষয়।

এ পর্য্যন্ত বিশেষ মতভেদ নাই। গীতায় এই বিষয় প্রয়োজন সম্বন্ধ ও অভিধেয়—সকল ব্যাখ্যাকারই স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু প্রবৃত্তি ধর্ম্ম ও নিবৃত্তি ধর্ম্মের লক্ষণ কি, প্রয়োজন কি, এই নিঃশ্রেয়স বা মোক্ষের স্বরূপ কি, ও অভিধেয় বাসুদেবাখ্য পরমব্রহ্মের স্বরূপ কি—সে সম্বন্ধে মতভেদ আছে।

প্রবৃত্তি ধর্ম্ম ও নিবৃত্তি ধর্ম্ম উভয়ই বেদবিহিত। গিরি বলিয়াছেন, যাগদানাদি প্রবৃত্তিসাধ্য ধর্ম্ম। আর নিবৃত্তি ধর্ম্ম—জ্ঞান শমদমাদি; আত্মতত্ত্ব-প্রকাশক জ্ঞান। বিবেক-বৈরাগ্যের আতিশয্যে তাহা সিদ্ধি হয়। প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম্ম—সকামভাবে অনুষ্ঠিত হইলে, স্বর্গাদি-ভোগ-কামনায় আচরিত হইলে, তাহা অভ্যুদয়ের কারণ হইতে পারে, কিন্তু তাহা নিঃশ্রেয়স বা মুক্তির কারণ হয় না। তাহা গীতার প্রতিপাদ্য বিষয় নহে। যে যাগদানাদি বর্ণাশ্রমবিহিত কর্ম্ম নিষ্কামভাবে সর্ব্বফলাভিসন্ধিরহিত হইয়া ঈশ্বরার্থ অনুষ্ঠিত হয়, তাহা প্রবৃত্তি ধর্ম্ম হইলেও চিত্তশুদ্ধি দ্বারা নিঃশ্রেয়স প্রাপ্তির হেতু হয়। এজন্য তাহা গীতায় নিবৃত্তি ধর্ম্মের সহিত উপদিষ্ট হইয়াছে। এইরূপে শঙ্করের মতে মোক্ষের উপায়ভূত প্রবৃত্তি-লক্ষণ নিষ্কাম কর্ম্মযোগ এবং নিবৃত্তিলক্ষণ জ্ঞান বা কর্ম্মসন্ন্যাসযোগ গীতার প্রতিপাদ্য বিষয়, শঙ্করাচার্য্য ভক্তিযোগের উল্লেখ করেন নাই। তাহা প্রবৃত্তিধর্ম্ম কি নিবৃত্তিধর্ম্ম কিছু বলেন নাই। তবে তাঁহার ইঙ্গিত হইতে বুঝা যায় যে ভক্তিযোগ নিবৃত্তিধর্ম্মের অন্তর্গত,—তাহা বেদোক্ত উপাসনার অন্তর্গত। যাহা হউক গীতায় প্রতিপাদ্য বিষয়, কর্ম্ম, ভক্তি এবং জ্ঞান ও তাহাদের মধ্যে পরস্পরের সম্বন্ধ ও প্রাধান্য বিষয়ে মতভেদ আছে। এস্থলে শঙ্করাচার্য্য যাহা বলিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায় যে, প্রবৃত্তিধর্ম্মের অন্তর্গত নিষ্কাম কর্ম্মযোগ গৌণভাবে সত্ত্বশুদ্ধির দ্বারা জ্ঞানলাভের যোগ্যতা-প্রাপক বলিয়া তাহা নিম্নাধিকারীর অনুষ্ঠেয়, আর নিবৃত্তিলক্ষণ জ্ঞানযোগ মুখ্যভাবে নিঃশ্রেয়স-সিদ্ধির

উপায় বলিয়া, তাহা উচ্চাধিকারীর অনুষ্ঠেয়। শঙ্কর গীতার সর্ব্বত্র এই মত স্থাপন করিতে, এবং এই মতানুসারে গীতা ব্যাখ্যা করিতে প্রযত্ন করিয়াছেন। ইহা পরে বিবৃত হইবে।

এইরূপে গীতার যে প্রয়োজন—নিঃশ্রেয়স, তাহার স্বরূপ বা লক্ষণ এস্থলে শঙ্করাচার্য্য ইঙ্গিতেও বুঝা'ন নাই। শঙ্কর অদ্বৈতবাদী। অদ্বৈত-বাদ অনুসারে জীবে ও ব্রহ্মে ভেদ নাই। ব্রহ্ম পরমার্থতঃ নির্গুণ। সেই নির্গুণ ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্তিতেই জীবের নিঃশ্রেয়স-সিদ্ধি হয়। ইহাই শঙ্করের অভিমত। দ্বৈতবাদ ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ অনুসারে—জীবব্রহ্মে ভেদবাদ বা ভেদাভেদ অনুসারে, নিঃশ্রেয়স অর্থ স্বতন্ত্র। ইহা আমরা যথাস্থানে বুঝিতে চেষ্টা করিব।

গীতার অভিধেয় যে পরমার্থতত্ত্ব বাসুদেবাখ্য, পরব্রহ্ম তাহা শ্রীশঙ্কর যে ভাবে এই গীতাভাষ্যের উপক্রমণিকায় উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা বিশেষ ভাবে আমাদের বুঝিতে হইবে। বাসুদেবাখ্য পরব্রহ্মই নারায়ণ বিষ্ণু, তিনি অব্যক্তের অতীত তত্ত্ব। তিনি অব্যক্ত হইতে এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি ভগবান্—সদা জ্ঞান ঐশ্বর্য্য শক্তি বল বীর্য্য ও তেজঃ—এই ষড়ৈশ্বর্য্যসম্পন্ন। তাঁহারই ত্রিগুণাত্মিকা বৈষ্ণবী মায়া—মূল প্রকৃতি। ভগবান্ মরীচি প্রভৃতি প্রজাপতিগণকে ও সনক-সনন্দনাদি ঋষিগণকে প্রথমে সৃষ্টি করেন। তিনিই জগতের স্থিতি বা রক্ষার নিমিত্ত মরীচি প্রভৃতি প্রজাপতিগণকে প্রবৃত্তিধর্ম্ম গ্রহণ করান ও সনক-সনন্দনাদি ঋষিগণকে নিবৃত্তিধর্ম্ম গ্রহণ করান। প্রাণীদের সেই সাক্ষাৎ অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স হেতু—বেদোক্ত প্রবৃত্তি ধর্ম্ম ও নিবৃত্তিধর্ম্ম কালে অধর্ম্ম দ্বারা অভিভূত হইলে, ভগবান্ অবতীর্ণ হন। তিনি অজ অব্যয় ভূত-মহেশ্বর নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাব হইয়াও লোককে অনুগ্রহ করিবার জন্য স্বীয় প্রকৃতিকে বশীভূত করিয়া মায়া দ্বারা দেহবান্ মানুষের ন্যায় পরিদৃষ্ট ন। তিনি বসুদেবের ঔরসে ও দেবকীর গর্ভে অংশরূপে সম্ভূত হইয়া

অর্জ্জুনকে সেই নিঃশ্রেয়স-প্রাপ্তির উপায়ভূত ধর্ম্মের ও পরমতত্ত্বের উপদেশ দিয়াছেন। এইরূপে শঙ্কর গীতার অভিধেয় এই পরমার্থতত্ত্ব এবং ঈশ্বরের অবতারতত্ত্ব বুঝাইয়াছেন।

শঙ্করের মায়াবাদ।—অতএব এস্থলে শ্রীশঙ্কর বাসুদেবাখ্য পরব্রহ্ম-তত্ত্ব যেরূপে বিবৃত করিয়াছেন, তাহাতে দ্বৈতবাদী বা ঈশ্বরনিষ্ঠ ভক্ত বৈষ্ণবাচার্য্যগণেরও বড় মতভেদ থাকিতে পারে না। শঙ্করাচার্য্য অদ্বৈতবাদী সত্য। কিন্তু সেই অদ্বৈতবাদ অনুসারে এস্থলে তিনি যে অদ্বয় ব্রহ্মতত্ত্ব বিবৃত করিয়াছেন, তাহা রামানুজ প্রভৃতি বৈষ্ণবাচার্য্যগণের মতের বিরোধী নহে। কেবল তাঁহার ব্যাখ্যাত অবতারতত্ত্ব সম্বন্ধে মতভেদ মাত্র থাকিতে পারে। এই উপক্রমণিকা পড়িয়া কেহ শঙ্করা-চার্য্যকে মায়াবাদী বলিতে পারেন না। তিনি এস্থলে যে পরমার্থতত্ত্ব অঙ্গীকার করিয়াছেন, সেই বাসুদেবাখ্য পরব্রহ্ম—আদিকর্ত্তা নারায়ণ বিষ্ণু। তিনি স্রষ্টা ঈশ্বর। তাঁহার সৃষ্ট জগৎ সত্য। তিনি প্রজাপতি-গণকে ও প্রজাগণকে সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি জগতের স্থিতি পালন জন্য প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি ধর্ম্মের প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। এইরূপে পরব্রহ্ম বাসুদেব এ জগতের স্রষ্টা,—জীবের স্রষ্টা। তিনি সর্ব্বভূত-মহেশ্বর, সর্ব্বভূত-পালক ও রক্ষক। ধর্ম্মরক্ষার্থ তাঁহার অবতারও সত্য। তবে জগৎ মায়াময় কেন? আমাদের অজ্ঞানবশে জগৎ যে ভাবে—যে ভোগ্যরূপে আমাদের নিকট প্রতিভাত হয়, সেই অজ্ঞানজনিত ভোগ্য জগৎ ব্যবহারিক। তাহা phenomenal world। তাহা পরমার্থ সত্য নহে। এই অর্থে মায়াবাদ গ্রহণ করিলে, এস্থলে শঙ্করাচার্য্যকে মায়াবাদী বলা যাইতে পারে বটে, কিন্তু বৌদ্ধ মায়া বাদ তিনি গ্রহণ করেন নাই।

মায়া কি—তাহা এ স্থলে শঙ্কর নিজেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইহা ভগবানের বৈষ্ণবী-শক্তি ত্রিগুণাত্মিকা,—ইহাই মূল প্রকৃতি। মায়া ভগবানের পরাখ্যশক্তি, তাহা জ্ঞানৈশ্বর্য্যশক্তিবলবীর্য্যতেজোরূপা।

শঙ্করাচার্য্য গীতার প্রায় সর্ব্বত্র মায়া ও প্রকৃতি এই অর্থেই গ্রহণ করিয়াছেন। চতুর্থ অধ্যায়ের ষষ্ঠ শ্লোকের ব্যাখ্যায় তিনি বলিয়াছেন,—'প্রকৃতিং স্বাং মম বৈষ্ণবীং মায়াং ত্রিগুণাত্মিকাম্।' সপ্তম অধ্যায়ের চতুর্দ্দশ শ্লোকের ব্যাখ্যায় তিনি বলিয়াছেন,—"ত্রিগুণাত্মিকাং বৈষ্ণবীং মায়াং মম.ঈশ্বরস্য বিষ্ণোঃ স্বভূতা।" কিন্তু এই স্থানে শঙ্কর আরও বলিয়াছেন, "গুণময়ী মম মায়া…সর্ব্বভূতমোহিনী।" তিনি অন্যস্থলে বলিয়াছেন, "মায়য়া ছদ্মনা" (১৮।৩১)।

যাহা হউক, এই ব্যাখ্যা হইতে জানা যায় যে, শঙ্কর গীতাতেও মায়াশব্দ বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। এই মায়া ভগবানের ত্রিগুণাত্মিকা বৈষ্ণবী শক্তি, কিন্তু ইহা সর্ব্বভূতমোহিনী, আচ্ছাদকশক্তি। এই অর্থে মায়া আমাদের জ্ঞান-আবরক শক্তি, ইহা অজ্ঞান বা অবিদ্যা—ইহা এই জগৎকে ভোগ্যরূপে আমাদের নিকট প্রকাশ করে, সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ—এই ত্রিগুণময়ী ভাবের দ্বারা আমাদিগকে ও জগৎকে মোহিত করে।

মায়া শব্দের নানা অর্থ হইতে পারে। মায়ার এক অর্থ - কৌশল বা শিল্পকৌশল। ইহার আর এক অর্থ অচিন্ত্যশক্তি "অঘটন-ঘটনা-পাটবত্ব,—ইহা ঐন্দ্রজালিকের শক্তির ন্যায়, Hypnotiserএর শক্তির ন্যায়,—যেখানে যাহা নাই, সেখানে তাহা দেখাইতে পারে, অথবা এক বস্তুকে অন্য বস্তুরূপে দেখাইতে পারে। ইহা হইতে মায়ার তৃতীয় অর্থ—মিথ্যা, কল্পনা বা ভ্রম—বিকল্প বা বিপর্য্যয়। ইহা আমাদের নিজেরই অজ্ঞানের বা ভ্রান্ত জ্ঞানের ফল। ইহাকে ইংরাজীতে Illusion বা Hallucination বলা যায়। সর্পে রজ্জু ভ্রম বা স্বপ্নে গন্ধর্ব্বনগর-দর্শন, এ অর্থে মায়ার দৃষ্টান্ত। 'মা' ধাতুর নানা অর্থ। ইহার এক অর্থ নির্ম্মাণ করা, এক অর্থ মাপ করা বা পরিমাণ করা, আর এক অর্থ সঙ্কীর্ণ সীমাবদ্ধ পরিচ্ছিন্ন করা বা পরিমাণযোগ্য করা। 'মা' ধাতুর এই বিভিন্ন অর্থ হইতে মায়ার

এইরূপ বিভিন্ন অর্থ হইতে পারে। বেদান্তদর্শনের ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য এইরূপ স্থানে স্থানে বিভিন্ন অর্থে মায়া শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। এ জন্য শঙ্করকে মায়াবাদী বলিলে, এবং মায়া অর্থে অবাস্তব কল্পনা গ্রহণ করিলে, তাঁহাকে জগৎ সম্বন্ধে স্বপ্নবাদ বা মিথ্যাবাদের প্রতিষ্ঠাতা, এমন কি প্রচ্ছন্ন-ভাবে বৌদ্ধদের শূন্যবাদ-প্রবর্ত্তক বলা যায়। কিন্তু গীতার এই উপক্রমণিকা হইতে, তাঁহাকে এইরূপ মায়াবাদী বলা যায় না। গীতা-ভাষ্য অনুসারে মায়া পরব্রহ্ম বাসুদেবের বা সর্ব্বজগতের আচ্ছাদক পরমেশ্বরের ত্রিগুণাত্মিকা বৈষ্ণবী শক্তি। যদি পরব্রহ্মের শক্তি এই মায়া হয়—এবং যদি তাহাই মূলপ্রকৃতি হয়, তবে মায়া মিথ্যা নহে, তাহা ঐন্দ্রজালিকশক্তি নহে। শঙ্করের মতে কারণের অন্তর্ভূত শক্তি ও শক্তির অন্তর্ভূত কার্য্য।

পারমার্থিক 'মা' ধাতু হইতে মায়ার যে অর্থ হয়, তাহা গ্রহণ করিলে, এ সম্বন্ধে আর গোলযোগ থাকে না। যাহা অপরিমেয়কে পরিমেয়, অপরিচ্ছিন্নকে পরিচ্ছিন্ন, অসীমকে সসীম, অনন্তকে সান্ত করে—তাহা মায়া। "পরিমীয়তে অনয়া ইতি মায়া"; তাহার ইংরাজী প্রতিশব্দ Limitation। শ্রুতি অনুসারে, ব্রহ্ম কল্পনা করেন—'আমি বহু হইব,' এবং এই কল্পনা সকলকে সংরূপে স্বশক্তি দ্বারা ব্যক্ত করিয়া আত্মারূপে তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হন। ব্রহ্মে যাহা Thought তাহাই Being। এজন্য এই মায়াহেতু ব্রহ্মজ্ঞানে যাহা কল্পিত, তাহাই সংরূপে বিবর্ত্তিত। এইজন্য পরমেশ্বর সৃষ্ট জগৎ পরমার্থতঃ মিথ্যা নহে। শঙ্কর বলিয়াছেন, 'স ভগবান্ সৃষ্ট্বেদং জগৎ তস্য চ স্থিতিং চিকীর্ষুঃ… মরীচ্যাদীন্ সৃষ্ট্বা… …ধর্ম্মং……গ্রাহয়ামাস।' এই আদিকর্ত্তা ভগবান্ নারায়ণাখ্য বিষ্ণুর এই জগৎ-সৃষ্টি, এই প্রজা-সৃষ্টি, এবং জগতের স্থিতি ও রক্ষার জন্য ধর্ম্মের সৃষ্টি ও প্রবর্ত্তন পরমার্থতঃ মিথ্যা নহে। যাহা পরমার্থ-সত্য নহে, পরমমোক্ষশাস্ত্র গীতায় তাহা উপদিষ্ট হইতে পারে না। এজন্য শঙ্করাচার্য্য গীতায় কোথাও এই জগৎকে মিথ্যা বা পরমার্থতঃ

অসৎ বলেন নাই। এই অর্থেই গীতায় শঙ্করাচার্য্যের মায়াবাদ গ্রহণ করিতে হয়।

শঙ্করাচার্য্য এই মায়াকে প্রকৃতি বলিয়াছেন, তাহা দেখিয়াছি। এই প্রকৃতি অর্থে শঙ্কর যাহা বলিয়াছেন, তাহাও এস্থলে দেখিতে হইবে। তিনি সাংখ্যদর্শন অনুসারে বলিয়াছেন,—

"প্রকৃতিঃ প্রধানং সত্ত্বরজস্তমসাং গুণানাং সাম্যাবস্থা। তস্যাঃ প্রকৃতেগুর্ণৈর্বিকারৈঃ কার্য্যকারণরূপৈঃ ক্রিয়মাণানি কর্ম্মাণি…।" (৩।২৭ শ্লোকের ভাষ্য)। গীতার সপ্তম অধ্যায়ে চতুর্থ হইতে ষষ্ঠ শ্লোকে যেখানে ভগবান্ স্বীয় পরা ও অপরা দুইরূপ প্রকৃতির উল্লেখ করিয়াছেন, সেখানে ভাষ্যে শঙ্কর বলিয়াছেন,—যথোক্তা (অপরা) যে প্রকৃতিঃ— মম ঐশ্বরী মায়াশক্তিঃ অষ্টধা ভিন্না—ক্ষেত্রলক্ষণা…অন্যাং (পরাং) বিশুদ্ধাং প্রকৃতিং মমাত্মভূতাং জীবভূতাং ক্ষেত্রজ্ঞলক্ষণাং…। এতে ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞলক্ষণে প্রকৃতী যোনী ভূতানাং…।" শঙ্করাচার্য্য অন্যত্র বলিয়াছেন,—"দৃশিমাত্রস্বরূপেণ ময়া অধ্যক্ষেণ সর্ব্বতো মম মায়া ত্রিগুণাত্মিকা অবিদ্যালক্ষণা প্রকৃতিঃ সচরাচরং জগৎ উৎপাদয়তি।" (৯।১০ শ্লোকের ভাষ্য)। এস্থলে অবিদ্যা অর্থে জড় বা অচিৎ ও বলা যায়।

যাহাহউক, শঙ্কর ভগবানের কেবল সাক্ষী দ্রষ্টাস্বরূপ স্বীকার করিয়া— এই জগৎকে অবিদ্যামূলক ও মায়াকে অবিদ্যালক্ষণ বা অজ্ঞানলক্ষণ বলিয়াছেন। আবার গীতার যেস্থানে প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়কে অনাদি বলা হইয়াছে (গীতা ১৩।১৯), সে স্থলে প্রকৃতিকে অপরা ক্ষেত্রলক্ষণা প্রকৃতি ও পুরুষকে ক্ষেত্রজ্ঞলক্ষণ পরা প্রকৃতি বলিয়া শঙ্কর ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, ঈশ্বর নিত্য এজন্য তিনি নিত্য এই উভয়প্রকৃতিযুক্ত ও এজন্য প্রকৃতি ও পুরুষ অনাদি এবং এই পুরুষপ্রকৃতিরূপ উভয় প্রকৃতিযুক্ত বলিয়াই ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব। এই সকল স্থানে শঙ্করের অর্থ-সঙ্গতি ভাল বুঝা যায় না। তিনি এই ত্রয়োদশ অধ্যায়ে প্রকৃতিকে অবিদ্যা-

লক্ষণ কার্য্যকারণরূপা বলিয়াছেন, এবং এইরূপে বেদান্তভাষ্য-প্রচারিত মায়াবাদের অবতারণা করিয়াছেন।

গীতায় জীব-প্রকৃতি—দৈবী ও আসুরী জীবপ্রকৃতির কথা উক্ত হইয়াছে। এই জীবপ্রকৃতি সম্বন্ধে শঙ্কর বলিয়াছেন,—"প্রকৃতির্নাম পূর্ব্বকৃতধর্ম্মাধর্ম্মাদিসংস্কারো বর্ত্তমানজন্মাদাবভিব্যক্তঃ।" (গীতা ৩৩৩ শ্লোকের ভাষ্য)। যাহা হউক, এ জীবপ্রকৃতির কথা এস্থলে উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই।

বাসুদেবাখ্য পরব্রহ্মরূপ পরমার্থতত্ত্ব বুঝিতে হইলে, তৎসংসৃষ্ট মায়া বা প্রকৃতির-তত্ত্ব বুঝিতে হয়। এজন্য এস্থলে শঙ্করাচার্য্যের ব্যাখ্যাত ব্রহ্ম-তত্ত্ব বুঝিবার জন্য তিনি মায়া ও প্রকৃতি কি অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা এস্থলে সংক্ষেপে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। বলিয়াছি ত, গীতার অভিধেয় এই পরমার্থতত্ত্বই গীতার মূল-সূত্র। তাহার প্রকৃত অর্থ বুঝিলে গীতার অর্থগ্রহণ কতক সম্ভব হয়। শঙ্করাচার্য্য গীতার অভিধেয় বা মূলসূত্র এই পরমার্থ ব্রহ্মতত্ত্বকে নারায়ণ, বাসুদেব বিষ্ণু প্রভৃতি আখ্যা দিয়াছেন। বলিয়াছি ত, ইহা হইতে শঙ্করকে বৈষ্ণবাচার্য্যগণের ন্যায় ঈশ্বরবাদী ভক্ত বলা যায়। তিনি বেদান্তদর্শনে যে ঈশ্বর জীব প্রভৃতি সমুদায়কে মায়াকল্পিত বলিয়া ইঙ্গিত করিয়াছেন, গীতায় তাহার বড় আভাস পাওয়া যায় না। নির্ব্বিশেষ পরব্রহ্মেই এই সকল বিশেষণ যে ব্যবহারিক, তাহা পরমার্থতঃ সত্য নহে,—এ সিদ্ধান্ত গীতা ভাষ্য হইতে পাওয়া যায় না। আমরা এইমাত্র দেখিতে পাই যে, শঙ্করের মতে বাসুদেব অর্থে সর্ব্বজগতের নিবাস বা আচ্ছাদক—সর্ব্বব্যাপক পরমেশ্বর,—তিনিই সর্ব্বব্যাপক বলিয়া বিষ্ণু। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহারই অংশাবতার। বসুদেব-দেবকী হইতে তিনি অংশরূপে মানুষী তনু গ্রহণ করিয়া লোকপ্রত্যক্ষ হইয়াছিলেন। কিন্তু সে তনু মায়াময়, বাস্তব নহে। এস্থলেও তাঁহার বেদান্ত-প্রতিপাদিত মায়াবাদের আভাস পাওয়া যায়।

আনন্দগিরি—শ্রীশঙ্করের বেদান্ত-ভাষ্যে প্রবর্ত্তিত অদ্বৈতবাদ অনুসারে তাঁহার গীতাভাষ্য, বিশেষতঃ এই ভাষ্যের উপক্রমণিকা বিবৃত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, ভগবান্ ভাষ্যকার প্রামাণিক ব্যবহার অনুসারে প্রথমতঃ উক্ত মঙ্গলাচরণ করিয়াছেন; এবং তাহার পর ইতিহাস ও পুরাণের সহিত গীতাশাস্ত্রের একবাক্যতা অভিপ্রায় করিয়া প্রথমে পুরাণোক্ত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। "ইতিহাসপুরাণয়োঃ প্রখ্যাচিখ্যাসিত-গীতাশাস্ত্রোক্তৈকবাক্যতামভিপ্রেত্য মঙ্গলাচরণং……।" কিন্তু সূক্ষ্মদর্শিগণ এই 'নারায়ণঃ পরোঽব্যক্তাৎ…' শ্লোকের অন্যরূপ অর্থ করিবেন। নারায়ণ শব্দের সূক্ষ্মার্থ কি? নর শব্দে চরাচরাত্মক শরীরজাত বুঝায়। তাহাতে নিত্যসন্নিহিত চিদাভাসই জীব—তাহাকে নারা বলে। তাহাদের অয়ন বা আশ্রয়, নিয়ামক বা অন্তর্য্যামী যিনি, তিনিই নারায়ণ। এই নারায়ণ পরমাত্মা—তিনি কূটস্থ, অসঙ্গ, অবিষয়, অদ্বিতীয়। কিন্তু মায়া-সম্বন্ধ হেতু শাস্ত্রে তাঁহার অন্তর্য্যামিত্বাদি প্রতিপাদিত হইয়াছে। সেই মায়াই অব্যক্ত অব্যাকৃত। পরমাত্মা সেই মায়াখ্য অব্যক্ত হইতে পর বা ব্যতিরিক্ত—অর্থাৎ মায়া দ্বারা অসংস্পৃষ্ট। সেই পরমাত্মাতে মায়াসম্বন্ধের অভাব থাকিলেও, সেই সম্বন্ধ কল্পনা বা অঙ্গীকার করিয়া তাঁহাকে অন্তর্য্যামী প্রভৃতি বলা হয়। তিনি সেই মায়া বা অব্যক্তের সাক্ষিমাত্র। সেই সাক্ষিত্ব হেতুই মূল কারণ, সেই অব্যক্ত হইতে অপঞ্চীকৃত পঞ্চমহাভূতাত্মক হিরণ্যগর্ভাখ্য অণ্ড সম্ভূত হয়, এবং তাহা হইতে বিরাটের উৎপত্তি হয়। বিরাট্‌রূপ এই সকল লোক ও সপ্তদ্বীপা পৃথ্বী সেই হিরণ্যগর্ভরূপ অণ্ডের মধ্যেই অবস্থিত থাকে। এই অব্যক্ত বা মায়া—যাহার মধ্যে এই বিশ্ব প্রতিষ্ঠিত,—তাহার অতীত তত্ত্ব—নারায়ণ। 'ত্বং'-পদবাচ্য জীব—নারা, তাহাদের অয়ন বা অধিষ্ঠান 'তৎ'-পদবাচ্য নারায়ণ—পরম ব্রহ্ম। এই বিশ্বজগৎ সেই অধিষ্ঠানে কল্পিত। এই কল্পিত জগতের ব্রহ্মই লক্ষ্য।

আনন্দগিরি এইরূপে অদ্বৈতবাদ অনুসারে মায়া হইতে অতীত পরমাত্মা নারায়ণ কর্ত্তৃক মায়াতে অধিষ্ঠানপূর্ব্বক সেই মায়া হইতে জগতের সৃষ্টি ও রক্ষার্থ ধর্ম্মদ্বয়ের সৃষ্টিতত্ত্বের আভাস দিয়াছেন। অবতার সম্বন্ধে গিরি বলিয়াছেন যে, নারায়ণ 'লীলাময়' মায়াশক্তি প্রযুক্ত অংশরূপে অর্থাৎ স্বেচ্ছানির্ম্মিত মায়াময় স্বরূপে বিগ্রহমূর্ত্তি গ্রহণ করিয়াছিলেন। সে মূর্ত্তিতেও তিনি জ্ঞানশক্তি প্রভৃতি ষড়ৈশ্বর্য্যসম্পন্ন ছিলেন। কেননা, তিনি সদা এই ষড়ৈশ্বর্য্যসম্পন্ন। এইজন্য তাঁহার সে বিগ্রহ মূর্ত্তির সহিত আমাদের বিশেষ পার্থক্য আছে। আর তাঁহার সে বিগ্রহ মূর্ত্তি প্রতিভাসমাত্র শরীর, তাহা বাস্তব নহে—মায়াময়। সেই মায়া নানাবিধ কার্য্য করে। পরিণামী বলিয়া তাহাকে মূলপ্রকৃতি বলা হইয়াছে। সেই মায়া ভগবানেরই অধীন। অতএব পরমাত্মা অজ অব্যয় হইয়াও যে শরীরীর ন্যায় দৃষ্ট হইয়াছিলেন, তাহা এই ভাবেই বুঝিতে হয়। ভগবান্ মায়াশক্তি দ্বারাই দেহবানের ন্যায় হইয়া প্রাণিগণকে অনুগ্রহ করিবার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, এবং অর্জ্জুনকে উপলক্ষ করিয়া এই গীতাশাস্ত্রে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি ধর্ম্ম উপদেশ দিয়াছিলেন।

আনন্দগিরির ব্যাখ্যা আর উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন নাই। অদ্বৈতবাদ অনুসারে গীতার অভিধেয় পরব্রহ্মতত্ত্ব শঙ্করাচার্য্য ও তাঁহার অনুবর্ত্তী আনন্দগিরি কি ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ও কি ভাবে গীতার মূলসূত্র বুঝিয়াছেন, তাহা আমরা এরূপে বুঝিতে পারি।

মধুসূদন—এক্ষণে শঙ্করের অনুবর্ত্তী মধুসূদন, তাঁহার গীতা ব্যাখ্যার উপক্রমণিকায় যাহা বলিয়াছেন, তাহা সংক্ষেপে বুঝিতে হইবে। মধুসূদন সরস্বতী—বাঙ্গালা দেশের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত। তিনি পণ্ডিতবর শ্রীশশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের উর্দ্ধতন দশম পুরুষ। তাঁহার ব্যাখ্যা বিস্তৃত। বিশেষতঃ ষষ্ঠ অধ্যায়ে তাহার পাণ্ডিত্য ও ব্যাখ্যা-গৌরব অসাধারণ।

তাঁহার ব্যাখ্যা সর্ব্বত্র আদৃত। তিনি গীতাভাষ্যের উপক্রমণিকায় যাহা বলিয়াছেন, তাহা এস্থলে উদ্ধৃত হইল :—

"ভগবৎপাদভাষ্যার্থং আলোচ্যাতিপ্রযত্নতঃ।
প্রায়ঃ প্রতিপদং কুর্ব্বে গীতা গূঢ়ার্থদীপিকাম্॥
সহেতুকস্য সংসারস্যাত্যন্তোপরমাত্মকম্।
পরং নিঃশ্রেয়সং গীতাশাস্ত্রস্যোক্তপ্রয়োজনম্॥
সচ্চিদানন্দরূপং তৎ পূর্ণং বিষ্ণোঃ পরং পদম্।
যৎ প্রাপ্তয়ে সমারব্ধা বেদাঃ কাণ্ডত্রয়াত্মকম॥
কর্ম্মোপাস্তি স্তথা জ্ঞানমিতি কাণ্ডত্রয়ং ক্রমাৎ।
তদ্রূপাষ্টাদশাধ্যায়ী গীতাকাণ্ডত্রয়াত্মিকা॥
তত্র তু প্রথমে কাণ্ডে কর্ম্মতত্ত্যাগ বর্ত্মনা।
ত্বংপদার্থো বিশুদ্ধাত্মা সোপপত্তি নিরূপ্যতে॥
দ্বিতীয়ে ভগবদ্ভক্তিনিষ্ঠাবর্ণনবর্ত্মনা।
ভগবান্ পরমানন্দ স্তৎপদার্থোঽবধার্য্যতে॥
তৃতীয়ে তু তয়োরৈক্যং বাক্যার্থো বর্ণ্যতে স্ফুটম্।
এবমপ্যত্র কাণ্ডানাং সম্বন্ধোঽস্তি পরস্পরম॥"

ইহা হইতে জানা যায় যে, মধুসূদন ভগবৎপাদ শ্রীশঙ্করের অনুবর্ত্তী। তিনি প্রায় প্রতিপদের ভাষ্যার্থ প্রযত্নপূর্ব্বক আলোচনা করিয়া গীতা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি শঙ্করাচার্য্যের মতানুসারে বলিয়াছেন যে, সহেতুক সংসারের অত্যন্ত উপরতিরূপ যে পরম নিঃশ্রেয়স বা মুক্তি, তাহাই গীতাশাস্ত্রের প্রয়োজন বলিয়া উক্ত হইয়াছে। গীতার অভিধেয়—পূর্ণ সচ্চিদানন্দরূপ বিষ্ণুর 'তৎ'-আখ্য পরমপদ। সেই পদরূপ নিঃশ্রেয়স প্রাপ্তি করাইবার জন্য এই ত্রিকাণ্ডযুক্ত গীতাশাস্ত্র সমারব্ধ হইয়াছে। গীতা বেদের ন্যায় তিন কাণ্ডযুক্ত। বেদ যেমন কর্ম্ম উপাসনা ও জ্ঞান ভেদে ত্রিকাণ্ডাত্মক, গীতাও সেইরূপ কর্ম্ম ভক্তি ও জ্ঞানভেদে ত্রিকাণ্ডা-

ত্মক। ইহার এক এক ষট্ক এক এক কাণ্ড। প্রথম ছয় অধ্যায়ে কর্ম্ম নিষ্ঠা ও ত্বং-পদার্থস্বরূপ নিরূপিত হইয়াছে। দ্বিতীয় ছয় অধ্যায়ে ভক্তি নিষ্ঠা ও 'তৎ'-পদার্থ নিরূপিত হইয়াছে, এবং শেষ ছয় অধ্যায়ে জ্ঞাননিষ্ঠা এবং ত্বং ও 'তৎ' পদার্থের ঐক্য প্রদর্শিত হইয়াছে। যাহা হউক, সেই তৎপদার্থ—পরমব্রহ্মস্বরূপ এ স্থলে মধুসূদন বিশেষভাবে তাহা উল্লেখ করেন নাই। তাঁহার গীতাব্যাখ্যা হইতে জানা যায় যে, তিনি শঙ্করাচার্য্যের মতানুসারে অদ্বৈত ব্রহ্মতত্ত্ব গীতার মূলসূত্ররূপে গ্রহণ করিয়াও অনেক স্থলে বৈষ্ণবাচার্য্যগণের মত অনুসরণ করিয়াছেন, এবং ভক্তি-বাদের প্রাধান্য দিয়াছেন। যাউক, সে কথা পরে উল্লিখিত হইবে।

শ্রীহনুমান্।—মধুসূদনের ন্যায় শ্রীহনুমান্ও তাঁহার পৈশাচ ভাষ্য শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্য অনুসারে বিবৃত করিয়াছেন। তিনিও গীতার সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, মোক্ষই গীতার প্রয়োজন। সেই মোক্ষ, গীতাশাস্ত্র-প্রতিপাদিত পরমার্থতত্ত্বের সম্যক্ সংবোধ হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেই পরমার্থস্বরূপই গীতার অভিধেয়। পরমাত্মস্বরূপ অববোধ ও এই শাস্ত্র—উভয়ের মধ্যে সাধ্যসাধনলক্ষণ সম্বন্ধ আছে। এই গীতাশাস্ত্র এই প্রয়োজন সম্বন্ধ ও অভিধেয়বিশিষ্ট। হনুমান্ এ সম্বন্ধে আর কোন কথা বলেন নাই। তাঁহার ব্যাখ্যা অতি সংক্ষিপ্ত। যাহা হউক, তিনি প্রায়শঃ শঙ্করের অনুবর্ত্তী। তিনিও গীতার অভিধেয় পরমার্থ-তত্ত্বকে অদ্বয় ব্রহ্মতত্ত্বরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার গীতাভাষ্যের ইহাই মূলসূত্র।

এইরূপে শঙ্করাচার্য্য প্রমুখ ব্যাখ্যাকারগণ অদ্বৈতবাদ অনুসারে গীতার অভিধেয় পরমার্থতত্ত্ব গ্রহণ করিয়াছেন, এবং জ্ঞানসাধন বা নিবৃত্তিলক্ষণ জ্ঞানযোগ দ্বারা মুখ্যতঃ এবং প্রবৃত্তিলক্ষণ কর্ম্মযোগ দ্বারা গৌণভাবে সেই পরমপদ প্রাপ্তব্য,—ইহা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক শ্রীশঙ্করের এবং তাঁহার অনুবর্ত্তী ব্যাখ্যাকারগণের ইহাই

গীতাব্যাখ্যার মূলসূত্র। এক্ষণে বৈষ্ণবাচার্য্যগণ কোন্ মূলসূত্র অবলম্বনে গীতাব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা সংক্ষেপে উল্লেখ করিতে হইবে।

শ্রীধরস্বামী।—বৈষ্ণবাচার্য্যগণের ব্যাখ্যার মধ্যে শ্রীধরস্বামীর ব্যাখ্যা সমধিক আদৃত। তাঁহার কৃত এই 'সুবোধিনী' টীকা সংক্ষিপ্ত, অথচ প্রাঞ্জল সুবোধ্য ও সুপাঠ্য। প্রবাদ আছে যে, শ্রীধরস্বামীর টীকা সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের মতভেদ হইলে, তাঁহারা বিশ্বেশ্বরের নিকট মীমাংসা প্রার্থনা করেন। কাশীধামে প্রণীত এই গীতাব্যাখ্যা সম্বন্ধে বিশ্বেশ্বর স্বপ্নে আদেশ দেন,—

"অহং বেত্তি শুকো বেত্তি ব্যাসো বেত্তি ন বেত্তি বা।
শ্রীধরঃ সকলং বেত্তি শ্রীনৃসিংহ-প্রসাদতঃ॥"

শ্রীধরস্বামী তাঁহার গীতাব্যাখ্যার উপক্রমণিকায় বলিয়াছেন,—

"ভাষ্যকারমতং সম্যক্ তদ্ব্যাখ্যাতৃগিরস্তথা।
যথামতি সমালোচ্য গীতাব্যাখ্যাং সমারভে॥"

অতএব শ্রীধরস্বামী শঙ্করাচার্য্যের গীতাভাষ্য ও তাঁহার মত সম্যক্ সমালোচন করিয়া তাঁহার গীতাব্যাখ্যা লিখিয়াছেন। কিন্তু তিনি পরব্রহ্ম বাসুদেবকে পরমতত্ত্বরূপে মূলসূত্র গ্রহণ করিয়া, তাঁহাতে ভক্তিমান্ হইয়া গীতাব্যাখ্যা করিয়াছেন,—

"তদ্ভক্তিযন্ত্রিতঃ কুর্ব্বে গীতাব্যাখ্যাং সুবোধিনীম্।"

রামানুজ।—শ্রীমদ্ রামানুজাচার্য্য ও "পরব্রহ্ম পুরুষোত্তম নারায়ণ"কে গীতার অভিধেয় বা মূলসূত্ররূপে গ্রহণ করিয়া, তাঁহার বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ অনুসারে গীতার ভাষ্য করিয়াছেন। তিনি ভাষ্যোপক্রমণিকায় বলিয়াছেন,—

শ্রিয়ঃপতিঃ নিখিলহেয়প্রত্যনীককল্যাণৈকতানঃ স্বেতরসমস্তবস্তুবিলক্ষণঃ অনন্তজ্ঞানানন্দৈকস্বরূপঃ স্বাভাবিকানবধিকাতিশয়জ্ঞান-বলৈশ্বর্য্যবীর্য্যশক্তিতেজঃসৌশীল্যপ্রভৃত্যসংখ্যেয়কল্যাণগুণগণমহোদধিঃ··· ······ বিবিধবিচিত্রানন্তভোগ্যভোক্তৃবর্গপূর্ণ-নিখিলজগদুদয়বিভবলয়লীলঃ

পরব্রহ্ম-পুরুষোত্তমো নারায়ণো ব্রহ্মাদিস্থাবরান্ত-মখিলং জগৎ সৃষ্ট্বা স্বেন রূপেণ অবস্থিতঃ......স্বমেব রূপং তত্তজ্জাতীয়-সংস্থানং স্বস্বভাবম্ অজহদেব কুর্ব্বন্ তেষু তেষু লোকেষু অবতীর্য্য তৈস্তৈরারাধিতস্তত্তদ্-ভীষ্টানুরূপ-ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাখ্যং ফলং প্রযচ্ছন্ ভূভারহরণাপদেশেন অস্মদাদীনামপি সমাশ্রয়ণীয়ত............পাণ্ডুতনয়-যুদ্ধপ্রোৎসাহন-ব্যাজেন পরমপুরুষার্থলক্ষণমোক্ষসাধনতয়া বেদান্তোদিতং স্ববিষয়জ্ঞানকর্ম্মানু-গৃহীতভক্তিযোগমবতারয়ামাস।......" স ভগবান্ পুরুষোত্তমঃ সর্ব্বেশ্বরো জগদুপকৃতিমর্ত্ত্যঃ স্বাশ্রিতবাৎসল্যবিবশঃ পার্থং রথিনমাত্মানঞ্চ সারথিং সর্ব্বলোকসাক্ষিকং চকার।"

এই উদ্ধৃত অংশ হইতে রামানুজাচার্য্য কোন্ মূলসূত্র অবলম্বন করিয়া গীতাব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহার আভাস পাওয়া যায়। রামানুজ পরমার্থ-তত্ত্ব পরব্রহ্ম পুরুষোত্তম নারায়ণের বিগ্রহমূর্ত্তি, ভক্তির আবেশে এই স্থলে বর্ণনা করিয়াছেন। তথাপি তিনি বলিয়াছেন যে, পুরুষোত্তম নারায়ণ, "পরমযোগিবাঙ্‌মনসা অপরিচ্ছেদ্যস্বরূপস্বভাবঃ।" এবং এই ভাবে তিনি গীতার অভিধেয় পরব্রহ্মতত্ত্বের স্বরূপ ইঙ্গিত করিয়াছেন। রামানুজ ভক্তিযোগের প্রাধান্য দিয়াছেন, এবং গীতায় যে জ্ঞান কর্ম্মানুগৃহীত ভক্তিযোগ বিবৃত হইয়াছে—তাহাই যে গীতার বিষয়, তাহা স্পষ্ট বলিয়া দিয়াছেন। তাঁহার গীতাব্যাখ্যায় দেখা যায় যে, তিনি কর্ম্মকে গৌণভাবে নিঃশ্রেয়স-সিদ্ধির উপায় বলেন নাই; তবে তিনি ভগবদারাধনারূপ কর্ম্মযোগেরই বিশেষ উল্লেখ করিয়াছেন।

বলদেব,—সে যাহা হউক, বৈষ্ণবাচার্য্যগণের মধ্যে বলদেব বিদ্যা-ভূষণ তাঁহার "গীতাভূষণভাষ্যের" উপক্রমণিকায় সংক্ষেপে অথচ বিশদ-ভাবে গীতার প্রয়োজন বিষয় সম্বন্ধ ও অধিকার বিবৃত করিয়াছেন, এবং দ্বৈতবাদ অনুসারে গীতার অভিধেয় পরমার্থতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—

"ভগবান্ অর্জ্জুনকে সপরিকর স্বীয় আত্মযাথাত্ম্য একমাত্র নিরূপণ জন্য এই গীতা উপনিষদ উপদেশ করিয়াছিলেন। এই গীতায় ঈশ্বর, জীব, প্রকৃতি, কাল ও কর্ম্ম—এই পঞ্চ বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। ঈশ্বর= বিভুসংবিৎ, জীব=অণুসংবিৎ, প্রকৃতি=সত্বাদি গুণত্রয়ের আশ্রয়-দ্রব্য, কাল=ত্রৈগুণ্য শূন্য জড় দ্রব্য, কর্ম্ম=পুরুষ-প্রযত্ন-নিষ্পাদ্য অদৃষ্টাদি-শব্দবাচ্য।"

"ঈশ্বর শ্রুতি অনুসারে—বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্ মন্তা বোদ্ধা কর্ত্তা বিজ্ঞানাত্মা পুরুষঃ।" তিনি কামনা করেন আমি বহু হইব। অতএব তিনি কর্ত্তা, তিনিই ভোক্তা। যদ্যপি তিনি সম্বিৎ-স্বরূপ, একমাত্র সাত্বত্তা ও প্রকাশস্বরূপ, তথাপি বিশেষ সামর্থ্য হেতু ব্যবহারে তাহার অন্যরূপ হয়। তাহাতে ভেদের অভাব থাকিলেও, তিনি ভেদকার্য্যের ও ধর্ম্ম-ধর্ম্মী ব্যবহারের হেতু। এই গীতা শাস্ত্রে সেই ভেদ প্রতিবিম্ব হইয়াছে। ইহাতে জীবাত্মা, পরমাত্মা, পরমাত্মার ধাম ও সেই ধাম প্রাপ্তির উপায়, ইহাদের স্বরূপ যথাবৎ নিরূপিত হইয়াছে। ইহাতে উপাসনা দ্বারা জীবাত্মার পরমাত্ম-যাথাত্ম্য লাভের তত্ত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে।"

"জীবাত্মার পরমাত্মস্বরূপ লাভের উপায় কর্ম্ম জ্ঞান ও ভক্তিভেদে ত্রিবিধ। কর্ম্ম—অর্থাৎ স্ববিহিত কর্ম্ম—শ্রুত্যুক্ত কর্ম্ম নিরপেক্ষ হইয়া কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক অনুষ্ঠিত হইলে তাহা চিত্তশুদ্ধি দ্বারা জ্ঞান ও ভক্তি লাভের সহায় হয়। সুতরাং কর্ম্ম পরম্পরারূপে পরমধাম প্রাপ্তির উপায়। এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে, যদি উক্তরূপে কর্ম্মা-নুষ্ঠান দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হওয়ায় তাহা জ্ঞানোৎপত্তির কারণ হয়, এবং জ্ঞানোৎপত্তি দ্বারা মুক্তির কারণ হয়, তবে ভক্তির বিশেষত্ব কি? ইহার উত্তর এই যে, জ্ঞানই কিঞ্চিৎ বিশেষভাবে ভক্তি। নির্বিশেষ ঈক্ষণাদি দ্বারা চিদ্বিগ্রহের অনুসন্ধানই জ্ঞান। আর বিচিত্র লীলা আশ্রয়পূর্ব্বক

সেই অনুসন্ধানই ভক্তি। ভক্তের জ্ঞানত্ব সচ্চিদানন্দ বিগ্রহের সহিত একরস যে ভক্তিযোগ,—তাহাতেই অবস্থিত।”

“গীতাশাস্ত্রের বিষয় তিন ষট্‌কে বিভক্ত। প্রথম ষট্‌কে ঈশ্বরের অংশ জীবের—সেই অংশী ঈশ্বরে ভক্তি-উপযোগী স্বরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে, এবং নিষ্কাম কর্ম্মসাধ্য জ্ঞান নিরূপিত হইয়াছে। দ্বিতীয় ষট্‌কে পরম প্রাপ্য অংশী ঈশ্বর ও তাঁহার প্রাপক ভক্তি ও তাহার মহিমা অভিব্যক্ত হইয়াছে। শেষ ষট্‌কে পূর্ব্বে বিবৃত ঈশ্বরাদির স্বরূপ পরিশোধিত হইয়াছে, অর্থাৎ পরিশুদ্ধ ভাবে বিবৃত হইয়াছে। এই তিন ষট্‌কে যথাক্রমে কর্ম্ম ভক্তি ও জ্ঞান ও তত্তৎ প্রাধান্য ব্যপদিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বশেষে ভক্তিই প্রতিপাদিত হইয়াছে।”

“গীতাশাস্ত্রের অধিকারী যিনি, তিনি শ্রদ্ধালু সদ্ধর্ম্মনিষ্ঠ ও বিজিতেন্দ্রিয়। সেই অধিকারী সনিষ্ঠ, পরিনিষ্ঠিত ও নিরপেক্ষ ভেদে ত্রিবিধ। তাহাদের মধ্যে স্বর্গাদিলোক প্রাপ্তি ইচ্ছুক ও হরির অর্চ্চনারূপ স্বধর্ম্ম নিষ্ঠাপূর্ব্বক আচরণকারী প্রথম। যিনি হরিভক্তিনিরত হইয়া লোকসংগ্রহার্থ স্বধর্ম্মানুষ্ঠানকারী—তিনি দ্বিতীয়। ইঁহারা উভয়েই স্ব স্ব আশ্রমে অবস্থানকারী। আর যিনি সত্য তপ জপাদি দ্বারা শুদ্ধচিত্ত ও একমাত্র হরিতে নিরত, সেই নিরাশ্রমী সাধক তৃতীয়।”

“গীতার সম্বন্ধ বাচ্যবাচক ভাব। ইহার বাচ্য উক্তলক্ষণ শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁহার বাচক এই গীতাশাস্ত্র। তাহাই গীতার বিষয়। আর অশেষক্লেশনিবৃত্তিপূর্ব্বক সেই শ্রীকৃষ্ণ-সাক্ষাৎকারই গীতার প্রয়োজন। ইহাই গীতার অনুবন্ধ চতুষ্টয়।”

এইরূপে গীতাভাষ্যের উপক্রমণিকায় বলদেব সংক্ষেপে গীতার মূল সূত্র বুঝাইয়াছেন।

বল্লভাচার্য্য—এক্ষণে বল্লভাচার্য্যের মতানুবর্ত্তী ‘অমৃত-তরঙ্গিণী’ নামক ভক্তিমার্গানুসারিণী টীকায় উপক্রমণিকায় যাহা উক্ত হইয়াছে

তাহা সংক্ষেপে বুঝিতে হইবে। ইহাতে শঙ্কর, রামানুজ, মধুসূদন ও শ্রীধর স্বামীর মত সংক্ষেপে আলোচিত হইয়াছে। প্রথমে শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্যোপক্রমণিকা উদ্ধৃত করিয়া, তাহার সমালোচনাকল্পে উক্ত হইয়াছে যে,—

"শঙ্করের মতে আত্মজ্ঞাননিষ্ঠারূপ বিদ্যাত্মক ধর্ম্ম হইতে সহেতুক সংসারের অত্যন্ত উপরম-লক্ষণ মোক্ষ হয়, ইহাই সিদ্ধ হইতেছে। কিন্তু এই বিদ্যা সাত্ত্বিকী, আর অবিদ্যা রাজস ও তামস। এই সত্ত্ব রজঃ তমঃ পরস্পর অভিভাবক। রজঃ ও তমঃগুণকে অভিভূত করিয়া সত্ত্বগুণের বিবৃদ্ধি হয়, ইহা উক্ত হইয়াছে। অতএব এই রজস্তমঃ দ্বারা অভিভব নিবৃত্তি জন্য গুণ-ত্রয় নিবারক অন্যরূপ সাধন—ভগবৎপ্রাপ্তি জন্য অন্বেষণ করিতে হয়। শঙ্কর তাহা করেন নাই। অতএব তাঁহার মত 'ন্যূন' বা অসম্পূর্ণ—ইহা অবশ্য বলিতে হয়। গীতায় জ্ঞানের ও সন্ন্যাসের উপদেশ আছে বলিয়াই যে ইহাই গীতার তাৎপর্য্য—এরূপ শঙ্কা করিবার কোন কারণ নাই। অনুগীতা হইতে জানা যায় যে গীতোক্ত উপদেশ অর্জ্জুন বিস্মৃত হইয়া তাহা আবার জানিতে চাহিলে, ভগবান্ অর্জ্জুনকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিয়াছিলেন,—

"ন শক্যং তন্ময়া ভূয়স্তথা বক্তুমশেষতঃ।
পরং হি ব্রহ্ম কথিতং যোগযুক্তেন তন্ময়া॥"

অতএব শঙ্কর যে অনুগীতা প্রামাণ্যরূপে গ্রহণ করিয়া গীতার অর্থ করিয়াছেন, তাহা যথেষ্ট নহে। অনুগীতাতেও অন্তে ভগবৎ-শরণের উপদেশ আছে। অতএব জ্ঞান বা সন্ন্যাস গীতার তাৎপর্য্য নহে।

"মধুসূদন সরস্বতীও নিঃশ্রেয়স সম্বন্ধে বিশেষে লিখিয়াছেন যে, সচ্চিদানন্দরূপ সেই পূর্ণ বিষ্ণুর পরমপদপ্রাপ্তির জন্য এই কাণ্ডত্রয়াত্মক বেদরূপ গীতা-শ্রুতি সমারব্ধ হইয়াছে। সেই কাণ্ডত্রয় যথাক্রমে কর্ম্ম, উপাসনা ও জ্ঞান। গীতার এক এক ষট্‌কে এই এক এক কাণ্ড বিবৃত

হইয়াছে। প্রথম ষট্‌কে কর্ম্মনিষ্ঠা, দ্বিতীয় ষট্‌কে ভক্তিনিষ্ঠা ও তৃতীয় ষট্‌কে জ্ঞাননিষ্ঠা উক্ত হইয়াছে। কর্ম্ম ও জ্ঞান অত্যন্ত বিরুদ্ধ, এজন্য তাহাদের সমুচ্চয়স্থান উপাসনা বা ভগবদ্ভক্তিনিষ্ঠা মধ্যম ষট্‌কে বর্ণিত হইয়াছে। মধুসূদন আরও বলিয়াছেন যে, উপাসনাত্মক ভগবদ্ভক্তি ত্রিবিধা,—কর্ম্মমিশ্রা, শুদ্ধা ও জ্ঞানমিশ্রা। প্রথম ষট্‌কে কর্ম্মত্যাগ-মুখে বিশুদ্ধ 'ত্বং'-পদার্থ নিরূপিত হইয়াছে। দ্বিতীয় ষট্‌কে ভগবদ্ভক্তিনিষ্ঠা বর্ণন-মুখে ভগবান্ পরমানন্দ 'তৎ'-পদার্থ নিরূপিত হইয়াছে। আর তৃতীয় ষট্‌কে এ উভয়ের ঐক-বাক্যার্থ পরিস্ফুটরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

"মধুসূদনের এ সিদ্ধান্ত অসঙ্গত। কেননা, গীতার অন্তে ভগবানের শরণ লইবার উপদেশ আছে। সুতরাং জীবব্রহ্মের একত্ববাদ সমীচীন নহে।"

"শ্রীধর বলিয়াছেন যে ভগবান্ অর্জ্জুনকে ধর্ম্মজ্ঞান-রহস্য উপদেশ দ্বারা শোক মোহ হইতে উত্তীর্ণ করিয়াছেন।"

'শ্রীধর আরও বলিয়াছেন,—

'ভগবদ্ভক্তিযুক্তস্য তৎপ্রসাদাত্মবোধতঃ।
সুখং বন্ধবিমুক্তিঃ স্যাৎ ইতি গীতার্থ সংগ্রহঃ॥'

"রামানুজাচার্য্য বলিয়াছেন, পরমপুরুষার্থলক্ষণ মোক্ষসাধনভূত বেদান্তোদিত বিষয়জ্ঞানকর্ম্মানুগত ভক্তিযোগ গীতায় বিবৃত হইয়াছে। জ্ঞানকর্ম্মসমুচ্চয় অঙ্গসহিত ভক্তিযোগই গীতাশাস্ত্রার্থ।'

সিদ্ধান্ত এই যে, এই গীতাশাস্ত্রে ভগবান্ পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ সকলের মুক্তির জন্য অবতীর্ণ হইয়া স্বরূপে ভক্তি প্রদানপূর্ব্বক সাত্ত্বিকাদি ত্রিবিধ ভক্তগণের উদ্ধারার্থ......ভক্তি উৎপাদন জন্য স্ব-স্বরূপ প্রসঙ্গক্রমে উপদেশ দিয়াছিলেন। গীতাতাৎপর্য্য-গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে,—

"প্রবৃত্তিধর্ম্মং ভগবান্ ঋষিদ্বারা নিরূপ্য তু।
নিবৃত্তিনিষ্ঠাং সুদৃঢ়াং নিঃসন্দিগ্ধাং হরির্জগৌ॥

সাংখ্যং যোগরহস্যং চ রহস্যতমমেব চ।
অন্যোন্যাধিক্যনির্দ্ধারো জ্ঞানবিজ্ঞানয়োরপি॥
স্বস্বরূপবিনির্দ্ধারো ভজনেতরনির্ণয়ঃ।
তদ্ধেতুগুণবৈষম্যং সর্ব্বশাস্ত্রবিনির্ণয়ঃ॥
ইতি গীতার্থনির্দ্ধারো যথাভাগো বিতন্যতে।
সাংখ্যযোগৌ নিরূপ্যাদৌ মোহমুৎসার্য্য ফাল্গুনম্।
ভক্তিপীযূষপাত্রারং কৃতবানিতি সংগ্রহঃ॥"

'অতএব গীতায় ভক্তিমার্গই উপদেষ্টব্য—ভক্তিমার্গই গীতায় নির্ণীত হইয়াছে। তাহারই মর্য্যাদা উপদিষ্ট হইয়াছে। তাই গীতাশেষে অর্জ্জুন বলিয়াছেন,—

"নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত।
স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব॥"

এইরূপে বল্লভ-সম্প্রদায় পরমতত্ত্ব শ্রীবাসুদেবে ভক্তিনিষ্ঠার প্রাধান্য—এবং তাহাই গীতাশাস্ত্রের মুখ্য প্রতিপাদ্যবিষয়রূপে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। শ্রীবল্লভ-মতে 'ভগবান্..... ব্রহ্মবিদ্যাং নিরূপ্য স্বরূপানুভবার্থং গুহ্যতমম্ ইত্যাদিনা—ভক্তিপ্রপত্তীরেবোক্তবান।'

গীতার অন্যান্য ব্যাখ্যা—এইরূপে এই স্থানে যাহা উদ্ধৃত হইল, তাহা হইতে আমরা গীতার অভিধেয় বা মূলসূত্র ব্রহ্মসম্বন্ধে এবং পরম প্রয়োজন সেই অভিধেয় ব্রহ্মরূপ পরমপদ লাভ বা নিঃশ্রেয়স ও তাহার উপায়ভূত কর্ম্ম ভক্তি ও জ্ঞানমার্গ সম্বন্ধে শঙ্করাচার্য্য ও টীকাকারগণের মত কতক বুঝিতে পারি। অন্য ভাষ্যকার বা টীকাকারগণের মত এ স্থলে উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন নাই। গীতার ভাষ্য ও টীকা অনেক আছে। এসিয়াটিক্ সোসাইটী কর্ত্তৃক সংস্কৃত পুঁথির অনুসন্ধান-ফলে বাট্ খানির অধিক গীতা-ভাষ্য ও টীকার পুঁথি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এ সকল সাধারণের অপ্রাপ্য। যে সকল ভাষ্য ও

টীকা প্রচলিত আছে বা পাওয়া যায়, তাহাদের মধ্যে শ্রীশঙ্করাচার্য্যের ভাষ্যই প্রধান, ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। শাঙ্করভাষ্য ব্যতীত, রামানুজকৃত ভাষ্য, গিরিকৃত শাঙ্করভাষ্যের টীকা, হনুমৎকৃত ভাষ্য, বলদেবকৃত ভাষ্য, শ্রীধরস্বামীর ব্যাখ্যা, মধুসূদন সরস্বতীর ব্যাখ্যা, বল্লভাচার্য্য-সম্প্রদায় অনুযায়ী ব্যাখ্যা, যে এই ব্যাখ্যায় সমালোচিত হইয়াছে, তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। এই সকল ভাষ্য ও টীকা ব্যতীত, গীতার মাধ্ব ভাষ্য, নীলকণ্ঠের টীকা, বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, নরহরিকৃত গীতাসংগ্রহ, আনন্দতীর্থপ্রণীত গীতাতাৎপর্য্য-নির্ণয় ভাষ্য, এই ভাষ্যের উপর জয়তীর্থের ব্যাখ্যা, শঙ্করানন্দের গীতাতাৎপর্য্যবোধিনী নিবন্ধ, জগদীশের গীতাপ্রদীপাখ্য ব্যাখ্যা, বল্লভসম্প্রদায়ভুক্ত বিট্‌ঠলকৃত গীতার্থ-বিবরণ ব্যাখ্যা, কল্যাণভদ্রের ব্যাখ্যা প্রভৃতি গীতার যে সকল ব্যাখ্যা পাওয়া যায়, সে সকল এই ব্যাখ্যায় আলোচিত হয় নাই। এই সকল ব্যাখ্যা সংগ্রহ করিতে না পারায় এবং তাহার প্রয়োজনবোধ না হওয়ায়, এ ব্যাখ্যায় উক্ত ভাষ্য ও টীকা সকল আলোচিত হয় নাই।

গীতার সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যা বিভাগ।—গীতার যত প্রকার ব্যাখ্যা বা ভাষ্য থাকুক তাহাদিগকে প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। এক—শ্রীশঙ্কর-প্রমুখ সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের ব্যাখ্যা আর এক শ্রীরামানুজ-প্রমুখ বৈষ্ণব বা বৈরাগি-সম্প্রদায়ের ব্যাখ্যা। শ্রীশঙ্করাচার্য্য সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক সংসারত্যাগী ব্রহ্মবাদী ও জ্ঞাননিষ্ঠ। অক্ষর নির্গুণ ব্রহ্মতত্ত্ব বিজ্ঞান দ্বারা যে ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্তিরূপ নিঃশ্রেয়স সিদ্ধি হয়, ইহাই শ্রীশঙ্করের সিদ্ধান্ত। তাঁহার অনুবর্ত্তী ব্যাখ্যাকারগণ তাঁহারই মতাবলম্বন করিয়া গীতা ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—এ জন্য তাঁহাদের ব্যাখ্যা স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করিবার তত প্রয়োজন নাই। তবে শাঙ্করভাষ্য বুঝিবার জন্য আনন্দগিরির টীকা ও মধুসূদনের ব্যাখ্যা বুঝিবার প্রয়োজন আছে, তাহা বলিয়াছি—

বৈষ্ণবাচার্য্যগণ পুরুষোত্তম বাসুদেবকে পরমতত্ত্বরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, এবং অনন্ত ভক্তি দ্বারা সেই পরমপদ লভ্য—ইহাই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। বৈষ্ণবসম্প্রদায় চারি শ্রেণীতে বিভক্ত। তদনুসারে তাঁহাদের প্রচারিত গীতাব্যাখ্যাও চারি ভাগে বিভক্ত করা যায়। প্রথম—রামানুজ ও তাঁহার অনুবর্ত্তী শ্রীসম্প্রদায়-প্রবর্ত্তিত বিশিষ্ট অদ্বৈতবাদ অনুসারে ব্যাখ্যা। দ্বিতীয়—বল্লভাচার্য্য-প্রমুখ বিষ্ণুস্বামি সম্প্রদায়ানুযায়ী শুদ্ধাদ্বৈতবাদ অনুসারে ব্যাখ্যা। তৃতীয়—নিম্বার্ক সম্প্রদায় মতানুসারে দ্বৈতাদ্বৈতবাদ অনুযায়ী ব্যাখ্যা। চতুর্থ—মধ্বাচার্য্য-প্রবর্ত্তিত মাধ্বি সম্প্রদায়ের দ্বৈতবাদ অনুসারে ব্যাখ্যা। এই সকল বিভিন্ন বাদের অর্থ এই সকল সম্প্রদায়ভুক্ত আচার্য্যগণের রচিত বেদান্তদর্শনের ভাষ্য হইতে জানা যায়। এস্থলে তাহা উল্লেখের আবশ্যক নাই। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, বৈষ্ণবাচার্য্যগণ যে গীতা ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সে সকলকে এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়; এবং কোন্ ব্যাখ্যাকার কোন্ সম্প্রদায়ভুক্ত তাহা জানিলে, তাঁহাদের গীতাব্যাখ্যার মূলসূত্রও জানা যায়। এই সকল ব্যাখ্যাকারগণের বিভিন্নবাদ এস্থলে সংক্ষেপে আলোচনার প্রয়োজন।

সাম্প্রদায়িক মতভেদের বিবরণ।—আমরা প্রত্যক্ষ ও অনুমান-প্রমাণের দ্বারা এই যে অসংখ্য (Plurality) বহুত্বপূর্ণ জগৎ জানিতে পারি, সেই জগতের নানাত্বের মধ্যে একত্বের ধারণার জন্য প্রয়াস—নিম্নগ জ্ঞানে স্বতঃসিদ্ধ। প্রসিদ্ধ জর্ম্মাণ পণ্ডিত ক্যাণ্ট্ তাহাকে Ideals of Reason বলিয়াছেন। পরমকরুণাময়ী শ্রুতি সেই প্রয়াসের সাহায্য জন্য অদ্বয় ব্রহ্মতত্ত্ব আমাদের নিকটে প্রকাশ করিয়াছেন। এই অসংখ্য বহুত্বপূর্ণ জড়জীবময় জগতের মধ্যে ও 'আমার' মধ্যে শ্রুতি সেই ব্রহ্মতত্ত্ব দেখাইয়া দিয়া তাহার অনুসন্ধানের উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শাস্ত্রজ্ঞ আচার্য্যগণ সেই শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট উপায়ে ব্রহ্মতত্ত্ব অনুসন্ধান করিতে গিয়া বিভিন্নভাবে

আমার ও এই জগতের অন্তরে বাহিরে, সেই এক ব্রহ্মতত্ত্ব যে রূপে উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহাই তাঁহারা তাঁহাদের কৃত বেদান্তদর্শনের ভাষ্যে ও গীতাভাষ্যে প্রধানতঃ বুঝাইয়াছেন।

এই প্রত্যক্ষ জড়জীবময় জগৎকে অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মতত্ত্ব উপলব্ধির উপায় কি? শঙ্কর বুঝাইয়াছেন যে, আমাদের জ্ঞান ও ব্রহ্মমধ্যে যে দেশকালনিমিত্তপরিচ্ছিন্ন জ্ঞেয় জগৎরূপ ব্যবধান রহিয়াছে, এই যে দেশকালনিমিত্তপরিচ্ছিন্ন দেহাদি অধ্যাসযুক্ত জ্ঞাতা জীবভাবের আবরণ রহিয়াছে, ইহাদিগকে দূর করিয়া দাও, তবে এ ব্রহ্মতত্ত্ব উপলব্ধি হইবে। শুধু তাহাই নহে। তাহা হইলে ব্রহ্মের সহিত আমাদের আর কোন ব্যবধান থাকিবে না। ব্রহ্ম ও আমরা এক হইয়া যাইব। কিন্তু এই যে জড়জীবময় জগৎরূপ আবরণ, ইহাকে সরাইয়া দিবার উপায় কি? শঙ্করের সিদ্ধান্ত এই যে, আমাদের জ্ঞানে যে এই জড়জীবময় জগৎ জ্ঞেয়রূপে প্রতিভাত, ইহা আমাদের অজ্ঞান মাত্র, ইহা মায়াময়—মায়া-কল্পিত। ইহার বাস্তবিক বা পারমার্থিক সত্তা নাই, ইহার ব্যবহারিক (phenomenal) সত্তা আছে মাত্র। স্বপ্নে যেমন আমরা মনেই জগৎ গড়িয়া লই ও তাহা ভোগ করি, জাগ্রৎ অবস্থায়ও আমরা সেইরূপ অবিদ্যাবশে এই জগৎ গড়িয়া লই। এইরূপে মায়া দ্বারাই ব্রহ্মে এই জড়জীবময় জগৎ বিবর্তিত বা কল্পিত হয়। ব্রহ্ম অনন্ত জ্ঞানস্বরূপ। জীব আমরাও স্বরূপতঃ সেই জ্ঞানরূপ। মায়া জন্যই সেই জ্ঞান অজ্ঞানাবরিত হয়,—জ্ঞাতা-জ্ঞেয়-রূপে দ্বৈতাত্মক হয়, দেশকাল-নিমিত্তপরিচ্ছিন্ন হয়, ত্রিগুণজ ভাব দ্বারা মোহিত হয়, তাই আমাদের জীবভাব হয়। এই সিদ্ধান্ত হইতে শঙ্কর নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবাদ, জীবব্রহ্মের অভেদবাদ এবং জগতের পারমার্থিক অর্থে মিথ্যাত্ববাদ স্থাপন করিয়াছেন। শঙ্করাচার্য্য বেদান্তদর্শনের ভাষ্যেই যুক্তিতর্ক দ্বারা পরপক্ষ নিরাশপূর্ব্বক এই বাদ স্থাপন করিয়াছেন। গীতাভাষ্যে তাহা বিবৃত হয় নাই, একথা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে।

রামানুজ এই বহুত্বপূর্ণ জগতের মধ্যে সেই এক তত্ত্বই অনুসন্ধান করিয়াছেন, এবং সেই ব্রহ্মতত্ত্বমধ্যেই সে একত্ব দর্শন করিয়াছেন। তিনও শ্রুতিপ্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া, সেই একত্ব স্থাপন করিয়াছেন; কিন্তু তাহার জন্য আমাদের ও ব্রহ্মের মধ্যে যে জগৎরূপ ব্যবধান, তাহা উড়াইয়া দেন নাই—তাহাকে মিথ্যা বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন নাই। তিনি ব্রহ্মেই এই জড়জীবময় জগৎ দর্শন করিয়াছেন। ব্রহ্ম কেবল অনন্ত জ্ঞানস্বরূপ নহেন, তিনি অচিন্ত্য শক্তিস্বরূপ। তিনি অনন্ত কল্যাণ-গুণের আকর—এজন্য সগুণ। আর কোন হেয় গুণ ব্রহ্মে থাকিতে পারে না, এজন্য ব্রহ্ম নির্গুণ। ব্রহ্ম নির্বিশেষ নহেন—তিনি সবিশেষ। তিনি স্বশক্তি দ্বারা শুদ্ধ চিৎ, চিদচিৎ ও অচিৎরূপে অভিব্যক্ত। শুদ্ধ চিৎ পুরুষোত্তম পরমেশ্বর (Personal God), জীব অচিৎযুক্ত চিৎকণা এবং এই চিদংশে পুরুষোত্তম পরমেশ্বরের সহিত অভিন্ন। আর অচিৎ এই জড়জগৎ। জীব ও জড় উভয়ই সেই চিন্ময় পুরুষোত্তমের শরীর। এইরূপে রামানুজ শঙ্করের নির্বিশেষ ব্রহ্মবাদ, জীবব্রহ্ম-সম্বন্ধ বিষয়ে অভেদবাদ এবং জগতের পারমার্থিক মিথ্যাত্ববাদ ও বিবর্ত্ত বা অধ্যাসবাদ নিরাসপূর্ব্বক সবিশেষ ব্রহ্মবাদ, জীবব্রহ্মে ভেদাভেদবাদ ও জগতের ব্রহ্মসত্তায় সত্যত্ববাদ ও পরিণামবাদ স্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। সাধারণতঃ বৈষ্ণবসম্প্রদায়গণ এই মতের অনুবর্ত্তী। কিন্তু তাঁহার ভেদাভেদবাদের অর্থ—অন্য বৈষ্ণব ব্যাখ্যাকারগণ গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার ভেদাভেদ-মতে, প্রকৃতি-বিযুক্ত জীব মুক্ত [illegible] ব্রহ্মের সহিত একাকার বলিয়া জীবব্রহ্মে অভেদ বলা [illegible] জীবে ও ব্রহ্মে ভেদ থাকে। ভগবান্ চিন্ময়, [illegible] কণা। ভগবান্ অংশী, জীব তাঁহার অংশ। অতএব জীব ও ভগবান্ [illegible]। ব্রহ্মে স্বগত ভেদ আছে মাত্র, অন্য ভেদ নাই।

যাহা হউক, রামানুজের মতে যদি জীব ও জগৎ সত্য হইল, তবে এ উভয়ের মধ্য দিয়া ব্রহ্মদর্শন কিরূপে সম্ভব? ইহার উত্তরে রামানুজ বলেন যে, অন্য সকল পদার্থের বিরোধী লক্ষণ দ্বারা ব্রহ্ম প্রতিপাদিত হন। সত্য জ্ঞান ও অনন্ত এই বিশেষণ বা লক্ষণা দ্বারা,—বিকারাস্পদ অসত্য বস্তু হইতে—জড় বস্তু হইতে বা দেশকালানিমিত্ত পরিচ্ছিন্ন বস্তু হইতে ব্রহ্মকে পৃথক্ করিয়া ধারণা করা যায়। এই সবিশেষ ভাবেই ব্রহ্ম আমাদের পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানের বিষয় হন। এক বস্তু হইতে অন্য বস্তুর পার্থক্য সাধন না করিতে পারিলে, আমাদের বস্তু-জ্ঞান সিদ্ধ হয় না। এই জন্য রামানুজ ভেদাভেদবাদ সংস্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু তিনি সাধারণভাবে ভেদাভেদবাদ গ্রহণ করেন নাই। তিনি অভেদমধ্যেও অংশ ও অংশী ভাব স্থাপন করিয়াছেন। রামানুজ সাধারণ ভেদাভেদবাদ সম্বন্ধে বলিয়াছেন, সে ভেদাভেদবাদে ব্রহ্মেতেই উপাধিসংসর্গ হয়। উপাধি-সংসর্গে জীবগত দোষ ব্রহ্মে প্রাদুর্ভূত হয়। ইহাতে বিরোধ উপস্থিত হয়। নিখিলদোষশূন্য অশেষকল্যাণগুণাকর ব্রহ্মে জীবভাব স্বীকার করিলে, নির্দোষ ব্রহ্মের সহিত জীবের তদ্ভাবাপন্নতার উপদেশ বিরুদ্ধ হয়। অতএব জীব ভগবানের অংশ। ভগবান্ জীবের অন্তর্যামী ও নিয়ন্তা। যাহা হউক, রামানুজের মত এস্থলে আর আলোচনা করিবার প্রয়োজন নাই।

বল্লভাচার্য্য শুদ্ধাদ্বৈতবাদী। তাঁহার মতে প্রপঞ্চাতীত পরব্রহ্ম বাসুদেবাখ্য পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণই পরম তত্ত্ব। প্রকৃতি ও জীব তাঁহারই অংশ—তাঁহারই প্রকাশ বা বিভূতি। সেই পরব্রহ্ম নিরবয়ব হইলেও, তাঁহার অংশকল্পনা আদৌ ঠিক নহে। তাঁহার নানাত্ব ঐচ্ছিক। মুক্তিতে জীব ভগবানের তুল্য হয়, ব্রহ্মসাযুজ্য হেতু তাহার দ্বৈতবিলোপ হয় ও তাহার শুদ্ধ ব্রহ্মত্ব হয়। পরম ব্রহ্ম শ্রীভগবান্ নিত্য-লীলাবিশিষ্ট। ভক্ত-গণকে স্বরূপানন্দ দান করিবার জন্যই ভগবান্ লীলা করেন। বল্লভাচার্য্য

প্রকৃত ভেদাভেদবাদী। বদ্ধ অবস্থায় জীবে ও ব্রহ্মে ভেদ থাকিলেও, মুক্তিতে জীব ব্রহ্মতুল্য হয়, তখন অংশাংশি-ভাব থাকে না।

মধ্বাচার্য্য দ্বৈতবাদী। তাঁহার মতে বাসুদেবাখ্য পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণই পরম তত্ত্ব। তাহা জীব ও জড়জগৎ হইতে ভিন্ন—অত্যন্ত ভিন্ন। এই ভেদ পাঁচ প্রকার,—জীব ও ঈশ্বরে ভেদ, জীবে জীবে পরস্পর ভেদ, জড় ও ঈশ্বরে ভেদ, জড়ে জড়ে পরস্পর ভেদ ও জড় ও জীবে ভেদ। এই পাঁচ প্রকার ভেদ অনাদিসিদ্ধ। জীব মুক্ত হইলেও, এই ভেদ থাকে। এই ভেদবাদে একত্ব দর্শন সিদ্ধি হয় না।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ প্রধানতঃ মাধ্ব সম্প্রদায়ভুক্ত হইলেও অচিন্ত্য ভেদাভেদরূপ গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীবলদেবের বেদান্ত-দর্শনের গোবিন্দ-ভাষ্য মাধ্ব মতানুযায়ী হইলেও, তাহাতে এই মতের আভাস পাওয়া যায়। ইঁহাদের মতে, অচিন্ত্য অবিদ্যারূপ শ্রীকৃষ্ণমায়ায় তত্ত্ব বিস্মৃত হওয়ায় সচ্চিদানন্দস্বরূপ জীবের সংসারভ্রম হয়। মুক্তিতে জীব যে সচ্চিদানন্দ-রূপ ব্রহ্মের অংশ, তাহা অনুভব করে। জীব আত্মস্বরূপে ব্রহ্মের অংশ। রবির সহিত কিরণের যে সম্বন্ধ, অগ্নির সহিত স্ফুলিঙ্গের যে সম্বন্ধ, সমুদ্রের সহিত তরঙ্গের যে সম্বন্ধ, সেইরূপ ব্রহ্মের সহিত জীবের সম্বন্ধ। সচ্চিদানন্দত্বাদি ব্রহ্মের সাধর্ম্ম্য জন্য জীব স্বরূপতঃ ব্রহ্মের সহিত অভেদ, কিন্তু পরিচ্ছিন্নত্ব জন্য ভেদও নিত্যসিদ্ধ। ভগবানের অনাদিসিদ্ধ চিদ্বিলাসরূপ মহাযোগাখ্য শক্তি হেতু জীব ভগবান্ হইতে নিত্য ভিন্ন। সে শক্তি অচিন্ত্য, এজন্য এ ভেদাভেদও অচিন্ত্য।

নিম্বার্কাচার্য্য, রামানুজ প্রভৃতি বৈষ্ণবাচার্য্যগণের মতানুযায়ী পুরুষোত্তম নারায়ণকে পরম তত্ত্ব বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন এবং এই দ্বৈতাদ্বৈতবাদ ও ভেদাভেদবাদ স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু তিনি নির্গুণ অক্ষর ব্রহ্মতত্ত্বও স্বীকার করেন। তাঁহার মতে ব্রহ্মের অভিব্যক্তির ভাব চারি প্রকার। অক্ষরভাব পরমপুরুষ বা পরমেশ্বর-ভাব, জীবভাব ও জড়প্রকৃতিভাব।

এই চারি প্রকারভাব পরম ব্রহ্মে নিত্যসিদ্ধ। অতএব ব্রহ্ম সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ উভয়ই, অক্ষররূপে ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ। আর ঈশ্বর জীব ও জগৎরূপে ব্রহ্মতত্ত্ব সবিশেষ, নানাভাবে প্রতিভাত।

এইরূপে বিভিন্ন ব্যাখ্যাকারগণ গীতার অভিধেয় পরমতত্ত্ব বিভিন্নভাবে বুঝাইয়াছেন। সেই পরম তত্ত্ব পরম ব্রহ্মের নির্দ্দেশক 'শ্রীকৃষ্ণ' প্রভৃতি নাম ভেদে কিছু আসিয়া যায় না। কিন্তু তাহার ধারণা বা অর্থ ভেদে যে বিভিন্ন বাদ বা মত স্থাপিত হইয়াছে, তাহাতেই বিরোধ হয়।

মতভেদের কারণ।—আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, এই মতভেদের কারণ পূর্ণ যোগজ দৃষ্টির অভাব। ইঁহারা সকলেই আংশিকভাবে সত্যদর্শন করিয়াছেন। বলিয়াছি ত মানবের পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানে অপরিচ্ছিন্ন পরম তত্ত্বের স্বরূপ দর্শন, একরূপ অসম্ভব। ব্যাখ্যাকারগণ সাধারণতঃ শ্রুতিপ্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া, এবং শ্রুতি সমন্বয় করিয়া যুক্তি ও তর্ক দ্বারা 'শ্রুতি-অধিগম্য' অতি গভীর ব্রহ্মতত্ত্ব এবং তদন্তর্গত অন্যান্য তত্ত্ব বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, যুক্তি তর্কের উপর নির্ভর করিয়া শ্রুত্যুক্ত পরমব্রহ্মতত্ত্ব মীমাংসার প্রয়াস করিলে বাদ-বিবাদ স্বভাবতঃই উপস্থিত হয়। তাহার প্রকৃত মীমাংসা সহজে পাওয়া যায় না। এজন্য শ্রীভগবান্ গীতায় যোগ পথ অবলম্বনে পরমতত্ত্ববিজ্ঞান লাভপূর্ব্বক সেই পরমপদপ্রাপ্তির উপদেশ দিয়াছেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, গীতোপদিষ্ট নিষ্কাম কর্ম্মনিষ্ঠায় স্থিত হইয়া সাংখ্য বা আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া, ধ্যানযোগে সংসিদ্ধি লাভ করিতে পারিলে যোগী তত্ত্বদর্শী হইতে পারেন। যুক্তিতর্কের দ্বারা, বাদ-বিবাদ দ্বারা তত্ত্বদর্শন সিদ্ধ হয় না। শ্রীভগবান বলিয়াছেন,—

> ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুঞ্জন্মদাশ্রয়ঃ।
> অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যসি তচ্ছৃণু॥ (৭।১)

ভগবানে আসক্তমনা হইয়া ভগবান্‌কে আশ্রয় করিয়া যোগযুক্ত হইলে,

তাঁহার সম্বন্ধে যে বিজ্ঞান-সহিত জ্ঞান প্রকাশ হয়, তাহাই ভগবান্ দ্বিতীয় ষট্‌কে বিবৃত করিয়াছেন এবং ত্রয়োদশ অধ্যায়ে সপ্তম হইতে একাদশ শ্লোকে উক্ত অমানিত্বাদি জ্ঞানলাভ হইলে, জ্ঞেয় ব্রহ্মতত্ত্ব স্বরূপতঃ জ্ঞানে যেরূপে প্রকাশ হয়, তাহাও ভগবান্ বিবৃত করিয়াছেন। যে জ্ঞানে এই ব্রহ্ম জ্ঞেয় হন, তাহার স্বরূপ ভগবান্ যেরূপ বলিয়াছেন, তাহার মধ্যে ঈশ্বরে অনন্য অব্যভিচারিণী ভক্তি, যোগ দ্বারা অধ্যাত্ম জ্ঞানে নিত্যস্থিতি ও তত্ত্বজ্ঞানার্থ দর্শনই প্রধান। এ তত্ত্ব পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। যাঁহারা ভগবদুপদিষ্ট এই মার্গ অনুসরণ না করিয়া তর্কযুক্তি বা বাদ বিবাদ দ্বারা শ্রুতি সমন্বয়পূর্ব্বক ঈশ্বরতত্ত্ব বা ব্রহ্মতত্ত্ব লাভ করিতে চাহেন, তাঁহাদের দর্শন আংশিক, একদেশী, অপূর্ণ।

শ্রুতি-উক্ত ব্রহ্ম তত্ত্ব।—শ্রুতিতে ব্রহ্মতত্ত্বের উপদেশ নানাভাবে প্রদত্ত হইয়াছে। সেই সকল শ্রুতি মন্ত্র বিচার ও সমন্বয় দ্বারা বিভিন্ন ব্যাখ্যাকারগণ ব্রহ্মতত্ত্ব বিভিন্নরূপে ধারণা করিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। এক্ষণে শ্রুত্যুক্ত ব্রহ্মতত্ত্ব সংক্ষেপে বুঝিতে হইবে। শ্রুতি বলিয়াছেন,—"এতৎ বৈ সত্যকাম পরব্রহ্ম অপরঞ্চ ব্রহ্ম।" (প্রশ্ন ৫।২)। ব্রহ্মের দুই ভাব—পরব্রহ্ম ও অপরব্রহ্ম অথবা নির্ব্বিশেষ নির্গুণ নিরুপাধি ব্রহ্ম, এবং সবিশেষ সগুণ সোপাধিক ব্রহ্ম। শঙ্করাচার্য্য এজন্য বলিয়াছেন,—

"দ্বিরূপং হি ব্রহ্মাবগম্যতে, নামরূপবিকারভেদোপাধিবিশিষ্টং, তদ্বিপরীতঞ্চ সর্ব্বোপাধিবর্জ্জিতম্।"

শঙ্করাচার্য্য অন্যত্র বলিয়াছেন,—

"সন্তি উভয়লিঙ্গাঃ শ্রুতয়ো ব্রহ্মবিষয়াঃ। সর্ব্বকর্ম্মা সর্ব্বকামঃ সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরস ইত্যেবমাদ্যাঃ সবিশেষ-লিঙ্গাঃ; অস্থূলম্ অনণুম্ অহ্রস্বম্ অদীর্ঘম্ ইত্যেবমাদ্যাশ্চ নির্ব্বিশেষলিঙ্গাঃ।"

শ্রুতি সর্ব্বত্র এই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মকে ক্লীবলিঙ্গ শব্দ দ্বারা ও 'তৎ' শব্দ

দ্বারা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এবং সবিশেষ ব্রহ্মকে পুংলিঙ্গবাচ্য শব্দ দ্বারা ও 'সঃ' শব্দ দ্বারা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যাহা হউক, শ্রুতিতে ব্রহ্মের এই দুইরূপ ভাব উপদিষ্ট হইলেও, শঙ্করাচার্য্যপ্রমুখ সন্ন্যাসি-সম্প্রদায় ব্রহ্মের এই নির্ব্বিশেষ নিরুপাধি পরম ভাবকেই পরমার্থসত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। আর রামানুজপ্রমুখ বৈষ্ণবাচার্য্যগণ কেবল ব্রহ্মের সগুণ সবিশেষ সোপাধিক ভাবকেই পরমার্থসত্যরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা কেবল নিগুণ নিরুপাধি নির্ব্বিশেষভাবকে পারমার্থিক সত্য বলিয়া স্বীকার করেন নাই। শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন,—

"অতশ্চ অন্যতরলিঙ্গপরিগ্রহেঽপি সমস্তবিশেষরহিতং নির্ব্বিকল্পমেব ব্রহ্ম প্রতিপত্তব্যং, ন তদ্বিপরীতম্। সর্ব্বত্র হি ব্রহ্মপ্রতিপাদনপরেষু বাক্যেষু অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্ ইত্যেবমাদিষু অপাস্তসমস্তবিশেষমেব ব্রহ্ম উপদিশ্যতে।"

অর্থাৎ উভয়বিধ লিঙ্গপরিগ্রহ সত্ত্বেও সমস্তবিশেষরহিত নির্ব্বিকল্প ব্রহ্মই প্রতিপাদ্য, তাহার বিপরীত সবিশেষ সগুণ ব্রহ্ম প্রতিপাদ্য নহেন। কারণ, উপনিষদে যেখানেই ব্রহ্মের স্বরূপ প্রতিপাদিত হইয়াছে, সেখানেই, অশব্দ অস্পর্শ প্রভৃতি শব্দ দ্বারা, ব্রহ্ম যে সমুদায় বিশেষণরহিত, তাহা উপদিষ্ট হইয়াছে। তবে ব্রহ্ম ও ঈশ্বর বা পর ও অপর ব্রহ্ম—এইরূপ ব্রহ্মের দুই ভাব উক্ত হইয়াছে কেন? ইহার উত্তরে শঙ্কর বলিয়াছেন,—"যত্র অবিদ্যাকৃতনামরূপাদিবিশেষপ্রতিষেধেন অস্থূলাদিশব্দৈর্ব্রহ্ম ব্যপদিশ্যতে তৎ পরম্। তদেব যত্র নামরূপাদিবিশেষেণ কেনচিদ্ বিশিষ্টম্ উপাসনায়োপদিশ্যতে 'মনোময়ঃ প্রাণশরীরো ভারূপঃ' ইত্যাদি শব্দৈস্তৎ অপরম্।" (বেদান্তসূত্র ৪।৩।১৪ ভাষ্য)। অর্থাৎ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মই পরম ব্রহ্ম। সবিশেষ ব্রহ্ম উপাসনার জন্য উপদিষ্ট।

অন্যদিকে রামানুজ এই মত খণ্ডন করিয়া, শ্রুতিস্মৃতির সর্ব্বত্র যে

সগুণ ব্রহ্মই প্রতিপাদিত হইয়াছেন, তাহা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। রামানুজ বলিয়াছেন,—

"যতঃ সর্ব্বত্র শ্রুতিস্মৃতিষু পরং ব্রহ্ম উভয়লিঙ্গম্ উভয়লক্ষণমভিধীয়তে নিরস্তনিখিলদোষত্ব-কল্যাণগুণাকরত্ব-লক্ষণোপেতম্ ইত্যর্থঃ।"

রামানুজ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ব্রহ্ম সমস্ত দোষরহিত বলিয়া নির্গুণ, এবং অশেষ কল্যাণগুণের আকর বলিয়া সগুণ। শঙ্কর যে অর্থে ব্রহ্মকে নির্গুণ বলিয়া বুঝিয়াছেন, তাহা পরমার্থসত্য নহে। পরব্রহ্ম সগুণই, তিনিই পুরুষোত্তম। অক্ষর ব্রহ্ম প্রত্যগাত্মা মাত্র।

আমরা পূর্ব্বে নিম্বার্ক-মতের উল্লেখ করিয়াছি। বৈষ্ণবাচার্য্যগণের মধ্যে প্রধানতঃ তিনিই সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ-বাদের সমন্বয় করিয়াছেন। তিনি দ্বৈতাদ্বৈতবাদের মীমাংসা করিয়াছেন। তাঁহার মতে ব্রহ্ম— সগুণ ও নির্গুণ উভয়ভাবযুক্ত। তিনি পরাখ্য মায়াশক্তির যোগে জগতের মূল-কারণ আধার কর্ত্তা নিয়ন্তৃরূপে সগুণ (Immanent) আর জগদতীত রূপে নির্গুণ (Transcendent)। * শ্বেতাশ্বতর শ্রুতির উপরে প্রধানতঃ এই মত প্রতিষ্ঠিত। এই শ্রুতি অনুসারে—

* নিম্বার্কাচার্য্য কৃত 'সবিশেষ নির্ব্বিশেষ শ্রীকৃষ্ণ স্তবে' উক্ত হইয়াছে যে, "পরমতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ নির্গুণ 'তৎ' প্রভৃতি শব্দের দ্বারা বেদে বাচ্য, তিনি অবিদ্যাকৃত সর্ব্ব-বিশেষণ রহিত, অথচ বস্তুতঃ তিনি সর্ব্ব বিশেষ-সাগর। তিনি সর্ব্ব—তিনি বিনা কিছুই থাকিতে পারে না, অথচ 'নেতি নেতি'—এই নিষেধমুখে যাহা বেদে নির্দ্দিষ্ট, তাহার আশ্রয়। তিনি অণু হইতেও অণু অথচ সুমহৎ—সর্ব্বশক্তি বল যোগশালী। তাঁহা হইতে এই বিশ্বের উৎপত্তি—তিনি বিশ্বাত্মক—বিশ্ব নিয়ামক। তিনি নির্ব্বিশেষ চিৎস্বরূপ নিরুপাধি হইয়াও ভক্তের কামনাপূরণকারী, তিনি অপরিচ্ছিন্ন অচিন্ত্য-শক্তিমান্ হইয়াও পরিচ্ছিন্নের ন্যায় জ্ঞাত (বা জ্ঞানগম্য)। সেই পরমতত্ত্ব দুই ভাবে বাচ্য,—তিনি অনুভূতিরূপ আত্মভাবরূপ এবং সত্যস্বরূপ সুখবোধরূপ ব্রহ্মভাব-রূপ বা পরমাত্মরূপ।" এই স্তবের কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল।—

"নির্গুণং তদিতি বৈদিকং বচোঽবিদ্যয়া ত্বয়ি বিশেষণাসহে।
বস্তুতোঽখিলবিশেষসাগরে নো বিরুদ্ধমিতি তাবদস্তু মে ॥ ১

"উদ্গীতমেতৎ পরমন্তু ব্রহ্ম।
তস্মিন্ ত্রয়ং সুপ্রতিষ্ঠাক্ষরঞ্চ ॥" (শ্বেতাশ্বতর, ১।৭)

অর্থাৎ এই যে পরম ব্রহ্ম উদ্গীত, তিনি অক্ষর এবং তাঁহাতে তিনটি সুপ্রতিষ্ঠিত, অথবা তাঁহাতে অক্ষর ও এই তিন সুপ্রতিষ্ঠিত। আমরা এই শেষ অর্থই গ্রহণ করিয়াছি। তাহার কারণ পরে নির্দ্দিষ্ট হইবে। এই মন্ত্রে যে 'তিন' উক্ত হইয়াছেন, তাহা (১) ভোগ্য ক্ষর প্রধানাখ্য জগৎ, (২) ভোক্তা জীব, আর (৩) প্রেরয়িতা ঈশ্বর (শ্বেতাশ্বতর ১।৮-১২)। এই তিন রূপে ব্রহ্ম সগুণ, আর অক্ষররূপে তিনি নিগুণ—পরম ব্রহ্ম।

শ্রুতিমতে পরমতত্ত্ব ব্রহ্ম সগুণ ও নির্গুণ ভাবযুক্ত। তিনি এক অদ্বৈততত্ত্ব. যাহারা তাহার কেবল নির্গুণ ভাবকে পরমার্থসত্যতত্ত্বরূপে গ্রহণ করেন তাঁহারা সত্যকে একদিক্ হইতে আংশিকভাবে দর্শন করেন। আবার যাহারা ব্রহ্মের সগুণ ভাবকে পরমার্থ তত্ত্ব রূপে দর্শন করেন, তাঁহারাও সত্যের অপর দিক্ আংশিক ভাবে দর্শন করেন। এ উভয়ের সমন্বয় করিয়া যে দর্শন, "অহং" ও "ইদং" মধ্যে যে ব্রহ্ম দর্শন, তাহা এক অর্থে মানবের পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানে ব্রহ্ম দর্শনের শেষ সীমা। জীব ও জগতের সহিত সম্বন্ধ হইতেই ব্রহ্মজ্ঞান সিদ্ধ হয়। নিরালম্ব ব্রহ্মজ্ঞান অসম্ভব। আমাদের জ্ঞানে আমরা এজন্য

কিঞ্চ কিঞ্চিদিহ বিদ্যতে ন হি ত্বাং বিনাঽণ্বপি তথাঽখিলেশ্বর।
নেতি নেতি চ নিষেধিতাশ্রয় স্তুম্বিশেষবিষয়েঽপি সম্মতঃ ॥
ব্রহ্মণো ভবত-আদিপুরুষাজ্জায়তে যত ইদং রমেশ্বরাৎ।
তন্নিয়ামকতয়া তদাত্মকং বিশ্বমেবমখিলং প্রচক্ষতে ॥

* * * * *

শ্রৌতবাদ উপলভ্যতে তদা নির্বিশেষ চ তি মঙ্গলালয়ে ॥
আত্মভাবমনুভূতিরূপিণো যে বদন্তি তব রূপরূপিণঃ।
ব্রহ্মভাব-পরমাত্ম-ভাবতঃ সত্যমেব সুখবোধ-রূপিণঃ ॥"

সগুণ ব্রহ্মের পরমভাব—পরমপুরুষ বা পুরুষোত্তম পরমেশ্বর, আর নির্গুণ ব্রহ্মের পরমভাব—'অক্ষর' ধারণা করিতে পারি। শ্রুতি এজন্য এই দুই ভাবেই ব্রহ্মের নির্দ্দেশ করিয়াছেন। গীতাতেও অভিধেয় ব্রহ্মতত্ত্ব এই-রূপেই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু ইহাই শেষ নহে। আমরা এই কথা বুঝিতে চেষ্টা করিব। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, গীতার এই মূলসূত্র অভিধেয় পরমতত্ত্ব ব্রহ্মকে ভিন্ন ভাবে ধারণা করিয়া ব্যাখ্যাকারগণ গীতা ও বেদান্ত ব্যাখ্যা করিয়াছেন, এজন্য তাঁহাদের ব্যাখ্যা বিভিন্ন ও এক-দেশী। ইঁহাদের এই বিভিন্নভাবে ব্রহ্মধারণার মধ্যে তাহাদের সমন্বয়-পূর্ব্বক যদি কোন মূল সূত্র পাওয়া যায়, তবে গীতার প্রকৃত অর্থ কতক বুঝিতে পারা যায়। নিম্বার্কাচার্য্য কিরূপে দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদের সমন্বয় করিয়াছেন, তাহাও দেখিয়াছি। কিন্তু তাহাতেও যেন সর্ব্বত্র সুমীমাংসা পাই নাই। তিনি পরম ব্রহ্মের 'পর' ও 'অপর' এই উভয় ভাবই পরমার্থ সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, এই মাত্র।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, মানুষ যত বড় পণ্ডিত বা জ্ঞানী হউন, তাঁহার জ্ঞান সীমাবদ্ধ। বলিয়াছি ত, এই জ্ঞান, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় এই দ্বৈত অবলম্বনে প্রকাশিত হয়। ভাবজ্ঞানে "অহং" ও "ইদং" এই দ্বৈততত্ত্ব নিত্য-প্রতিভাত। ইহা ব্যতীত এই জ্ঞান দেশকালনিমিত্তপরি-চ্ছিন্ন। যে কোন বস্তু-জ্ঞান উদয় হয়, তাহা দেশকালনিমিত্তপরিচ্ছিন্ন হইয়া অভিব্যক্ত হয়। জ্ঞানের যে দ্বন্দ্ব অহং ও ইদং বা জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়, তাহা এই দেশকালনিমিত্তপরিচ্ছিন্ন হইয়া জ্ঞান-ক্রিয়াকালে অভিব্যক্ত হয়। প্রত্যক্ষ অনুমান বা শ্রুতিপ্রমাণজ প্রমাজ্ঞান এরূপ পরিচ্ছিন্ন। এই জ্ঞান চিত্তের ধর্ম্ম—বুদ্ধিরই রূপ। সাংখ্যদর্শন-মতে ইহা সাত্ত্বিক বুদ্ধিরই রূপ। রজস্তমঃসম্বন্ধ জন্য এই জ্ঞান নিত্য অজ্ঞানজড়িত—আবৃত বা বিক্ষেপযুক্ত। এজন্য এ প্রমাজ্ঞানও রজস্তমোরূপ অজ্ঞানহেতু বিকল্প ও বিপর্য্যয়বৃত্তিরূপ হয়। অমৃততরঙ্গিণীভাষ্যে ইহার ইঙ্গিত আছে।

আমাদের জ্ঞান যে পরিচ্ছিন্ন অজ্ঞান দ্বারা সীমাবদ্ধ হয়, তাহা আমাদের শাস্ত্রে প্রায় সর্ব্বত্র উপদিষ্ট হইয়াছে। বেদান্তের সকল ব্যাখ্যাকারগণই ইহা স্বীকার করেন। এই মায়া বা অজ্ঞান মুক্ত না হইলে জ্ঞান অপরিচ্ছিন্ন হয় না। যখন জ্ঞান অপরিচ্ছিন্ন হয়, তখন পূর্ণ মুক্তি হয়, আর ব্যক্তিত্ব থাকে না। শঙ্করাচার্য্য বলেন,—জ্ঞানস্বরূপ বা নিত্যবোধ ব্রহ্ম-স্বরূপ আত্মা মায়ামুক্ত হইয়া অপরিচ্ছিন্ন জ্ঞানস্বরূপ হইতে পারে। তখন দ্রষ্টা-দৃশ্য থাকে না, ভেদাভেদ থাকে না। কিন্তু অন্য কোন ব্যাখ্যাকারই ইহা স্বীকার করেন না। ইহা তর্কযুক্তির কথা, বিচার দ্বারা তত্ত্ব নির্ণয়ের কথা। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, জ্ঞানের চরম সাধন যোগ। অব্যাহত যোগদৃষ্টি দ্বারা সর্ব্বত্র ব্রহ্মদর্শন সিদ্ধ হয়। প্রমাণ দ্বারা যাহা সিদ্ধ হয় না, যোগজ দৃষ্টি উদ্‌ঘাটিত হইলে তাহা প্রত্যক্ষ হয়,—প্রজ্ঞার আলোক প্রকাশিত হয়। যোগের সাধনাসিদ্ধিতে চিত্তবৃত্তির নিরোধ হয়, সর্ব্ববৃত্তি-জ্ঞান ও তদন্তর্গত প্রজ্ঞানও নিরুদ্ধ হয়। তখন সাধক আত্মস্বরূপে বা শুদ্ধ দ্রষ্টৃস্বরূপে অবস্থান করেন, তখন দ্রষ্টা দৃশ্য ও দর্শন একীভূত হইয়া যায়। সেই অবস্থায় অর্থাৎ আত্মাতে যোগে অবস্থিতের অবস্থায়, আত্মজ্ঞান ও তাহার সহিত ব্রহ্মজ্ঞান প্রতিভাত হয়। সে অবস্থায় যে ব্রহ্মজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা অক্ষর অদ্বৈত নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম বা আত্মজ্ঞান। শঙ্করাচার্য্য এইজন্য এই অদ্বৈত ব্রহ্মতত্ত্বকেই পরমার্থসত্য বলিয়াছেন। কিন্তু এই যোগ যদি ঈশ্বরযোগ হয়, যদি যোগে আত্মাতে আত্মার আত্মা নিয়ন্তা অন্তর্য্যামী ঈশ্বরদর্শনসিদ্ধি হয়, তবে যোগে পুরুষোত্তম পরমেশ্বরতত্ত্ব যে প্রকাশিত হয়, তাহা শঙ্করাচার্য্য যুক্তি তর্ক দ্বারা শাস্ত্র হইতে সিদ্ধান্ত করেন নাই, তাহা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। যেমন 'অহং'এর দিক্ হইতে যোগসাধনা করিয়া নির্গুণ অক্ষরতত্ত্ব প্রকাশিত হয়, সেইরূপ 'ইদং'এর দিক্ হইতে যোগসাধন করিলে, প্রধানতঃ এই জগতের মধ্যে সগুণব্রহ্ম বা ঈশ্বরতত্ত্ব প্রত্যক্ষ হয়। অনির্দ্দেশ্য

ব্রহ্মতত্ত্বার্থ যে নির্গুণ অক্ষর ব্রহ্মতত্ত্ব ও সগুণ পরমেশ্বরতত্ত্বরূপে জ্ঞানে প্রকাশিত হয়, তাহা পূর্ণ পরব্রহ্মের জ্ঞান হইতে পারে না। কেননা, জ্ঞানের পরিচ্ছিন্নত্ব বা মায়ার আবরণ কখন সম্পূর্ণ দূর হয় না। যদি দূর হওয়া সম্ভব হয়, তবে তখন পূর্ণ মুক্তি হয়, তখন মানুষ আর মানুষ থাকে না, তখন জ্ঞাতা জ্ঞেয় কিছুই থাকে না। এজন্য আমাদের জ্ঞানে ব্রহ্মতত্ত্ব ধারণা যতদূর সম্ভব, তাহাই শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে। আমাদের পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানে যতদূর ব্রহ্মতত্ত্ব ধারণা সম্ভব, তাহা পরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মতত্ত্ব। ব্রহ্মকে আমরা অক্ষর অদ্বয় নির্গুণ প্রপঞ্চাতীতরূপেই দর্শন করি, কিংবা ঈশ্বর জীব ও জগৎরূপে অভিব্যক্ত সগুণরূপেই দর্শন করি—সে দৃষ্টি অবশ্যই পরিচ্ছিন্ন। শ্রুতি এইজন্য পর ও অপর এই উভয়ভাবে ব্রহ্মতত্ত্ব নির্দ্দেশ করিয়া আমাদের জ্ঞানে ধারণার অতীত ব্রহ্মতত্ত্বের ইঙ্গিত করিয়াছেন মাত্র, অক্ষর ব্রহ্মতত্ত্বের মধ্য দিয়া অনির্দ্দেশ্য জ্ঞানাতীত ব্রহ্মতত্ত্বের আভাস দিয়াছেন মাত্র।

এই তত্ত্ব আমরা পাশ্চাত্য দর্শনশাস্ত্র হইতে সংক্ষেপে বুঝিতে চেষ্টা করিব। ব্রহ্ম যদি ‘জ্ঞেয়’ হন, তবে জ্ঞানে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় এই দ্বৈতবোধ থাকিয়া যায় এবং তাহা হইলে, এই জ্ঞেয়কে দেশকালনিমিত্ত-পরিচ্ছেদ দ্বারা ব্যবচ্ছেদপূর্ব্বক জানিতে হয়। বিশেষণ দ্বারা বিশিষ্ট ভাবেই ব্রহ্মতত্ত্ব নির্দ্দেশ সম্ভব হয়। তবে দেশকালনিমিত্ত দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মতত্ত্বের আভাস যে জ্ঞানে অস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয় না, তাহা নহে। প্রসিদ্ধ জর্ম্মাণ পণ্ডিত ক্যাণ্ট্ দেখাইয়াছেন যে, আমাদের জ্ঞান কতকগুলি স্বতঃসিদ্ধ ভাবের (pure concepts of the understanding অথবা forms of the understanding) মধ্য দিয়াই বস্তু-তত্ত্ব গ্রহণ করিতে পারে। এই বিভিন্ন ভাবকে (categories) তিনি চারি প্রধান ভাগ ও প্রত্যেক ভাগকে আবার তিন ভাগ করিয়া সর্ব্বশুদ্ধ বারটি ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। পণ্ডিতবর স্পেন্সর্, ‘এই সকল-

গুলিকে সাধারণভাবে 'নিমিত্ত' (causality) ভাবের অন্তর্গত করিয়াছেন। অতএব আমাদের শাস্ত্রে যাহাকে জ্ঞানের দেশকাল-নিমিত্তপরিচ্ছেদ বলে, তাহাই পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ ক্যাণ্ট্‌ বিস্তৃতভাবে তাঁহার (Critique of Pure Reason) গ্রন্থে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইহা হইতে আমরা জানিতে পারি যে, জ্ঞেয় বস্তু মাত্রই দেশ কালের মধ্য দিয়া, এক, দুই, বহু অসংখ্যরূপ—এইপ্রকার সংখ্যা দ্বারা বাচ্য হয়; সামান্য-বিশেষ দ্বারা বাচ্য হয়; অস্তিত্ব-অনস্তিত্ব অনন্তত্ব দ্বারা বাচ্য হয়; কার্য্য-কারণসূত্রের দ্বারা বাচ্য হয় এবং নিশ্চয়-অনিশ্চয় এই বিকল্পদ্বারা বাচ্য হয়। এইরূপ বিভিন্ন ভাবের সহিত আমাদের বস্তুজ্ঞান উদয় হয় বলিয়া, আমাদের জ্ঞানের প্রধান অথবা একমাত্র জ্ঞেয় (Ideal of Reason) যে ব্রহ্মতত্ত্ব ও তৎসংসৃষ্ট তত্ত্ব বিভিন্নভাবে—এমন কি বিপরীতভাবে (Antinomy of pure Reason) ধারণা হয়। সেইজন্য এই শুদ্ধজ্ঞানে (pure transcendental Reason) অবস্থিতি করিয়াও আমরা বিভিন্নভাবে ব্রহ্মকে দর্শন করি। এইজন্য আমরা ব্রহ্মকে অদ্বৈত-দ্বৈত বা অনন্ত বিশ্বরূপে ধারণা করি, নির্গুণ-সগুণরূপে ধারণা করি, সর্ব্বকারণ-রূপে বা সর্ব্বকার্য্যরূপে ধারণা করি, তাঁহাকে সৎ বলি বা অসৎ বলি, তাঁহাকে সন্দেহ করি বা বিশ্বাস করি।

বাস্তবিক ব্রহ্মস্বরূপ আমাদের এই পরিচ্ছিন্নজ্ঞানে ধারণার অতীত। তাঁহাকে জ্ঞেয় বলা যায় না, তাঁহাকে অজ্ঞেয়ও বলা যায় না, তাঁহাকে এক কি বহু বলা যায় না, তাঁহাকে দ্বৈত কি অদ্বৈত বলা যায় না, তাঁহাকে সৎ কি অসৎ বলা যায় না, তিনি সবিশেষ কি নির্ব্বিশেষ বলা যায় না, তিনি সগুণ কি নির্গুণ বলা যায় না। ব্রহ্ম কোনরূপে বাচ্য নহেন,—তিনি অবাচ্য, অনিরুক্ত, অনির্দ্দেশ্য।

শ্রুতি এই তত্ত্ব নানাস্থলে নানাভাবে বুঝাইয়াছেন। শ্রুতি পরমব্রহ্মকে 'নেতি নেতি' বলিয়া সেই অনির্দ্দেশ্য ব্রহ্মকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—

"অথাত আদেশো নেতি নেতি। ন হ্যেতস্মাদিতি নেত্যন্যৎ পরম্ অস্তি।"

(বৃহদারণ্যক, ২।৩।৬,৪।২।৪, ৪।৪।২২)।

শ্রুতি সর্ব্বত্র নিষেধমুখে তাঁহার ইঙ্গিত করিয়াছেন, যথা—

"অস্থূলম্ অনণু অহ্রস্বম্ অদীর্ঘম্।" (বৃহদারণ্যক, ৩।৮।৮)

"অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্।" (কঠ, ৬।১৫)

"অপূর্ব্বম অনপরম অনন্তরম্ অবাহ্যম।" (বৃহদারণ্যক, ২।৫।১৯)

ব্রহ্ম অবাঙ্মনসগোচর,—

"নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা।" (কঠ, ৬।১২)

"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।" (তৈত্তিরীয়, ২।৪।১)

অতএব শ্রুতি অনুসারে পরম ব্রহ্ম স্বরূপতঃ আমাদের জ্ঞান ও ধারণার অতীত। কেননা, পরমব্রহ্ম "নান্তঃপ্রজ্ঞং ন বহিঃপ্রজ্ঞং নোভয়তঃপ্রজ্ঞং ন প্রজ্ঞানঘনং ন প্রজ্ঞং ন অপ্রজ্ঞম্ অদৃষ্টম্ অব্যবহার্য্যম্ অগ্রাহ্যম্ অলক্ষণম্ অচিন্ত্যম্, অব্যপদেশ্যং প্রপঞ্চোপশমম্।" (মাণ্ডূক্য, ৭)

এইরূপে শ্রুতি পরম ব্রহ্মের অজ্ঞেয়ত্ব ও অনির্দ্দেশ্যত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। কিন্তু ব্রহ্ম আমাদের জ্ঞানের একেবারে অজ্ঞেয় নহেন— অনির্দ্দেশ্যও নহেন তাঁহাকে শ্রুতি আরও বলিয়াছেন, তিনি "শান্ত শিব অদ্বৈত, একাত্মপ্রত্যয়সার" শ্রুতি ব্রহ্মের জ্ঞেয়ত্ব ও অজ্ঞেয়ত্ব আরও স্পষ্টরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

"যস্যামতং তস্য মতং মতং যস্য ন বেদ সঃ।

অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতমবিজানতাম॥" (কেন উপঃ, ২।৩)

অতএব ব্রহ্ম বিজ্ঞাত ও অবিজ্ঞাত উভয়ই। জ্ঞানের শেষ সীমায় বেদান্তে যাইতে পারে ব্রহ্ম বিজ্ঞাত হইয়াও অবিজ্ঞাত থাকেন। যখন সাধনাবলে জ্ঞানে দ্বৈতভান থাকে না—একত্ব দর্শন সিদ্ধ হয়, জ্ঞাতা-জ্ঞেয় এক হইয়া যায়, অহং-ইদং একীভূত হইয়া শুদ্ধ জ্ঞান প্রকাশিত হয়, তখন ব্রহ্ম এইরূপে বিজ্ঞাত হন। তখন অধ্যাত্মযোগে

ব্রহ্মকে অক্ষর কূটস্থ, বিজ্ঞাতার বিজ্ঞাতা বা বিজ্ঞানস্বরূপে জানিতে পারা যায়। ইহাই অদ্বৈত ব্রহ্মবিজ্ঞান। ইহাই অক্ষর ব্রহ্ম পরম (কঠ, ৩।১) নানাত্ব-জ্ঞান ও দ্বৈতজ্ঞান দূর করিবার জন্য 'নেতি নেতি' নির্দ্দেশ দ্বারা তিনি নির্দ্দিষ্ট হন। দ্বৈতজ্ঞানকালেও সর্ব্বরূপে সেই অক্ষর, সর্ব্বপ্রকাশক, সর্ব্বভূতাত্মা, সর্ব্বনিয়ন্তা, অচল, ধ্রুব, নিশ্চল, নির্ব্বিকার রূপে ব্রহ্ম জ্ঞেয় হন।

"তদেতদক্ষরং ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি।" (বৃহদারণ্যক, ৩।৮।৯)

"এতস্য অক্ষরস্য প্রশাসনে...।" (বৃহদারণ্যক, ৩।৮।১১)

এই সর্ব্বের মধ্যে ব্রহ্ম সগুণ সবিশেষরূপেও জ্ঞানে জ্ঞেয় হন। তাঁহাকে তটস্থ ও স্বরূপ লক্ষণ দ্বারা এ জগৎ ও আমার সহিত সম্বন্ধ হইতে সগুণ ব্রহ্মরূপে বা পুরুষোত্তম পরমেশ্বররূপে জানিতে পারা যায়। শ্রুতিতে আছে,—

এষ সর্ব্বেশ্বর এষ সর্ব্বজ্ঞ এষ অন্তর্যামী এষ যোনিঃ সর্ব্বস্য প্রভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাম্।' (মাণ্ডূক্য, ৬)

ইহাই সগুণ ব্রহ্মের ধারণা। যাহা হউক, আর অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। ইহা হইতে আমরা কতক বুঝিতে পারি যে, শ্রুতিতে ব্রহ্ম জ্ঞানাতীতরূপে ও জ্ঞানগম্যরূপে উপদিষ্ট হইয়াছেন। জ্ঞানাতীত স্বরূপ সম্বন্ধে কিছুই বলা যায় না। কেননা, তাহা অবাচ্য অনির্দ্দেশ্য—কেবল 'নেতি নেতি' দ্বারা তিনি ইঙ্গিতে নির্দ্দেশ্য। জ্ঞানগম্য স্বরূপে ব্রহ্ম নির্গুণ ও সগুণ, আমার আত্ম-স্বরূপে ব্রহ্ম অক্ষর, কূটস্থ, নির্গুণ, আর প্রপঞ্চ সম্বন্ধে ব্রহ্ম সগুণ ঈশ্বর জীব ও জড় জগৎ রূপ। প্রপঞ্চাতীত অক্ষর ব্রহ্ম অদ্বৈততত্ত্ব, প্রপঞ্চ সম্বন্ধে ঈশ্বর ও প্রকৃতিরূপে তিনি দ্বৈততত্ত্ব, অথবা তিনি বহুরূপ। নির্গুণ ব্রহ্ম আত্মযোগে অক্ষর কূটস্থরূপে অধিগম্য ও সগুণব্রহ্ম ঈশ্বরযোগে পুরুষোত্তমরূপে প্রাপ্তব্য। বলিয়াছি ত, জ্ঞানাতীত পরব্রহ্ম এই বিবিধভাবে

আমাদের জ্ঞানগম্য হইলেও, এই দ্বিবিধ ভাবের সমন্বয় দ্বারা তাঁহার স্বরূপ কিয়ৎপরিমাণে জ্ঞানে প্রতিভাত হইলেও, তাঁহার জ্ঞানাতীত স্বরূপ অপ্রকাশিত থাকে।

পরব্রহ্মে এই বিবিধ ভাবের সমন্বয় শ্রুতি ইঙ্গিত করিয়াছেন। কোথাও একই মন্ত্রে ব্রহ্মের সগুণ ও নির্গুণ ভাব অথবা কোথাও তৎসহ নির্বিশেষ ভাবের নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—নির্বিশেষ অজ্ঞেয় তত্ত্বের মূলসূত্র যে 'নেতি নেতি', তাহা বলিয়াছেন। ব্রহ্ম অস্থূল, অনণু, অহ্রস্ব, অদীর্ঘ প্রভৃতি বলিয়া শ্রুতি ব্রহ্মের স্থান কাল ও নিমিত্ত পরিচ্ছেদ নিষেধ করিয়াছেন। কোথাও ব্রহ্মের সর্ব্ববিরোধের সমন্বয় দেখাইয়াছেন,—

"আসীনো দূরং ব্রজতি শয়ানো যাতি সর্ব্বতঃ।
কস্তম্মদামদং দেবং মদন্যো জ্ঞাতুমর্হতি॥" (কঠ, ২।২১)
"তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বদন্তিকে।
তদন্তরস্য সর্ব্বস্য তদু সর্ব্বস্যাস্য বাহ্যতঃ॥" (ঈশ, ৫)

যাহা হউক, এইরূপে শ্রুতি জ্ঞানাতীত ব্রহ্মতত্ত্ব নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এবং ব্রহ্ম এই সমুদায় 'সর্ব্বং খল্বিদং' 'সোঽহং' এই ভাবে জ্ঞানগম্য ব্রহ্মতত্ত্বও উপদেশ করিয়াছেন। জ্ঞানাতীত পরমব্রহ্ম তুরীয় বা ব্রহ্মের চতুর্থ অব্যবহার্য্য অমাত্র পাদ দ্বারা শ্রুতি ইঙ্গিত করিয়াছেন। তথা তাঁহাকে প্রণবের অমাত্রানাদ বিন্দুরও অতীত অশব্দ বলিয়া ইঙ্গিত করিয়াছেন। মাণ্ডুক্য উপনিষদে আছে, আত্মা বা ব্রহ্ম চতুষ্পাদ,—

"সর্ব্বংহ্যেতদ্ ব্রহ্ম, অয়মাত্মা ব্রহ্ম, সোঽয়মাত্মা চতুষ্পাৎ॥" ২

ব্রহ্মের এই চতুর্থ পাদ অব্যবহার্য্য অজ্ঞেয়। তাহা শান্ত শিব অদ্বৈতরূপে বিশিষ্ট বা নির্দ্দিষ্ট হইলেও তাহা নির্ব্বিশেষ ও অনির্দ্দেশ্য। যাহা এইরূপে বিশিষ্ট, তাহা অক্ষর। এই অক্ষর কূটস্থ আত্মারূপে বিশিষ্ট হইয়া জ্ঞেয়। ব্রহ্মের অন্য তিন পাদ ও জ্ঞেয়। তাহার মধ্যে পরমেশ্বর ভাবই পরম ভাব।

অতএব ব্রহ্ম অদ্বৈত কি দ্বৈত কি অসংখ্য দেবাদি ভাবে অভিব্যক্ত এই সংখ্যার মধ্য দিয়া ব্রহ্মতত্ত্ব ধারণার চেষ্টায় যে বাদবিবাদ (যে antinomy) উপস্থিত হয়, যে নির্গুণ, সগুণ বা গুণাতীতরূপ বিরোধী ভাব ব্রহ্মে নির্দ্দিষ্ট করায় যে বিরোধ হয়, তাহা নিরর্থক। ব্রহ্ম এ সকলই,— অথচ সর্ব্বাতীত। এইরূপে ব্রহ্মতত্ত্বে সর্ব্ববিরোধ মীমাংসার মূলসূত্র যে শ্রুতিতে পাওয়া যায়, কোন কোন আধুনিক পাশ্চাত্য জর্ম্মাণ পণ্ডিত তাহার ব্যাখ্যার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহারা সর্ব্ববিরোধের ও সর্ব্বদ্বন্দ্বের মধ্যে (principle of contradiction এর মধ্যে) এই সর্ব্বসমন্বিত একত্ব (principle of identity) অবলম্বন করিয়া, বাদ (thesis) ও বিবাদের (antithesis) মধ্যে একত্ব ধারণা (synthesis) করিয়া, এই অজ্ঞেয় ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ জর্ম্মাণ পণ্ডিত ক্যাণ্ট্ আমাদের শুদ্ধ জ্ঞানতত্ত্ব আলোচনা করিয়া তাহাতে যে বাদ-বিবাদ-রূপ বিরোধ (যে antinomy of Pure Reason অথবা principle of contradiction) প্রতিপন্ন করিয়াছেন, তাহার মীমাংসার মূলসূত্র পান নাই। তাঁহার পরবর্ত্তী দার্শনিক পণ্ডিত হেগেল, সেলিং প্রভৃতি সমন্বয় (synthesis) দ্বারা সেই মূলসূত্র দেখাইয়াছেন, তাহা– জ্ঞানের স্বতঃসিদ্ধ একত্ব ধারণার আকাঙ্ক্ষা (principle of identity), জ্ঞানে সর্ব্বমধ্যে একের ধারণা এবং এক বিজ্ঞান দ্বারা সর্ব্ববিজ্ঞান লাভের প্রয়াস। শ্রুতি আমাদিগকে এই মূলসূত্র দেখাইয়া দিয়াছেন, এক বিজ্ঞানে কিরূপে সর্ব্ববিজ্ঞান লাভ হইতে পারে, তাহারও উপদেশ দিয়াছেন। গীতায় সাত্ত্বিক রাজসিক তামসিক ভেদে জ্ঞান ত্রিবিধ, এবং সাত্ত্বিক জ্ঞানের ধর্ম্ম সর্ব্বত্র যে একত্ব দর্শন, তাহা উপদিষ্ট হইয়াছে।—

"সর্ব্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে।
অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্‌জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্॥"

অতএব সাত্ত্বিক নির্ম্মল জ্ঞানের এই একত্ব দর্শন জন্য স্বতঃসিদ্ধ প্রবৃত্তি হইতেই তত্ত্বদ্রষ্টা জ্ঞানীর ব্রহ্মদর্শন সিদ্ধি হয়। তিনি ব্রহ্মকে

"অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্। (গীতা ১৩।১৬)

দর্শন করেন। তিনি অদ্বৈত ব্রহ্মতত্ত্বে—দ্বৈততত্ত্ব নানাত্ব সর্ব্বত্ব দর্শন করেন। তিনি এই এক বিজ্ঞানে সর্ব্ব বিজ্ঞান লাভ করিয়া সর্ব্বাতীত জ্ঞানাতীত ব্রহ্মস্বরূপ তাহার সান্ত পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানের অনন্ত অপরিচ্ছিন্ন আধার বা অধিষ্ঠান স্বরূপে কতক ধারণা করিতে পারেন।

অতএব পরমব্রহ্মতত্ত্ব দ্বৈতও নহে, অদ্বৈতও নহে। শাস্ত্রে আছে,—

"ন দ্বৈতং নাপি চাদ্বৈতমিত্যেতৎ পারমার্থিকম্॥"

(দক্ষসংহিতা ৭। ৪৮)

অতএব অদ্বৈতবাদ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, শুদ্ধাদ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ দ্বৈতাদ্বৈতবাদ, শাস্ত্রোক্ত বহুদেববাদ প্রভৃতি লইয়া গণ্ডগোল বৃথা। ব্রহ্ম সগুণ কি নির্গুণ—এ বাদ-বিবাদও নিরর্থক। ব্রহ্ম সগুণ (Immanent), ও নির্গুণ (Transcendent), এবং এই বাদ-বিবাদের অতীত পরম তত্ত্ব এই সমন্বয়ের মূলসূত্র বুঝিলে, এই বিভিন্ন বাদের মধ্যে যে সত্য আংশিকভাবে নিহিত আছে, তাহা জানা যায়, এবং এই বিভিন্নবাদ হইতেই পরমব্রহ্মতত্ত্ব জানিবার মূলসূত্র পাওয়া যায়।

গীতোক্ত ব্রহ্মতত্ত্ব।—গীতার অভিধেয় পরমব্রহ্মতত্ত্ব এইরূপেই উপদিষ্ট হইয়াছে। ব্রহ্মতত্ত্ব এই ভাবে বুঝিলেই গীতার্থ বুঝিবার মূলসূত্র পাওয়া যায়, ইহাই আমাদের ধারণা। গীতায় পরমব্রহ্ম সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে,—

"অনাদিমৎ পরংব্রহ্ম ন সৎ তন্নাসদুচ্যতে (১৩।১২)।

যাহা কিছু বস্তুজ্ঞান, তাহা 'সৎ' বা 'অসৎ' এই উভয়ের কোন এক ভাবে প্রকাশিত হয়। ইহাই সর্ব্বপদার্থের পরা-সামান্য ভাবে ধারণার মূল। কিন্তু পরমব্রহ্মকে সৎও বলা যায় না, অসৎও বলা যায় না। যাহা জ্ঞানগম্য নহে, তাহা কোনরূপেই বাচ্য বা নির্দ্দেশ্য নহে। ভগবান্ পরমব্রহ্মে

সর্ব্ব বিরোধের সমন্বয় করিয়া ইঙ্গিতে নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—পরমব্রহ্মের সর্ব্বস্বরূপ (Immanence) ও সর্ব্বাতীত স্বরূপ (Transcendence) এবং এ উভয়ের সমন্বয় করিয়া ব্রহ্মতত্ত্বের ইঙ্গিত করিয়াছেন। তাহা এ স্থলে উল্লেখের প্রয়োজন নাই। (গীতা ১৩। ১২—১৭ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। সর্ব্বেশ্বর ভগবান্, পরমব্রহ্মকে তাঁহার পরমধাম বলিয়াছেন,—

"ন তদ্‌ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ।
যদ্ গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম॥"
(গীতা, ১৫। ৬)

ভগবান্ বলিয়াছেন,—পরমব্রহ্ম 'সূক্ষ্মত্ব হেতু অবিজ্ঞেয় (গীতা, ১৩।১৫) জ্ঞানাতীত ব্রহ্মতত্ত্ব সম্বন্ধে গীতায় আর কিছু উক্ত হয় নাই। জ্ঞানগম্য তৎশব্দবাচ্য ব্রহ্মতত্ত্ব সম্বন্ধে অর্জ্জুনের প্রশ্নের উত্তরে ভগবান্ বলিয়াছেন,— 'অক্ষরং ব্রহ্ম পরমম্' (গীতা, ৮।৩)। বেদবিদ্‌গণ তাঁহাকে 'অক্ষর' বলেন, ইহাও উক্ত হইয়াছে,—

"যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি:" (গীতা, ৮।১১)

এই অক্ষরকেও ভগবান্ তাঁহার পরমধাম বলিয়াছেন,—

"অব্যক্তোঽক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহুঃ পরমাং গতিম্।
যং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম॥" (গীতা ৮।২১)।

অর্জ্জুনও ভগবান্‌কে পরম অক্ষর বলিয়া স্তুতি করিয়াছেন,—"ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যম্" (গীতা, ১১।১৮), "ত্বমক্ষরং সদসৎ তৎ পরং যৎ।" (গীতা, ১১।৩৭)।

ভগবান্ গীতাতে দুইরূপ উপাসনার কথা বলিয়াছেন,—জ্ঞানমার্গীর আত্মযোগসিদ্ধিতে অক্ষরপ্রাপ্তি ও ভক্তযোগীর ঈশ্বরযোগসিদ্ধিতে পুরুষোত্তমপ্রাপ্তিই পরমপুরুষার্থ—বলিয়াছেন। অক্ষরোপাসনা সম্বন্ধে ভগবান্ বলিয়াছেন,—

"যে ত্বক্ষরমনির্দ্দেশ্যমব্যক্তং পর্য্যুপাসতে।
সর্ব্বত্রগমচিন্ত্যঞ্চ কূটস্থমচলং ধ্রুবম্॥
* * . *
তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ॥"
(গীতা, ১২।৩।৪)।

কন্তু এই অক্ষর উপাসনা বহু আয়াসসাধ্য বলিয়া ভগবান্ ভক্তিযোগে ঈশ্বরোপাসনা ও ঈশ্বরযোগের পন্থাই বিশেষভাবে উপদেশ দিয়াছেন। এই পরমেশ্বর পুরুষোত্তম সম্বন্ধে ভগবান্ বলিয়াছেন,—

"উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ॥" (গীতা, ১৫।১৭)।

গীতাতে আরও উক্ত হইয়াছে যে, এই পরমেশ্বরই একাংশে জীবরূপে ও জগৎরূপে অভিব্যক্ত - সমুদায় তাঁহাতে, সংস্থিত অথচ তিনি সর্ব্বাতীত। (গীতা, ১০।৪২, ১৫।৭, ৯।৪-৬)। এইরূপে গীতায় জ্ঞানাতীত ব্রহ্মতত্ত্ব নির্দ্দেশপূর্ব্বক জ্ঞানগম্য অক্ষর পরমব্রহ্মতত্ত্ব ও পরমেশ্বরতত্ত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে। এই জ্ঞানগম্য ব্রহ্মের ত্রিবিধ নির্দ্দেশ,—

"ওঁ তৎ সদিতি নির্দ্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ॥" (গীতা, ১৭।২৩)

পরম ব্রহ্মের যে চারি পাদ উক্ত হইয়াছে, "ওঁ" এই একাক্ষর ব্রহ্ম তাহার বাচক (মাণ্ডূক্য উপনিষদ্)। ইহা জ্ঞানগম্য ও জ্ঞানাতীত অপর ও পর ব্রহ্ম-বাচক। 'তৎ'—অক্ষর ব্রহ্মের নির্দ্দেশক। আর 'সৎ' সৎরূপে বিবর্ত্তিত বা পরিণত ও এই জড়জীবময় জগতের নিয়ন্তা ঈশ্বরের নির্দ্দেশক। শ্রুতিতে আছে,—

"একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি। (ঋগ্বেদ ১।১২, ৪।৪৬)।

অজ্ঞেয় অর্থাৎ জ্ঞানে অনধিগম্য পরম ব্রহ্ম 'সৎ' বা 'অসৎ'-শব্দবাচ্য না হইলেও এবং তাহা 'সদসৎ' হইতে 'পরম্' বা অতীত হইলেও জ্ঞানগম্য ব্রহ্ম নির্গুণভাবে ও সগুণ পরমেশ্বররূপে 'সৎ'-শব্দবাচ্য হন।

এইরূপে জানা যায় যে, শ্রুতিতে ও গীতাতে যে ব্রহ্মতত্ত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহাতে দ্বৈতাদ্বৈতবিরোধ নাই। আমাদের মধ্য দিয়া ও এই জগতের মধ্য দিয়া এই জড় জীবময় জগৎরূপ ব্যবধান দূর করিয়া ব্রহ্মদর্শন করিতে হইলে, এ জগৎকে অসৎ মায়াময় স্বপ্নবৎ বলিয়া উড়াইয়া দিবার প্রয়োজন নাই। অথবা জীব জড়ময় জগৎকে ব্রহ্ম হইতে পৃথগ্‌ভাবে বা পৃথগপৃথগ্‌ ভাবে দেখিবারও প্রয়োজন নাই। যে অধিষ্ঠান স্থান (point of view) হইতে যোগসংসিদ্ধিফলে যোগ-দৃষ্টিতে আমাদের আত্মাতেই অক্ষর ব্রহ্মদর্শন হইতে পারে, ও পরমাত্মা পুরুষোত্তমের দর্শন সিদ্ধ হইতে পারে, সেই স্থান যোগবলে লাভ করিতে পারিলে, সর্ব্ব বিরোধের আর স্থান থাকে না। তখন 'আমাতে' ও 'সর্ব্বমধ্যে' ব্রহ্মদর্শন সিদ্ধি হয়, কোন ভেদ থাকে না। তখন 'জ্ঞাতা জ্ঞেয়' এ দ্বৈত জ্ঞানে একাকার হইয়া যায়।

এইরূপে ব্রহ্মতত্ত্ব ধারণা করিতে পারিলে, আমরা গীতা বুঝিবার মূল-সূত্র প্রকৃতরূপে ধরিতে পারি, এবং তাহার দ্বারা গীতার প্রকৃত অর্থ আমাদের জ্ঞানে ক্রমে প্রকাশিত হইতে থাকে। গীতোক্ত সাধনাপথ অবলম্বনপূর্ব্বক অগ্রসর হইলে, বা যোগপথে অগ্রসর হইলে, ক্রমে সমগ্র ঈশ্বরতত্ত্ববিজ্ঞান লাভ হয় (গীতা, ৭।১) এবং 'ওঁ তৎসৎ' ব্রহ্মতত্ত্বও জ্ঞানে প্রকাশিত হয় (গীতা, ৭।২৯)। তখন আমার মধ্যে ও এই পরিদৃশ্যমান জগতের মধ্যে ব্রহ্মতত্ত্ব প্রকাশিত হয়। তখন আত্মার মধ্যে পরমাত্মারূপে ব্রহ্মদর্শন সিদ্ধ হয়। তখন এ জগৎ সেই সৎ সগুণ মায়াময় অনন্ত জ্ঞান-বল-ঐশ্বর্য্য-শক্তিমান্‌ ব্রহ্মেরই অভিব্যক্ত রূপ বলিয়া প্রতিভাত হয়। তখন ব্রহ্ম বিশ্বরূপে সর্ব্বনিয়ন্তা সর্ব্বাধিষ্ঠাতা সর্ব্বহৃদিস্থিত পরমেশ্বর পরম-পুরুষরূপে, এবং সর্ব্বভূতে সর্ব্বত্র কূটস্থ অক্ষর সর্ব্বাত্মা বা পরমাত্মারূপে ব্রহ্ম অভিব্যক্ত হন। তখন সর্ব্বাতীত অথচ সর্ব্বস্বরূপ ব্রহ্মকে সর্ব্বেন্দ্রিয়-বিবর্জ্জিত অথচ সর্ব্ব ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্তা রূপে, নির্গুণ অথচ সগুণ

রূপে, সর্ব্ব ভূতের ও সর্ব্ব জগতের অন্তরে ও বাহিরে, দূরে ও নিকটে ব্রহ্মতত্ত্ব প্রতিভাত হয়। তখন এই নানাত্বের মধ্যে অনন্তভূতজাত জগতের মধ্যে বিভক্তের ন্যায় প্রতিভাত সেই অবিভক্ত ব্রহ্মতত্ত্ব—সেই পরমেশ্বরতত্ত্বের ধারণা হয়। তখন ব্রহ্মকে "অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম" (গীতা, ১৩।১৬) এবং পুরুষোত্তমকে "সমং সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্" (গীতা, ১৩।২৭) ভাবে জানিয়া, ব্রহ্ম বিজ্ঞান লাভ ও ব্রহ্ম-দর্শন-সিদ্ধি হয়। তখন অনন্ত অখণ্ড একত্বজ্ঞানের মধ্যে সর্ব্বভেদ দূর হইয়া যায়, সর্ব্ব রূপনাম দ্বারা বিভক্ত এই নানাত্ব—এই সব্ব বিরোধ তিরোহিত হয়। তখন ব্রহ্মদর্শন সিদ্ধি হয়।

বলিয়াছি ত, বিশুদ্ধ জ্ঞানে (Pure Reason) শাস্ত্র সমন্বয়পূর্ব্বক যোগসাধনার সিদ্ধিতে যোগদৃষ্টি লাভ করতঃ যতক্ষণ এই দর্শন সিদ্ধি না হয়, যতক্ষণ জ্ঞানে এই 'এক রস' ব্রহ্মতত্ত্ব প্রতিভাত না হয়, ততক্ষণ প্রকৃত ব্রহ্মবিজ্ঞান লাভ হয় না—গীতার্থবিজ্ঞান প্রকাশিত হয় না। বলিয়াছি ত, গীতার্থবিজ্ঞান লাভের জন্য গীতার মূলসূত্র এই অভিধেয় ব্রহ্মতত্ত্বের স্বরূপ সর্ব্বশাস্ত্র ও শাস্ত্রের ব্যাখ্যাদি সমন্বয়পূর্ব্বক অনুসন্ধান করিতে হইবে। যতক্ষণ সেই মূলসূত্র ধরিতে না পারা যায়, ততক্ষণ গীতার্থ প্রতিভাত হয় না। এই জন্য গীতাব্যাখ্যায় ভূমিকারূপে এই মূল সূত্র আমরা এ স্থলে বিবৃত করিতে চেষ্টা করিয়াছি। এবং ব্যাখ্যামধ্যে স্থানে স্থানে প্রয়োজনমত এই ব্রহ্মতত্ত্ব এবং ইহার সংসৃষ্ট অন্যতত্ত্ব আরও বিস্তৃতভাবে বিবৃত করিয়াছি। পুনরুক্তি-দোষভয়েও তাহা হইতে নিবৃত্ত হই নাই। কেননা, এই দুর্ব্বোধ্য তত্ত্ব বুঝিবার জন্য পুনঃপুনঃ আলোচনা শাস্ত্রেই বিহিত হইয়াছে।

গীতার প্রয়োজন ও সম্বন্ধ।—গীতাব্যাখ্যা বুঝিতে হইলে, এই অভিধেয় তত্ত্ব ব্যতীত প্রয়োজন এবং সম্বন্ধও প্রথমে বুঝিতে হয়। আমরা এস্থলে সংক্ষেপে তাহাও বুঝিতে চেষ্টা করিব। প্রথমে গীতার প্রয়োজন

যে নিঃশ্রেয়স তাহা বুঝিতে হইবে। সকল ব্যাখ্যাকারই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, গীতার প্রয়োজন নিঃশ্রেয়স বা পরম মুক্তি। কিন্তু মুক্তির স্বরূপ কি, সে সম্বন্ধে ইঁহাদের মধ্যে মতভেদ আছে। তাহাও সমন্বয় করিয়া বুঝিতে হইবে। এই নিঃশ্রেয়স-তত্ত্ব বুঝিতে হইলে, আমাদের স্বরূপ কি, তাহা বুঝিতে হয়। কারণ নিঃশ্রেয়স লাভের অর্থ—আমাদের স্বরূপপ্রাপ্তি, আমাদের যাহা পরম আদর্শ, তাহা লাভ,—আমাদের স্বরাজ্যসিদ্ধি। যে উপায়ে তাহা লাভ হয়, তাহাই গীতার সম্বন্ধ ও বিষয়। এ সম্বন্ধ বুঝিতে হইলেও জীবতত্ত্ব প্রথমে বুঝিতে হয়।

জীবতত্ত্ব।—আমাদের স্বরূপ বুঝিতে হইলে, জীবতত্ত্ব প্রথমে জানিতে হইবে। কেননা, সামান্যভাবে আমরা জীব। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, এই জীবতত্ত্ব সম্বন্ধে বিভিন্ন ব্যাখ্যাকারগণের মধ্যে মতভেদ আছে; জীব ব্রহ্মের সম্বন্ধ বিষয়ে অভেদবাদ, ভেদবাদ ও ভেদাভেদবাদ ও অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ প্রচলিত আছে। শঙ্করাচার্য্য জীবব্রহ্মে অভেদবাদী। তাঁহার মতানুসারে ব্যাবহারিক অর্থে যে ভেদ দৃষ্ট হয়, তাহা মায়াময়, অবিদ্যাকৃত। রামানুজ বলেন,—জীব চিৎকণা। চিৎস্বরূপে চিদ্ঘন পরম ব্রহ্মের সহিত তাহার স্বরূপতঃ ভেদ না থাকিলেও, জীবব্রহ্মে স্বগত ভেদ আছে। পরমেশ্বর অংশী—জীব অংশ মাত্র। জীব কেবল চিৎস্বরূপ নহে, চিদচিৎস্বরূপ। এজন্য জীবব্রহ্মে ভেদও আছে। ভেদবাদিগণ বলেন—জীব ব্রহ্মে ভেদ নিত্যসিদ্ধ—মুক্তিতেও সে ভেদ দূর হয় না। জীবে জীবে ভেদ, জীবে ব্রহ্মে ভেদ পরমার্থ সত্য। অচিন্ত্য ভেদাভেদ বাদ অনুসারেও জীবব্রহ্মে অভেদ হইলেও, ভেদ নিত্যসিদ্ধ। আমরা এই জীবব্রহ্মে সম্বন্ধ বিষয়ে বিভিন্নবাদ পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি।

জীব যে স্বরূপতঃ আত্মা, তাহা সকলেই স্বীকার করেন। কিন্তু সে আত্মা কি? ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শন দেহাত্মবাদ, মনাত্মবাদ নিরাশ পূর্ব্বক বলেন, আত্মা দেহ হইতে মন হইতে ভিন্ন। আত্মা ও মনঃ-সংযোগে

চৈতন্যের অভিব্যক্তি হয়, নতুবা আত্মাও জড়স্বভাব। প্রকৃত আত্মতত্ত্বের সিদ্ধান্ত ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনে নাই। সাংখ্যদর্শনে তাহা জানা যায়। সাংখ্যজ্ঞানের নামই আত্মজ্ঞান। সাংখ্যদর্শনে আত্মা পুরুষ নামে অভিহিত। পুরুষ প্রকৃতি হইতে—প্রকৃতিজাত বুদ্ধি অহংকার মন ও ইন্দ্রিয়গণ হইতে ভিন্ন; প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেক-জ্ঞান দ্বারাই মুক্তি হয়, ইহা প্রতিপাদিত হইয়াছে। তাহা এস্থলে বিবৃত করিবার প্রয়োজন নাই। এই সাংখ্যজ্ঞান অনুসারে জীব যে স্বরূপতঃ পুরুষ বা আত্মা—তাহা সকল ব্যাখ্যাকারই স্বীকার করেন। কিন্তু সে আত্মা কি? তাহা যে দেহ হইতে ভিন্ন, প্রাণ হইতে ভিন্ন, ইন্দ্রিয় হইতে ভিন্ন, মন হইতে ভিন্ন, অন্তঃকরণ হইতে ভিন্ন, এক কথায় প্রকৃতি হইতে ভিন্ন, ইহা স্বীকার করিলেও এই জীবাত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে মতভেদ আছে।

এই জীবাত্মা ও পরমাত্মা বা ব্রহ্ম যে 'এক'—পারমার্থিক অর্থে অভিন্ন —তাহা শঙ্করের সিদ্ধান্ত। শ্রুতি অবলম্বন করিয়াই শঙ্কর এই একত্ব-বাদ, এই অভেদবাদ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। 'তত্ত্বমসি' 'সোঽহং' 'অয়-মাত্মা ব্রহ্ম' প্রভৃতি মহাবাক্যের উপরই শঙ্কর তাঁহার মত স্থাপন করিয়াছেন। তবে তিনি সর্ব্বত্র ব্যবহারদশায় এই ভেদ স্বীকার করেন। তিনি কোন কোন স্থলে মুক্তিতেও জীবাত্মা ও পরমাত্মার ভেদ থাকে, জীবাত্মার কখন জগৎ-সৃষ্টি-শক্তি সম্ভব হয় না, ইহাও অঙ্গীকার করিয়া-ছেন, এবং এইরূপে ভেদাভেদবাদের অবসর দিয়াছেন। বেদান্তশাস্ত্র হইতেই বৈষ্ণবাচার্য্যগণ জীবব্রহ্মে ভেদাভেদবাদ ও ভেদবাদ সংস্থাপন করিয়াছেন—শ্রুতিতে 'বালাগ্রশত' 'অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ' ইত্যাদি মন্ত্র এই ভেদবাদের পোষক। আমরা আরও বলিতে পারি যে, সাংখ্যদর্শনের বহুপুরুষবাদ জীবে জীবে ভেদ-কল্পনার পরিপোষক।

আমরা দেখিয়াছি যে বৈষ্ণবাচার্য্যগণ শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বকেই পূর্ণ পরমব্রহ্ম বলেন। তাঁহারা 'ব্রহ্ম' অর্থে 'প্রত্যগাত্মা' বা জীবাত্মা বুঝিয়াছেন;

এবং এইরূপে 'সোহয়ং আত্মা ব্রহ্ম' প্রভৃতি শ্রুতি হইতেই জীবব্রহ্মে অভেদবাদ স্বীকার করিয়াও পরমব্রহ্ম পরমতত্ত্ব শ্রীবাসুদেব হইতে জীবের ভেদাভেদবাদ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কেহ বা তত্ত্বমসি মহাবাক্যের ভিন্ন-রূপ অর্থ করিয়া ভেদবাদ সংস্থাপন করিয়াছেন। শ্রুতি-সমন্বয় করিলে ইহা সঙ্গত বোধ হয় না। শ্রুতিতে পরমার্থতঃ ভেদদর্শন নিষিদ্ধ হইয়াছে। আমরা দেখিয়াছি যে, গীতায়ও এই ভেদদর্শন নিষিদ্ধ হইয়াছে। সাত্ত্বিক বুদ্ধিতে যে "সর্ব্বভূতে এক অব্যয় ভাবই দৃষ্ট হয়, সে অব্যয় ভাব অবিভক্ত হইয়াও সর্ব্বভূতে বিভক্তের ন্যায় প্রতীয়মান হয় মাত্র (গীতা ১৮।২৯) সেই এক অব্যয় ভাবই অক্ষরব্রহ্ম। সেই ব্রহ্মই "অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্" (গীতা ১৩।১৬)। এই যে এক অব্যয়ভাব সর্ব্বভূতে অবস্থিত, ইহাই আত্মা—অক্ষর পুরুষ, ইহাই ব্রহ্ম। যিনি জ্ঞানী, তিনি জীবাত্মাতে ও ব্রহ্মে একত্ব নির্ম্মল সাত্ত্বিক জ্ঞানে দর্শন করেন। সে জ্ঞানে ভেদবুদ্ধি থাকে না—ভেদবাদ বা ভেদাভেদবাদ থাকে না।

এই জীবাত্মা বা পুরুষ ত ব্রহ্ম—পরমাত্মা। কিন্তু এই জীবাত্মাই কি জীব? না। জীবাত্মা অক্ষর কূটস্থ ব্রহ্মস্বরূপ। আর জীব বা ভূত—ক্ষর। জীবভাব—ষড়্‌ভাব-বিকারাধীন। সেই জীবভাবে জীবাত্মা অক্ষর হইয়াও ক্ষরপুরুষ হন। অক্ষরব্রহ্ম এইরূপে অবিভক্ত হইয়াও, সর্ব্বভূতে বিভক্তের ন্যায় স্থিত হন। সগুণ সর্ব্বাত্মা ব্রহ্ম পরমেশ্বররূপে সর্ব্বভূতহৃদয়ে অবস্থিত থাকেন। জীব ও ব্রহ্ম তত্ত্বতঃ এক হইয়াও পরিচ্ছিন্নত্ব হেতু জীব পৃথকের ন্যায় হন। তাই ভেদবাদ ও ভেদাভেদবাদ দ্বারা আচার্য্যগণ সে একত্ব ও পৃথকত্ব বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

গীতা হইতে জানা যায় যে, ব্রহ্ম পরাখ্য মায়াশক্তিমান্-রূপে সগুণ হন, এবং মায়া হেতু পরিচ্ছিন্নভাবে পরমজ্ঞাতা পরমেশ্বর ও পরমজ্ঞেয় "অব্যক্ত'রূপে আমাদের শুদ্ধ সাত্ত্বিক জ্ঞানের বিষয়ীভূত হন। এই

পরমজ্ঞেয়ই মহদ্‌ব্রহ্ম—পরমেশ্বরের মহৎ যোনি। পরমজ্ঞাতা ভগবানের 'বহু' হইবার কল্পনা-বীজ সেই মহৎ যোনি 'অব্যক্ত'রূপ ব্রহ্মে নিষিক্ত হইয়া সর্ব্বভূতভাবের বিকাশ হয় (গীতা, ১৪।৩-৪)। ভগবানের কল্পনা হেতু এই অব্যক্ত অপরা—মন বুদ্ধি অহঙ্কার, ও সূক্ষ্ম ভূতাত্মক প্রকৃতি-রূপে ও পাণাখ্য পরাপ্রকৃতিরূপে অভিব্যক্ত হইলে, ভগবান্ সেই উভয় প্রকৃতিরূপ অব্যক্ত মহদ্‌ব্রহ্মকে সর্ব্বভূতযোনি কল্পনা করিয়া, নামরূপ দ্বারা তাহা অভিব্যক্ত করেন ও আত্মস্বরূপে তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হন। এইরূপে সর্ব্ব সত্তার বা সর্ব্ব মূর্ত্তির বিকাশ হয়। সর্ব্বসত্তাতে পুরুষ ক্ষেত্রজ্ঞরূপে ও প্রকৃতি ক্ষেত্ররূপে অভিব্যক্ত হন। ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ যোগ হইতেই স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমুদায় সত্বপর—সর্ব্বভূতের বা সর্ব্বজীবের উৎপত্তি হয় (গীতা, ১৩।২৬)। ইহাই গীতা ও শ্রুতি অনুসারে জীবের অভিব্যক্ত স্বরূপ। ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞযোগে যে জীবভাব হয়, সে ক্ষেত্রজ্ঞও আত্মা বা পরমাত্মা—তাহা ব্রহ্ম, আর সে ক্ষেত্রও ব্রহ্ম—মহদ্‌ব্রহ্ম। শঙ্করাচার্য্য বলেন যে, এই ক্ষেত্র—ব্রহ্মেরই উপাধি। ব্রহ্ম সেই উপাধিযুক্ত হইয়া পরিচ্ছিন্ন হন—জীবভাবযুক্ত হন।

জ্ঞানগম্য ব্রহ্ম—'সচ্চিদানন্দঘন'—সত্যজ্ঞান-অনন্তস্বরূপ—ইহা শ্রুতি-প্রমাণ অনুসারে সকল ব্যাখ্যাকারই স্বীকার করেন। জীব যে সচ্চিদানন্দস্বরূপ, তাহাও সকলে স্বীকার করেন। বৈষ্ণবাচার্য্যগণও বলেন,—"অচিন্ত্য অবিদ্যারূপ কৃষ্ণমায়ায় তত্ত্ব বিস্মৃত হইয়া সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ জীবগণের সংসারভ্রম হইয়া থাকে" (ভাগবতামৃত)। ইহা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দঘন বলিয়া, ব্রহ্মরূপ অব্যক্ত হইতে অভিব্যক্ত প্রকৃতিতে সেই সচ্চিদানন্দভাবের ছায়া রূপে সত্ব রজঃ ও তমোগুণের বিকাশ হয়। সত্ব রজঃ তমঃ—এই প্রকৃতিজ গুণ প্রকৃতিজ ক্ষেত্রেও অভিব্যক্ত হয়। ক্ষেত্রস্থ অন্তঃকরণ—বুদ্ধি অহঙ্কার ও মনরূপ চিত্তেও সেজন্য এই ত্রিগুণের ভাব অভিব্যক্ত হয়।

চিত্তরূপ উপাধিবদ্ধ আত্মার সচ্চিদানন্দস্বরূপ সেই চিত্তে প্রতিবিম্বিত হয় বলিয়া, চিত্তে জ্ঞাতা কর্ত্তা ও ভোক্তা-ভাবের বিকাশ হয়। আত্মার চিৎস্বরূপ চিত্তে প্রতিবিম্বিত হইয়া চিত্ত সাত্ত্বিকভাবযুক্ত হয়—জ্ঞাতা-ভাবের অভিব্যক্তি হয়। আত্মার সৎস্বরূপ চিত্তে প্রতিফলিত হইয়া চিত্ত রাজসিক ভাবযুক্ত হয়—কর্ত্তা-ভাবের অভিব্যক্তি হয়। সেইরূপ আত্মার আনন্দ স্বভাব চিত্তে প্রতিবিম্বিত হইয়া চিত্ত তামসিক ভাবযুক্ত হয় ও ভোক্তা-ভাবের অভিব্যক্তি হয়। সচ্চিদানন্দস্বরূপ আত্মার স্বশক্তি রূপে,—এই সচ্চিদানন্দস্বরূপত্ব হেতু সন্ধিনী সম্বিৎ ও হ্লাদিনী শক্তির অভিব্যক্তি হইয়া সেই শক্তি দ্বারা চিত্তে উক্তরূপ কর্ত্তা জ্ঞাতা ও ভোক্তা-ভাবের বিকাশ হয়। এই কর্তৃত্বভাবের মূল—ইচ্ছাশক্তি বা কাম।

এই কর্ত্তৃত্ব (willing অথবা activity) জ্ঞাতৃত্ব (intellect) বা this understanding) এবং ভোক্তৃত্ব (feeling) ভাবকে অধ্যাসবশতঃ আত্মার ধর্ম্মরূপে সাধারণতঃ গৃহীত হইয়া থাকে। ইহা উক্তরূপ প্রকৃতি-পুরুষ বা ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ সংযোগ হেতু যে জীবভাবের অভিব্যক্তি হয়, সেই জীবভাবেরই ধর্ম্ম বা স্বরূপ। জীব জ্ঞাতা কর্ত্তা ও ভোক্তা। ক্ষেত্র বা ক্ষেত্রান্তর্গত অন্তঃকরণরূপ অসংখ্য উপাধিবদ্ধ বা অসংখ্য ক্ষেত্রে বদ্ধ ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মার জীবভাবও অসংখ্য। ক্ষেত্রের মলিনতার প্রভেদ অনুসারে জীবভাব বা তাহার জ্ঞাতা কর্ত্তা ও ভোক্তা 'আমি'ভাবও অসংখ্যরূপে অভিব্যক্ত হয়। বলিয়াছি ত, ব্রহ্ম পরাখ্য মায়াশক্তি-যোগে পরিচ্ছিন্নের ন্যায় হইয়া এইরূপে অসংখ্য জীবভাবে আমাদের জ্ঞানে প্রকাশিত (manifest) হন। আমরা মায়াহেতু এই পরিচ্ছিন্ন জীবভাব গ্রহণ করিয়া সেই অপরিচ্ছিন্ন স্বরূপ হইতে প্রচ্যুত হই। ইহাই মায়া বা অবিদ্যাবশে জীবের বদ্ধভাব—ইহা হইতেই জীবের সংসার-বন্ধন হয়। ব্রহ্ম নিরংশ নিষ্কল অবিভক্ত হইয়াও, অসংখ্য প্রকারে নামরূপ

দ্বারা বা উপাধি দ্বারা ভিন্নের ন্যায় হন এবং সচ্চিদানন্দ আত্মাস্বরূপে এক বা সমভাবে সর্ব্বজীবে অবস্থিতি করেন। কিন্তু অবিদ্যা পরিচ্ছিন্ন ভাবহেতু জীব আপনার সেই সচ্চিদানন্দ অক্ষর ব্রহ্মরূপ বা নিয়ন্তা ঈশ্বরস্বরূপ জানে না—(Phenomenal Ego জীব তাহার স্বরূপ Absolute Self তাব জানে না)।

ব্রহ্মের সর্ব্বপ্রকার অভিব্যক্তিই উপাধি-সাপেক্ষ ও উপাধি দ্বারা পরিচ্ছিন্ন। ক্ষেত্রজ্ঞ জীবরূপে অভিব্যক্তিও ক্ষেত্রসাপেক্ষ এবং ক্ষেত্রদ্বারা পরিচ্ছিন্ন। সেই ক্ষেত্রই শরীর। এই ক্ষেত্রান্তর্গত অন্তঃকরণ আমাদের সূক্ষ্মশরীর। আমাদের অন্তঃকরণ যত নির্ম্মল হইতে থাকে—যত পরিণত হইয়া পূর্ণ বিকাশের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে, ততই আমাদের জ্ঞাতৃত্ব কর্ত্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব ভাবের ক্রমবিকাশ হইতে থাকে। আমাদের অন্তঃকরণই আত্মার অধিষ্ঠান ও অভিব্যক্তির স্থান। আর এই অন্তঃকরণের বাধা জন্যই সে অভিব্যক্তিও পরিচ্ছিন্ন হয়, তাহা বলিয়াছি। অন্তঃকরণ যতই নির্ম্মল হয়, ততই এই জ্ঞাতৃত্ব কর্ত্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব ভাবের বিকাশ হয় সত্য, এই পরিচ্ছিন্ন ভাব এ সঙ্কীর্ণতা ক্রমে হ্রাস হইয়া আসে সত্য,—কিন্তু তাহা একেবারে দূর হয় না। চিত্ত পূর্ণ নির্ম্মল হইলেও, সে পরিচ্ছেদ একেবারে ঘুচিয়া যায় না। চিত্ত যত নির্ম্মল হয়, ততই তাহাতে আত্মার সচ্চিদানন্দরূপ প্রতিবিম্বিত হইয়া চিত্তে জ্ঞাতৃত্ব কর্ত্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব ভাবের বিকাশ হইতে থাকে সত্য, এবং চিত্ত পূর্ণ নির্ম্মল হইলেও, তাহাতে এই পূর্ণ অখণ্ড আত্মস্বরূপ চিত্তের গ্রহণশক্তির পূর্ণ বিকাশে তাহার যতদূর প্রতিবিম্ব গ্রহণ সম্ভব, তাহা গ্রহণ করিতে পারে সত্য, কিন্তু এই চিত্তের সহিত সংযোগ দূর না হইলে, জীব ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্ত হয় না, তাহার ব্যক্তিত্ব ভাব ঘুচিয়া সর্ব্বত্ব লাভ হয় না, তাহার 'অহং'কার 'ওঁকারে' একীভূত হয় না। কিন্তু প্রকৃতিজ ক্ষেত্র বিযুক্ত হইলে—পুরুষের সূক্ষ্ম শরীর নাশ হইলে, আর জীবত্বও থাকে না।

প্রকৃতির সহিত যুক্ত না হইলে, আত্মাতে জীবত্বের অভিব্যক্তি হয় না এবং সে যোগ দূর হইলেও, আর তাহার অভিব্যক্তি থাকে না। তখন তাহার অনন্ত অপরিচ্ছিন্ন স্বরূপ লাভ হয়। *

সে যাহা হউক, সচ্চিদানন্দস্বরূপ আত্মা বা ব্রহ্ম ক্ষেত্ররূপ উপাধি অভিব্যক্ত করিয়া, তাহাতে অধিষ্ঠিত হইয়া তাহাতে জীবরূপে প্রতিভাত হন। তাহা এস্থলে আর বুঝিবার প্রয়োজন নাই। অসংখ্যজাতীয় জীব এবং প্রত্যেকজাতীয় জীবের অসংখ্য ব্যক্তিভাব আমরা দেখিতে পাই। আব্রহ্ম তৃণ পর্য্যন্ত সমুদায়ই জীব। প্রত্যেক বিশেষ জীবজাতি অপর

---

* ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ-যোগে জীবত্বের এই নানাভাবে অভিব্যক্তি আমরা এস্থলে আধুনিক বিজ্ঞানশাস্ত্র হইতে একটি দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিব। বৃহৎ চুম্বকের সন্নিধানে অসংখ্য লৌহখণ্ডের চুম্বকত্বের (তৎসান্নিধ্যমধিষ্ঠাতৃত্বং মণিবৎ) দৃষ্টান্ত সাংখ্যদর্শন গ্রহণ করিয়াছেন। তাড়িত ক্রিয়া হইতে আমরা এই দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিব।

কলিকাতার এক প্রান্তে তড়িৎশক্তি-উৎপাদক যন্ত্রে তাড়িত উৎপন্ন হইয়া তারে তারে প্রবাহিত হইয়া, ট্রাম গাড়ী চালাইতেছে, ঘরে ঘরে আলোক দিতেছে, পাখা চালাইতেছে, কল চালাইতেছে—কতরূপ কার্য্য করিতেছে, কতরূপে অভিব্যক্ত হইতেছে—তাহা আমরা দেখিতেছি। ইহাদের মধ্যে বৈদ্যুতিক আলোকের কথাই বলিব। ছোট একটি বৈদ্যুতিক বাতিতে এই তড়িৎশক্তিপ্রবাহে যে আলো—হয়ত পাঁচ বাতির আলো পাওয়া যায়। একটি বড় আলোকাধার যদি সেই স্থানে ছোট বাতিটির পরিবর্ত্তে সংযোগ করা যায়, তবে সেই তাড়িৎশক্তিপ্রবাহ হইতেই দশগুণ, শতগুণ, এমন কি, সহস্রগুণ উজ্জ্বল আলোক পাওয়া যায়। শক্তি (Electro motive force) একই, কিন্তু তাহার ক্রিয়া বা গতি (Current) ভিন্ন হয়। সেই একই শক্তিপ্রবাহের ক্রিয়ার যে ইতর বিশেষ হয়, তাহার কারণ 'বাধা'। এই বাধা (resistance) যত বেশী হয়, সে শক্তির বিকাশ বা ক্রিয়া তত অল্প হয়, আলোকবাতির আলো তত ক্ষীণ হয়। এই বাধা আবার যত হ্রাস হয়, সে শক্তিক্রিয়ার বিকাশ তত অধিক হয়। অতএব এই বাধার হ্রাসবৃদ্ধিতে সেই শক্তির বিকাশেরও হ্রাসবৃদ্ধি হয়। বাধাশূন্য হইলে, শক্তি ক্রিয়া অনন্ত অব্যাহত হয়।

সেইরূপ আত্মার জীবত্ব বিভিন্ন ক্ষেত্রে অন্তঃকরণের মধ্য দিয়াই বিকাশিত হয়। সেই ক্ষেত্র ব্যতীত যেমন তাহার অভিব্যক্তিও হয় না, সেইরূপ সেই ক্ষেত্রের মলিনতা বা বাধা থাকায়, তাহার পূর্ণ অভিব্যক্তিও হয় না। এই বাধার তারতম্য বা হ্রাসবৃদ্ধি অনুসারেই সে অভিব্যক্তির হ্রাসবৃদ্ধি হয়। আর অধিক বলিতে হইবে না।

জীবজাতি হইতে ভিন্ন। প্রত্যেক ব্যষ্টি জীব সেই জাতীয় অপর জীব হইতে ভিন্ন। শ্রেষ্ঠ জীবজাতি মানুষের মধ্যে কত প্রভেদ! নগ্নদেহ আমমাংসভোজী নরাকার পশুতুল্য জীবের সহিত তুলনায় ব্যাস বশিষ্ঠ শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি জ্ঞানিগণের কি অনন্ত ব্যবধান! জীবমাত্রেই জ্ঞাতা কর্ত্তা ও ভোক্তা। কিন্তু এই জ্ঞাতৃত্ব কর্ত্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব ভাবের কত প্রভেদ! উদ্ভিদে ও নিম্নশ্রেণীর জীবে ইহার অভিব্যক্তি অতি সামান্য মানবে এই জ্ঞাতৃত্ব কর্ত্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব ভাবের বিশেষ বিকাশ হয় সত্য, কিন্তু তাহাদের মধ্যেও এই ভাবের কত প্রভেদ আমরা দেখিতে পাই। সুতরাং জীবে জীবে ভেদ অনন্ত, অপরিমেয়, নিত্য-প্রত্যক্ষ। এত প্রভেদ আছে সত্য, কিন্তু আমাদের সকলেরই স্বরূপ সেই সচ্চিদানন্দ-ঘন ব্রহ্ম। আমাদের পরম আদর্শ—পরম গতি সেই পূর্ণ সচ্চিদানন্দ ঘন সর্ব্বজীবের (নারা) আশ্রয়স্থান (অয়ন) সেই নারায়ণ। প্রকৃতি বা ক্ষেত্রসংযোগে ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মার এই ভেদ,—প্রকৃতিবিযুক্ত সচ্চিদানন্দ স্বরূপ আত্মার কোন ভেদ নাই। এক অবিভক্ত আত্মা প্রতি ক্ষেত্রে বিভিন্ন 'সত্ত্ব'রূপে বিভিন্ন জীবভাবে বা ভূতভাবে বিভক্তের ন্যায় পরিদৃষ্ট হন, অপরিচ্ছিন্ন আত্মা উপাধিযোগে পরিচ্ছিন্নের ন্যায় হন।

ইহা হইতে আমরা জীবব্রহ্মে অভেদবাদ ভেদবাদ ভেদাভেদবাদ, জীবের বহুত্ববাদ প্রভৃতির মূল বুঝিতে পারি। প্রকৃতিপুরুষসংযোগ বা ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ সংযোগে এই জীবভাবের উৎপত্তি হয়। ক্ষেত্রের দিক হইতে জীবকে বুঝিতে চেষ্টা করিলে ভেদবাদ ও বহুত্ববাদ অপরিহার্য্য। আর পুরুষ বা ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মার দিক্ দিয়া দেখিলে, অভেদবাদ অবশ্য স্বীকার্য্য। প্রকৃতির স্বরূপ যে মায়াশক্তিযুক্ত 'মহৎ' অব্যক্ত 'ব্রহ্ম'—ক্ষেত্র যে ব্রহ্মরূপ আধারে মায়া হেতু অভিব্যক্তি মাত্র এবং পুরুষের স্বরূপ যে অক্ষরব্রহ্ম—তাহা দেখিলে অভেদবাদই স্বীকার করিতে হয়। প্রকৃতিপুরুষ উভয়েই অনাদি, উভয়ের সংযোগ অনাদি, সুতরাং জীবভাব অনাদি

ইহা স্বীকার করিলে, ব্রহ্মে জীবত্ব নিত্যসিদ্ধ হয়—ভেদাভেদবাদ ও স্বীকার করিতে হয়।

আমাদের জ্ঞানে ব্রহ্মের এই পুরুষ-প্রকৃতি-ভাব অনাদি। আমাদের পরিচ্ছিন্ন জ্ঞান ইহার আদি ধারণা করিতে পারে না। আমরা বলিয়াছি ত, পরমতত্ত্ব ব্রহ্ম অনধিগম্য হইয়াও জ্ঞানগম্য। জ্ঞানগম্য ব্রহ্ম অনন্ত জ্ঞান ও শক্তিস্বরূপ। আমাদের জ্ঞানে আমরা পরমজ্ঞাতা পরমেশ্বররূপে ও পরমজ্ঞেয় প্রকৃতিরূপে ব্রহ্মের সগুণভাবে অভিব্যক্তি ধারণা করিতে পারি; কিন্তু এই অভিব্যক্তির আদি আমরা ধারণা করিতে পারি না। এই পরম জ্ঞাতা পুরুষোত্তমের সহিত তাঁহারই স্বভূত এই অব্যক্তরূপা পরমা প্রকৃতির সংযোগ আমাদের জ্ঞানে নিত্য; এবং এই পরমপুরুষ-প্রকৃতি ভাব হইতে যে বহু ক্ষেত্রজ্ঞ-ক্ষেত্র-ভাবের অভিব্যক্তি ও সংযোগ, তাহাও নিত্য। এইজন্য আমাদের পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানে এই ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ-যোগে উৎপন্ন জীবভাবও নিত্য। আমরা তাহা অপরিচ্ছিন্নভাবে ধারণা করিতে পারি না। কাজেই জীবব্রহ্মে অচিন্ত্য ভেদাভেদ আমাদের স্বীকার করিতে হয়। তাই জীবে জীবে ভেদ আমাদের এই পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানে নিত্যসিদ্ধ।* শঙ্করাচার্য্যের মতে এই পরিচ্ছিন্ন জ্ঞান ব্যাবহারিক।

কিন্তু জীবে জীবে এই ভেদ দৃষ্ট হইলেও, পরমার্থতঃ বা স্বরূপতঃ কোন ভেদ নাই, তাহা বলিয়াছি। ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষস্বরূপে বা আত্ম-স্বরূপে কোন ভেদ নাই। সাংখ্যজ্ঞান এই প্রকৃতিবিমুক্ত আত্মার বা পুরুষের স্বরূপ-বিবেক দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে। ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মা ক্ষেত্রযোগে দেহী বা শরীরী হন এবং দেহে প্রকৃতিজ গুণে বদ্ধ হইয়া সংসারী হন সত্য, কিন্তু দেহের বা ক্ষেত্রের ধর্ম্মদ্বারা জীবাত্মা বাস্তবিক রঞ্জিত হন না। আত্মার ধর্ম্ম স্বতন্ত্র। শরীর পরিণামী, অস্তবৎ ও বিকারযুক্ত—স্থূল শরীর ও সূক্ষ্ম শরীর উভয়ই

এইরূপ ধর্ম্মযুক্ত। আর শরীরী আত্মা—অবিনাশী, সর্ব্বব্যাপী, অব্যয়, নিত্য, অজ। তাঁহার স্বরূপ অপ্রমেয়, অচিন্ত্য, অব্যক্ত, তাহা সর্ব্বদেহে সমভাবে অবস্থিত। সাংখ্যজ্ঞানে আমরা এই পুরুষতত্ত্ব বা দেহপুরস্থ আত্মতত্ত্ব জানিতে পারি। ইহা গীতায় উপদিষ্ট হইয়াছে। এই সাংখ্যোক্ত শুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাব পুরুষ দেহিভাবে বহুরূপে প্রতীয়মান হইলেও, পরমার্থতঃ যে এক, তাহা যে সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মস্বরূপ, তাহা বেদান্তবিজ্ঞানে উপলব্ধি হয়। এবং সেই দেহী আত্মাই যে পরমাত্মা-স্বরূপ—সচ্চিদানন্দ অক্ষর কূটস্থস্বরূপ এবং সর্ব্বাত্মা সর্ব্বভূতমহেশ্বর পুরুষোত্তমস্বরূপ, তাহা অধ্যাত্মযোগে প্রত্যক্ষ হইতে পারে। এ তত্ত্ব এস্থলে আর উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই।

জীবত্বের ক্রমবিকাশতত্ত্ব।—যাহা হউক, জীবের এই স্বরূপ হইলেও, জীবাত্মা—ব্রহ্ম ও সর্ব্বভূতে এক অবিভক্ত হইলেও, ক্ষেত্রাধিষ্ঠিত জীবভাবে আত্মা বিভক্তের ন্যায় সর্ব্বভূতে স্থিত এবং প্রকৃতিজ গুণবদ্ধ হইয়া সংসারী। এই জীবভাব এক অর্থে নিত্য। আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত—সামান্য তৃণ হইতে ব্রহ্মা পর্য্যন্ত যাহা কিছু 'সত্ত্বা'—সমুদায়ই জীব। জীব-অসংখ্য, তাহা বলিয়াছি। এই বহুত্বের কারণ প্রকৃতি-ভেদ। প্রকৃতির ত্রিগুণ হইতে যে পরিণাম হয়, তাহা হইতে বহু ক্ষেত্রের উৎপত্তি হয়। ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মা সেই বহু ক্ষেত্রে বদ্ধ হইয়া বহুরূপ হন। তৃণরূপ শরীরে ক্ষুদ্রতম জীবাণুতে জীবভাব—তাহার জ্ঞাতৃত্ব কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বভাব—বিকাশিত হইতে পারে না। মানবে সে জীবভাব বিশেষ বিকাশিত হইয়াও প্রকৃতিজ স্বক্ষেত্র দ্বারা বদ্ধ থাকায় পরিচ্ছিন্ন। জীবের স্ব-প্রকৃতি যত মলিন থাকে, জীবভাবও তত মলিন, তত পরিচ্ছিন্ন থাকে। ক্রমে প্রকৃতির যত আপূরণ হয়, জীবভাবের ততই বিকাশ হইতে থাকে, ততই ক্রমে ক্রমে জীবের জাত্যন্তর-পরিণাম হইতে থাকে। ইহা পাতঞ্জল দর্শনে বিবৃত হইয়াছে। এ তত্ত্ব জাতির ক্রম-পরিণাম সম্বন্ধে

আধুনিক পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ আবিষ্কার করিয়াছেন; কিন্তু প্রতি জীব-সম্বন্ধে যে এই নিয়ম, তাহা এখনও পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করিতে পারেন নাই।

'ইরূপে প্রকৃতিবদ্ধ পুরুষের বা জীবের এই প্রকৃতির পরিণাম বা ক্রম-আপূরণ-ফলে যে জীবত্বের ক্রম-পরিণাম হয়, তাহাতে পুরুষের অধিষ্ঠান মাত্র থাকে,—কোন কর্তৃত্ব বা পুরুষকার থাকে না। নিম্ন-জাতীয় জীব, প্রকৃতির এই ক্রম-আপূরণ দ্বারা ক্রমশঃ উচ্চজাতীয় জীবভাব লাভ করিতে করিতে, জন্মমৃত্যুর মধ্য দিয়া, মনুষ্যযোনি লাভ করে। মানুষে মানুষে কত প্রভেদ, তাহা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। তামসিক, রাজসিক ও সাত্ত্বিক প্রকৃতি-ভেদে মানুষকে সাধারণতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। মনুষ্যযোনি লাভ করিয়াও যতদিন সে জীবের প্রকৃতি প্রধানতঃ তামসিক বা রাজসিক থাকে, যতদিন সে আসুরী প্রকৃতিতে বদ্ধ থাকে, ততদিন জন্ম জন্ম ধরিয়া সে সেই আসুরী প্রকৃতি দ্বারা পরিচালিত হয়, এবং সংস্কাররাশির ক্রমসঞ্চয়ে প্রকৃতি দ্বারাই ক্রমে আপূরিত হইতে থাকে। এই সময়ে তাহারা কখন কর্ম্মানুযায়ী হীন যোনি কখন উচ্চতর যোনি প্রাপ্ত হয়। জগতে কোথাও সরল গতি নাই। উন্নতি-অবনতির মধ্য দিয়াই জীবপ্রকৃতি ক্রম-আপূরিত হইতে থাকে, ও জীবকে উন্নতির দিকে লইয়া যাইতে থাকে। এইরূপে ক্রমে ক্রমে পরমকরুণাময়ী প্রকৃতিই মানুষের তামসিক ও রাজসিক প্রকৃতিকে পরাজিত ও অভিভূত করিয়া, তাহার পাশব ও রাক্ষস-স্বভাবকে নিয়মিত করিয়া, তাহার সাত্ত্বিক ভাবের বিকাশ করেন,—তাহার অনাদিকাল-প্রবর্ত্তিত কুসংস্কার-রাশি ক্রমে পরিশুদ্ধ করিয়া, সুসংস্কাররাশির ক্রমবিকাশ করেন, মানুষকে দৈবী সম্পদযুক্ত করেন, তাহার শুদ্ধ জ্ঞাতৃত্ব কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব ভাবের ক্রমবিকাশ করেন। সে যাহা হউক, কিরূপে জীব এইরূপ প্রকৃতির ক্রম-

আপূরণে জাত্যন্তর পরিণতি দ্বারা সামান্য তৃণত্ব হইতে মনুষ্যত্বে উন্নীত হয়, সে দুর্ব্বোধ্য তত্ত্ব এস্থলে বুঝিবার প্রয়োজন নাই; এবং মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়াও মানুষ কিরূপে প্রকৃতির অনুগ্রহে প্রকৃতিরই ক্রম-আপূরণ দ্বারা ক্রমে ক্রমে তামসিক বা পাশব বৃত্তি সংযত ও অভিভূত করিয়া রাজসিক স্বভাব প্রাপ্ত হয়, এবং কিরূপে সেই রাজসিক বৃত্তি সংযত ও অভিভূত করিয়া সাত্ত্বিক বা দৈবী প্রকৃতি লাভ করে, তাহার তত্ত্বও এস্থলে বুঝিবার প্রয়োজন নাই। আমাদের আধ্যাত্মিক দেবাসুরযুদ্ধপ্রসঙ্গে—মহিষাসুর ও শুম্ভনিশুম্ভ-যুদ্ধপ্রসঙ্গে সে গূঢ় রহস্য ইঙ্গিতে মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে বিবৃত হইয়াছে। কত যুগ—কত কল্প ধরিয়া এরূপ প্রকৃতির ক্রম-আপূরণ হইয়া, নিম্ন জাতীয় জীব দৈবীপ্রকৃতিযুক্ত মানবযোনি লাভ করে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। তাহাও এস্থলে বুঝিবার প্রয়োজন নাই।

যাহা হউক, পরমা প্রকৃতি দেবী ভগবতীর অনুগ্রহে যতদিন মানুষ সাত্ত্বিক শুদ্ধ প্রকৃতি বা দৈবী সম্পদ্ লাভ করিতে না পারে, ততদিন সে প্রকৃতির অধীন—স্বপ্রকৃতির বশীভূত থাকে। ততদিন তাহার 'পুরুষকার' চেষ্টা নিষ্ফল হয় ততদিন তাহার প্রকৃত সাধনপথ উন্মুক্ত হয় না। যখন পুরুষ আপনার এই প্রকৃতিবদ্ধ স্বরূপ জানিতে পারে, প্রকৃতি হইতে আপনার পৃথক্ আত্মস্বরূপ অনুভব করে; তখন প্রকৃতির বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া স্বরূপে অবস্থান করিতে চেষ্টা করে, অথবা প্রকৃতির প্রভু হইয়া, তাহাকে বশীভূত ও নিয়মিত করিয়াও স্বরূপে অবস্থিত থাকিতে চেষ্টা করে। এই পুরুষ-প্রযত্নেই পরিণামে-পুরুষার্থ-সিদ্ধি হয়। দৈবী প্রকৃতির অনুগ্রহে—দৈবী প্রকৃতির সহায়েই এই পুরুষকার-সিদ্ধি হয়—পরম পুরুষার্থ লাভ হয়। যখন দৈবী-প্রকৃতির সহায়ে, সাধনার পরিপাকে যোগসংসিদ্ধি হয়, তখন পুরুষ, প্রকৃতিমুক্ত হইয়া, 'অক্ষরকূটস্থ ব্রহ্ম'স্বরূপে অবস্থিতি লাভ করে। তাহার আর

প্রকৃতিবন্ধন হেতু কোনরূপ পরিচ্ছেদ থাকে না। অথবা তখন 'বিভু'আত্মা আপনার এই প্রকৃতির 'প্রভু' ভাবে—প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান হেতু নিয়ন্তা হইয়া সর্ব্বাত্মা সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বনিয়ন্তা স্বপ্রকৃতির অধীশ্বরস্বরূপে অবস্থান করিতে পারে। শাস্ত্রে আছে,—মায়া যাহার বশ তিনি ঈশ্বর; আর যে মায়া দ্বারা বশীভূত—মায়া দ্বারা অর্দ্দিত, সে জীব। এইরূপে জীব 'অক্ষরব্রহ্ম' স্বরূপে অথবা সর্ব্বেশ্বর পুরুষোত্তমস্বরূপে অবস্থান করিতে পারে, আর তাহার প্রচ্যুতি হয় না, আর তাহাকে প্রকৃতির অধিকার মধ্যে আসিতে হয় না। তখন তাহার পূর্ণ সচ্চিদানন্দস্বরূপ লাভ হয়,—জীবত্বের চরম পরিণাত পূর্ণ বিকাশ সিদ্ধি হয়, পরমপুরুষার্থ লাভ হয়।

নিঃশ্রেয়স-তত্ত্ব।—গীতা অনুসারে এই ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তিতেই নিঃশ্রেয়স-সিদ্ধি হয়। বলিয়াছি ত, এই ব্রহ্মভাব দুই রূপে আমাদের জ্ঞানগম্য হয়। এক অক্ষরকূটস্থভাব, আর এক—সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বনিয়ন্তা ঈশ্বরভাব। কেবল অক্ষরকূটস্থ ব্রহ্মভাব লাভ করিলেই পূর্ণ জ্ঞানগম্য ব্রহ্মভাব প্রাপ্তি হয় না। কেবল ঈশ্বরভাব লাভ হইলেও এই পূর্ণজ্ঞানগম্য ব্রহ্মভাব লাভ হয় না। শঙ্করাচার্য্য এই কূটস্থ অক্ষরব্রহ্মভাব লাভেই পরমপুরুষার্থ বা নিঃশ্রেয়স-সিদ্ধি বুঝিয়াছেন। বৈষ্ণবাচার্য্যগণ সচ্চিদানন্দ-ঈশ্বরসারূপ্য লাভকেই পরম মুক্তি বলিয়া বুঝিয়াছেন। কিন্তু গীতা অনুসারে ব্রহ্মের পূর্ণভাব লাভ করিতে হইলে, এই দ্বিবিধ ভাবই লাভ করিতে হয়। ঈশ্বর ভাব লাভ করিলেও তাঁহার পরম ধাম 'পরম অক্ষর ভাব' লাভ করিতে হয়, আর অক্ষর উপাসনা ফলে অক্ষরভাবেও ঈশ্বর ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়, তবে পরমগতি প্রাপ্তি হয়। এই দ্বিবিধ ভাব স্বরূপতঃ একই—ভিন্ন নহে।

অক্ষরপুরুষভাবপ্রাপ্তি বা 'অক্ষরকূটস্থ' ব্রহ্মভাব-প্রাপ্তিরূপ যে নিঃশ্রেয়স, তাহা গীতার নানাস্থানে উক্ত হইয়াছে। তাহা এস্থলে উল্লেখ প্রয়োজন। গীতায় আছে,—

"এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ! নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি।
স্থিত্বাস্যামন্তকালেঽপি ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃচ্ছতি॥" (২।৭২)

এই "ব্রহ্মভূত" হইয়া "ব্রহ্মে স্থিতি"র কথা পঞ্চম অধ্যায়ে ১৯শ ও ২০শ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। ব্রহ্মে নির্ব্বাণের কথাও এই অধ্যায়ে ২৪শ হইতে ২৬শ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। ব্রহ্মসম্পন্নতার কথা ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ৩০শ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। সেই প্রকার সর্ব্বাত্মা পরমেশ্বরে তত্ত্বতঃ প্রবেশ (১১।৫৪, ১৮।৫৫), পরমেশ্বর-প্রাপ্তি (১২।৪) পরমেশ্বরে নিবাস (১২।৮) পরমেশ্বরের সাধর্ম্ম্যলাভ (১৪।২) উক্ত হইয়াছে। এই সাধর্ম্ম্য অর্থ যে স্বরূপত্ব—সচ্চিদানন্দভাবে একত্ব, তাহা সকল ব্যাখ্যাকারই স্বীকার করিয়াছেন। যাহা হউক, বৈষ্ণবাচার্য্যগণ 'ব্রহ্ম' বা কূটস্থ অক্ষর ব্রহ্ম অর্থে কেবল জীবাত্মা বা প্রত্যগাত্মাই বুঝিয়াছেন, এবং প্রত্যগাত্মার ঈশ্বর-সাধর্ম্ম্য-প্রাপ্তিই যে নিঃশ্রেয়স তাহা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অন্য দিকে শঙ্করাচার্য্য 'ব্রহ্ম' অর্থে পরমাত্মা—পরম অক্ষর ব্রহ্ম বুঝিয়াছেন। এবং গীতায় ভগবান্ যে, 'আমাকে' প্রাপ্তি, 'আমাতে' নিবাস, 'আমার' সাধর্ম্ম্য লাভ প্রভৃতি বলিয়াছেন,—তাহার অর্থ পরমাত্মা ব্রহ্মরূপ-প্রাপ্তিই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কিন্তু গীতায় এই 'অক্ষর' উপাসনা ও ঈশ্বরোপাসনা, (অর্থাৎ The Absolute Transcendent এর উপাসনা, এবং Immanent বা Personal God এর উপাসনা) এ উভয়ের পার্থক্য দ্বাদশ অধ্যায়ের প্রথমে উক্ত হইয়াছে, এবং আত্মযোগ ও ঈশ্বরযোগ ষষ্ঠ অধ্যায়ের শেষে পৃথগ্‌ভাবে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অতএব গীতায় আমাদের জ্ঞানগম্য অধ্যাত্মযোগে প্রাপ্য ব্রহ্মকে অক্ষরকূটস্থভাবে ও সর্ব্বাত্মা সর্ব্বনিয়ন্তা সর্ব্বস্বরূপ ঈশ্বরভাবে নির্দ্দিষ্ট করিয়া সেই অক্ষরকূটস্থভাবপ্রাপ্তি ও ঈশ্বরভাবপ্রাপ্তিই যে আমাদের পরমপুরুষার্থ, তাহা উপদিষ্ট হইয়াছে। তবে, অক্ষরোপাসনা ও অক্ষরে যোগসংসিদ্ধি-ফলে অক্ষরভাব লাভ করিলেও যে সর্ব্বভূত-

হিতে রত, তাহার যে ঈশ্বরভাবপ্রাপ্তি হয়, তাহাও গীতায় উক্ত হইয়াছে,—

"যে ত্বক্ষরমনির্দ্দেশ্যমব্যক্তং পর্য্যুপাসতে।

* * *

তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ॥" (গীতা ১২।৩-৪)

অতএব অক্ষরভাবে সাধনা দ্বারা হউক, আর ঈশ্বরভাবে সাধনা দ্বারা হউক, সচ্চিদানন্দঘন ব্রহ্মস্বরূপসিদ্ধিতেই জীবের নিঃশ্রেয়স-সিদ্ধি হয়—তাহার পরমপুরুষার্থ লাভ হয়। কিন্তু বলিয়াছি ত, এ উভয়ভাব একই। যতক্ষণ ব্যক্তিত্ব থাকে,—পরিচ্ছিন্নত্ব থাকে, এক কথায় যত-ক্ষণ জীবরূপে পৃথকত্বের ভাব থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত এই পরম নিঃশ্রেয়স-সিদ্ধি হয় না।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, ব্রহ্মতত্ত্ব অবিজ্ঞাত হইয়াও বিজ্ঞাত। অধ্যাত্ম-যোগে ব্রহ্ম আত্মার আত্মা—কূটস্থ অক্ষরস্বরূপে ও সর্ব্বাত্মা ঈশ্বরভাবে বিজ্ঞাত হন। সেই ব্রহ্মবিজ্ঞানসিদ্ধিতে আমাদের ব্রহ্মস্বরূপতা লাভ হয়, নিঃশ্রেয়স সিদ্ধি হয়। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, 'চিৎ' ও 'সৎ' মধ্যে প্রভেদ নাই—তাহা ব্রহ্মেরই স্বরূপ। পাশ্চাত্য দর্শনের ভাষায় Thought is Being। অতএব অধ্যাত্মযোগে যখন আমাদের জ্ঞান এই ব্রহ্ম-ভাবময় হয়, তখন আমরাও সৎ—ব্রহ্ম-ভাব প্রাপ্ত হই। সে জ্ঞান তখন 'সৎ'রূপে অবস্থান করে—তখন জ্ঞানে জ্ঞাতা-জ্ঞেয়-মধ্যে প্রভেদ থাকে না।

সে যাহা হউক, আমাদের পরমার্থ যে নিঃশ্রেয়স, তাহা গীতা হইতে আমরা অন্যভাবে বুঝিতে চেষ্টা করিব। বলিয়াছি ত, পুরুষ-প্রকৃতি-যোগে বা ক্ষেত্রজ্ঞ-ক্ষেত্র-যোগে, অথবা শ্রুতির ভাষায় সচ্চিদানন্দ আত্মা নামরূপময় উপাধিযোগে জীবভাব হয়। ব্রহ্ম আত্মা-রূপে নামরূপময় উপাধিতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া জীবভাবযুক্ত হন। পুরুষ বা দেহী—

সচ্চিদানন্দস্বরূপ,—প্রকৃতি জড়। পুরুষ-সান্নিধ্যে সেই পুরুষের ক্ষেত্ররূপে ত্রিগুণময়ী-প্রকৃতির যে অভিব্যক্তি ও পরিণতি হয়, সেই ক্ষেত্রস্থ বুদ্ধি অহঙ্কার মনরূপ অন্তঃকরণে বা চিত্তে. পুরুষ অধিষ্ঠিত হন। সেই অধিষ্ঠান হেতু চিত্ত (সাংখ্যমতে বুদ্ধি অহঙ্কার মন, দশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ সূক্ষ্মভূত বা তন্মাত্র—এই অষ্টাদশ অবয়বযুক্ত লিঙ্গশরীর) চেতনবৎ হয়। চিত্ত বা অন্তঃকরণ চেতনবৎ হইয়া আত্মার সচ্চিদানন্দস্বরূপের প্রতিবিম্ব গ্রহণ করে বলিয়া অন্তঃকরণে জ্ঞাতা কর্ত্তা ও ভোক্তা জীব-ভাবের বিকাশ হয়, তাহা বলিয়াছি। অন্তঃকরণ যত নির্ম্মল হয়, এই জ্ঞাতা কর্ত্তা ও ভোক্তা 'আমি' ভাবের অভিব্যক্তি তত প্রস্ফুট হয়। আত্মা বা পুরুষ এই ক্ষেত্রবদ্ধ থাকিয়া, আপনার স্বরূপ এই অন্তঃকরণে প্রতিফলিত প্রতিবিম্ব হইতেই দর্শন করে। এইজন্য প্রতিক্ষেত্রে বদ্ধ আত্মা আপনাকে জ্ঞাতা কর্ত্তা ও ভোক্তা 'আমি' রূপে বা জীবভাবেই জানিতে পারে। অন্তঃকরণের মধ্য দিয়া সেই আত্মভাবের বিকাশ হয় বলিয়া তাহা পরিচ্ছিন্ন হয়। তাহার সর্ব্বাত্মভাব—সম্প 'আমি'-ভাব অন্তঃ-করণে বিকাশিত 'অহং'-ভাবে পরিচ্ছিন্ন হয় এবং 'ইদং' হইতে পৃথক্ করিয়া যে অহংভাবের বিকাশ হয়, তাহাতে তাহার অপরিচ্ছিন্ন জ্ঞানস্বরূপ বৃত্তিজ্ঞানরূপে অজ্ঞান দ্বারা সীমাবদ্ধ হয়, তাহার আনন্দ স্বরূপ— সুখ দুঃখজড়িত ভোক্তৃভাবে পরিচ্ছিন্ন হয় এবং তাহার 'সৎ' রূপ তাহার ইচ্ছা ও কার্য্যশক্তি—আন্তর ও বাহ্য বাধা দ্বারা সঙ্কীর্ণ হইয়া যায়।"

এই সঙ্কীর্ণতা—এই পরিচ্ছেদ দূর করিতে পারিলে, তবে জীবের পূর্ণ সচ্চিদানন্দ আত্মস্বরূপ লাভ হয়। ক্ষেত্রের মধ্য দিয়া, বাহ্য সংস্পর্শের মধ্য দিয়া এই জ্ঞাতৃত্ব কর্ত্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব ভাবের ক্রমশঃ বিকাশে যখন এই ভাবের পূর্ণ অভিব্যক্তি হয়, যখন আত্মা সম্প্রসারিত হইয়া সর্ব্বভূতে সেই এক আত্মার দর্শন লাভ হয়, তখন আত্মা অন্তর্মুখ হইয়া ক্ষেত্রের সঙ্কীর্ণতা হইতে বিমুক্ত হইয়াও, সর্ব্বাত্মস্বরূপে অবস্থান করিতে পারে—

তখন জীব ভূতভাব বা ক্ষরভাব ত্যাগ করিয়া অক্ষরস্বরূপে অবস্থান করিতে পারে। সেই আত্মভাবে সেই কূটস্থ অক্ষরভাবে অবস্থান করিয়াও প্রকৃতিতে বা ক্ষেত্রে অধিষ্ঠিত থাকিয়া, সেই অধিষ্ঠান হেতু প্রকৃতির নিয়ন্তৃরূপে বা পুরুষোত্তম পরমেশ্বরভাবে জীব তাহার পরমাদর্শ লাভ করিতে পারে। বলিয়াছি ত, তখন জীবের নিজস্বরূপ ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তি হয়, তখন নিঃশ্রেয়স-সিদ্ধি হয়।

নিঃশ্রেয়স-সিদ্ধির উপায়—কর্ম্ম ভক্তি ও জ্ঞানযোগ।—এস্থলে যাহা উক্ত হইল, তাহা হইতে এই নিঃশ্রেয়স-সিদ্ধির যে উপায়, তাহার আভাস পাওয়া যাইবে। মোক্ষশাস্ত্র গীতায়, এই নিঃশ্রেয়স-সিদ্ধির উপায় বিশেষভাবে বিবৃত হইয়াছে। তাহার তত্ত্ব এস্থলে সংক্ষেপে বুঝিতে হইবে। গীতোক্ত নিঃশ্রেয়স-সিদ্ধির উপায়—কর্ম্মযোগ, ভক্তিযোগ ও জ্ঞানযোগ। নিঃশ্রেয়স-সিদ্ধিতে অক্ষর নির্গুণ ব্রহ্মে ও সগুণ ব্রহ্ম পরমেশ্বরে যোগসংসিদ্ধি হয়, তাহা বলিয়াছি। যে উপায় দ্বারা এই যোগসংসিদ্ধি হয়, তাহাকেও গীতায় যোগ বলা হইয়াছে। এইজন্য গীতা পরম যোগশাস্ত্র ও ইহার বক্তা স্বয়ং 'যোগেশ্বর হরি'। অষ্টাদশাধ্যায়িনী গীতার প্রতি অধ্যায়েই এই যোগসিদ্ধির উপায় উক্ত হইয়াছে। ইহার প্রত্যেক অধ্যায়ই 'যোগ'-নামে অভিহিত হইয়াছে। ইহাতে বিষাদযোগ হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ অধ্যায়ে মোক্ষযোগ বিবৃত হইয়াছে। তাহা সমগ্রভাবে—কর্ম্ম, ধ্যান ভক্তি ও জ্ঞানযোগ এই চারিভাগে বিভক্ত বলা যায়। কিন্তু ধ্যানযোগ এক অর্থে কর্ম্মযোগের অন্তর্গত। এজন্য গীতোক্ত যোগকে কর্ম্মযোগ, ভক্তিযোগ ও জ্ঞানযোগ এই তিন ভাগে সামান্যতঃ বিভক্ত করা যায়।

নিঃশ্রেয়স-সিদ্ধির উপায় সম্বন্ধে মতভেদ।—শঙ্করাচার্য্য ভক্তিযোগকে স্বতন্ত্রভাবে গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার মতে কর্ম্মযোগ ও জ্ঞানযোগ এই দুইটিই নিঃশ্রেয়স-সিদ্ধির উপায়, তাহাই বেদোক্ত

প্রবৃত্তিধর্ম্ম ও নিবৃত্তিধর্ম্ম। এ উভয়ের মধ্যে নিষ্কাম কর্ম্মযোগ নিম্নাধিকারীর পক্ষে বিহিত, আর জ্ঞানযোগ উচ্চাধিকারীর পক্ষে বিহিত। নিষ্কাম কর্ম্মযোগ সাধনা দ্বারা যাহার চিত্ত শুদ্ধ ও নির্ম্মল হয়, সে-ই জ্ঞানযোগের অধিকারী হয়। এজন্য কর্ম্মযোগ গৌণভাবে জ্ঞানপ্রাপ্তি দ্বারা এবং জ্ঞানযোগ মুখ্যভাবে জ্ঞানসিদ্ধির দ্বারা নিঃশ্রেয়সপ্রাপ্তির হেতু হয়। কর্ম্ম ও জ্ঞান এ উভয়ের সমুচ্চয় অসম্ভব। ইহারা পরস্পর বিরুদ্ধধর্ম্মী। কর্ম্মযোগানুষ্ঠানকালে আত্মার ভেদদর্শন থাকে, আত্মার কর্তৃত্ব বোধ থাকে, এজন্য এই কর্ম্মযোগ দ্বারা নিঃশ্রেয়স-সিদ্ধি সম্ভব নহে। কেবল জ্ঞানযোগ দ্বারাই আত্মার অভেদ দর্শন হয়—তাহার অকর্ম্মস্বরূপ সিদ্ধি হয়। শঙ্করাচার্য্য গীতার উপক্রমণিকায় যাহা বলিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বে উদ্ধৃত হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন,—"দ্বিবিধো হি বেদোক্তো ধর্ম্মঃ—প্রবৃত্তিলক্ষণো নিবৃত্তিলক্ষণশ্চ। * * স চ ভগবান্ * * বৈদিকং হি ধর্ম্মদ্বয়ং অর্জ্জুনায় উপদিদেশ।"

তিনি আরও বলিয়াছেন যে, এই দুই প্রকার ধর্ম্মই নিঃশ্রেয়স-সিদ্ধির জন্য প্রয়োজন। "ইমং দ্বিপ্রকারং ধর্ম্মং নিঃশ্রেয়সপ্রয়োজনম্।" তবে প্রবৃত্তিধর্ম্ম সকামভাবে 'দেবাদিস্থানপ্রাপ্তি হেতু' অনুষ্ঠিত হইলে, তাহা দ্বারা কেবল অভ্যুদয় হয়, নিঃশ্রেয়স-সিদ্ধি হয় না। নিষ্কাম ভাবে কর্ম্মযোগ, অনুষ্ঠিত হইলে, তবে তাহা নিঃশ্রেয়স-সিদ্ধির হেতু হয়। শঙ্কর বলিয়াছেন,—

"প্রবৃত্তিলক্ষণো ধর্ম্মঃ—ঈশ্বরার্পণবুদ্ধ্যা অনুষ্ঠীয়মানঃ সত্ত্বশুদ্ধয়ে ভবতি ফলাভিসন্ধিবর্জ্জিতঃ, শুদ্ধসত্ত্বস্য চ জ্ঞাননিষ্ঠা যোগ্যতাপ্রাপ্তিদ্বারেণ জ্ঞানোৎপত্তিহেতুত্বেন চ নিঃশ্রেয়সহেতুত্বমপি প্রতিপদ্যতে।"

অতএব নিঃশ্রেয়স-সিদ্ধির জন্য নিম্নাধিকারীর প্রথম সাধনমার্গ প্রবৃত্তি-লক্ষণ নিষ্কাম কর্ম্মযোগ। এবং এই নিষ্কাম কর্ম্মযোগ দ্বারা চিত্তশুদ্ধ হইয়া উচ্চাধিকারী হইলে,—নিবৃত্তি-লক্ষণ জ্ঞানযোগ। গীতার নিঃশ্রেয়স-

সিদ্ধির উপায়রূপে এই দুই বেদোক্ত ধর্ম্ম—অর্থাৎ প্রবৃত্তিলক্ষণ কর্ম্মযোগ ও নিবৃত্তিলক্ষণ জ্ঞানযোগ মাত্র উপদিষ্ট হইয়াছে। অন্য গীতোক্ত যোগ এ উভয়ের কোন না কোনটির অন্তর্গত। গীতোক্ত নিষ্ঠা দুইরূপ—সাংখ্য-যোগে জ্ঞানীদের নিষ্ঠা ও কর্ম্মযোগে যোগীদের নিষ্ঠা। শঙ্করাচার্য্য ভক্তি-যোগের স্বতন্ত্র উল্লেখ করেন নাই। তিনি ভক্তিকে জ্ঞানের অন্তর্গত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "আত্মেশ্বরভেদমাশ্রিত্য বিশ্বরূপ-ঈশ্বরে চেতঃসমাধানলক্ষণো যোগঃ" (গীতা ১১।১১ শ্লোকের ভাষ্য)—ইহাই ভক্তিযোগ। অভেদদর্শী অক্ষরোপাসকের কর্ম্মযোগ সম্ভব নহে,—তাহার ঈশ্বরে ভক্তিযোগও উপপন্ন হয় না। যাহাদিগকে ভগবান্ 'মৎপরমাঃ' বলিয়াছেন (গীতা ১২।২০শ্লোকের ভাষ্য) তাহারা "যথোক্তো-হহমক্ষরাত্মা পরমো নিরতিশয়া গতিঃ," আর তাহাদের ভক্তিও "উত্তমাং পরমার্থজ্ঞানলক্ষণাং"। গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ের ৫৪ শ্লোকে "মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্" এই বাক্যের ব্যাখ্যায় শঙ্কর বলিয়াছেন,—"জ্ঞাননিষ্ঠো মদ্ভক্তিং ময়ি পরমেশ্বরে ভক্তিং ভজনং পরাম্ জ্ঞানলক্ষণাং চতুর্থীং লভতে 'চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাম্' ইত্যুক্তং।" অতএব শঙ্করাচার্য্যের মতে—পরা ভক্তি জ্ঞাননিষ্ঠারই অন্তর্গত। অপরাভক্তিতে আত্মেশ্বরে ভেদদৃষ্টি থাকে। এইজন্য শঙ্কর স্বতন্ত্রভাবে ভক্তিনিষ্ঠার বা ভক্তি-যোগের উল্লেখ করেন নাই। গিরি বলিয়াছেন, আর্ত্ত অর্থার্থী ও জিজ্ঞাসুর অপরা ভক্তি অপেক্ষা যে চতুর্থ জ্ঞানলক্ষণা ভক্তি তাহাই পরা ভক্তি। ভগবান্ বলিয়াছেন—

"তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে।
প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ॥"
(গীতা, ৭।১৭)

এইরূপে শঙ্করাচার্য্য জ্ঞান ও ভক্তির সমুচ্চয় সাধন করিয়াছেন। গিরিও তাঁহার অনুবর্ত্তী হইয়া এই জ্ঞান ও ভক্তির সমুচ্চয় করিয়াছেন।

কিন্তু মধুসূদন, শঙ্করাচার্য্যের অনুবর্ত্তী হইয়াও ভক্তিযোগ স্বতন্ত্রভাবে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। তিনি গীতা-ব্যাখ্যার উপক্রমণিকায় বলিয়াছেন,—

"ভগবদ্‌ভক্তিনিষ্ঠা তু মধ্যমে পরিকীর্ত্তিতা।
কর্ম্মমিশ্রা চ শুদ্ধা চ জ্ঞানমিশ্রা চ সা ত্রিধা॥"

মধুসূদন বলিয়াছেন, কর্ম্মনিষ্ঠা ও জ্ঞাননিষ্ঠা উভয়ের সমুচ্চয় হইতে পারে না, তাহারা পরস্পর বিরুদ্ধ স্বভাব। ভক্তিনিষ্ঠা এ উভয়ের মধ্যবর্ত্তী —ভক্তিযোগ সব বিঘ্ন অপনোদন করে। ভক্তি ত্রিবিধা—কর্ম্মমিশ্রা, শুদ্ধা ও জ্ঞানমিশ্রা। জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি যে 'পরা'ভক্তি তাহা যে শুদ্ধ পরমাত্মায় ভক্তি অর্থাৎ নিদিধ্যাসন পরিপাকে পরমাত্মার আকারে চিত্তবৃত্তির আবৃত্তি-রূপ উপাসনা,—তাহা শঙ্করাচার্য্যের ন্যায় মধুসূদনও সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। (১৮৷৫৪ শ্লোক ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।)

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে গীতায় ত্রিবিধ সাধন—কর্ম্মযোগ-নিষ্ঠা ভক্তিযোগ-নিষ্ঠা ও জ্ঞানযোগ-নিষ্ঠা উপদিষ্ট হইয়াছে। শ্রুতিতে যেমন প্রবৃত্তি-লক্ষণ কর্ম্ম ও নিবৃত্তি-লক্ষণ জ্ঞান এই দুই কাণ্ড আছে, সেইরূপ জ্ঞানসাধন উপাসনাও উপদিষ্ট হইয়াছে। ভক্তিযোগ এই উপাসনার অন্তর্গত। বৈষ্ণবাচার্য্যগণ এই ত্রিবিধ নিষ্ঠাই স্বীকার করিয়াছেন। তবে ইহাদের মধ্যে যে ভক্তিযোগ-নিষ্ঠাই প্রধান, তাহা তাঁহারা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। রামানুজ বলিয়াছেন যে ভগবান্ গীতায় "পরমপুরুষার্থলক্ষণ-মোক্ষসাধনতয়া বেদান্তোদিতং স্ববিষয়জ্ঞানকর্ম্মানু-গৃহীতভক্তিযোগমবতারয়ামাস।"

রামানুজের মতে নিঃশ্রেয়স প্রাপ্তির মুখ্য উপায় ভক্তিযোগ। তবে ভগ-বৎ-স্বরূপ-জ্ঞান ও কর্ম্মযোগ এই ভক্তিযোগের সহায়ভূত। সুতরাং কর্ম্ম ও জ্ঞান-মিশ্রা ভক্তিই একমাত্র সাধন এবং তাহাই গীতায় উপদিষ্ট হইয়াছে। রামানুজ কর্ম্ম ও জ্ঞানের সমুচ্চয় করিয়াছেন। তবে জ্ঞানকর্ম্ম-

সমুচ্চয় অঙ্গসহিত ভক্তিযোগই যে গীতাশাস্ত্রার্থ, তাহা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কর্ম্মযোগমধ্যে তিনি ভগবদারাধনারূপ কর্ম্মেরই বিশেষ উল্লেখ করিয়াছেন। তাহাই ভক্তির পুষ্টিকর। .

বলদেবও বলিয়াছেন,—নিঃশ্রেয়স অর্থাৎ জীবাত্মার পরমাত্ম-ধাম-প্রাপ্তির উপায় কর্ম্ম জ্ঞান ও ভক্তিভেদে ত্রিবিধ। কর্ম্মযোগ হৃদিশুদ্ধি দ্বারা জ্ঞান ও ভক্তিযোগের সহায় বা উপকারী বলিয়া পরম্পরারূপে নিঃশ্রেয়স-সিদ্ধির উপায়। তিনি বলিয়াছেন,—

"কর্তৃত্বাভিনিবেশ-পরিত্যাগেন চানুষ্ঠিতস্য কর্ম্মণঃ হৃদিশুদ্ধিদ্বারা জ্ঞান-ভক্ত্যোরুপকারিত্বাৎ পরম্পরয়া তৎপ্রাপ্তৌ উপায়ত্বেন।"

বলদেবের মতে জ্ঞান ও ভক্তিই মুক্তির সাক্ষাৎ উপায়। জ্ঞান ও ভক্তি—একই। তবে কিঞ্চিৎ বিশেষ আছে। জ্ঞানে চিদ্-বিগ্রহের অনুসন্ধান ও দর্শন-সিদ্ধি হয়,—ফলে তৎসালোক্যাদি লাভ হয়। আর ভক্তিতে বিচিত্র লীলারস আশ্রয়পূর্ব্বক শ্রীভগবানের অনুসন্ধান ও দর্শন সিদ্ধি হয়, তাহার ফলে পরমানন্দ লাভ হয়। ভক্তের জ্ঞানই ভক্তিযোগে সচ্চিদানন্দরূপ একরস আস্বাদনে সিদ্ধ হয়, বলদেবের কথা এই,—

"ভক্তে জ্ঞানিত্বং তু সচ্চিদানন্দৈকরসে ভক্তিযোগে তিষ্ঠতি।"

বল্লভ-নিম্বার্ক ও মাধ্বসম্প্রদায়ানুযায়ী ব্যাখ্যায় ভক্তিই যে গীতার্থ, ও নিঃশ্রেয়স-সিদ্ধির একমাত্র উপায়, তাহা সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। বল্লভমতানুযায়ী অমৃততরঙ্গিণী ব্যাখ্যায় শঙ্করের মত প্রথমে সমালোচিত হইয়াছে, তাহাতে উক্ত হইয়াছে যে, শঙ্করের মতে জ্ঞান-নিষ্ঠারূপ বিদ্যাত্মক ধর্ম্ম হইতে নিঃশ্রেয়স সিদ্ধি হয়, সুতরাং জ্ঞান ও সন্ন্যাসই গীতার তাৎপর্য্য। কিন্তু জ্ঞান বা বিদ্যা—সাত্বিকী, অর্থাৎ চিত্তের সত্বগুণের ধর্ম্ম। অবিদ্যা রাজস ও তামস চিত্তের ধর্ম্ম। ত্রিগুণের ধর্ম্ম এই যে ইহারা পরস্পর একত্র সম্বদ্ধ অথচ পরস্পর পরস্পরকে অভিভূত

করিতে চেষ্টা করে। সুতরাং জ্ঞান নিত্য অজ্ঞান-মিশ্রিত, বিদ্যা নিত্য অবিদ্যা জড়িত। অতএব এ জ্ঞান হইতে মুক্তি সম্ভব নহে।

এ আপত্তি সঙ্গত হয় নাই। কারণ, শঙ্করাচার্য্য বৃত্তিজ্ঞান ও আত্ম-জ্ঞান বা আত্মার নিত্যবোধস্বরূপ—এ উভয় জ্ঞানমধ্যে প্রভেদ দেখাইয়াছেন। তিনি ক্ষণিক-বিজ্ঞানবাদ নিরাশ করিয়া নিত্য-বিজ্ঞান-বাদ স্থাপন করিয়াছেন। সে নিত্যবিজ্ঞান—ব্রহ্মবিজ্ঞান আত্মাবিজ্ঞান, তাহা বৃত্তিজ্ঞান নহে। এই জ্ঞানে স্থিতি হইলে, তবে আত্মস্বরূপ লাভ হয়—মুক্তি হয়। ইহাই শঙ্করাচার্য্যের সিদ্ধান্ত। সে যাহাহউক, এই অমৃততরঙ্গিণী ব্যাখ্যায় আরও উক্ত হইয়াছে যে, "গুণত্রয়-নিবারক সাধনান্তর অন্বেষ্টব্য।" সে সাধন—ভক্তি। অতএব রামানুজ যে বলিয়াছেন 'জ্ঞানকর্ম্মসমুচ্চয়াঙ্গ সহিত ভক্তিযোগই গীতাশাস্ত্রার্থ', তাহাই সিদ্ধান্ত। কিন্তু অমৃততরঙ্গিণী ব্যাখ্যায় সেই ভক্তিকেই যখন সাত্ত্বিক রাজসিক ও তামসিক ভেদে ত্রিবিধ বলা হইয়াছে, তখন ইহা গুণত্রয়নিবারক সাধনান্তর কিরূপে বলা যাইতে পারে, তাহা বুঝা যায় না। গুণাতীত শুদ্ধ ভক্তির কথা সেস্থলে পাওয়া যায় না।

এইরূপে নিঃশ্রেয়সসিদ্ধির উপায় কর্ম্মযোগ ভক্তিযোগ ও জ্ঞানযোগ সম্বন্ধে বিভিন্ন ব্যাখ্যাকারগণের মধ্যে মত বিরোধ দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদিগকে এই বিরোধ মীমাংসার মূল অনুসন্ধান করিতে হইবে। তাহার পূর্ব্বে এ বিরোধের কারণ সংক্ষেপে বুঝিতে হইবে।

এই বিরোধের এক কারণ সাম্প্রদায়িক মতভেদ। কোন সম্প্রদায় কর্ম্ম ভক্তি ও জ্ঞানের সমুচ্চয়বাদী, কেহ আংশিক-সমুচ্চয়-বাদী, কেহ অসমুচ্চয়বাদী। অর্থাৎ কেহ জ্ঞান কর্ম্ম ও ভক্তি এই ত্রিবিধ সাধন একত্র গ্রহণ করিয়াছেন, এবং ইঁহাদের মধ্যে কেহ জ্ঞানের প্রাধান্য দিয়া কর্ম্ম ও ভক্তিকে সেই জ্ঞানসিদ্ধির উপায়রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। কেহ বা ভক্তির প্রাধান্য দিয়া কর্ম্ম ও জ্ঞানকে তাহার সহায় বা সহকারি সাধন

মাত্র বলিয়াছেন। কেহ বা, এই ত্রিবিধ সাধন একত্র অসম্ভব, সুতরাং তাহার প্রত্যেকটি ভিন্ন অধিকারীর জন্য বিহিত, অথবা একই অধিকারীর ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় একের পর আর একটি অনুষ্ঠেয়, ইহা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, অর্থাৎ এই তিনরূপ সাধন,—সাধনার তিনটি বিভিন্ন স্তর বা সোপানরূপে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কেহ জ্ঞান বা বৈরাগ্যপথাশ্রয়ী, কেহ ভক্তি বা অনুরাগপথাশ্রয়ী। আমরা দেখিয়াছি যে, শঙ্কর ও তাঁহার অনুবর্ত্তিগণ জ্ঞাননিষ্ঠাকেই নিঃশ্রেয়সসিদ্ধির একমাত্র মুখ্য উপায় বলিয়াছেন, রামানুজ বলদেব প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবাচার্য্যগণ ধ্যানলক্ষণ ভক্তিকেই নিঃশ্রেয়সসিদ্ধির মুখ্য উপায় বলিয়াছেন, এবং অন্য উপায়কে —অর্থাৎ কর্ম্মযোগ ও জ্ঞানযোগকে গৌণ বা সহকারী উপায় বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কর্ম্মযোগের প্রাধান্য কেহই স্বীকার করেন নাই— কর্ম্মযোগ যে মুখ্য সাধন, তাহা কেহই বলেন নাই। তাহা গৌণভাবে জ্ঞান বা ভক্তির সহকারিরূপে সাধন অথবা নিম্নাধিকারীর পক্ষে অবলম্বনীয় কিংবা সাধনার প্রথম অবস্থায় মাত্র অনুষ্ঠেয়, ইহাই প্রায় সকল ব্যাখ্যাকারই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ইহা দৃষ্টান্ত দ্বারা এস্থলে বুঝিবার প্রয়োজন নাই।

গীতার ব্যাখ্যাকারগণকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়, তাহা বলিয়াছি। এক শঙ্করপ্রমুখ সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়, আর এক রামানুজ প্রমুখ সংসারত্যাগী বৈষ্ণব-সম্প্রদায়। কাজেই ইঁহাদের দ্বারা কর্ম্ম বা প্রবৃত্তিমার্গে সাধনা অনুমোদিত হয় নাই। অথবা তাহাকে নিম্নাধিকারীর সাধনা বলিয়া একরূপ অশ্রদ্ধার সহিত গৃহীত হইয়াছে।

এই দুই শ্রেণীর ব্যাখ্যাকারগণ কেন কর্ম্মযোগের প্রাধান্য দেন নাই, তাঁহারা কেন জ্ঞানযোগ অথবা ভক্তিযোগের প্রাধান্য দিয়াছেন, তাহার হেতু পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। শঙ্করাচার্য্য অক্ষর কূটস্থ অদ্বয় নির্গুণ প্রপঞ্চাতীত ব্রহ্মকেই পরমতত্ত্ব, ও তাহার প্রাপ্তিই পরমনিঃশ্রেয়সসিদ্ধি

বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। সেই অক্ষর নির্গুণ কূটস্থ ব্রহ্মই আত্মা। তিনি নিষ্ক্রিয়স্বরূপ। অধ্যাত্মজ্ঞানে তাঁহাকে জ্ঞানস্বরূপে আমরা ধারণা করি। অতএব এই নিষ্ক্রিয় জ্ঞানস্বরূপে অবস্থান-সিদ্ধিতেই মুক্তি হয়। ইহাকেই শঙ্কর নির্ব্বাণমুক্তি বা কৈবল্যমুক্তি বলিয়াছেন। নৈষ্কর্ম্ম্য-সিদ্ধিতেই ইহা লাভ হয়। ইহাই পরম নিঃশ্রেয়স। নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধির ব্যাখ্যায় (গীতা ১৮।৪৯ শ্লোকের ভাষ্য) শঙ্কর বলিয়াছেন,—যাহা হইতে সমুদায় কর্ম্ম নির্গত হইয়াছে, সেই নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মই আত্মা—এই বোধ যাহার হইয়াছে, সে নিষ্কর্ম্মা, তাহারই ভাব—নৈষ্কর্ম্ম্য। সন্ন্যাসের দ্বারা সেই নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি লাভ হয়। অথবা নৈষ্কর্ম্ম্য শব্দের অর্থ নিষ্ক্রিয় আত্মা স্বরূপে অবস্থিতি। তাহার সিদ্ধিতেই নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি হয়। তাহাই পরমা সিদ্ধি। কেননা, তাহা কর্ম্মজনিত সিদ্ধি হইতে বিলক্ষণ। সন্ন্যাস বা সম্যগ্ দর্শন অথবা সম্যগ্দর্শনের ফলস্বরূপ যে সর্ব্বকর্ম্ম ত্যাগ, তাহা দ্বারা সদ্যোমুক্তিতে অবস্থানস্বরূপ নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিপ্রাপ্তি হয়।

রামানুজ প্রভৃতি বৈষ্ণব ব্যাখ্যাকারগণ শ্রীকৃষ্ণাখ্য বাসুদেবকেই সগুণ পূর্ণব্রহ্ম, তাঁহাকেই পরম তত্ত্ব বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা নির্গুণ ব্রহ্মতত্ত্ব গ্রহণ করেন নাই। তাঁহারা অক্ষর ব্রহ্মকে প্রত্যগাত্মা বলিয়া বুঝিয়াছেন। সেই শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব রসস্বরূপ—আনন্দস্বরূপ। তাঁহাদের মতে ভগবানের অংশস্বরূপ জীব এই আনন্দলাভ করিতে পারিলেই নিঃশ্রেয়সসিদ্ধি লাভ করে। অনন্য ভক্তি—ঈশ্বরে পরানুরক্তি দ্বারা জীব আপনার সেই আনন্দস্বরূপে আনন্দরস আস্বাদন লাভ করে. তাহাতেই তাহার নিঃশ্রেয়সসিদ্ধি হয়। কাজেই ইঁহারা ভক্তিযোগের প্রাধান্য দিয়াছেন, এবং কর্ম্ম ও জ্ঞানকে ইহার সহকারী বলিয়াছেন। তাঁহাদের মতে নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি জ্ঞানযোগের ফলস্বরূপ ধ্যাননিষ্ঠ বা আনন্দ আস্বাদের অন্তরায় বিক্ষেপকর কর্ম্ম সন্ন্যাস বা ত্যাগ, দ্বারা লাভ হয়। তাঁহারা কর্ম্ম জ্ঞান ও ভক্তি সমুচ্চয় করিয়াও ভক্তির প্রাধান্য দিয়াছেন।

গীতোক্ত কর্ম্মযোগের বিশেষত্ব।—যাহা হউক, যদি কোন নিষ্কাম কর্ম্মী—ভগবানের আদর্শ অনুসারে ঈশ্বরার্থ, লোকসংগ্রহার্থ, পরহিতার্থ কর্ত্তব্যকর্ম্মকারী জ্ঞানে অবস্থিত থাকিয়া গীতাব্যাখ্যা লিখিতেন, তবে তিনি কর্ম্মযোগের প্রাধান্য সিদ্ধান্ত করিতেন মনে হয়। গীতা-বক্তা শ্রীভগবানই আদর্শ কর্ম্মযোগেশ্বর। বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়া জগতের রক্ষার্থ লোকহিতার্থ ধর্ম্মসংস্থাপনার্থ স্বয়ং কর্ম্ম করেন। গীতা-শ্রোতা নরশ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয়বীর অর্জ্জুন প্রধান কর্ম্মী। অর্জ্জুনকে কর্ত্তব্য কর্ম্মে—স্বধর্ম্মে প্রবৃত্ত করিবার জন্যই গীতা উপদিষ্ট হইয়াছে। অর্জ্জুনও গীতার উপদেশ শ্রবণ করিয়া, মোহমুক্ত হইয়া স্বধর্ম্ম—যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। গীতার উপদেশ গ্রহণ করিয়া অর্জ্জুন বলিয়াছেন,—

"নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত।
স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব॥"

অতএব এক অর্থে গীতায় কর্ম্মযোগেরই প্রাধান্য উপদিষ্ট হইয়াছে। গীতার উপদেশ শ্রবণ করিয়া অর্জ্জুন কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হন নাই, বা বৈরাগী হন নাই। তিনি স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তিনি যে নিম্নাধিকারী বলিয়া স্বধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহা নহে।

গীতায় যে কর্ম্মযোগেরই প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে, তাহার অন্য কারণও আছে। এস্থলে তাহা বিবৃত করিবার প্রয়োজন নাই। কেবল তাহার একটি কারণ মাত্র উল্লেখ করিতে হইবে। ভগবান্ এই জগৎ সৃষ্টি করিয়া তাহার স্থিতির জন্য প্রজাপতিগণকে প্রবৃত্তিধর্ম্ম গ্রহণ করান ও সনকাদি কুমারগণকে নিবৃত্তিধর্ম্ম গ্রহণ করান, ইহা শাঙ্কর ব্যাখ্যার উপক্রমণিকায় উক্ত হইয়াছে। ধর্ম্ম সংস্থাপন ও দুষ্কৃত নিধন দ্বারা জগতের অভ্যুদয় জন্য ভগবান্ যুগে যুগে অবতীর্ণ হন, তাহা গীতায় উক্ত হইয়াছে। জগতের অভ্যুদয় জন্য তিনি তাঁহার পথে সকলকে কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করেন এবং জীবের নিঃশ্রেয়সসিদ্ধি ও জগতের অভ্যুদয় যুগপৎ সংসাধনের জন্য

তিনি ভগবৎ-পরায়ণ জ্ঞানীদের ঈশ্বরার্থ কর্ম্মে বা যজ্ঞার্থ কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করেন, জগৎচক্র প্রবর্ত্তনের জন্য তাঁহাদের যজ্ঞদানাদি বিহিত কর্ম্মে প্রবৃত্ত করান। কর্ম্মত্যাগে জগতের স্থিতি ও অভ্যুদয় হয় না। ভগবান্ অতন্দ্রিত হইয়া কর্ম্ম না করিলে, এই লোক সকল উৎসন্ন যাইত। এজন্য ভগবান নিঃশ্রেয়সসিদ্ধির মার্গে কোথাও কর্ম্মত্যাগের উপদেশ দেন নাই। তিনি ফল ও আসক্তি ত্যাগপূর্ব্বক কামসঙ্কল্প ত্যাগপূর্ব্বক রাগ-দ্বেষ-হীন হইয়া, প্রকৃত সন্ন্যাসী ও যোগী হইয়া কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান-পূর্ব্বক শ্রেয়োমার্গে অগ্রসর হইবার উপদেশ দিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার তাঁহার গীতা-পরিচয়ে গীতার লক্ষ্য সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—"জগতের অভ্যুদয় ও জীবের নিঃশ্রেয়স,—ইহাই গীতার লক্ষ্য। * * * জীব একদিকে জগৎচক্র অভ্যুদয়ের দিকে বা আনন্দপথে পরিচালিত করিবে, সঙ্গে সঙ্গে আপনিও নিঃশ্রেয়স অর্থাৎ পরমানন্দে স্থিতিলাভ করিবে। ইহাই গীতার লক্ষ্য।

"অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স এককালে আচরণ করিবার জন্য গীতা উপদেশ করিতেছেন। নিষ্কাম কর্ম্মই গীতার সাধনমার্গের বিশেষত্ব। * * * নিষ্কাম কর্ম্মের কর্ম্মভাগ জগতের অভ্যুদয় জন্য এবং নিষ্কাম ভাব জীবের নিঃশ্রেয়স জন্য। বিনা কর্ম্মে জগতের উন্নতি অসম্ভব, বিনা কামনার ত্যাগে জীবের পরমানন্দে স্থিতি সুদূর-পরাহত।

"জগৎচক্র পরিচালনের জন্য কর্ম্ম করিতে হইবে। গীতা বলিতেছেন,—

'এবং প্রবর্ত্তিতং চক্রং নানুবর্ত্তয়তীহ যঃ।
অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি॥'

প্রকৃত জীবন্মুক্ত ভিন্ন যথার্থ জগৎ রক্ষা করিতে কেহই সমর্থ নহে। * * * আদিতেও কর্ম্ম—সে কেবল চিত্তশুদ্ধির জন্য। জীবন্মুক্তের পরেও কর্ম্ম—সে কেবল লোকশিক্ষার্থ। ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া কর্ম্ম করা আর জীবন্মুক্তের কর্ম্ম করা একই কথা। কাজেই আত্মরক্ষা

কার্য্যে (নিজের মুক্তি জন্য) সাধনকার্য্যে যাহারা নিযুক্ত—তাহাদের সাধনাবস্থার মধ্যভাগে কর্ম্ম না থাকিলেও, প্রবৃত্ত অবস্থার ও সিদ্ধাবস্থার পরে কর্ম্ম আছে। এই কর্ম্ম দ্বারাই যথার্থরূপে জগৎ রক্ষা হয়।"

যাহা হউক, গীতায় যে কর্ম্মযোগের বিশেষত্ব নানাভাবে উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা বলিতে পারা যায়। গীতায় এই কর্ম্মযোগ বিশেষভাবে উপদেশ দিবার প্রয়োজনও ছিল। যখন ভগবান্ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তখন, "সর্ব্বকর্ম্ম ত্যাগপূর্ব্বক নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিতেই মুক্তি হয়"—এই মতের অনেকে অনুবর্ত্তী ছিলেন। বহুকাল হইতে ভারতে "অবিশ্রান্ত বৈরাগ্য" প্রবাহ চলিয়া আসিতেছিল। এই বৈরাগ্য বুদ্ধদেব আমাদের দেশে প্রথম প্রবর্ত্তিত করেন নাই। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাহাতে বাধা দিয়া কর্ম্মযোগ বা এই জগতের অভ্যুদয় ও জীবের নিঃশ্রেয়সসিদ্ধির উপায়—নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠানরূপ প্রবৃত্তিধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্যই অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ইহা এক অর্থে নিবৃত্তিধর্ম্মেরই অন্তর্গত। ভগবান্ কর্ম্মযোগ সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

> "ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্।
> বিবস্বান্ মনবে প্রাহ মনুরিক্ষ্বাকবেঽব্রবীৎ॥
> এবং পরম্পরাপ্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ।
> স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরন্তপ॥
> স এবায়ং ময়া তেঽদ্য যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ।"

(গীতা, ৪।১-৩)

ভগবান্ গীতার শেষেও বলিয়াছেন,—

> "এতান্যপি তু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানি চ।
> কর্ত্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুত্তমম্॥
> নিয়তস্য তু সন্ন্যাসঃ কর্ম্মণো নোপপদ্যতে॥"

(গীতা, ১৮।৬-৭)

যে কর্ত্তব্য কর্ম্মে সন্ন্যাসী, কর্ত্তব্য কর্ম্ম ত্যাগী, সে তামসিক মোহ হেতু তাহা ত্যাগ করে, অথবা রাজসিক দুঃখ বোধে তাহা ত্যাগ করে। যাহার প্রকৃতি শুদ্ধ সাত্ত্বিক, সে কর্ত্তব্য কর্ম্ম ত্যাগ করে না, সে ফলাসক্তি ত্যাগপূর্ব্বক 'কার্য্য' বা কর্ত্তব্য বুদ্ধিতে নিয়ত কর্ম্ম করিয়াও প্রকৃত-সন্ন্যাসী থাকে। (গীতা, ১৮। ৭-৯)।

এইরূপে গীতায় 'কর্ম্মসন্ন্যাস অপেক্ষা যে কর্ম্মযোগ বিশিষ্ট ও নিঃশ্রেয়সকর' (গীতা, ৫।২) ইহা উপদিষ্ট হইয়াছে। সুতরাং কর্ম্মযোগ গৌণভাবে নিঃশ্রেয়সকর, আর কর্ম্মসন্ন্যাস যে মুখ্যভাবে নিঃশ্রেয়সকর, তাহা বলিতে পারা যায় না। কর্ম্মযোগনিষ্ঠা অবলম্বন করিলে যে তাহা হইতেই সর্ব্বত্র আত্মদর্শন ও ঈশ্বরদর্শনরূপ জ্ঞানসিদ্ধি হয়, ঈশ্বরে পরা ভক্তি লাভ হয় ও অক্ষর ব্রহ্মে বা ঈশ্বরে যোগসংসিদ্ধি হয়, তাহা গীতায় উপদিষ্ট হইয়াছে।

কর্ম্ম ভক্তি ও জ্ঞানযোগের সমুচ্চয়বাদ।—সে যাহা হউক, জ্ঞানবাদিগণের জ্ঞানযোগের মুখ্যত্ব, ভক্তিবাদিগণের ভক্তিযোগের মুখ্যত্ব, অথবা কর্ম্মপক্ষপাতিগণের কর্ম্মযোগের মুখ্যত্ব লইয়া বিবাদ নিরর্থক। ইহারা একদেশদর্শী। জ্ঞান কর্ম্ম ও ভক্তির ক্রম-বাদ ও সমুচ্চয়-বাদ সমন্বয় দ্বারা এই বিরোধের মীমাংসা হয়—এই সকল বিভিন্ন মতের সামঞ্জস্য হইতে পারে।

আধুনিক ব্যাখ্যাকারগণের মধ্যে পণ্ডিত গৌরগোবিন্দ উপাধ্যায়, তাঁহার উপাদেয় সমন্বয় ভাষ্যে, এই সমুচ্চয়বাদ প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।* এস্থলে, তাহার বিস্তারিত উল্লেখের প্রয়োজন নাই। তিনি প্রতি অধ্যায়ের অনেক শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া, এই সমন্বয়বাদ প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—"আচার্য্য

* গৌরগোবিন্দ উপাধ্যায়-কৃত গীতা-সমন্বয় ভাষ্যের তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকের অন্তর্গত ভাষ্য প্রধানতঃ দ্রষ্টব্য।

(শ্রীকৃষ্ণ) সর্ব্বত্র কর্ম্ম জ্ঞান ও ভক্তিযোগের একতা সম্পাদন করিয়াছেন; কর্ম্ম বিনা অপর যোগদ্বয় মুহূর্ত্তও তিষ্ঠিতে পারে না, বা উদ্ভূত হয় না, ইহা দেখাইবার জন্য এরূপ বলিয়াছেন, ইহাই যথার্থ তত্ত্ব” তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন,—“কর্ম্মযোগ জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ, এ তিনের একটিও উপেয় (প্রাপ্তির বিষয়) নহে, সকলগুলি উপায়। ভাগবতে (১১।২০।৬ শ্লোকে) আচার্য্য উদ্ধবকে বলিয়াছেন,—“মনুষ্যগণের শ্রেয় হয়, এই উদ্দেশে আমি তিনটি যোগ বলিয়াছি,—জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তি; এ তিন ব্যতীত আর কোন উপায় নাই।”

উপাধ্যায় মহাশয় আরও বলিয়াছেন,—“উপেয় সেই পরব্রহ্ম—যাঁহার নির্দ্দিষ্ট পথ অতিক্রম করিয়া কেহ তাঁহাকে পাইতে পারে না। এ নির্দ্দিষ্ট পথ কি? তৎপ্রদত্ত স্বভাব। সুতরাং জীবের স্বভাবানুযায়ী তৎপ্রাপ্তির উপায়ও তিনটি। ঈশ্বরে যেমন ‘স্বাভাবিক জ্ঞান ও বলের ক্রিয়া আছে’ (শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ ৬।৮) জীবেও সেইরূপ আছে; এবং সেইজন্যই জ্ঞানযোগ ও কর্ম্মযোগ তাহাতে নিয়তই থাকিবে। পরব্রহ্ম রসস্বরূপ, এজন্য ভক্তিও জীবেতে স্বাভাবিক।” উপাধ্যায় মহাশয় এই রূপে কর্ম্ম ভক্তি ও জ্ঞানের সমন্বয়বাদের মূল সূত্র দিয়াছেন। কিন্তু ইহা যথেষ্ট ও সম্যক্ পরিস্ফুট নহে। আমরা ইহা পরে বুঝিতে চেষ্টা করিব।

বঙ্কিম বাবু অন্যভাবে, এই সমুচ্চয়বাদ বুঝাইয়াছেন। তিনি কর্ম্ম জ্ঞান ও ভক্তির যে সমন্বয় করিয়াছেন, তাহা এক্ষণে উল্লেখ করা কর্ত্তব্য। দুঃখের বিষয়—আমাদের দুর্ভাগ্য যে, বঙ্কিম বাবু তাঁহার অপূর্ব্ব গীতাব্যাখ্যা সম্পূর্ণ করিতে পারেন নাই। তিনি গীতার চতুর্থ অধ্যায়ের উনবিংশ শ্লোক পর্য্যন্ত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাহার মধ্যে কোন তত্ত্বই পরিস্ফুট হয় নাই। কিন্তু তাঁহার ধর্ম্মতত্ত্বে গীতা হইতে যে ‘অনুশীলন ধর্ম্ম’ ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহা হইতে এই সমন্বয়ের এক মূলসূত্র পাওয়া যায়। জীব

স্থূলশরীরযুক্ত, অন্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয়যুক্ত। এই স্থূল শরীরের স্ফূর্ত্তি ও পরিণতিতে, ও সর্ব্বচিত্তবৃত্তির সম্যক্ স্ফূর্ত্তি ও পরিণতিতেই জীবত্বের বিকাশ ও পরিণতি হয়। চিত্তবৃত্তির মধ্যে জ্ঞানবৃত্তি ইচ্ছাবৃত্তি বা কর্ম্ম-বৃত্তি ও চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি প্রধান। এই সকল বিভিন্ন বৃত্তির অনুশীলন দ্বারা সম্যক্ স্ফূর্ত্তি ও পরিণতিতে আমাদের মনুষ্যত্বের বিকাশ হয়। ইহাদের পূর্ণ স্ফূর্ত্তি ও পরিণতিতে আমাদের পূর্ণ মনুষ্যত্বের বিকাশ হয়। ইহাই এক অর্থে নিঃশ্রেয়স। বঙ্কিম বাবুর মতে এই অনুশীলনধর্ম্মই গীতায় উপদিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু এ সিদ্ধান্ত সর্ব্বথা সঙ্গত নহে। তিনি ক্ষেত্রের দিক্ হইতেই জীবকে দেখিয়াছেন ; ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মার দিক্ হইতে তাহাকে দেখিতে চেষ্টা করেন নাই। সর্ব্ববৃত্তিনিরোধ দ্বারা যে আত্মা নিজ স্বরূপে অবস্থান করিতে পারেন, তাহা তিনি লক্ষ্য করেন নাই। প্রবৃত্তিধর্ম্ম ব্যতীত যে নিবৃত্তিধর্ম্ম আছে, চিত্তবৃত্তির অধঃস্রোত নিরুদ্ধ করিয়া যে উর্দ্ধস্রোতপ্রবাহ উদ্ঘাটনপূর্ব্বক চিত্তের একাগ্রতা—এক-তানতা সম্পাদন করা যায়—তাহা বঙ্কিম বাবু দেখান নাই। আত্মার সচ্চিদানন্দস্বরূপ লাভ দ্বারা জীবের অক্ষরব্রহ্মস্বরূপ বা ঈশ্বরস্বরূপ-প্রাপ্তিরূপ নিঃশ্রেয়সসিদ্ধি কাহাকে বলে, তাহা বঙ্কিম বাবু বুঝান নাই। এজন্য বঙ্কিম বাবুর উপদিষ্ট অনুশীলনধর্ম্ম লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়াছে। গীতোক্ত কর্ম্মযোগ ভক্তিযোগ ও জ্ঞানযোগের উপযুক্ত সমুচ্চয় হয় নাই, এ সম্বন্ধে বিভিন্নবাদের সমন্বয়ও হয় নাই।

কর্ম্ম ভক্তি ও জ্ঞানের ক্রমবাদ।—যাহা হউক, এই সমুচ্চয়বাদ ব্যতীত কর্ম্ম ভক্তি ও জ্ঞানযোগের ক্রম বা পারম্পর্য্যবাদও কেহ কেহ স্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। শঙ্করাচার্য্য কর্ম্ম ও জ্ঞান সম্বন্ধে সমুচ্চয়বাদ নিরাশ করিয়া পারম্পর্য্যবাদের ইঙ্গিত করিয়াছেন। শ্রেয়ঃ-প্রার্থী সাধক প্রথমে বা নিম্নাধিকার অবস্থায় কর্ম্মযোগী হইবেন,—যোগে আরোহণাভিলাষী হইয়া কর্ম্মযোগ অনুষ্ঠান করিবেন, আর যোগারূঢ়

উচ্চাধিকারী হইলে—"শম" বা নৈষ্কর্ম্ম্য অবলম্বন করিয়া জ্ঞানযোগী হইবেন।

মধুসূদন অষ্টাদশাধ্যায়ী গীতাকে তিন কাণ্ডে বিভক্ত করিয়াছেন। প্রতি কাণ্ডে ছয় অধ্যায় আছে। এজন্য প্রত্যেক কাণ্ডকে ষট্ক বলা হইয়াছে। প্রথম কাণ্ডকে প্রথম ষটক, দ্বিতীয় কাণ্ডকে দ্বিতীয় ষট্ক ও তৃতীয় কাণ্ডকে তৃতীয় ষট্ক বলা হইয়াছে। মধুসূদন বলিয়াছেন,—

"কর্ম্মোপাস্তিস্তথা জ্ঞানমিতি কাণ্ডত্রয়ং ক্রমাৎ।
তদ্রূপাষ্টাদশাধ্যায়ী গীতা কাণ্ডত্রয়াত্মিকা॥
এবমেকেন ষট্কেন কাণ্ডমত্রোপলক্ষয়েৎ।
কর্ম্মনিষ্ঠা জ্ঞাননিষ্ঠা কথ্যতে পথমান্ত্যয়োঃ।
যতঃ সমুচ্চয়ো নাস্তি তয়োরতিবিরোধতঃ।
ভগবদ্ভক্তিনিষ্ঠাতু মধ্যমে পরিকীর্ত্তিতা॥

*   *   *   *

তত্রতু প্রথমে কাণ্ডে কর্ম্ম তত্ত্যাগবর্ত্মনা।
ত্বংপদার্থবিশুদ্ধাত্মা সোপপত্তিনিরূপ্যতে॥
দ্বিতীয়ে ভগবদ্ভক্তিনিষ্ঠাবর্ণনবর্ত্মনা।
ভগবৎপরমানন্দস্তৎপদার্থোঽবধার্য্যতে॥
তৃতীয়ে তু তয়োরৈক্যং বাক্যার্থো বর্ণ্যতে স্ফুটম্।
এবমপ্যত্র কাণ্ডানাং সম্বন্ধোঽস্তি পরস্পরম্॥"

ইহা পূর্ব্বে উদ্ধৃত হইয়াছে। মধুসূদনের মতে প্রথম ষট্কে কর্ম্ম ও কর্ম্মত্যাগমার্গে 'ত্বং'পদার্থ বা জীবের স্বরূপ নিরূপিত হইয়াছে। দ্বিতীয় ষট্কে ভক্তিযোগনিষ্ঠা মার্গে 'তৎ' বা পরমেশ্বরের স্বরূপ অবধারিত হইয়াছে, আর তৃতীয় ষট্কে জ্ঞানযোগমার্গে 'ত্বং' ও 'তৎ' পদার্থের ঐক্য সমাধান হইয়াছে। অর্থাৎ নিষ্কাম কর্ম্মযোগ ও তদনন্তর কর্ম্মসন্ন্যাসরূপ উপায়ে আত্মতত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়, তদন্তর ভক্তিযোগে পরমেশ্বরতত্ত্বজ্ঞান সিদ্ধি হয়, শেষে জ্ঞানযোগে জীবাত্মা ও ব্রহ্মের বা পর-

মেশ্বরস্বরূপের ঐক্য সংস্থাপিত হয়,—"তত্ত্বমসি" তত্ত্ব বিজ্ঞাত হয়, ফলে মোক্ষলাভ হয়। গীতার ইহাই সাধনাক্রম।

বলদেবও এইরূপে গীতাকে তিন কাণ্ডে বা তিন ষট্‌কে বিভক্ত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—

"ষট্‌ত্রিকেঽস্মিন্ শাস্ত্রে প্রথমেন ষট্‌কেন ঈশ্বরস্য অংশস্য জীবস্য অংশীশ্বরভক্ত্যুপযোগি-স্বরূপ-দর্শনম্। মধ্যেন পরমপ্রাপ্যাংশীশ্বরস্য প্রাপণীভক্তিঃ স্বমহিমধীপূর্ব্বিকা অভিধীয়তে। অন্ত্যেন তু পূর্ব্বোদিতা-নাম্ ঈশ্বরাদীনাম্ স্বরূপাণি পরিশোধ্যন্তে। ত্রয়াণাং ষট্‌কানাং কর্ম্মভক্তিজ্ঞানপূর্ব্বতাব্যপদেশস্তু তত্তৎ প্রাধান্যেনৈব। চরমে ভক্তেঃ প্রতিপত্তেশ্চ উক্তিঃ।"

এইরূপে কর্ম্ম (ও কর্ম্মসন্ন্যাস) ভক্তি ও জ্ঞান—সাধনার এই ক্রম অঙ্গীকৃত হইয়াছে। শ্রেয়োমার্গে প্রবেশ লাভ করিয়া ক্রমে ক্রমে এই কর্ম্ম ভক্তি ও জ্ঞান-রূপ দ্বার অতিক্রম করিয়া শেষে পরমলক্ষ্য পরমপদ প্রাপ্তি হয় বা নিঃশ্রেয়সসিদ্ধি হয়,—জ্ঞানী ব্রহ্মৈক্যস্বরূপে অবস্থান করেন, অথবা ভক্ত পরম ভক্তি লাভ করিয়া ঈশ্বরে নিবাস করেন,—ইহাই উক্ত ব্যাখ্যাকারগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এইরূপে সাধনার ক্রম স্বীকৃত হইয়াছে।

কেহ কেহ বলেন যে গীতার প্রতি অধ্যায় সাধনার এক একটি সোপান। শ্রেয়োমার্গে সাধনার অষ্টাদশটি সোপান গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। গীতার প্রথম অধ্যায়—বিষাদ যোগ। বিষাদ-হেতু যে বৈরাগ্য—সংসারে বিরক্তি ও শ্রেয়ঃ প্রাপ্তির জন্য ব্যাকুলতা হয়, তাহাতেই শ্রেয়োমার্গের দ্বার উদ্ঘাটিত হয়, শ্রেয়ঃ পথে প্রবেশ হয়। যোগবাশিষ্ঠ গ্রন্থের আরম্ভে বৈরাগ্যপ্রকরণে ইহার বিস্তারিত বিবরণ আছে। শ্রীশ্রীচণ্ডীতেও সুরথ ও সমাধির তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা এই বিষাদ-যোগেই আরম্ভ হইয়াছে। এইজন্য অর্জ্জুন-বিষাদ যোগ

গীতার প্রথম অধ্যায়। আত্মতত্ত্ব-জ্ঞানে এই বিষাদের নিবৃত্তি হয়। এইজন্য গীতায় প্রথম সাংখ্য-জ্ঞান বা আত্ম-জ্ঞান উপদিষ্ট হইয়াছে। সাংখ্যযোগ গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়। এই আত্মতত্ত্ব জ্ঞান লাভের জন্য প্রথম সাধন যে কর্ম্মযোগ তাহা দ্বিতীয় অধ্যায়ে ইঙ্গিত পূর্ব্বক তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। আত্মতত্ত্ব-জ্ঞানলাভের জন্য শেষ সাধন, কর্ম্মসন্ন্যাসযোগ ও ধ্যানযোগ, ইহা পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। অতএব প্রথম ষট্‌কে আত্মতত্ত্ব জ্ঞান ও সেই জ্ঞান-লাভের জন্য সাধনার ক্রম উপদিষ্ট হইয়াছে। এইরূপ গীতায় দ্বিতীয় ষট্‌কের প্রথমে সপ্তম অধ্যায়—বিজ্ঞানযোগ। ইহাতে যে ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, তাহার পরিসমাপ্তি দশম অধ্যায়ে বিভূতিযোগে ও একাদশ অধ্যায়ে বিশ্বরূপদর্শন যোগ। এইরূপে ক্রমে ঈশ্বর-তত্ত্ব-জ্ঞানলাভ করিয়া তাঁহার সহিত যোগযুক্ত হইবার উপদেশ দেওয়া হই-য়াছে। মধ্যে অষ্টম অধ্যায়ে অক্ষর ব্রহ্মযোগ—নবম অধ্যায়ে রাজবিদ্যা ও রাজগুহ্য যোগ যে উক্ত হইয়াছে, দ্বাদশে ভক্তিযোগে তাহার পরিসমাপ্তি হইয়াছে। পরিশেষে তৃতীয় ষট্‌কে, মোক্ষসাধনভূত তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শন জন্য জীব আপনার স্বরূপ জানিয়া ব্রহ্মরূপতা লাভ করিবার জন্য, ত্রয়োদশ অধ্যায়ে প্রকৃতি-পুরুষ বা ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-বিভাগ-যোগ ও তৎসহিত জ্ঞান ও জ্ঞেয় ব্রহ্মতত্ত্ব নিরূপিত হইয়াছে। চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে গুণত্রয়বিভাগযোগ ও পঞ্চদশ অধ্যায়ে পুরুষোত্তমযোগ, ষোড়শ অধ্যায়ে দৈবাসুর-সম্পদ্-বিভাগ-যোগ, সপ্তদশ অধ্যায়ে ও অষ্টাদশ অধ্যায়ের প্রথমে ত্রিগুণানুসারে শ্রদ্ধাদি-বিভাগ-যোগ এবং শেষে মোক্ষযোগ উপদিষ্ট হইয়াছে। এইরূপে অষ্টাদশ অধ্যায়ে মোক্ষলাভের উপায়ভূত সাধনার এক একটি সোপান উপদিষ্ট হইয়াছে।

গীতোক্ত সাধনমার্গ।—গীতার শেষে গীতার সংগ্রহার্থ এই সাধনার তত্ত্ব সংক্ষেপে উক্ত হইয়াছে। তাহা এস্থলে উল্লেখ করিতে

হইবে। এই সাধনমার্গের প্রথম সোপান—স্বধর্ম্মাচরণ। স্বধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা সিদ্ধি লাভ হইতে পারে। ভগবান্ বলিয়াছেন,—

"স্বে স্বে কর্ম্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ।" (গীতা ১৮।৪৫)

কিরূপে এই সংসিদ্ধি লাভ হয়, সে সম্বন্ধে ভগবান্ বলিয়াছেন,—

"যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ॥" (গীতা, ১৮।৪৬)

এই স্বধর্ম্ম যখন অসক্ত বুদ্ধিতে জিতাত্মা ও বিগতস্পৃহ হইয়া অনুষ্ঠিত হয়, তখন সন্ন্যাসসিদ্ধি হয়, এবং নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি লাভ হয়। তখন 'কর্ম্মে অকর্ম্ম দর্শন ও অকর্ম্মে কর্ম্ম দর্শন' হয়।

"অসক্তবুদ্ধিঃ সর্ব্বত্র জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ।
নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিং পরমাং সন্ন্যাসেনাধিগচ্ছতি॥" (গীতা, ১৮।৪৯)

এই নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিতে জ্ঞানের পরা নিষ্ঠা যে ব্রহ্মভাব, তাহা লাভ হয়।—

"সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথা ব্রহ্ম তথাপ্নোতি নিবোধ মে।
সমাসেনৈব কৌন্তেয় নিষ্ঠা জ্ঞানস্য যা পরা॥" (গীতা, ১৮।৫০)

বিশুদ্ধ বুদ্ধিতে 'ধ্যানযোগপর' হইলে, শান্ত ব্রহ্মভাব লাভ হয়, সর্ব্বভূতে 'সমত্ব' জ্ঞান হয়, ও পরমেশ্বরে পরা ভক্তি লাভ হয়।—

"ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্॥" (গীতা, ১৮।৫৪)

এই পরা ভক্তি দ্বারা তত্ত্বতঃ পরমেশ্বরস্বরূপজ্ঞান লাভ হেতু পরমেশ্বরে প্রবেশ সিদ্ধি হয়।—

"ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্॥"
(গীতা ১৮।৫৫)।

এইরূপে যেমন কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠান করিতে করিতে নৈষ্কর্ম্ম্য বা জ্ঞান-যোগ, তৎপরে ধ্যানযোগ, তৎপরে পরাভক্তিযোগ, তৎপরে সমগ্র ঈশ্বর-

তত্ত্বজ্ঞান হেতু ঈশ্বরে প্রবেশ লাভ সিদ্ধি হয়,—সেইরূপ ঈশ্বরকে আশ্রয়পূর্ব্বক সদা কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠান করিলেও ঈশ্বরপ্রসাদে শাশ্বত পরম অব্যয় পদ লাভ হয়।

"সর্ব্বকর্ম্মাণ্যপি সদা কুর্ব্বাণো মদ্‌ব্যপাশ্রয়ঃ।
মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্॥"

(গীতা, ১৮।৫৬)।

যথন ঈশ্বরই সর্ব্বভূতের হৃদ্দেশে অধিষ্ঠানপূর্ব্বক সকলকে প্রবর্ত্তিত করেন, তথন সর্ব্বভাবে তাঁহারই শরণ লইয়া স্বকর্ম্ম দ্বারা তাঁহারই অর্চ্চনা করিলে, তাঁহারই প্রসাদে পরা শান্তি—শাশ্বত পরম পদ লাভ হইতে পারে। ইহাই নিঃশ্রেয়সসিদ্ধির সুগম উপায়। ভগবান্, বলিয়াছেন,—ইহাই "গুহ্যাৎ গুহ্যতর জ্ঞান"। গীতায় নিঃশ্রেয়সসিদ্ধির যে সাধন—যে পন্থা উক্ত হইয়াছে, তাহা এক হইলেও, দুই ভাবে আমরা তাহা দেখিতে পারি। এক,—'কূটস্থ অক্ষর' ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তির পন্থা, আর এক—পরমাত্মা পরমেশ্বরভাবপ্রাপ্তির পন্থা। প্রথম পথ কঠোর-সাধনা-সাধ্য, দ্বিতীয় পথ অপেক্ষাকৃত সুগম। প্রথম পথে আত্মযোগীর প্রথম নিষ্কামভাবে কর্ম্মযোগ অনুষ্ঠান দ্বারা চিত্তকে নির্ম্মল করিয়া, পরে জ্ঞানযজ্ঞ সাধনা দ্বারা জ্ঞান লাভ করিতে হইবে ও ধ্যানযোগ দ্বারা সেই জ্ঞান অপরোক্ষভাবে লাভ করিয়া ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইতে হইবে। তবে অক্ষর কূটস্থ ব্রহ্মে নির্ব্বাণ লাভ হইবে। শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি সন্ন্যাসিগণ এই পথের পথিক, কিন্তু এ ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তি বা ব্রহ্মনির্ব্বাণই শেষ নহে। এ পথের শেষে আসিয়া যথন ব্রহ্মভাব লাভ হয়, যথন অধ্যাত্মযোগে সর্ব্বভূতে সমভাবে স্থিত কূটস্থ অক্ষর পরব্রহ্মের উপলব্ধি হয়, সেইরূপ সর্ব্বাত্মা সর্ব্বনিয়ন্তা পুরুষোত্তম' পরমেশ্বর—পর-ব্রহ্মের এ সগুণ ভাবও উপলব্ধ হয়,—ফলে পরমেশ্বরে পরাভক্তি লাভ হয়। তথন ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়—ও ঈশ্বরে প্রবেশ-সিদ্ধি হয়, তাঁহার পরম ধাম—

পরম পদ লাভ হয়। কিন্তু প্রথম পথের এই পরিসমাপ্তি অতি 'দুঃখে' লাভ হয়। দ্বিতীয় পথ ঈশ্বর-যোগীর। তাহা ঈশ্বরপ্রসাদে সহজ-লভ্য। সে দ্বিতীয় পথে প্রথম হইতেই ঈশ্বরকে সর্ব্বভাবে আশ্রয়পূর্ব্বক তাঁহার অর্চ্চনার্থ স্বধর্ম্মানুষ্ঠান বিহিত, তাহাতে পূর্ব্বোক্ত পথ সংক্ষিপ্ত হয়। এই পথের উপদেশেই গীতার পরিসমাপ্তি। ইহাই গীতার বিশেষত্ব। ইহাতে কর্ম্ম ভক্তি ও জ্ঞানের সমুচ্চয় হইয়াছে। ইহাতে প্রথম হইতেই ঈশ্বরের আশ্রয় গ্রহণের দ্বারা কর্ম্ম ভক্তি ও জ্ঞান সমুচ্চয়ভাবে সাধনার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। এইজন্য প্রতি ষট্‌কেই কর্ম্ম ভক্তি ও জ্ঞানের উল্লেখ আছে, প্রতি ষট্‌কে একের সাধনায় অন্য দুইটির সাধনার ফল-প্রাপ্তি হয়,—উক্ত হইয়াছে। প্রথম ষট্‌কে কর্ম্মের বিশেষ বিবরণ, দ্বিতীয় ষট্‌কে ভক্তির বিশেষ বিবরণ ও তৃতীয় ষট্‌কে জ্ঞানের বিশেষ বিবরণ থাকিলেও, প্রথম ষট্‌কে কর্ম্ম-মূল ভক্তি ও জ্ঞান, দ্বিতীয় ষট্‌কে ভক্তিমূল কর্ম্ম ও জ্ঞান, এবং তৃতীয় ষট্‌কে জ্ঞান-মূল কর্ম্ম ও ভক্তি বিবৃত হইয়াছে। ইহাতে যেমন "অধ্যায়ে অধ্যায়ে ক্রম, কাণ্ডে কাণ্ডে ক্রম, শ্লোকে শ্লোকে ক্রম" আছে—ইহাতে যেমন সাধনপথের আরম্ভ অবধি শেষপর্য্যন্ত যাইবার ক্রমিক পথ-চিহ্ন দেখাইয়া দেওয়া হইয়াছে, সেইরূপ শেষে কর্ম্ম, ভক্তি ও জ্ঞান—এই ত্রিবিধ সাধনা সমুচ্চয়ভাবে অবলম্বন করিয়া, সেই শ্রেয়ঃ-পথে যাইবার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। অতএব গীতায় নিঃশ্রেয়সসিদ্ধির উপায় কর্ম্মযোগ, ভক্তিযোগ ও জ্ঞানযোগের ক্রম ও সমুচ্চয়, তাহাদের বিশেষত্ব ও একত্ব উভয়ই উক্ত হইয়াছে। কেবল জ্ঞানযোগে নৈষ্কর্ম্ম্য-সিদ্ধিতে প্রকৃত নিঃশ্রেয়সসিদ্ধি হয় না, কেবল ভক্তিযোগেও নিঃশ্রেয়সসিদ্ধি হয় না, কেবল নিষ্কাম কর্ম্মযোগেও নিঃশ্রেয়সসিদ্ধি হয় না। জ্ঞানযোগ অবলম্বন করিলেও—জ্ঞানসহ, ভক্তি ও কর্ম্ম—সর্ব্বভূতহিতার্থ কর্ম্ম সমুচ্চয়-পূর্ব্বক সাধনা দ্বারা সম্যক্ সিদ্ধ হইলে, তবে নিঃশ্রেয়স-প্রাপ্তি হয়। ভক্তিযোগ অবলম্বন করিলেও কর্ম্ম ও জ্ঞানের মধ্য দিয়া সিদ্ধিলাভ

করিতে হয়। কর্ম্মযোগ অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেও জ্ঞান ও ভক্তির মধ্য দিয়া গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতে হয়। যাঁহার যেরূপ প্রবৃত্তি, তিনি তদনুসারে কর্ম্মযোগ বা ভক্তিযোগ বা জ্ঞানযোগ আরম্ভ করিতে পারেন। কিন্তু পরিশেষে সর্ব্বপথ একীভূত হয়, এ তিনেরই সমুচ্চয় সাধিত হয়। কর্ম্ম জ্ঞানে পরিসমাপ্ত হয়। জ্ঞান পরা ভক্তিতে পরিণত হয়, পরা ভক্তির দ্বারা যোগযুক্ত হইলে বিজ্ঞান লাভ হয়, তবে মুক্তি হয়। সর্ব্বত্র এইরূপ। অতএব গীতোক্ত সাধনক্রমের সমন্বয় করিয়া—সমুচ্চয় করিয়া, এই নিঃশ্রেয়সসিদ্ধির উপায় বুঝিতে হইবে।

গীতোক্ত কর্ম্মযোগমার্গ।—এস্থলে যাহা উক্ত হইল, তাহা হইতে আরও জানা যাইবে যে, গীতায় ঈশ্বরযোগীর কর্ম্মযোগমার্গই নিঃশ্রেয়স সিদ্ধির বিশিষ্ট উপায়রূপে নির্দ্ধারিত হইয়াছে। এই কর্ম্মমার্গে কর্ম্ম জ্ঞান ও ভক্তির সমুচ্চয় হয়, ও নিঃশ্রেয়সসিদ্ধি হয়। কর্ম্মযোগের বিশেষত্ব পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। ভগবান্ যে বলিয়াছেন,—

"তয়োস্তু কর্ম্মসন্ন্যাসাৎ কর্ম্মযোগো বিশিষ্যতে।" (গীতা, ৫।২)

তাহার কারণ, এই পথে সিদ্ধি অপেক্ষাকৃত অল্পায়াসসাধ্য ও অল্পকালে লভ্য। কেননা, এই সাধনায় সত্বর কর্ম্মবন্ধনও ঘুচিয়া যায় (গীতা, ৫।৬-৭)। আমরা দেখিয়াছি যে, ঈশ্বরযোগী ঈশ্বরকে আশ্রয়পূর্ব্বক কর্ম্মযোগনিষ্ঠা অবলম্বন করিলে, তবে ঈশ্বরপ্রসাদে সহজে ও ত্বরায় সিদ্ধি লাভ করে,—'শাশ্বত অব্যয় পরম পদ' প্রাপ্ত হয়। ঈশ্বরভক্ত এইরূপে কর্ম্মযোগনিষ্ঠা অবলম্বন করিলে, ঈশ্বরার্থ বা 'ঈশ্বরে অর্পণ'-বুদ্ধিতে কর্ম্মযোগ অনুষ্ঠান করিলে যে অল্পায়াসে অচিরে সিদ্ধিলাভ হয়, তাহার প্রধান কারণ 'ভগবানের কৃপা'। যিনি হৃদয়স্থ ঈশ্বরের 'বাণী' অনুসরণ করিয়া ঈশ্বর-নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মপথ অবলম্বন করেন, ঈশ্বর-প্রসাদে তাঁহার, অচিরে সিদ্ধিলাভ হয়। বলিয়াছি ত, ইহাই গীতার 'গুহ্যাৎ গুহ্যতর' উপদেশ। শ্রীভগবানের কৃপাতেই এই পথ সুগম

হয়। অর্জ্জুনও ইহা বুঝিয়া গীতা শেষে বলিয়াছেন—"করিষ্যে বচনং তব।"

ভগবানের বাণী অনুসরণ করিয়া যে ঈশ্বরার্থ কর্ম্ম করে, তাহার সম্বন্ধে এই ঈশ্বরের প্রসন্নতা-লাভ—ঈশ্বরের কৃপালাভ, গীতায় যেরূপ স্পষ্টভাবে উপদিষ্ট হইয়াছে, আর কোথাও সেরূপ পাওয়া যায় না। শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার গীতা-পরিচয়ে বলিয়াছেন,—

"কিন্তু শ্রীভগবানের আশ্বাস-বাণী অন্যান্য শাস্ত্রে প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ থাকিলেও, আর কোন্ শাস্ত্রে এত আশ্বাস-বাণীর প্রাধান্য এত অধিক?"

ভগবান্ তাঁহার আশ্রিত—তাঁহার ভক্ত—তাঁহার বাণী অনুসরণে কর্ত্তব্য-কর্ম্মকারী মানবকে আশ্বাস দিয়াছেন, বলিয়াছেন,—

'অহং তেষাং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যু-সংসার-সাগরাৎ।'

তাহাদের যে মুক্তিপ্রদ জ্ঞানলাভ হইবে, তাহাও ভগবান্ বলিয়াছেন,—

'তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা॥'

ভগবানের অনুগ্রহে যে ত্রিগুণাতীত হওয়া যায়, তাহাও ভগবান্ বলিয়াছেন (গীতা, ১৪।২৬)। ভগবান্ পরিশেষে অর্জ্জুনকে নিষ্কাম-ভাবে কর্ম্মযোগ অনুষ্ঠান করিবার উপদেশ দিয়া বলিয়াছেন,—

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥"

এইরূপে ভগবান্ ঈশ্বরযোগীকে নিঃশ্রেয়সসিদ্ধির জন্য ভগবান্‌কে আশ্রয় পূর্ব্বক কর্ম্মযোগ অনুষ্ঠান করিবার উপদেশ দিয়াছেন, এবং ভগবানের প্রসাদে সেই কর্ম্মযোগমার্গেই মোক্ষসাধক জ্ঞান ও পরাভক্তি যে অচিরে লাভ হইবে, তাহা বিশেষ ভাবে উপদেশ দিয়াছেন। ভগবান্ বলিয়াছেন,— অতি দুরাচারী, অজ্ঞান ও এই ভক্তিসহকৃত কর্ম্মপথ অনুসরণ করিয়া ভগবানের কৃপা লাভ করিতে পারিবে। যাহা হউক, এই সাধনায় যে

কর্ম্ম ভক্তি ও জ্ঞানের সমুচ্চয় হয়, তাহাও আমরা দেখিয়াছি। এস্থলে এ সম্বন্ধে আর কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই।

অতএব নিঃশ্রেয়সসিদ্ধির উপায় যে কর্ম্ম ভক্তি ও জ্ঞানযোগ গীতায় উক্ত হইয়াছে, তাহা এইভাবে আমাদের বুঝিতে হইবে। কেবল জ্ঞান-সাধনায়, বা কেবল ভক্তি-সাধনায়, কি কেবল নিষ্কাম কর্ম্ম অনুষ্ঠান দ্বারা নিঃশ্রেয়সসিদ্ধি হয় না। ঈশ্বরাশ্রয়ে কর্ম্ম ভক্তি ও জ্ঞান সমুচ্চয়ভাবে সাধন করিতে হইবে। কর্ম্ম ভক্তি ও জ্ঞানের পূর্ণ স্ফূর্ত্তি ও পরিণতি ব্যতীত পরমপুরুষার্থসিদ্ধি হয় না।

কর্ম্ম ভক্তি ও জ্ঞানযোগ-সাধনার অর্থ।—পূর্ব্বে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা হইতে এই তত্ত্ব আমরা বুঝিতে পারি। আমরা দেখিয়াছি যে, ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-যোগে জীবভাবের উৎপত্তি ও বিকাশ হয়। ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ—স্বরূপতঃ আত্মা—বিজ্ঞানাত্মার অতীত, মহৎ আত্মার অতীত—শান্ত আত্মা—সর্ব্বাত্মা সচ্চিদানন্দ অনন্ত ব্রহ্ম। সাংখ্যমতে পুরুষ ‘জ্ঞ’ স্বরূপ—নিত্য শুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাব। আর ক্ষেত্র বা প্রকৃতি জড় ত্রিগুণাত্মিকা, ক্ষণপরিণামী। আমাদের বুদ্ধি, অহঙ্কার ও মন রূপ অন্তঃকরণ বা চিত্ত—এই ক্ষেত্রেরই পরিণাম। ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ সংযোগে—অন্তঃকরণে ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষের প্রতিবিম্ব পতিত হয়। পুরুষের সচ্চিদানন্দ স্বরূপ চিত্তে প্রতিবিম্বিত হইয়া—জ্ঞাতা কর্ত্তা ও ভোক্তা ‘আমি’ ভাব যে চিৎপ্রতিবিম্ব হেতু প্রকাশিত হয়, বলিয়াছি ত তাহাই জীব। ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ এই চিত্তের প্রতিবিম্ব গ্রহণ করে—চিত্তদর্পণে আপনার স্বরূপ দর্শন করে। পুরুষ আপনাকে এই জ্ঞাতা কর্ত্তা ভোক্তা ‘আমি’ ভাবে সেইজন্য জানিতে পারে। এই চিত্তে পুরুষের স্বভাব অভিব্যক্ত হয় ও পরিচ্ছিন্ন হয়। ইহাই অবিদ্যা, অজ্ঞান বা মায়া। ইহাতেই পুরুষের ক্ষরভাব হয়। এ সকল তত্ত্ব পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে।

সে যাহা হউক, পুরুষের আপন সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মস্বরূপ লাভ করিতে হইলে, ক্ষেত্রের সহায়েই তাহা লাভ করিতে হয়। ক্ষেত্ররূপ উপাধি বিযুক্ত হইলে তাহার স্বরূপ তাহার নিকট আর ক্ষেত্র দ্বারা প্রকাশিত হয় না। আমরা দর্পণের সাহায্য বিনা মুখ দেখিতে পাই না। দর্পণের সাহায্যে মুখ দেখিতে হইলে যেমন সে দর্পণ নির্ম্মল—স্বচ্ছ হওয়ার প্রয়োজন, সেইরূপ চিত্তের সহায়ে পুরুষের আপন স্বরূপ দর্শন করিতে হইলে, চিত্ত স্বচ্ছ—নির্ম্মল হওয়া প্রয়োজন। পুরুষ সচ্চিদানন্দ আত্মা-স্বরূপ। পুরুষ অপরিচ্ছিন্ন সন্ধিনী সম্বিৎ ও হ্লাদিনী-শক্তিযুক্ত। প্রকৃতি সেই শক্তির ছায়া গ্রহণ করিয়া সত্ত্বরজস্তমোগুণযুক্ত হয়। চিত্ত সেই শক্তিবলে সৎস্বরূপ বা সন্ধিনী শক্তির বিকাশে কর্ত্তৃত্বভাবযুক্ত হয়। চিৎস্বরূপ বা সম্বিৎ শক্তির বিকাশে জ্ঞাতৃত্বভাবযুক্ত হয়, আর আনন্দ-স্বরূপ বা হ্লাদিনী শক্তির বিকাশে ভোক্তৃত্বভাবযুক্ত হয়। চিত্ত যত স্বচ্ছ—নির্ম্মল হইতে থাকে, চিত্তের এই জ্ঞাতৃত্ব কর্ত্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব ভাব ততই স্ফূর্ত্ত বিকাশিত ও পরিণত হইতে থাকে, ততই চিত্তের পরিচ্ছিন্নত্ব অপসৃত হইতে থাকে, ততই পরিচ্ছিন্ন জ্ঞাতা কর্ত্তা ভোক্তা 'আমি' ভাব সম্প্রসারিত হইয়া অপরিচ্ছিন্ন জ্ঞাতা কর্ত্তা ও ভোক্তা 'আমি' ভাবের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। নির্ম্মল চিত্তে আত্মস্বরূপ বিশেষভাবে প্রতিবিম্বিত হইলে, পরিচ্ছিন্ন জীবভাব—ব্যক্তিভাব অপসারিত হইয়া সর্ব্বাত্মা সর্ব্ব 'আমি' ভাব—সর্ব্ববিৎ সর্ব্বকর্ত্তা সর্ব্বভোক্তা 'আমি'—ভাব প্রকাশ হইতে থাকে। এই ভাব লাভ করিতে পারিলেই জীবের নিঃশ্রেয়সসিদ্ধি হয়। তখন জীব পূর্ণ সচ্চিদানন্দ আত্মস্বরূপে অবস্থান করিতে পারে। পুরুষ আপন স্বরূপ তখন নির্ম্মল চিত্ত-দর্পণে পূর্ণ ভাবে দেখিতে পায়, এবং সেই স্বরূপে অবস্থান করিতে পারে।

এইরূপে চিত্তে 'জ্ঞাতা' ভাবের পূর্ণ বিকাশ দ্বারা আত্মার চিৎস্বরূপ উপলব্ধি হয়—পুরুষের 'জ্ঞ'স্বরূপ উপলব্ধি হয়। 'কর্ত্তা' ভাবের পূর্ণ বিকাশ

দ্বারা আত্মার সংস্বরূপের উপলব্ধি হয়। আর ভোক্তা ভাবের বিকাশ দ্বারা আত্মার আনন্দস্বরূপ উপলব্ধি হয়। চিত্তে এই জ্ঞাতা কর্ত্তা ভোক্তা 'আমি' ভাবের যত বিকাশ হইতে থাকে, ততই জীব সচ্চিদানন্দ আত্মার অভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকে, ততই সে সচ্চিদানন্দ আত্মস্বরূপ লাভ করিতে থাকে। এই জ্ঞাতা কর্ত্তা ও ভোক্তা 'আমি' ভাবের পূর্ণ বিকাশে সর্ব্বাত্মা সর্ব্বেশ্বর সর্ব্ববিৎ সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বকর্ত্তা সর্ব্বভোক্তা পুরুষোত্তম ভাব লাভ হয়—সচ্চিদানন্দ ঘন ব্রহ্মভাবে অধিষ্ঠান হয়।

চিত্ত পরিচ্ছিন্ন, চিত্ত ত্রিগুণজ। চিত্তকে নির্ম্মল করিতে হইলে, তাহার ত্রিগুণজ বৃত্তি নিরুদ্ধ করিতে হয়। চিত্তের বৃত্তিজ্ঞান নিরুদ্ধ হইলে, তাহাতে চিৎস্বরূপ—'জ্ঞ'স্বরূপ আত্মার প্রতিবিম্ব পূর্ণ প্রকাশিত হইলে, তাহাতে নিত্য অপরিচ্ছিন্ন সর্ব্বজ্ঞত্ব (একবিজ্ঞান দ্বারা সর্ব্ববিজ্ঞান) সিদ্ধ হয়। চিত্তের রজোগুণজ অহং-কার নিরুদ্ধ হইলে, তাহাতে 'আত্মার'—শুদ্ধ সৎ-'আমি' ভাব—অপরিচ্ছিন্ন আত্মভাব প্রতিবিম্বিত হইয়া প্রকাশিত হয়। চিত্তের রজোগুণজ কর্ম্মবৃত্তি নিরুদ্ধ হইলে, তাহাতে আত্মার সৎস্বরূপ, তাহার সন্ধিনী শক্তির বিকাশ হয়, রজোগুণ-বৃত্তির কর্ম্ম-প্রবর্ত্তনার পরিবর্ত্তে সন্ধিনী শক্তির প্রেরণায় 'সৎভাবে, সাধুভাবে' কর্ম্ম-কর্তৃত্ব প্রকাশিত হয়। 'সৎ' ইহা ব্রহ্মেরই এক নির্দ্দেশ (গীতা,—১৭।২৩)। এইজন্য ভগবান্ বলিয়াছেন,—

> সদ্ভাবে সাধুভাবে চ সদিত্যেতৎ প্রযুজ্যতে।
> প্রশস্তে কর্ম্মণি তথা সচ্ছব্দঃ পার্থ যুজ্যতে॥
> যজ্ঞে তপসি দানে চ স্থিতিঃ সদিতি চোচ্যতে।
> কর্ম্ম চৈব তদর্থীয়ং সদিত্যেবাভিধীয়তে"॥
>
> (গীতা, ১৭।২৬-২৭)।

আত্মা অকর্ম্মস্বরূপ সত্য। তাহার অর্থ এই যে, প্রকৃতির রজোগুণ হেতু চিত্তের যে ইদং-বিরোধী অহঙ্কার ও তাহা হইতে যে কর্ম্মপ্রবৃত্তি,

তাহা আত্মার নহে, সে কর্ম্মে আত্মার কর্তৃত্ব নাই। অবিদ্যা জন্যই সে কর্ম্মে আত্মাধ্যাস হয়—

"প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢাত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥" (গীতা ৩।২৭)

কিন্তু নির্ম্মল শুদ্ধ সাত্ত্বিক চিত্তে আত্মার সৎস্বরূপের প্রতিবিম্ব হেতু—আত্মার সন্ধিনী শক্তির প্রকাশ হেতু, আত্মার নিয়ন্তৃত্বে 'সদ্ভাবে সাধুভাবে প্রশস্ত কর্ম্মে' যে প্রবর্ত্তনা, তাহাতে আত্মার সৎস্বরূপেরই প্রকাশ হয়, নিয়ন্তৃত্ব মাত্র প্রকাশ হয়, প্রকৃতির রজোগুণজ কর্তৃত্বের ন্যায় কর্তৃত্ব প্রকাশ হয় না।

এইরূপ নির্ম্মল চিত্তে সুখদুঃখরূপ ভোক্তৃভাব নিরুদ্ধ হইলে, বাহ্য-বিষয়সংস্পর্শজনিত ভোক্তৃভাব দূর হইলে, আত্মার আনন্দস্বরূপ—হ্লাদিনী শক্তিহেতু তাহাতে প্রকাশিত হয়। তখন জীব তাহারই চিত্তে আপনার দ্বন্দ্বাতীত অত্যন্ত ভূমাসুখস্বরূপ—আনন্দস্বরূপ অনুভব করে,—'ব্রহ্মসংস্পর্শরূপ অত্যন্ত সুখে' নিমগ্ন থাকে। চিত্তের ভোক্তৃ-ভাব—এই ভোগবৃত্তি, আত্মার প্রতিবিম্ব গ্রহণ হেতুই ক্রমে অভিব্যক্ত হয়। চিত্তের ভাবপ্রবণতা এই ভোগবৃত্তির মূল। সেই ভাবপ্রবণতা বাহ্যবিষয়সংযোগে অভিব্যক্ত হইলে, চিত্ত সুখদুঃখ-দ্বন্দ্বযুক্ত হয়। কদাচিৎ বাহ্য সৌন্দর্য্যাদির অভিব্যক্তিতে সেই আনন্দের কথঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়। কিন্তু সেই ভাবপ্রবণতা যদি সর্ব্ব সৌন্দর্য্যের—সর্ব্বরসের উৎস ঈশ্বরে সমর্পিত হয়, তবে তাহা ঈশ্বরে বিভিন্ন ভাবে (পিতা, মাতা, প্রভু, সখা, স্বামী প্রভৃতি ভাবে) অভিব্যক্ত হয়। ইহাতেই আত্মার আনন্দস্বরূপ চিত্তে প্রধানতঃ অভিব্যক্ত হয়। ভক্তির অনুশীলনেই চিত্তে রসস্বরূপ আনন্দস্বরূপ 'ভূমা' ব্রহ্মের সংস্পর্শরূপ অত্যন্ত সুখ অনুভূত হয়।

এই প্রকারে চিত্তের স্বাভাবিক জ্ঞাতৃত্ব কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব ভাবের মধ্য দিয়া জীবত্বের ক্রমবিকাশ হয়। জীব যখন দৈবী প্রকৃতি লাভ করে, তখন

"জ্ঞানবৃত্তির পূর্ণ সম্প্রসারণে—সর্ব্বজ্ঞত্ব নিত্যবোধত্ব—শুদ্ধচৈতন্ত্র স্বরূপত্ব সিদ্ধ হয়—ইহাই চিৎ। কর্ম্মবৃত্তির পূর্ণ সম্প্রসারণে—সত্যকামত্ব সত্যসংকল্পত্ব সিদ্ধ হয়—ইহাই সৎ। আর ভোগবৃত্তির পূর্ণ সম্প্রসারণে—দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি ও পূর্ণ—অত্যন্ত সুখপ্রাপ্তি হয়—ইহাই আনন্দ। মানুষ পূর্ণ হইলে, সচ্চিদানন্দময় হয়—ব্রহ্ম হয়, মানুষ তাহার পূর্ণাদর্শ লাভ করে। ভগবান্‌ই সচ্চিদানন্দঘন—ব্রহ্ম। মানুষ পূর্ণ হইলে—ব্রহ্ম হইলে—মানুষ তাহার পূর্ণ আদর্শ লাভ করিলে, সচ্চিদানন্দময় হয়।

"যে ধর্ম্মসাধনাবলে মানুষের জ্ঞান পূর্ণসম্প্রসারিত হয়, কর্ম্মবৃত্তি পূর্ণ সম্প্রসারিত হয়, ভোগবৃত্তি পূর্ণ-সম্প্রসারিত হয়—মানুষ সচ্চিদানন্দময় হয়, তাহাই পূর্ণ ধর্ম্ম। গীতায় এই পূর্ণ ধর্ম্মের উপদেশ আছে। অজ্ঞান দূর করিয়া—চিত্ত নির্ম্মল করিয়া, তাহাতে পরমজ্ঞানসূর্য্য পূর্ণ প্রতিফলিত হইবার উপযুক্ত করিলে, দ্বৈত ও অদ্বৈতবাদ প্রভৃতি আংশিক জ্ঞানের উপরে উঠিয়া 'একবিজ্ঞান দ্বারা সর্ব্ববিজ্ঞান লাভ' করিয়া পূর্ণ একত্বে সর্ব্বজ্ঞান একীভূত করিয়া কিরূপে নিত্যবোধস্বরূপে অবস্থান করা যায়—অক্ষর কূটস্থ জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মে অবস্থিতি হয়, গীতায় তাহার পথ দেখান আছে, সে পরম জ্ঞান কি, নির্ম্মল চিত্তের জ্ঞানরূপ কি, তাহা বুঝান আছে। আমাদের কর্ম্মবৃত্তি কোন্ পথে কিরূপে নিয়মিত করিয়া ঈশ্বরের এই জগচ্চক্রপ্রবর্ত্তন ও ধর্ম্ম-সংস্থাপন-রূপ কর্ম্মের অনুবর্ত্তী হইয়া তাঁহারই আদেশে কর্ম্ম করিয়া কর্ম্মবৃত্তির পূর্ণসম্প্রসারণপূর্ব্বক কিরূপে ঈশ্বরভাব লাভ করিতে হয়, তাহা গীতায় বিশেষরূপে উপদিষ্ট হইয়াছে। আর মাত্রাস্পর্শজ সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্বের অতীত হইয়া, আত্মপ্রসন্নতা লাভ করিয়া, স্থিত-প্রজ্ঞ হইয়া সর্ব্বত্র ব্রহ্মদর্শন করিয়া, কিরূপে ব্রহ্মসংস্পর্শরূপ অত্যন্ত সুখ উপভোগ করা যায়, ভক্তিবৃত্তির উপযুক্ত অনুশীলন দ্বারা সেই পূর্ণানন্দরসস্বরূপ ভগবানের উপাসনা-ফলে কিরূপে দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি দ্বারা সেই আনন্দময়ত্ব লাভ করা যায়, গীতায় তাহার উপদেশ আছে।

"এইরূপে গীতায় জ্ঞান কর্ম্ম ও ভক্তির সামঞ্জস্য করা হইয়াছে। এই জ্ঞান কর্ম্ম ও ভক্তির পূর্ণ স্ফূর্ত্তি ও পরিণতি দ্বারা মানুষ কিরূপে পূর্ণ সচ্চিদানন্দময়ত্ব লাভ করিতে পারে, তাহা গীতায় দেখান আছে। * * *

"যাহা হউক, গীতোক্ত এই জ্ঞান কর্ম্ম ও ভক্তির সামঞ্জস্য ও পূর্ণ বিকাশের তত্ত্বই—পূর্ণধর্ম্মতত্ত্ব। এইরূপ পূর্ণধর্ম্মতত্ত্বকথা আর কোথাও এমন প্রচারিত হয় নাই। বৌদ্ধধর্ম্মের মূলসূত্র—নিষ্কাম কর্ম্ম ও যোগ। তাহাতে জ্ঞান ও ভক্তির অনুশীলন উপদিষ্ট হয় নাই। খ্রীষ্টধর্ম্মে কেবল পিতৃভাবে ঈশ্বরে ভক্তিযোগের উপদেশ আছে। তাহাতে জ্ঞান ও কর্ম্ম অনুশীলনের বিশেষ উপদেশ নাই। চৈতন্যধর্ম্মে কেবল ভক্তির বিশেষ বিকাশ 'প্রেম' অনুশীলিত হইয়াছিল। * * * সুতরাং আমরা এক অর্থে বলিতে পারি যে, আর সকল ধর্ম্মই অপূর্ণ—কেবল গীতোক্ত ধর্ম্মই পূর্ণ।"

ভগবান্ যে কেবল এই পূর্ণধর্ম্মের—মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশের উপদেশ দিয়াছেন, তাহা নহে। তিনি যে কেবল মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশে সচ্চিদানন্দঘন ব্রহ্মের বা সর্ব্বাতীত অথচ সর্ব্বাধার সর্ব্বকর্ত্তা সর্ব্বজ্ঞাতা সর্ব্বভোক্তা ঈশ্বরের স্বরূপ লাভ দ্বারা পরম নিঃশ্রেয়স-সিদ্ধির উপদেশ দিয়াছেন, তাহা নহে। তিনি সেই আদর্শ আমাদের সম্মুখে প্রকাশ ও স্থাপন জন্য স্বয়ং সর্ব্বজ্ঞাতা সর্ব্বকর্ত্তা সর্ব্বভোক্তা সচ্চিদানন্দঘন বিগ্রহরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। মানুষ তাহার পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানে আপনার এই সর্ব্বজ্ঞাতা সর্ব্বকর্ত্তা সর্ব্বভোক্তা সর্ব্ব 'আমি' রূপ—তাহার সেই পরম আদর্শ জানিতে পারে না। তাই শ্রীভগবান্ অবতীর্ণ হইয়া, তাহার সেই পূর্ণ পরম আদর্শ, তাহার গম্য সেই পরম পদ—পরম ধাম দেখাইয়া দিয়াছেন। তাই এখন মানুষ সে পরম আদর্শ লক্ষ্য করিয়া, তাহা লাভ করিবার জন্য অগ্রসর হইতে পারে। আমাদের সেই পরম লক্ষ্য—পরম আদর্শ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। তিনিই আমাদের জ্ঞানে অধিগম্য পূর্ণ অবতার। ভগবান্ আপনার অবতার-তত্ত্ব গীতাতেই প্রকাশ করিয়াছেন। বাহুল্যভয়ে

এই ব্যাখ্যা-ভূমিকায় তাহা বিবৃত হয় নাই। সে যাহা হউক, আমরা যদি আমাদের এই পরম আদর্শকে সম্মুখে রাখিয়া, তাঁহারই উপদিষ্ট কর্ম্মযোগ ভক্তিযোগ জ্ঞানযোগ যথাক্রমে ও সমুচ্চয়রূপে সাধন করিয়া, তাঁহার অভিমুখে অগ্রসর হইতে পারি, তবে একদিন না একদিন সেই সাধনার সংসিদ্ধিতে তাঁহার সহিত পূর্ণ যোগযুক্ত হইতে পারিব—আমাদের পরম নিঃশ্রেয়স-সিদ্ধি হইবে। ইহাই গীতার সার উপদেশ।

গীতার সম্বন্ধে অন্য কথা।—এ ভূমিকা দীর্ঘ হইয়া পড়িয়াছে গীতার্থ বুঝিবার জন্য—গীতার মূল সূত্র প্রথমে বুঝিবার জন্য, গীতার প্রয়োজন অভিধেয় সম্বন্ধ প্রভৃতি বুঝিবার জন্য এই দীর্ঘ ভূমিকার প্রয়োজন বোধ হওয়ায়, ইহা, লিখিত হইল। উপসংহারে গীতা সম্বন্ধে আরও কয়েকটি কথা বলিতে হইবে। মহাভারতে গীতার প্রতি অধ্যায় শেষে উক্ত হইয়াছে যে, এই কৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদরূপ গীতা উপনিষৎ, ব্রহ্মবিদ্যা ও যোগশাস্ত্র। গীতা যে উপনিষদ্ ব্রহ্মবিদ্যা বা পরাবিদ্যা, তাহা পূর্ব্বে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। গীতাকে কেন যোগশাস্ত্র বলে, তাহার কারণও পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। এস্থলে সে সম্বন্ধে আরও দুই একটি কথা বলিতে হইবে। যুজ্ ধাতু হইতে যোগ। যে শাস্ত্রে ব্রহ্মযোগ অর্থাৎ প্রকৃতিমুক্ত পুরুষের—পরম ব্রহ্মের সহিত পরম অক্ষরভাবে স্থিতি ও মহৎব্রহ্মরূপ প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা নিগুর্ণ সগুণ পরমেশ্বরভাবে স্থিতি-রূপ যোগসংসিদ্ধির কথা এবং তাহার উপায় উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহাকে যোগশাস্ত্র বলা যায়। এই অর্থে গীতা যোগশাস্ত্র, ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। যোগ শব্দের যদি কোন ইংরাজী প্রতিশব্দ থাকে, তবে তাহা (Religion) রিলিজন্। Re অর্থাৎ পুনর্ব্বার ও Ligion অর্থাৎ বন্ধন বা যুক্ত হওয়া—ইহাই Religion শব্দের ধাতুগত অর্থ। জীব ঈশ্বর হইতে প্রচ্যুত হইয়া সংসারী :হইয়াছে—সয়তানের প্রলোভনে পাপপথে নীত হইয়াছে

তাহাকে পুনর্ব্বার সেই ঈশ্বরে যুক্ত করাই রিলিজন্, এবং যে উপায় দ্বারা জীব ঈশ্বরে যুক্ত হইতে পারে, তাহাও রিলিজন্। এই অর্থে গীতোক্ত যোগকে রিলিজন্ বলা যায়। আমরা দেখিয়াছি, সেই অক্ষরব্রহ্মে বা ঈশ্বরে যোগযুক্ত হইবার উপায় ত্রিবিধ—কর্ম্মযোগ, ভক্তিযোগ ও জ্ঞানযোগ। ইহার ইংরাজী প্রতিশব্দ আমরা অনুসন্ধান করিব। কর্ম্মযোগ=Religion of work, ভক্তিযোগ=Religion of love (ইহাই খ্রীষ্টধর্ম্মের মূল), আর জ্ঞানযোগ=Religion of knowledge। যাহাকে এই যোগ বা Religion বলে, খ্রীষ্টধর্ম্মশাস্ত্রে তাহার একটি সুন্দর প্রতিশব্দ আছে,—তাহা Atonement। Atonement শব্দের প্রকৃত অর্থ at-one-ment—অর্থাৎ ঈশ্বরে যোগযুক্ত হওয়া বা একত্বসিদ্ধ হওয়া। ইহাতেই নিঃশ্রেয়সসিদ্ধি হয়। অতএব গীতোক্ত যোগের উপযুক্ত প্রতিশব্দ—at-one-ment। এসম্বন্ধে আর অধিক বলিতে হইবে না।

গীতার এই কর্ম্ম ভক্তি ও জ্ঞান—এই ত্রিবিধ সাধনা অনুসারে গীতাকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়, তাহা বলিয়াছি। মধুসূদন ও বলদেব এইরূপে গীতাকে ত্রিকাণ্ডে বা ত্রিষট্‌কে বিভক্ত করিয়াছেন। আমরাও এই বিভাগ অবলম্বন করিয়াছি। গীতার প্রথম ষট্‌কে "ত্বং" বা আত্মতত্ত্ব, ও আত্মতত্ত্ব লাভের উপায় কর্ম্মযোগ ও তাহার বিভিন্ন স্তর উক্ত হইয়াছে। দ্বিতীয় ষট্‌কে "তৎ" বা ঈশ্বরতত্ত্ব ও ভক্তিযোগ প্রধানতঃ বিবৃত হইয়াছে। আর তৃতীয় ষট্‌কে জ্ঞানের স্বরূপ ও জ্ঞেয় ব্রহ্ম-তত্ত্ব, প্রকৃতি-পুরুষ-তত্ত্ব ও পুরুষোত্তম-তত্ত্ব—এই তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শন ও তাহার ফল মোক্ষ অর্থাৎ 'ত্বং' ও 'তৎ' ইহার একত্ব-সংসাধন 'অসি'—ইহা বিবৃত হইয়াছে। মধুসূদন বলিয়াছেন,—গীতায় 'তত্ত্বমসি' এই মহাবাক্যার্থ উপদিষ্ট হইয়াছে। এতদনুসারে গীতাকে ত্রিষট্‌ক বা ত্রিকাণ্ডে বিভাগ করা যায়। সে যাহা হউক, আমরা অন্য ভাবেও গীতার এই তিন বিভাগ অবলম্বন করিতে পারি। পাশ্চাত্য দর্শনশাস্ত্রের

বিভাগ অনুসারে আমরা এই তিন বিভাগ বুঝিব। তদনুসারে গীতার প্রথম কাণ্ড বা প্রথম ষট্‌ককে Psychology and Ethics বিভাগ বলা যায়। সেইরূপ দ্বিতীয় ষট্‌ককে Theology and Religion বিভাগ বলা যায়। আর তৃতীয় ষট্‌ককে Philosophy and Metaphysics বিভাগ বলা যায়। কিন্তু ইংরাজী দর্শনে Psychology, Ethics প্রভৃতি সঙ্কীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ প্রধানতঃ মনাত্মবাদী। এজন্য তাঁহাদের Psychology—মনোবিজ্ঞান। এইজন্য আধুনিক জর্ম্মাণ দর্শনে আত্মতত্ত্বদর্শনকে Philosophy of the Spirit বলা হইয়াছে। এতদনুসারে কেহ কেহ গীতার প্রথম ষট্‌ককে Philosophy of the Spirit আখ্যা দিয়াছেন। আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনে যাহা Ethics, তাহা সাধারণ ব্যবহারশাস্ত্র। প্রকৃত কর্ম্মযোগ তাহাতে পাওয়া যায় না। প্রসিদ্ধ জর্ম্মাণ পণ্ডিত ক্যাণ্ট (Kant) যাহাকে তাঁহার Critique নামক পুস্তকে Practical Reason বলিয়াছেন, জ্ঞানাঙ্গভূত সেই কর্ম্মযোগ,—যাহা দ্বারা ঈশ্বরতত্ত্ব আত্মতত্ত্ব প্রভৃতি নির্ম্মল জ্ঞানে অভিব্যক্ত হয়—তাহাই এক অর্থে গীতোক্ত কর্ম্মযোগ। তাহা ঠিক Ethics নহে। যাহা হউক, সাধারণভাবে গীতার প্রথম ষট্‌কের নাম Psychology and Ethics হইলেই যথেষ্ট হয়। সেইরূপ গীতার দ্বিতীয় ষট্‌কে যে ঈশ্বরতত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে, তাহাকে Theology না বলিয়া Philosophy of the Absolute বলা অধিক সঙ্গত। তবে সাধারণভাবে আমরা এই দ্বিতীয় ষট্‌ককে Theology and Religion বলিব, এবং এই Religion শব্দ এস্থলে সাধারণ অর্থেই বুঝিব। আর তৃতীয় ষট্‌কে 'ত্বং' ও 'তৎ' শব্দার্থের ঐক্য সংস্থাপিত হইয়াছে—ইহা মধুসূদন সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, বলিয়াছি। তদনুসারে এই ষট্‌কের নাম Philosophy of Identity বলা যাইতে পারে। কিন্তু এই ষট্‌কে মূল দার্শনিক তত্ত্ব সকল বিবৃত হইয়াছে। ইহা দর্শনশাস্ত্রের সার। এজন্য

এই ষট্‌ককে আমরা Philosophy and Metaphysics নামে অভিহিত করা অধিক সঙ্গত বোধ করি। আজ কালের ইংরাজীশিক্ষিত পণ্ডিত-গণ ইংরাজী শব্দের দ্বারা সহজে 'অর্থ' বুঝিতে পারেন। এজন্য আমরা ইংরাজী প্রতিশব্দ দ্বারাই গীতার তিন ষট্‌কে বিবৃত মূল তত্ত্ব বুঝিতে চেষ্টা করিলাম। যাহা হউক, এই ত্রিষট্‌ক বিভাগ অনুসারে আমরা বলিতে পারি যে, গীতার প্রথম ষট্‌কের প্রধান বিষয়—আত্মতত্ত্ব ও কর্ম্মযোগ, দ্বিতীয় ষট্‌কের প্রধান বিষয়—ঈশ্বরতত্ত্ব ও ভক্তিযোগ এবং শেষ ষট্‌কের প্রধান বিষয়—ব্রহ্মতত্ত্ব ও জ্ঞানযোগ। এইরূপে গীতাশাস্ত্রে সর্ব্ব দর্শনশাস্ত্রের সর্ব্ব ধর্ম্মশাস্ত্রের যাহা সার, তাহা বিবৃত হইয়াছে।

গীতা সার্ব্বদেশিক, সার্ব্বকালিক সার্ব্বজনিক। গীতাশাস্ত্র কোন সম্প্রদায়ের নিজস্ব নহে। এইজন্য আমাদের দেশে সকল মুমুক্ষু-সম্প্রদায়ই ইহাকে আপনার শাস্ত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছেন। এইজন্য গীতা বুঝিতে পাশ্চাত্যদেশীয় পণ্ডিতগণও কত চেষ্টা—কত যত্ন করিয়াছেন। কত ভাষায় ইহার কতরূপ অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। কত পণ্ডিত কত প্রকারে ইহা বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছেন। সকল দেশের পণ্ডিতই গীতার আদর করিয়াছেন। গীতায় খ্রীষ্টধর্ম্মের মূলতত্ত্ব পাইয়া কত খ্রীষ্টধর্ম্মযাজক ইহাকে খ্রীষ্টধর্ম্মমত অবলম্বনে রচিত বলিয়াছেন। বৌদ্ধ পণ্ডিত ইহাতে বৌদ্ধধর্ম্মের মতমত নির্ব্বাণ প্রভৃতি লক্ষ্য করিয়া, গীতাকে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের পরে রচিত বলিয়া বুঝিয়াছেন। গীতায় যে সনাতন ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছে, তাহা সকল ধর্ম্মেরই মূল। বিভিন্নধর্ম্মাবলম্বিগণ যে গীতায় আপন আপন ধর্ম্মের আভাস দেখিতে পান, ইহাতেই গীতার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত হয়। প্রসিদ্ধ ফরাসী পণ্ডিত কুঁজে—গীতাতে সর্ব্ব ধর্ম্মের সমন্বয় (Eclecticism) দেখিয়া গীতার সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—'Mohument of the greatest prize, which contains all the Indian Mysticism"। যাউক সকল অবান্তর কথা এস্থলে উল্লেখের প্রয়োজন নাই।

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা।—গীতা-ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে পূর্ব্বে গীতার বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যা উল্লেখ করিয়াছি। তাহা ব্যতীত গীতার আর এক সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে। তাহাকে যোগি-সম্প্রদায়-সম্মত আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা বলা যায়। এই ব্যাখ্যা অনুসারে সমগ্র গীতাই রূপক। গীতা অধ্যাত্মশাস্ত্র,—ইহাতে রূপকচ্ছলে যোগের কথাই বর্ণিত আছে,—ইহাতে আধ্যাত্মিক দেবাসুর-সংগ্রামই বিবৃত হইয়াছে। এই সম্প্রদায়ের মতে সকল শাস্ত্রই দ্ব্যর্থবোধক। এক—বহির্লক্ষ্য অর্থ। আর এক--যোগের গূঢ় মর্ম্মানুসারে অন্তর্লক্ষ্য অর্থ। অন্তর্লক্ষ্য অর্থই সাধনা-পথের পথিক যোগীদের গ্রাহ্য। অনেক শাস্ত্রের যে এইরূপ আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা হইতে পারে, তাহা অবশ্য স্বীকার করিতে হয়। ব্রহ্মাণ্ডের ও ভাণ্ডের নিয়ম একই—বাহ্য ও আন্তর ব্যাপার একই রূপ। এজন্য অনেক স্থলে এই আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাও সঙ্গত হয়। যাহারা মায়াবাদী বা বিজ্ঞানবাদী (যাহারা Idealists) অথবা ধ্যানযোগী—তাহাদের কাছে আধ্যাত্মিক অর্থই বিশেষ গ্রাহ্য হইতে পারে। সে যাহা হউক, বেদের যে আধ্যাত্মিক, যাজ্ঞিক, ঐতিহাসিক ও নৈরুক্ত ভেদে চারি প্রকার ব্যাখ্যা হইতে পারে—তাহা নিরুক্তে যাস্ক বুঝাইয়াছেন। এই বিভিন্ন ব্যাখ্যাকে কেহ কেহ আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক ভেদে ত্রিবিধ বলিয়াছেন। পুরাণেরও এই ত্রিবিধ ব্যাখ্যা অনেকে স্বীকার করিয়াছেন। শাস্ত্রে কোন কোন স্থলে আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা স্পষ্ট, কোন কোন স্থলে গূঢ় ও অস্পষ্ট, কোথাও বা আদৌ গ্রাহ্য নহে। উপনিষদে দেবাসুর-সংগ্রামের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা শাঙ্করভাষ্য-মতে স্পষ্ট। শ্রীভাগবতে পুরঞ্জয়ের উপাখ্যানে আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা পরিস্ফুট। মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা গূঢ় রহস্যময়। শাস্ত্রে সর্ব্বত্র এই ত্রিবিধ ব্যাখ্যা সঙ্গত হয় না। গীতারও এরূপ আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার অধিকাংশ স্থলে সঙ্গত অর্থ হয় না। ইহাতে যে রূপকে আধ্যাত্মিক

যুদ্ধব্যাপার মাত্র বর্ণিত হইয়াছে, তাহা বলিতে পারা যায় না। গীতা রূপক হইলে, সমগ্র মহাভারতকে রূপক বলিতে হয়। সমগ্র কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধব্যাপারকে—ধর্ম্ম ও কর্ম্ম-সাধন-ক্ষেত্র—শরীরে কুপ্রবৃত্তির সহিত সুপ্রবৃত্তির যুদ্ধ বলিতে হয়। এজন্য এই সম্প্রদায়ের ব্যাখ্যাকারগণ ধৃতরাষ্ট্রকে মন ও তাঁহার শত পুত্রকে মনের শত রাজসিক বৃত্তি বলিয়াছেন, পাণ্ডুকে শাস্ত্রানুসন্ধায়ী বুদ্ধি ও পাণ্ডুপুত্রগণকে পঞ্চতত্ত্ব বলিয়াছেন, গীতার প্রথম অধ্যায়োক্ত যোদ্ধৃগণও যে বিভিন্ন মনোবৃত্তি, তাহা দেখাইয়াছেন, এবং শ্রীকৃষ্ণকে কূটস্থ চৈতন্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আর্য্যমিসন্ হইতে প্রকাশিত গীতায় এই আধ্যাত্মিক অর্থের আভাস পাওয়া যায়। ৺কাশীধাম প্রণবাশ্রম হইতে প্রকাশিত গীতায় এই যোগশাস্ত্রীয় আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা বিবৃত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত প্রসাদদাস গোস্বামী মহাশয়ও এই আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা-সহ গীতা প্রকাশ করিয়াছেন। সে যাহা হউক, বলিয়াছি ত, গীতার এইরূপ আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা সর্ব্বত্র সঙ্গত নহে। শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি কোন প্রাচীন ব্যাখ্যাকার তাহা গ্রহণ করেন নাই। আমরা এই ব্যাখ্যায় তাহা কোথাও গ্রহণ করি নাই। সুতরাং এস্থলে তাহার বিশেষ বিবরণের প্রয়োজন নাই। যাঁহারা যোগাবলম্বী, তাঁহারা সে আধ্যাত্মিক অর্থ গ্রহণ করিতে পারেন। আমরা প্রসঙ্গক্রমে তাহার উল্লেখ করিলাম মাত্র।

শেষকথা।—এই ব্যাখ্যা-ভূমিকায় যাহা বলিবার ছিল, তাহা শেষ হইয়াছে। কোন্ মূলসূত্র ধরিয়া কি ভাবে আমরা গীতা-ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহা ইহা হইতে একরূপ বুঝা যাইবে। গীতার অর্থ ভাবনা করিয়া, তাহা আমাদের সীমাবদ্ধ পরিচ্ছিন্ন অজ্ঞানাবরিত জ্ঞানে যেরূপ প্রতিভাত হইয়াছে, তাহাই এ ব্যাখ্যায় যথাসাধ্য লিপিবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। আমরা গীতা বুঝিবার বা ব্যাখ্যা করিবার প্রকৃত অধিকারী নহি। যে সাধনা দ্বারা—যে যোগবলে গীতার প্রকৃত অর্থ

নির্ম্মল বুদ্ধিতে প্রতিভাত হয়, সে সাধনা—সে জ্ঞান আমাদের নাই। তথাপি এই দুঃসাধ্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছি। যিনি সর্ব্বহৃদিস্থিত, সর্ব্ব-বুদ্ধির প্রচোদক, সকলের নিয়ন্তা, তাঁহারই প্রেরণায় এই গীতা-ব্যাখ্যায় প্রবর্ত্তিত হইয়াছি। তাঁহার অভিপ্রায় কেহ বুঝিতে পারে না। তিনি কাহাকে তাঁহার কোন্ কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করেন, কাহাকে তাঁহার কোন্ কর্ম্মের 'নিমিত্ত' করেন, তাহা আমরা বলিতে পারি না। তাঁহার নিকট জ্ঞানী-অজ্ঞানী নাই, অধিকারী-অনধিকারী নাই,—সকলে তাঁহারই বর্ত্ম অনুসরণ করে। তিনি যাহাকে যে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করেন, সে অজ্ঞাতে সেই কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত হয়। এ ব্যাখ্যা তাঁহারই প্রেরণায় অবশ্য লিখিত হইয়াছে। জড় দর্পণ যেমন সূর্য্যাভিমুখে স্থাপিত করিলে, তাহা সেই আলোক-প্রতিবিম্ব গ্রহণ করিয়া অপরের নিকট প্রকাশ করে, অথচ নিজে বড় গ্রহণ করিতে পারে না, সেইরূপ আমাদের মলিন বুদ্ধিতে এই গীতা-জ্ঞানালোক যেরূপ প্রতিবিম্বিত হইয়াছে, তাহাই এই ব্যাখ্যা-রূপে বিবৃত হইয়াছে। আমাদের চিত্তের মলিনতা হেতু অনেক স্থলে সে ব্যাখ্যা অবশ্য মলিন হইয়াছে। যাহা হউক, আমরা এই গীতা প্রকাশের 'নিমিত্ত' মাত্র। ইহাতে যাহা কিছু গ্রাহ্য, তাহার জন্য আমাদের কোন কৃতিত্ব নাই। তবে যাহা আমাদের চিত্তের মলিনতা হেতু অগ্রাহ্য—অস্পষ্ট, তাহার দোষ আমাদেরই। আমাদের মলিন বুদ্ধিতে যতটুকু গীতা-জ্ঞানালোক প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়াছি। এ ব্যাখ্যায় গুণ দোষ যাহাই হউক, তাহার ফল শ্রীভগবানেই অর্পিত হইয়াছে, বলিয়াছি। আর অধিক কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। ইতি। ওঁ তৎসৎ।

"মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম্॥"

ভ্রম-সংশোধন।

নানাকারণে এই পুস্তকে ছাপার ভুল ঘটিয়াছে। তন্মধ্যে কতকগুলি নিম্নের তালিকায় প্রদর্শিত ও সংশোধিত হইল। পুস্তক পাঠের পূর্ব্বে এই ভ্রমগুলি যথাস্থানে সংশোধন করিয়া লইলে ভাল হয়।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	ভ্রম	সংশোধন
১৸৶০	২১, ২২	সর্ব্বউপনিষৎ সার ও উক্ত গীতার উপদেশ প্রণালী রূপ।	সর্ব্বউপনিষৎসার গীতারও উপদেশ-প্রণালী উক্ত রূপ।
[illegible]	৪	করিয়াছে তথান	করিয়াছেন, তথাপি
৫ ৴০	২৪	ববিধ	বিবিধ
৭ ৴০	১০	ভেদাভেদরূপ	ভেদাভেদবাদ
[illegible]	১৫	পরমতত্ত্ব	পরম তত্ত্ব।
[illegible]	১০	সত্বপর	সত্তার
[illegible]	১২, ১৩	(intellect) বা this under-standing)	(intellect অথবা understanding)
[illegible]	৯	সুখ	সূক্ষ্ম
[illegible]	১৩	অন্তর্গত।	অন্তর্গত। কর্ম্মযোগে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিধর্ম্মের সমন্বয় (synthesis) হইয়াছে।
২২	১২	ত্রিজগদাত্মিকা ...	ত্রিগুণাত্মিকা
২২	২২	revolution ...	Revelation
৩৭	১	জগৎ, কারণ ...	জগৎ-কারণ
৩৭	৯	মহালয় কালে ঈশ্বরে...	প্রলয়কালে অব্যক্তে
৩৮	৭	(মধু)।	(মধু)। দেহস্বভাব কর্ম্মবিপাক স্বরূপজ্ঞ জীব (বলদেব)।
৪০	৩	বলদেব ... জীব ...	(এ অংশ বাদ যাইবে।)
৪২	১৮, ২১	সত্তা	ভাব
৪৫	১১	অপরা প্রকতি	পরা প্রকৃতি
৪৫	১৩	জগৎ ব্যাপক, জীব ব্যাপ্য	জ্ঞাতা ব্যাপক, জ্ঞেয় ব্যাপ্য
৪৮	৭	কথা	কথন

পৃষ্ঠা	পংক্তি	ভ্রম	সংশোধন
৭৩	৬	তোমার অহিত	অহিতার্থী তব
৭৩	৯	অহিত—অহিতকর	অহিতার্থী—অহিতকারী
৭৩	২০	সংকল্প	নিশ্চয়
৭৪	৮	সংকল্প	নিশ্চয়
৯২	১২, ১৭	স্বাত্বিক	সাত্বিক
৯৩	৫	দেহরই	দেহেরই
৯৩	১৭	ধর্ম্ম	পদার্থ
১০৩	২০	হয়ে	যেই
১০৪	১৭	হ'য়ে	যেই
১০৪	১৭	হইয়া	যে ব্যক্তি
১১২	৯	হয়।	হয়,
১১৬	৯	ফলে	কালে
১২৮	১৬	ইহার আর পুরুষার্থ নহে।	ইহার অধিক আর পুরুষার্থ নাই।
১৩৯	১২	লভিলেও	লভিলেই
১৩৯	১৯	জ্ঞয়	জ্ঞেয়
১৪১	১	পরিচ্ছন্ন	পরিচ্ছিন্ন
১৪২	২৪	জ্ঞাননিষ্ঠা হইতে কর্ম্মনিষ্ঠার	কর্ম্মনিষ্ঠা অপেক্ষা জ্ঞাননিষ্ঠার
১৪৬	২২	astra	astral
১৭২	৬	হইয়াছে।	হইয়াছে,
১৯৫	২	৮।৪১-৪৪	১৮।৪১-৪৪
২২২	২১	কর্ত্তব্য কর্ম্মে	কর্ত্তব্য কর্ম্মের
২৪৫	১১	হইতে	ব্যতীত
২৪৫	১৯	আমি	আমার
২৭১	১১	স্তভোরূপা	তমোরূপা
২৭৬	১১	বর্ত্তামহে * *	বর্ত্তামহে...ব্যবস্থাম্।
৩১১	১৮	স্থিত্তিশীল	...স্থিতিশীল
৩১৩	১	তাঁহারা কোন শ্রেণীর লোক, কোন্	তাহারা, কোন শ্রেণীর লোক কোন্
৩৫০	৮	মাত্র।	আছে মাত্র।

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা

প্রথম ভাগ।

শ্রীমদ্‌-ভগবদ্গীতা।

প্রথম অধ্যায়।

অর্জ্জুন-বিষাদ।

"যদ্‌বক্ত্র-পঙ্কেরুহ-সম্প্রসূতং
নিষ্ঠামৃতং বিশ্ব-বিভাগ-নিষ্ঠম্।
সাধ্যেতরাভ্যাং পরিনিষ্ঠিতাস্তং
তং বাসুদেবং সততং নতোঽস্মি॥"

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ।
মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব কিমকুর্ব্বত সঞ্জয়॥ ১

ধৃতরাষ্ট্র—

সঞ্জয়!
ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ-আশে মিলে,
কি করিলা—আমার ও পাণ্ডবের দলে? ১

(১) সঞ্জয়—ধৃতরাষ্ট্রের সারথি। ধৃতরাষ্ট্র বৃদ্ধ, অন্ধ। তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে যাইয়া যুদ্ধ দেখিতে অক্ষম। তাঁহার যুদ্ধ দর্শনাভিলাষ পূর্ণ করিবার জন্য

বেদব্যাস ধাম্মিক সঞ্জয়কে দিব্য চক্ষু দিয়াছিলেন। সঞ্জয় হস্তিনাপুরে ধৃতরাষ্ট্রের কাছে থাকিয়াও কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ-ব্যাপার দিব্য চক্ষে দেখিতে-ছিলেন ও ধৃতরাষ্ট্রের নিকট তাহা যথাযথ বর্ণনা করিতেছিলেন। এই যুদ্ধ-বিবরণ জানিবার জন্য ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে জিজ্ঞাসা করিতেছেন।

ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে—কুরুক্ষেত্র ধর্ম্মক্ষেত্র, ধর্ম্মপ্রসব-ভূমি। এই স্থানে কুরুরাজ তপস্যা করিয়া সিদ্ধ হন। দেবগণ এই স্থানে যজ্ঞে উপস্থিত থাকেন। তাঁহারা এই স্থানে দেব-যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়াছিলেন (মধু)। জাবাল-শ্রুতিতে আছে,—"যদনু কুরুক্ষেত্রং দেবানাং দেবযজনং সর্ব্বেষাং ভূতানাং ব্রহ্মসদনম্।" শতপথ ব্রাহ্মণে আছে,—"কুরুক্ষেত্রং বৈ দেবযজনম্।" কুরুক্ষেত্র দেশ প্রাচীন ব্রহ্মাবর্ত্তের অন্তর্গত। ইহার এক দিকে সরস্বতী ও অপর দিকে দৃশদ্বতী নদী প্রবাহিত ছিল। ইহাই আর্য্যগণের প্রথম বসতিস্থান। বর্ত্তমান দিল্লী-কালকা রেলওয়ের কর্ণাল ও থানেশ্বর ষ্টেসনের মধ্যবর্ত্তী জনপদই কুরুক্ষেত্র। ইহার দৈর্ঘ্য ৩৫ ও প্রস্থ ৫।৬ ক্রোশ। ইহার মধ্যে এখনও দুই শতেরও অধিক তীর্থস্থান আছে। তন্মধ্যে থানেশ্বর ষ্টেসনের নিকটস্থ দ্বৈপায়ন হ্রদই প্রসিদ্ধ। দ্বৈপায়ন হ্রদ দৈর্ঘ্যে প্রস্থে প্রায় অর্দ্ধক্রোশ হইবে। বঙ্কিমবাবু তাঁহার গীতা-ব্যাখ্যায় কুরুক্ষেত্রের ঐতিহাসিক বিবরণ সন্নিবেশিত করিয়াছেন। এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

কি করিলা ?—অভিপ্রায় এই যে, স্থান-মাহাত্ম্যে, ধর্ম্ম-প্রভাবে তাহারা যুদ্ধ হইতে বিরত হইয়াছিল কি না? (মধু ও গিরি)। ধর্ম্মক্ষেত্র বলায় এই যুদ্ধের প্রারম্ভে অর্জ্জুনের বিষাদ ও যুদ্ধে বিরতি এবং শ্রীকৃষ্ণের এই গীতার উপদেশ সঙ্গত হইয়াছে।

আমার দলে—ইহা দ্বারা পাণ্ডবের প্রতি মমত্বের অভাব ও দ্রোহিতা, আর নিজ পক্ষের প্রতি মমত্ব অভিব্যক্ত হইয়াছে (মধু)।

দৃষ্ট্বা তু পাণ্ডবানীকং ব্যূঢ়ং দুর্য্যোধনস্তদা।
আচার্য্যমুপসঙ্গম্য রাজা বচনমব্রবীৎ ॥ ২

ব্যূহিত পাণ্ডব-সেনা দেখি দুর্য্যোধন,
আচার্য্য-সমীপে গিয়া কহিলা বচন ॥ ২

(২) পাণ্ডব-সেনা—(পাণ্ডবানীকং) = অনীকিনী অর্থে সৈন্য-বিভাগ বিশেষ। সাধারণ অর্থে সৈন্য।

অনীকিনী শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ, অর্থ (১) সেনা, (২) সৈন্য-বিভাগবিশেষ।

আর অনীকং (অনীক) শব্দ পুং ও ক্লীবলিঙ্গ, অর্থ সৈন্য। ইহা 'সৈন্য-বিভাগবিশেষ' অর্থে ব্যবহৃত দেখা যায় না। এখানে অনীক শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে; সুতরাং এস্থলে সৈন্য অর্থ গ্রহণীয়। যথা—

"ধ্বজিনী বাহিনী সেনা পৃতনাঽনীকিনী চমূঃ।
বরূথিনী বলং সৈন্যং চক্রঞ্চানীকমস্ত্রিয়াম্ ॥

চমূ শব্দও ঐরূপ দুই অর্থেই ব্যবহৃত হয়; [পরবর্ত্তী চমূর টীকা দ্রষ্টব্য]

আচার্য্য—ধনুর্বিদ্যা-বিশারদ দ্রোণাচার্য্য। তিনি কৌরব ও পাণ্ডবদের আচার্য্য ছিলেন। দুর্য্যোধন ও অর্জ্জুন উভয়কে তিনি ধনুর্বিদ্যা শিখাইয়াছিলেন। তাই অর্জ্জুনও তাঁহাকে পরে আচার্য্য বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। (১।৩৩)

পশ্যৈতাং পাণ্ডুপুত্রাণামাচার্য্য মহতীং চমূম্।
ব্যূঢ়াং দ্রুপদপুত্রেণ তব শিষ্যেণ ধীমতা ॥ ৩

হের, গুরো! পাণ্ডবের চমূ এ মহান্,
সাজায়েছে শিষ্য তব দ্রৌপদ ধীমান্ ॥ ৩

(৩) চমূ এ মহান্—চমূ অর্থাৎ সৈন্য। সাধারণতঃ সৈন্যের বিভাগ-

বিশেষকে চমূ বলে। এক্ষণে যেরূপ Battalion, Brigade, Division প্রভৃতি সেনা-বিভাগ আছে, পূর্ব্বেও সেইরূপ অনীকিনী, চমূ প্রভৃতি সেনা-বিভাগ ছিল। সে বিভাগ এইরূপ :—

"একেভৈকরথা ত্র্যশ্বা পত্তিঃ পঞ্চ পদাতয়ঃ।
পত্ত্যঙ্গৈস্ত্রিগুণৈঃ সর্ব্বৈঃ ক্রমাদাখ্যা যথোত্তরম্‌॥
সেনামুখং গুল্মগণৌ বাহিনী পৃতনা চমূঃ।
অনীকিনী দশানীকিন্যক্ষৌহিণ্যথসম্পদি॥" ইত্যমরঃ॥

ইহার অর্থ নিম্নে বিবৃত হইল :—

নাম	হস্তি-সংখ্যা	রথ-সংখ্যা	অশ্ব-সংখ্যা	পদাতিক-সংখ্যা	মোট।
পত্তি	১	১	৩	৫	১০
সেনামুখ	৩	৩	৯	১৫	৩০
গুল্ম	৯	৯	২৭	৪৫	৯০
গণ	২৭	২৭	৮১	১[illegible]	২৭০
বাহিনী	৮১	৮১	২৪৩	৪০৫	৮১০
পৃতনা	২৪৩	২৪৩	৭২৯	১২১৫	২৪৩০
চমূ	৭২৯	৭২৯	২১৮৭	৩৬৪৫	৭২৯০
অনীকিনী	২১৮৭	২১৮৭	৬৫৬১	১০৯৩৫	২১৮৭০
অক্ষৌহিণী	২১৮৭০	২১৮৭০	৬৫৬১০	১০৯৩৫০	২১৮৭০০

কুরুক্ষেত্রে কৌরবের পক্ষে ১১ অক্ষৌহিণী, আর পাণ্ডবের পক্ষে ৭ অক্ষৌহিণী সৈন্য ছিল। প্রায় সকলেই যুদ্ধে নিহত হইয়াছিল।

সাজায়েছে—যুদ্ধকালে ও অভিনির্য্যাণকালে সেনাপতি যে বিশেষ বিশেষ প্রণালীতে সেনা বিন্যস্ত করেন, তাহাকে ব্যূহ বলে। ব্যূহ সাধারণতঃ ছয় প্রকার। যথা,—মকর, শ্যেন, সূচি, শকট, বজ্র ও সর্ব্বতোভদ্র। পাণ্ডবেরা কুরুক্ষেত্রে বজ্রব্যূহ সাজাইয়াছিলেন (মধু)।

ধীমান্ শিষ্য—টীকাকারগণ বলেন, ব্যঙ্গচ্ছলে দুর্য্যোধন এরূপ বলিয়াছিলেন, দ্রুপদপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন শিষ্য হইয়া গুরুবধার্থে এইরূপ উদ্যোগ করিতেছিলেন এই জন্য, (মধু)। দ্রোণবধ জন্য দ্রুপদরাজ যজ্ঞকুণ্ড হইতে ধৃষ্টদ্যুম্নকে উৎপন্ন করিয়াছিলেন এইজন্য, (বলদেব)। ধীমান্ অর্থ সেনাব্যূহ বিন্যাসাদি-বুদ্ধিযুক্ত, (হনু)।

অত্র শূরা মহেষ্বাসা ভীমার্জ্জুনসমা যুধি।
যুযুধানো বিরাটশ্চ দ্রুপদশ্চ মহারথঃ ॥ ৪
ধৃষ্টকেতুশ্চেকিতানঃ কাশিরাজশ্চ বীর্য্যবান্।
পুরুজিৎ কুন্তিভোজশ্চ শৈব্যশ্চ নরপুঙ্গবঃ ॥ ৫
যুধামন্যুশ্চ বিক্রান্ত উত্তমৌজাশ্চ বীর্য্যবান্।
সৌভদ্রো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব্ব এব মহারথাঃ ॥ ৬
অস্মাকন্তু বিশিষ্টা যে তান্ নিবোধ দ্বিজোত্তম।
নায়কা মম সৈন্যস্য সংজ্ঞার্থং তান্ ব্রবীমি তে ॥ ৭
ভবান্ ভীষ্মশ্চ কর্ণশ্চ কৃপশ্চ সমিতিঞ্জয়ঃ।
অশ্বত্থামা বিকর্ণশ্চ সৌমদত্তিস্তথৈব চ ॥ ৮
অন্যে চ বহবঃ শূরা মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ।
নানাশস্ত্রপ্রহরণাঃ সর্ব্বে যুদ্ধবিশারদাঃ ॥ ৯

হোথা বীর মহাধন্বা রণে ভীমার্জ্জুন—
মহারথ বিরাট, দ্রুপদ, যুযুধান, ৪
বীর কাশীরাজ, ধৃষ্টকেতু, চেকিতান,
পুরুজিৎ, কুন্তিভোজ, শৈব্য নরোত্তম, ৫

বীর উত্তমৌজা, যুধামন্যু বলবান্,
সৌভদ্র, দ্রৌপদীসুত—মহারথগণ। ৬
আমাদের (ও) বিশিষ্ট যে সেনাপতিগণ
জ্ঞাতার্থ তোমায় কহি, শুন দ্বিজোত্তম—৭
তুমি, ভীষ্ম, কর্ণ, কৃপ—সর্ব্বজয়যুত,
অশ্বত্থামা, বিকর্ণ ও সোমদত্ত-সুত, ৮
জয়দ্রথ,—আরও শূর অস্ত্রধারী কত,
রণে পটু—মোর তরে প্রাণ দিতে রত। ৯

(৪—৯) যুযুধান—সাত্যকি। ধৃষ্টকেতু—চেদীরাজ। পুরুজিৎ ও কুন্তিভোজ—পুরুজিতের ভ্রাতা কুন্তিভোজ বসুদেব-কন্যা কুন্তী-দেবীকে দত্তককন্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন।' সৌভদ্র—অভিমন্যু। দ্রৌপদীসুত—দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র; যথা, প্রতিবিন্ধ্য, শ্রুতসোম, শ্রুত-কীর্ত্তি, শতানীক ও শ্রুতসেন।

মহারথ—মহারথ অতিরথ অর্দ্ধরথ প্রভৃতির লক্ষণ এই :—

"একো দশসহস্রাণি যোধয়েদ্ যস্তু ধন্বিনাম্।
শস্ত্রশাস্ত্র-প্রবীণশ্চ মহারথ ইতি স্মৃতঃ॥"
অমিতান্ যোধয়েদ্ যস্তু সংপ্রোক্তোঽতিরথস্তু সঃ।
রথী চৈকেন যো যোদ্ধা তন্ন্যূনোঽর্দ্ধরথঃ স্মৃতঃ॥

বিকর্ণ—দুর্য্যোধনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। সোমদত্ত-সুত—ভূরিশ্রবা।

অপর্য্যাপ্তং তদস্মাকং বলং ভীষ্মাভিরক্ষিতম্।
পর্য্যাপ্তং ত্বিদমেতেষাং বলং ভীমাভিরক্ষিতম্॥ ১০

অপর্য্যাপ্ত বল মম ভীষ্ম-সুরক্ষিত,
পর্য্যাপ্ত এদের বল ভীমের রক্ষিত॥ ১০

(১০) অপর্য্যাপ্ত ও পর্য্যাপ্ত—(১) অপর্য্যাপ্ত—যুদ্ধ করিতে অসমর্থ; পর্য্যাপ্ত—যুদ্ধ করিতে সমর্থ, (স্বামী ও রামানুজ)। ভীষ্মের উভয়পক্ষপাতিত্ব হেতু আমাদিগের বল পাণ্ডবসৈন্যের প্রতি অসমর্থ, আর ভীমের একপক্ষপাতিত্ব হেতু, পাণ্ডবদিগের বল, আমাদিগের সৈন্যের প্রতি সমর্থ, (হনু)। (২) অথবা—অপর্য্যাপ্ত=অপরিমিত ও অপরিগণিত; পর্য্যাপ্ত=পরিমিত—(গিরি, মধু ও বলদেব)। অথবা অপর্য্যাপ্ত—more than enough, পর্য্যাপ্ত—sufficient। এই দুই বিপরীত অর্থ মধ্যে শেষ অর্থ অধিক সঙ্গত। প্রথম টীকাকারগণ বুঝাইতে চাহেন যে, পাণ্ডবদলের মধ্যে ভীমার্জ্জুনসম অনেক যোদ্ধা মহারথ ও তাহাদের মহাচমূ ব্যূহবদ্ধ দেখিয়া, দুর্য্যোধন কিছু ভগ্নমনাঃ হইয়াছিলেন ও সেই জন্য ভীষ্ম তাঁহার হর্ষোৎপাদন জন্য পরে শঙ্খধ্বনি করেন। সুতরাং তিনি তাঁহার সৈন্যগণকে আপাততঃ যুদ্ধ করিতে অসমর্থ ও পাণ্ডবসেনাকে যুদ্ধ করিতে সমর্থ মনে করিতে পারেন। অন্য টীকাকারগণ বলেন যে, দুর্য্যোধন পাণ্ডবদের সাত অক্ষৌহিণী সেনা অপেক্ষা তাঁহার একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা অনেক অধিক এবং তাহা ভীম অপেক্ষা অধিক রণনিপুণ ভীষ্ম কর্ত্তৃক রক্ষিত দেখিয়া, তখন বিশেষ আশ্বস্ত হইয়াছিলেন।

অয়নেষু চ সর্ব্বেষু যথাভাগমবস্থিতাঃ।
ভীষ্মমেবাভিরক্ষন্তু ভবন্তঃ সর্ব্ব এব হি ॥ ১১

সকল অয়নে থাকি যথাভাগ মত,
ভীষ্মকে করুন রক্ষা হয়ে সম্মিলিত ॥ ১১

(১১) অয়ন—মর্য্যাদাক্রমে অগ্রপশ্চাৎ অবস্থিতির স্থান, (গিরি ও মধু); ব্যূহপথ (স্বামী ও বলদেব); ব্যূহ-প্রবেশ-মার্গ (হনু)।

ভীষ্মকে রক্ষা—ভীষ্ম প্রধান সেনাপতি বলিয়া ব্যূহ-মধ্যস্থলে থাকিবেন ও অন্য সেনাপতিগণ তাঁহাকে পার্শ্ব হইতে রক্ষা করিবেন—তবে সকলে রক্ষিত হইবে। যুদ্ধকালে প্রধান সেনাপতিকে বিনাশ করিবার জন্য প্রধানতঃ বিপক্ষগণ চেষ্টা করিত (মধু)।

তস্য সংজনয়ন্ হর্ষং কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহঃ।
সিংহনাদং বিনদ্যোচ্চৈঃ শঙ্খং দধ্মৌ প্রতাপবান্॥১২
ততঃ শঙ্খাশ্চ ভের্য্যশ্চ পণবানকগোমুখাঃ।
সহসৈবাভ্যহন্যন্ত স শব্দস্তুমুলোঽভবৎ॥ ১৩

কুরুবৃদ্ধ পিতামহ উল্লাসিতে তাঁরে,
প্রতাপেতে শঙ্খধ্বনি সিংহনাদ করে॥ ১২
গোমুখ পণবানক শঙ্খ ভেরী তবে,
বাজিল সহসা—নাদি তুমুল আরাবে॥ ১৩

(১২) করে—মুখে দুর্য্যোধনকে কোন উত্তর না দিয়া, যুদ্ধারম্ভ-সূচক শঙ্খধ্বনি করিলেন।

(১৩) পণব—মাদল। আনক—পটহ। গোমুখ—শৃঙ্গ প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র। তবে—সেনাপতি ভীষ্মকে প্রবৃত্ত দেখিয়া (বলদেব)।

ততঃ শ্বেতৈ র্হয়ৈ র্যুক্তে মহতি স্যন্দনে স্থিতৌ।
মাধবঃ পাণ্ডবশ্চৈব দিব্যৌ শঙ্খৌ প্রদধ্মতুঃ॥ ১৪

তবে শ্বেত অশ্বযুত মহারথোপরে,
মাধব অর্জ্জুন দিব্য শঙ্খধ্বনি করে॥ ১৪

(১৪) মহারথ—অর্জ্জুনের এই রথ অগ্নিদত্ত, ত্রিলোক-বিজয়ী ও মহাপ্রভাবযুক্ত (বলদেব)।

দিব্য শঙ্খধ্বনি করে—এখনকার (bugle) তুরীর মত পূর্ব্বে যুদ্ধে শঙ্খ ব্যবহৃত হইত। সেনাপতিগণ শঙ্খধ্বনি দ্বারা যুদ্ধে আদেশ ঘোষণা করিতেন।

দিব্য – অসাধারণ, অলৌকিক।

পাঞ্চজন্যং হৃষীকেশো দেবদত্তং ধনঞ্জয়ঃ।
পৌণ্ড্রং দধ্মৌ মহাশঙ্খং ভীমকর্ম্মা বৃকোদরঃ ॥১৫
অনন্তবিজয়ং রাজা কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
নকুলঃ সহদেবশ্চ সুঘোষমণিপুষ্পকৌ ॥ ১৬
কাশ্যশ্চ পরমেষ্বাসঃ শিখণ্ডী চ মহারথঃ।
ধৃষ্টদ্যুম্নো বিরাটশ্চ সাত্যকিশ্চাপরাজিতঃ ॥ ১৭
দ্রুপদো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব্বশঃ পৃথিবীপতে।
সৌভদ্রশ্চ মহাবাহুঃ শঙ্খান্ দধ্মুঃ পৃথক্ পৃথক্ ॥১৮

কৃষ্ণ—পাঞ্চজন্য, দেবদত্ত—ধনঞ্জয়,
ভীমকর্ম্মা ভীম—পৌণ্ড্র, মহাশঙ্খ লয় ॥ ১৫
অনন্ত-বিজয় শঙ্খ যুধিষ্ঠির ঘোষে;
সহদেব—মণিপুষ্পে, নকুল—সুঘোষে ॥ ১৬
ধৃষ্টদ্যুম্ন, কাশীরাজ—পরম ধানুকী,
বিরাট, শিখণ্ডী রথী, অজিত সাত্যকি, ১৭
দ্রুপদ, দ্রৌপদীপুত্র, সুভদ্রানন্দন,
সবে ঘোষে নিজ নিজ শঙ্খ, হে রাজন্! ১৮

---

(১৫) পাঞ্চজন্য—শ্রীকৃষ্ণ প্রভাসকূলে গুরু সন্দীপনির পুত্রকে রক্ষ করিবার জন্য পঞ্চজন-নামক সমুদ্রবাসী দৈত্যকে বধ করিয়া তাহার অস্থি হইতে এই শঙ্খ প্রস্তুত করান।

স ঘোষো ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাং হৃদয়ানি ব্যদারয়ৎ।
নভশ্চ পৃথিবীঞ্চৈব তুমুলোব্যনুনাদয়ন্‌॥ ১৯
অথ ব্যবস্থিতান্‌ দৃষ্ট্বা ধার্ত্তরাষ্ট্রান্‌ কপিধ্বজঃ।
প্রবৃত্তে শস্ত্রসম্পাতে ধনুরুদ্যম্য পাণ্ডবঃ।
হৃষীকেশং তদা বাক্যমিদমাহ মহীপতে॥ ২০

কাঁপাইয়া নভঃ পৃথ্বী তুমুল শবদে,
বাজিল সে ধ্বনি গিয়া কৌরবের হৃদে॥ ১৯
তবে পার্থ কপিধ্বজ—শরক্ষেপ তরে
ধনু তুলি—রণোদ্যত কৌরবেরে হেরে, ২০
হৃষীকেশে হে রাজন্‌! কহে এই মত,—

(২০) কপিধ্বজ—হনুমান অর্জ্জুনের রথের ধ্বজে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এইজন্য অর্জ্জুন কপিধ্বজ। অথবা তাঁহার ধ্বজায় সাধারণ বানরের মূর্ত্তি অঙ্কিত ছিল।

অর্জ্জুন উবাচ।

সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে রথং স্থাপয় মেঽচ্যুত॥২১
যাবদেতান্‌ নিরীক্ষেঽহং যোদ্ধুকামানবস্থিতান্‌।
কৈর্ম্ময়া সহ যোদ্ধব্যমস্মিন্‌ রণসমুদ্যমে॥২২
যোৎস্যমানানবেক্ষেঽহং য এতেঽত্র সমাগতাঃ।
ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য দুর্ব্বুদ্ধের্যুদ্ধে প্রিয়চিকীর্ষবঃ॥২৩

অর্জ্জুন—

উভ সেনা মাঝে রথ রাখ হে অচ্যুত! ২১
যাবৎ না হেরি আমি যুদ্ধকামিগণে
কে যুঝিবে মম সনে উপস্থিত রণে, ২২
দেখি যারা রণ-আশে এসেছে এখানে—
দুর্য্যোধন দুর্বোধের প্রিয়কারী রণে॥ ২৩

(২১) অচ্যুত—যাঁহার চ্যুতি বা বিকার নাই। রণক্ষেত্রে অবিচলিত থাকা সারথির প্রধান গুণ, (মধু)।

(২২) হেরি—নিরীক্ষণ পূর্ব্বক পরীক্ষা করি (হনু)। নির্দ্ধারণ করি। কে যুঝিবে—অর্জ্জুনের সমকক্ষ কেহ যোদ্ধা ছিল না বলিয়া, এই কথায় কিছু ব্যঙ্গ বা কৌতুকের ভাব আছে, (মধু)। এ ভাবার্থ সুসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না।

সঞ্জয় উবাচ।

এবমুক্তো হৃষীকেশো গুড়াকেশেন ভারত।
সেনয়োরুভয়োর্ম্মধ্যে স্থাপয়িত্বা রথোত্তমম্॥ ২৪
ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখতঃ সর্ব্বেষাঞ্চ মহীক্ষিতাম্।
উবাচ পার্থ পশ্যৈতান্ সমবেতান্ কুরূনিতি॥২৫

নিদ্রাজয়ী অর্জ্জুনের শুনি এ বচন,
হৃষীকেশ স্থাপি রথ সেনা-সন্ধিস্থান—২৪
যেথা ভীষ্ম দ্রোণ আদি ভূপতি সকল,
কহিলেন—"হের পার্থ অই কুরুদল॥" ২৫

(২৪) হৃষীকেশ—(হৃষীক) বিষয়েন্দ্রিয়ের (ঈশ) নিয়ন্তা, ইন্দ্রিয়-প্রবর্ত্তক ও অন্তর্য্যামী, (মধু)।

তত্রাপশ্যৎ স্থিতান্ পার্থঃ পিতৄনথ পিতামহান্।
আচার্য্যান্ মাতুলান্ ভ্রাতৄন্ পুত্রান্ পৌত্রান্ সখীংস্তথা।
শ্বশুরান্ সুহৃদশ্চৈব সেনয়োরুভয়োরপি ॥ ২৬

দেখে পার্থ তথা সেই উভ-সেনা-দলে
পিতৃব্য ও পিতামহ আচার্য্য মাতুলে,
পুত্র পৌত্র ভাই বন্ধু শ্বশুর সকলে ॥ ২৬

(২৬) পিতৃব্য—মূলে আছে পিতৃগণ, অর্থাৎ পিতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ—ভূরিশ্রবাঃ প্রভৃতি। পিতামহ—ভীষ্ম, সোমদত্ত প্রভৃতি। আচার্য্য—দ্রোণ, কৃপ প্রভৃতি। মাতুল—শল্য, শকুনি প্রভৃতি। ভ্রাতা—দুর্য্যোধন ইত্যাদি। পুত্র—পুত্রস্থানীয়, লক্ষণ ইত্যাদি। পৌত্র—লক্ষণের পুত্র ইত্যাদি। বন্ধু—অশ্বত্থামা, জয়দ্রথ ইত্যাদি, (বলদেব)।

তান্ সমীক্ষ্য স কৌন্তেয়ঃ সর্ব্বান্ বন্ধূনবস্থিতান্।
কৃপয়া পরয়াবিষ্টো বিষীদন্নিদমব্রবীৎ ॥ ২৭

সেই সব বন্ধুগণে হেরি অবস্থিত,
কহিল অর্জ্জুন—বড় দুঃখ-কৃপান্বিত,—২৭

(২৭) বন্ধুগণে—যাহারা পরস্পরকে স্নেহপাশে বদ্ধ করে, তাহারা, বান্ধব, (হনু)।

বড় দুঃখ-কৃপান্বিত—বিশেষরূপে অবসন্ন বা গ্লানিযুক্ত হইয়া এবং অতিশয় করুণাযুক্ত হইয়া, (হনু)।

অর্জ্জুন উবাচ।

দৃষ্ট্বেমান্ স্বজনান্ কৃষ্ণ যুযুৎসূন্ সমবস্থিতান্।
সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখঞ্চ পরিশুষ্যতি॥ ২৮

অর্জ্জুন—

হেরি রণ-আশে স্থিত এ স্বজনগণ—
অবসন্ন দেহ মম—বিশুষ্ক বদন,—২৮

(২৮) অবসন্ন—বিশীর্ণ, শিথিল, অবসাদযুক্ত, (হনু)।

বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষশ্চ জায়তে।
গাণ্ডীবং স্রংসতে হস্তাৎ ত্বক্ চৈব পরিদহ্যতে॥ ২৯
ন চ শক্নোম্যবস্থাতুং ভ্রমতীব চ মে মনঃ।
নিমিত্তানি চ পশ্যামি বিপরীতানি কেশব॥ ৩০

কাঁপে অঙ্গ মম, কৃষ্ণ—হয় রোমাঞ্চিত—
জ্বলে দেহ—হাত হ'তে গাণ্ডীব স্খলিত, ২৯
ভ্রান্ত মম মন, স্থির রহিতে না পারি,
লক্ষণ সকল কৃষ্ণ! বিপরীত হেরি॥ ৩০

(৩০) ভ্রান্ত মম মন—কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-বোধসাধন অন্তঃকরণ—মন। সেই মন ভ্রমযুক্ত হইয়াছে—অর্থাৎ কর্ত্তব্য অবধারণে অসমর্থ হইয়াছে; এজন্য স্থির থাকিতে অক্ষম, (হনু)। বিপরীত লক্ষণ—যথা বামনেত্র স্পন্দন, (গিরি); শকুনি প্রভৃতি দর্শন, (স্বামী); অশ্বব্যতীত রথের আপনাআপনি গতি, ইত্যাদি, (বলদেব)।

ন চ শ্রেয়োঽনুপশ্যামি হত্বা স্বজনমাহবে।
ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানি চ ॥ ৩১

—:*:—

বধিয়া স্বজনে রণে নাহি লাভ হেরি ;
জয়, রাজ্যসুখ, কৃষ্ণ ! নাহি ইচ্ছা করি ॥ ৩১

নাহি লাভ হেরি—যুদ্ধে লোকহত্যা করিলে লাভ নাই—তবে মরিলে স্বর্গলাভ হয়, একথা শাস্ত্রে আছে ; যথা—

"দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে সূর্য্যমণ্ডলভেদিনৌ।
পরিব্রাড়্ যোগযুক্তশ্চ রণে চাভিমুখো হতঃ ॥

কিং নো রাজ্যেন গোবিন্দ কিং ভোগৈর্জীবিতেন বা।
যেষামর্থে কাঙ্ক্ষিতং নো রাজ্যং ভোগাঃ সুখানি চ ॥৩২
ত ইমেঽবস্থিতা যুদ্ধে প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা ধনানি চ।
আচার্য্যাঃ পিতরঃ পুত্রাস্তথৈব চ পিতামহাঃ ॥ ৩৩
মাতুলাঃ শ্বশুরাঃ পৌত্রাঃ শ্যালাঃ সম্বন্ধিনস্তথা।
এতান্ ন হন্তুমিচ্ছামি ঘ্নতোঽপি মধুসূদন ॥৩৪
অপি ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য হেতোঃ কিংনু মহীকৃতে।
নিহত্য ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ নঃ কা প্রীতিঃ স্যাজ্জনার্দ্দন ॥৩৫

কেন রাজ্য ভোগ, কৃষ্ণ ! কেন বা জীবন—
চাহি রাজ্য ভোগ সুখ, যাদের কারণ, ৩২
অই তারা রণে স্থিত—ত্যজি ধন প্রাণ—
আচার্য্য পিতৃব্য পিতামহ পুত্রগণ, ৩৩

মাতুল শ্বশুর পৌত্র সম্বন্ধী শ্যালক।
বধিলেও ইচ্ছা নাহি হইতে ঘাতক—৩৪
ত্রিলোকের (ও) রাজ্যতরে,—ধরা কোন্ ছার ?
কি প্রীতি লভিব, বধি ধার্ত্তরাষ্ট্রে আর। ৩৫

পাপমেবাশ্রয়েদস্মান্ হত্বৈতানাততায়িনঃ।
তস্মান্নার্হা বয়ং হন্তুং ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ স্ববান্ধবান্।
স্বজনং হি কথং হত্বা সুখিনঃ স্যাম মাধব॥ ৩৬

পাপাশ্রয় হবে বধি আততায়িগণ,
বন্ধু সহ কুরুগণে কি কাজ নিধন।
কেমনে হইব সুখী বধিয়া স্বজন! ৩৬

(৩৬) আততায়ী—স্মৃতিতে আছে

"অগ্নিদো গরদশ্চৈব শস্ত্রপাণির্ধনাপহঃ।
ক্ষেত্রদারাপহারী চ ষড়েতে আততায়িনঃ॥"

অর্থাৎ "যে অগ্নিদ্বারা গৃহ দাহ করে,যে বিষ পান করায়, যে বিনাশার্থ শস্ত্র ধারণ করে, যে ধনাপহরণ করে, যে ভূমি অপহরণ করে এবং যে স্ত্রী হরণ করে, সেই আততায়ী।" এই সকল উপায়েই দুর্য্যোধন পাণ্ডবদের নির্য্যাতন ও বিনাশ চেষ্টা করিয়াছিল। অর্থশাস্ত্রমতে আততায়ি-বধে পাপ না থাকিলেও ধর্ম্মশাস্ত্রমতে আছে, (মধু)। কেননা অর্থশাস্ত্রে আছে—

"আততায়িনমায়ান্তং হন্যাদেবাবিচারয়ন্।
নাততায়িবধে দোষো হন্তুর্ভবতি কশ্চন॥"

আর ধর্ম্মশাস্ত্রে আছে,—"ন হিংস্যাৎ।"—ধর্ম্মশাস্ত্রে ও অর্থশাস্ত্রে বিরোধ হইলে, ধর্ম্মশাস্ত্রই অনুসরণীয়। যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন—

"স্মৃতির্ব্বিরোধে ন্যায়স্তু বলবান্ ব্যবহারতঃ।
অর্থশাস্ত্রাত্তু বলবৎ ধর্ম্মশাস্ত্রমিতি স্থিতিঃ॥

অথবা আততায়ি-বধে পাপ না থাকিলেও স্বজন-বধ বা গুরুজন-বধজন্য পাপ আছে (গিরি)। ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে আততায়িবধও অন্যায়, তাহাতে অধর্ম্ম হয়। তাহা উভয়লোকেই অকল্যাণের হেতু। তাহা যে কেবল পারলৌকিক সুখলাভের অন্তরায় এমন নহে, ইহলোকেও তাহা দুঃখহেতু, (হনু)।

যদ্যপ্যেতে ন পশ্যন্তি লোভোপহতচেতসঃ।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং মিত্রদ্রোহে চ পাতকম্॥৩৭
কথং ন জ্ঞেয়মস্মাভিঃ পাপাদস্মান্নিবর্ত্তিতুম্।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং প্রপশ্যদ্ভির্জনার্দ্দন॥ ৩৮

লোভ-হত-চিত্ত এরা, যদি নাহি হেরে
কুলক্ষয়ে দোষ, পাপ মিত্রবধ তরে; ৩৭
কিন্তু কুলক্ষয়ে দোষ জেনে, মোরা কেন,
নিবৃত্ত না হব, কৃষ্ণ! পাপ হ'তে হেন? ৩৮

(৩৭) লোভ-হত-চিত্ত—পরদ্রব্যাদিতে অভিলাষ=লোভ। ইহা মানুষের উভয়লোক-নষ্টকারী। এরূপ লোভের দ্বারা উপহতচিত্ত কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেক-বিজ্ঞান-বিরহিত, (হনু)।

কুলক্ষয়ে প্রণশ্যন্তি কুলধর্ম্মাঃ সনাতনাঃ।
ধর্ম্মে নষ্টে কুলং কৃৎস্নমধর্ম্মোঽভিভবত্যুত॥ ৩৯

কুলক্ষয়ে নষ্ট কুলধর্ম্ম সনাতন,
ধর্ম্ম-নাশে কুল হয় অধর্ম্মে পূরণ। ৩৯

(৩৯) কুলক্ষয়ে—গোত্রপুরুষগণের বিনাশে,(হনু)। সনাতন—পরম্পরাপ্রাপ্ত, চিরন্তন। কুল—অবশিষ্ট কুল। কুলধর্ম্ম—কুলোচিত ধর্ম্ম (মধু)।

অধর্ম্মাভিভবাৎ কৃষ্ণ প্রদুষ্যন্তি কুলস্ত্রিয়ঃ।
স্ত্রীষু দুষ্টাসু বার্ষ্ণেয় জায়তে বর্ণসঙ্করঃ॥ ৪০

অধর্ম্মেতে কুলস্ত্রীরা ব্যভিচারী হবে—
নারী দুষ্টা হলে কুলে সঙ্কর জন্মিবে॥ ৪০

(৪০) সঙ্কর জন্মিবে—পুরুষেরা যুদ্ধে হত হইলে, স্ত্রীলোকে কুলধর্ম্ম পালনে অক্ষম বলিয়া কুলধর্ম্মের লোপ হইবে এবং স্ত্রীলোকে বাধ্য হইয়া অসবর্ণ বিবাহ করিবে, অথবা ব্যভিচারিণী হইবে ও সে কারণ বর্ণসঙ্কর জন্মিবে। কোন বর্ণের বর্ণান্তর সহ মিশ্রণই—সঙ্কর (মধু)।

সঙ্করো নরকায়ৈব কুলঘ্নানাং কুলস্য চ।
পতন্তি পিতরোহ্যেষাং লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ॥ ৪১

সঙ্কর নরকহেতু—কুলে কুলঘ্নের
জলপিণ্ডলোপে পিতা পতিত তাদের॥ ৪১

(৪১) কুলে কুলঘ্নের—এই কুলঘাতিগণের এবং তাহাদের কুলের (হনু)। পিতা পতিত—ইহা যে কেবল সেই কুলঘাতিজনগণের এবং তাহাদের কুলে যাহারা বর্ত্তমান, তাহাদেরই নরকের কারণ হয়, এমন নহে; ইহা তাহাদের স্বর্গস্থ পিতাদেরও নরকের কারণ। কেন না, কুলের সকলের বিনাশে তাহাদের জলপিণ্ড-লোপ হইবে (হনু)। জলপিণ্ডলোপ—পুত্রগণ যুদ্ধে হত হইলে, জলপিণ্ড-লোপ হইবে।

দোষৈরেতৈঃ কুলঘ্নানাং বর্ণসঙ্করকারকৈঃ।
উৎসাদ্যন্তে জাতিধর্ম্মাঃ কুলধর্ম্মাশ্চ শাশ্বতাঃ ॥৪২

সঙ্করের সৃষ্টিদোষে কুলঘ্নের তবে,
চির জাতি-কুল-ধর্ম্ম উচ্ছেদ হইবে ॥ ৪২

(৪২) কুলধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম, চিরন্তন অগ্নিহোত্রাদি ক্রিয়াকলাপ। জাতিধর্ম্ম—বর্ণধর্ম্ম, (মধু)। কুলধর্ম্ম - কুলবিশেষের বিশেষ ধর্ম্ম। প্রত্যেক কুলের কতকগুলি বিশেষ ধর্ম্ম থাকে। সেই বিশেষ ধর্ম্ম থাকায়, এক কুল হইতে অন্য কুলের পার্থক্য। কুল অর্থে বংশও বলা যায় (হনু)। এই বিশেষ বংশ-ধর্ম্ম বা কুলধর্ম্ম—আদিপুরুষ হইতে পরম্পরাগত। এজন্য শাশ্বত বলা হইয়াছে। জাতি-ধর্ম্ম, এক অর্থে বর্ণ-ধর্ম্ম। ক্ষাত্রিয়াদি বর্ণের বিশেষ ধর্ম্ম ও কর্ম্ম—পরে অষ্টাদশ অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। আশ্রম-ধর্ম্মের এস্থলে উল্লেখ নাই। মূলে "চ" শব্দের দ্বারা তাহার ইঙ্গিত আছে, (হনু)।

উৎসন্নকুলধর্ম্মাণাং মনুষ্যাণাং জনার্দ্দন।
নরকে নিয়তং বাসো ভবতীত্যনুশুশ্রুম ॥ ৪৩

শুনিয়াছি জনার্দ্দন ! কুল-ধর্ম্ম নাশে
নরগণ নিত্যকাল নরকে নিবসে ॥ ৪৩

(৪৩) শুনিয়াছি—ব্যাসাদির মুখে শুনিয়াছি (হনু, স্বামী)। জনার্দ্দন—দেব-বিপক্ষভূত অসুরাদি জনের অর্দ্দনকারী অর্থাৎ পীড়নকারী। অথবা অধিকারী পুরুষেরা যাঁহার নিকট অভ্যুদয়াদি প্রার্থনা করেন, তিনিই জনার্দ্দন, (হনু)।

নরকে নিবসে—শ্রুতিতে আছে—

"প্রায়শ্চিত্তমকুর্ব্বাণাঃ পাপেষ্বভিরতা নরাঃ।
অপশ্চাত্তাপিনঃ পাপাৎ নিরয়ান্ যান্তি দারুণান্॥"

অহোবত মহৎ পাপং কর্ত্তুং ব্যবসিতা বয়ম্।
যদ্রাজ্যসুখলোভেন হন্তুং স্বজনমুদ্যতাঃ॥ ৪৪
যদি মামপ্রতীকারমশস্ত্রং শস্ত্রপাণয়ঃ।
ধার্ত্তরাষ্ট্রা রণে হন্যুস্তন্মে ক্ষেমতরং ভবেৎ॥ ৪৫

হায়! মোরা মহাপাপ উদ্যত করিতে,
রাজ্যসুখ-লোভে ব্যস্ত স্বজন বধিতে॥ ৪৪
যদি বধে মোরে—অস্ত্রহীন নিরুদ্যম
সশস্ত্র ধার্ত্তরাষ্ট্রেরা,—সেও ভাল মম॥ ৪৫

(৪৫) সেও ভাল—পাপের অনুৎপত্তি হেতু অত্যন্ত হিতকর (হয়)।

সঞ্জয় উবাচ।

এবমুক্ত্বার্জ্জুন সংখ্যে রথোপস্থ উপাবিশৎ।
বিসৃজ্য সশরং চাপং শোকসংবিগ্নমানসঃ॥ ৪৬

সঞ্জয়—

এত বলি ধনুঃশর ত্যজি রণাঙ্গণে,
বসে পার্থ রথক্রোড়ে শোকমগ্ন মনে॥ ৪৬

মহাভারতের উদ্যোগ পর্ব্বের অন্তর্গত ভগবদ্গীতা পর্ব্বাধ্যায়। তন্মধ্যে এই অধ্যায় হইতে ভগবদ্গীতার আরম্ভ। এই অধ্যায়ের নাম

"অর্জ্জুন-বিষাদ"। কাহারও মতে এই অধ্যায়ের নাম 'সৈন্য-দর্শন'। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে অর্জ্জুন উভয় পক্ষের সৈন্য-দর্শন করিয়া এবং যুদ্ধে আত্মীয়-স্বজন-বধ অপরিহার্য্য জানিয়া বিষাদিত ও শোকযুক্ত হইয়াছিলেন এবং বন্ধু-বধ দ্বারা অধর্ম্ম সঞ্চয় অপেক্ষা মরণও মঙ্গল; ইহা নিশ্চয় করিয়া, যুদ্ধ করিবার সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে শোক-মোহ দূর করিয়া ধর্ম্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত করাইবার জন্য, এই গীতার উপদেশ। পণ্ডিত নীলকণ্ঠ মজুমদার তাঁহার গীতা-রহস্যে বলিয়াছেন যে, কর্ত্তব্য-বিমুখকে কর্ত্তব্য-পরায়ণ করিবার জন্যই গীতার অবতারণা। সাধারণভাবে ইহাতে প্রাণিগণের শোক মোহ প্রভৃতি যে সংসারের বীজভূত দোষ, তাহারই উদ্ভবের কারণ যে অবিদ্যা, তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। আরও শোক-মোহের উদয়ে বিবেক-জ্ঞান অভিভূত হয়। এই শোক ও মোহ হেতু অর্জ্জুন ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিতে উদ্যত। এই শোক ও মোহ হেতু প্রাণিমাত্রই স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া, প্রতিষিদ্ধ-সেবাপর হয়; অথবা তাহাদের স্বধর্ম্মে প্রবৃত্তি ফলাভিসন্ধানমূলক ও অহঙ্কারপূর্ব্বক হইয়া থাকে। ইহাতে ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম উভয়ই সঞ্চিত হয়, তাহার ফলে সুখদুঃখ ভোগ হয়। ইহাই সংসার। আত্মজ্ঞান দ্বারা সেই শোক ও মোহের নিবারণ হয়, (শঙ্কর)।

গীতা-উপদেশের অবতারণা-জন্য এই অধ্যায়ের সূচনা। পণ্ডিত নীলকণ্ঠ মজুমদার মহাশয় কাব্যাংশে ইহার শ্রেষ্ঠত্ব দেখাইয়াছেন। দেশ কাল পাত্রের এরূপ আশ্চর্য্য সংস্থান আর কোথাও নাই। তাহা এস্থলে বিবৃত করিবার প্রয়োজন নাই।

গীতা-মাহাত্ম্যে আছে——

তস্মাদধ্যায়মাদ্যং যঃ পঠেদ্‌ যঃ সংস্মরেৎ তথা।
অভ্যাসাদস্য ন ভবেৎ ভবাম্ভোধিঃ সুদুস্তরঃ ॥

——:০:——

দ্বিতীয় অধ্যায়।

সাংখ্য যোগ।

"দ্বিতীয়ে শোকসন্তপ্তমর্জ্জুনং ব্রহ্মবিদ্যয়া।
প্রতিবোধ্য হরিশ্চক্রে স্থিত-প্রজ্ঞস্য লক্ষণম্॥
শোকপঙ্কং নিমগ্নং যঃ সাংখ্যযোগোপদেশতঃ।
উজ্জহারার্জ্জুনং ভক্তং স কৃষ্ণঃ শরণং মম॥"

সঞ্জয় উবাচ—

তং তথা কৃপয়াবিষ্টমশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণম্।
বিষীদন্তমিদং বাক্যমুবাচ মধুসূদনঃ॥ ১

সঞ্জয়—

এইরূপ কৃপাবিষ্ট আকুল-নয়ন
অশ্রুপূর্ণ বিষাদিত অর্জ্জুনে তখন,
কহিলেন এই কথা শ্রীমধুসূদন,—১

(১) কৃপাবিষ্ট—ইহা আমার—এইরূপ ব্যামোহ-বিশিষ্ট স্নেহ-বিশেষকে কৃপা বলা যায়; তাহা দ্বারা স্বাভাবিক ভাবে ব্যাপ্ত (মধু)।

মধুসূদন—শরণাপন্ন ব্রহ্মার প্রার্থনায় কল্পারম্ভে ব্রহ্মাকে বধোদ্যত সৃষ্টিবিরোধী তামসপ্রকৃতি মধু-অসুরের সংহর্ত্তা। দুষ্ট-নিগ্রহকারী। শরণাগতের শত্রুনাশকারী।

শ্রীভগবানুবাচ—

কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্।
অনার্য্যজুষ্টমস্বর্গ্যমকীর্ত্তিকরমর্জ্জুন ॥ ২

শ্রীভগবান্—

অর্জ্জুন! কি হেতু এই বিষম সময়ে,
কীর্ত্তিলোপী স্বর্গলোপী অনার্য্যসেবিত
হেন মলিনতা চিতে উপজিল তব? ২

(২) শ্রীভগবান্—যিনি ঐশ্বর্য্যাদি ভগ বা সম্পদ্‌যুক্ত—তিনিই ভগবান্। শাস্ত্রে আছে,—

ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।
জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চাপি ষণ্ণাং ভগ ইতি স্মৃতঃ॥

অথবা ভগ=বা জগতের উৎপত্তি কারণ যোনি বা ত্রিজগদাত্মিকা মায়া যাঁহাতে আছে, তিনিই শ্রীভগবান্। এই যোনি মহদ্‌ব্রহ্ম (গীতা ১৪।৩)।

এই রূপ ভগ যাঁহার আছে—সেই মহাভাগ্যবান্‌ই ভগবান্। ভগবানের লক্ষণ এই :—

উৎপত্তিং প্রলয়ঞ্চৈব ভূতানামাগতিং গতিম্।
বেত্তি বিদ্যামবিদ্যাঞ্চ স বাচ্যো ভগবানিতি।

গীতায় সর্ব্বত্র শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীভগবান্ বলা হইয়াছে। তিনি ষড়ৈশ্বর্য্য-যুক্ত পরমেশ্বর। শ্রীকৃষ্ণ এই গীতা উপদেশকালে আত্মযোগ-যুক্ত হইয়া পরমাত্মার সহিত একীভূত হইয়া, পরমেশ্বরের সহিত অভিন্নভাবে স্থিত হইয়া এই উপদেশ দিয়াছেন। এজন্য গীতাশাস্ত্র ঈশ্বরের উক্তি। ইহা শ্রুতির ন্যায় প্রামাণ্য—শ্রেষ্ঠ revolution। মহাভারতে এই ভগবদ্গীতাকে উপনিষদ্ বলা হইয়াছে। ইহা সর্ব্বোপনিষদ্ সার। গীতার উপদেশ শ্রীভগবান্-উক্ত।

বিষম সময়ে—যুদ্ধ সময়ে, সঙ্কটে (স্বামী, বলদেব) সভয় স্থানে (গিরি, মধু)।

কীর্ত্তিলোপী, স্বর্গলোপী—এই কথা, এই অধ্যায়ের ৩১ হইতে ৩৭ শ্লোকে বুঝান হইয়াছে।

অনার্য্যসেবিত—সাংখ্য ও কর্ম্মযোগীর অনুপযুক্ত। চিত্তশুদ্ধি জন্য যে স্বধর্ম্ম আচরণ করে, যে মোক্ষাভিলাষী—সেই আর্য্য, (বলদেব)। আর্য্যের অনুপযুক্ত। এস্থলে আর্য্য অর্থে শ্রেষ্ঠ, পূজনীয়। শ্রেষ্ঠব্যক্তিগণ যে আচরণ করেন, তাহার বিপরীত আচরণ—অনার্য্যসেবিত। শিষ্টগর্হিত যুদ্ধে পরাঙ্মুখতা (মধু, গিরি)।

মলিনতা—(মূলে আছে কশ্মল) স্বধর্ম্ম-বৈমুখ্য (স্বামী)। মোহ কলুষ (হনু)।

ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ ॥ ৩

হ'য়োনা কাতর আর; এ দীনতা কভু
সাজে কি তোমারে পার্থ? উঠ পরন্তপ,
হৃদয়-দৌর্ব্বল্য ক্ষুদ্র করি পরিত্যাগ ॥৩

(৩) দীনতা—(মূলে আছে ক্লৈব্যং) ক্লীবতা বা অধৈর্য্য (গিরি, মধু)। ভীরুতা (বলদেব)। কাতরতা (হনু)

অর্জ্জুন উবাচ।

কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে দ্রোণঞ্চ মধুসূদন।
ইষুভিঃ প্রতিযোৎস্যামি পূজার্হাবরিসূদন ॥ ৪

অর্জ্জুন—

কেমনে পারিব আমি হে মধুসূদন।
প্রতিরণ করিবারে অস্ত্র নিঃক্ষেপিয়া,
পূজ্য ভীষ্ম দ্রোণ প্রতি হে অরিসূদন। ৪

(৪) কেমনে পারিব—যে গুরুজনের সহিত বাক্যযুদ্ধ বা লীলা-ছলে যুদ্ধও অকর্ত্তব্য, তাঁহাদের যথার্থ যুদ্ধ করিতে পারিব না। (মধু)।

প্রতিরণ করিবারে (প্রতিযোৎস্যামি)—ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য্যের প্রতি বা সহ রণ করিতে (স্বামী)। তাঁহারা আমার প্রতি অস্ত্র নিক্ষেপ করিলে, তাহার প্রতিবিধান জন্য তাঁহাদের প্রতি অস্ত্র নিক্ষেপ পূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে (মধু)।

গুরূনহত্বা হি মহানুভাবান্‌
শ্রেয়ো ভোক্তুং ভৈক্ষ্যমপীহ লোকে।
হত্বার্থকামাংস্তু গুরূনিহৈব
ভুঞ্জীয় ভোগান্‌ রুধির-প্রদিগ্ধান্‌॥ ৫

না বধি মহাত্মা গুরুগণ
শ্রেয়ঃ হেথা ভিক্ষান্ন-ভোজন;—
গুরু বধি ভুঞ্জিব হেথায়
রুধিরাক্ত অর্থ কাম হায়! ৫

(৫) ভিক্ষান্ন—এস্থলে অর্জ্জুন স্বধর্ম্ম যুদ্ধ পরিত্যাগ করিয়া ভিক্ষারূপ পরধর্ম্ম বা যতিধর্ম্ম গ্রহণের অভিলাষ করিয়াছেন,—শঙ্করাচার্য্য-প্রমুখ ব্যাখ্যাকারগণ এই অর্থ করেন। কিন্তু যখন ইতিপূর্ব্বে বনবাসী কৃতসর্ব্বস্ব

পাণ্ডবদের ভিক্ষাই একরূপ উপজীবিকা ছিল—তখন এস্থলে সহজ অর্থ করিলেও চলে।

রুধিরাক্ত—(রুধির-প্রদিগ্ধান্)—প্রকৃষ্টরূপে রুধিরলিপ্ত। ইহ-কালে যে অর্থকাম ভোগ করিতে হইবে, তাহা গুরুগণের রুধির-লিপ্ত বলিয়া সর্ব্বদা মনে অনুভূত হইবে, আর পরকালে নরকে সেই রুধিরলিপ্ত অন্ন আহার করিতে হইবে, (হনু)।

ন চৈতদ্‌বিদ্মঃ কতরন্নোগরীয়ো
যদ্‌বা জয়েম যদি বা নো জয়েয়ুঃ।
যানেব হত্বা ন জিজীবিষামঃ
তেঽবস্থিতাঃ প্রমুখে ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ ॥ ৬

যদি জিনি—কিম্বা হই জিত,
কিবা শ্রেয়ঃ না বুঝি নিশ্চিত ;
বধি যারে না চাহি বাঁচিতে
সে ধার্ত্তরাষ্ট্রেরা সম্মুখেতে। ৬

(৬) কিবা শ্রেয়ঃ।—(মূলানুযায়ী অর্থ—কিবা গুরুতর) যুদ্ধ করা বা ভিক্ষা করা, ইহার মধ্যে আমার কি শ্রেয়ঃ (মধু ও গিরি) ; সাধারণতঃ কি কর্ত্তব্য (স্বামী)। গুরুগণকে হনন বা অহনন—এ দুয়ের কোনটিতে, অথবা ইঁহাদিগকে জয় করিলে, বা ইঁহাদিগের দ্বারা পরাজিত হইলে—কিসে অধিক লাভ হইবে। কেন না স্বজন-বধ হেতু আমাদিগের জয়ও পরাজয়মাত্র (হনু)। অর্জ্জুন যুদ্ধ না করিয়া পরাজিত হইলে, গুরু ও আত্মীয়-বধজনিত পাপ ও শোকযুক্ত হইবেন না, এ জন্য তাহাই শ্রেয়ঃ মনে করিতেছেন।

কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ
পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্ম্মসংমূঢ়চেতাঃ।
যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে
শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্ ॥ ৭

কৃপণতা-দোষে মুগ্ধমতি
ধর্ম্মে মূঢ়—জিজ্ঞাসি সম্প্রতি,
শ্রেয়ঃ যাহা শিখাও এখন
শিষ্য আমি লইনু শরণ ॥ ৭

কৃপণতা দোষ—দীনতা বা বিপন্ন-ভাবাপন্ন। "মহদ্‌বা ব্যসনং প্রাপ্তো দীনঃ কৃপণ উচ্যতে" (বাচস্পত্যম্)। যে আপনার অল্পস্বল্প ক্ষতিও সহ্য করিতে পারে না, সেই কৃপণ (গিরি)। ইহাদের বধসাধন করিয়া কিরূপে বাঁচিব, আত্মজ্ঞানাভাবে এই মমতা-লক্ষণই দোষ (মধু)। কৃপণতা এবং দোষ—অর্থাৎ ইহাদের বধ সাধন করিয়া কিরূপে বাঁচিব, এই কৃপণতা এবং কুলক্ষয় জন্য দোষ দর্শন (স্বামী, হনু) শ্রুতিতে আছে "যোঽবা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণঃ।"

ধর্ম্ম—অর্থাৎ ক্ষত্রিয়ের কার্য্য যুদ্ধ না ভিক্ষা, ইহার কোন্‌টা অর্জ্জুনের ধর্ম্মসঙ্গত (স্বামী); ধর্ম্ম—যে ধারণ করে, অর্থাৎ পরমাত্মা—তদ্‌বিষয়ে বিবেকহীন (গিরি); হিংসাপ্রধান ক্ষত্রিয়-ধর্ম্ম ও অহিংসারূপ যতিধর্ম্ম, ইহাদের মধ্যে কি শ্রেয়ঃ, তাহা অর্জ্জুন বুঝিতে পারেন নাই। বিবেক-বিজ্ঞানের অভাবে অর্জ্জুনের চিত্ত মোহযুক্ত হইয়াছে।

শিষ্য—শাসনার্হ (হনু)। জিজ্ঞাসু শিষ্য প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা দ্বারা গুরুর নিকট উপস্থিত হইলে, গুরু কৃপাযুক্ত হইয়া শিষ্যকে তত্ত্বোপদেশ প্রদান করেন। এ স্থলে অর্জ্জুনের উপদেশ লাভের আগ্রহ দেখান হইয়াছে।

ন হি প্রপশ্যামি মমাপনুদ্যাৎ
যচ্ছোকমুচ্ছোষণমিন্দ্রিয়াণাম্।
অবাপ্য ভূমাবসপত্নমৃদ্ধং
রাজ্যং সুরাণামপি চাধিপত্যম্॥ ৮

কিন্তু—না বুঝি কেমনে হব পার
যেই শোকে দহিছে অন্তর—
নিষ্কণ্টক রাজ্য পাই যদি
কিম্বা হই অমরার পতি॥ ৮

(৮) না বুঝি—ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম যুদ্ধ, অতএব যুদ্ধই কর্ত্তব্য—ভগবান্ এই উপদেশ দিবেন, ইহা আশঙ্কা করিয়াই অর্জ্জুন এরূপ বলিতেছেন (হনু)। যুদ্ধে জয় পরাজয় অনিশ্চিত। জয় নিশ্চিত হইলেও তাহার ফলে ভূমিতে অসপত্ন রাজ্য লাভ হইবে। কিন্তু তাহাতে আত্মীয়-স্বজন-বধজনিত শোক দূর হইবে না। এজন্য সংশয়। অর্জ্জুন ভগবান্‌কে উপদেষ্টা স্বীকার করিয়াও সংশয়যুক্ত হইতেছেন। ইহাতে উপদেষ্টার প্রতি শ্রদ্ধাহীনতা বুঝাইতেছে না, (মধু)।

দহিছে অন্তর—(উচ্ছোষণমিন্দ্রিয়াণাং)—যে শোক ইন্দ্রিয়গণকে শোষণ করে—এরূপ শোক, (হনু)।

অমরার পতি—ইন্দ্রত্ব অথবা ব্রহ্মত্ব (গিরি)। হিরণ্যগর্ভত্ব পর্য্যন্ত ঐশ্বর্য্য, (মধু)। যুদ্ধে মৃত্যু হইলে স্বর্গ—এমন কি ইন্দ্রত্ব পর্য্যন্ত লাভ হইতে পারে। শাস্ত্রে আছে—

"দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে সূর্য্যমণ্ডল-ভেদিনৌ।
পরিব্রাড়্‌যোগযুক্তশ্চ রণে চাভিমুখো হতঃ॥

সঞ্জয় উবাচ—

এবমুক্ত্বা হৃষীকেশং গুড়াকেশঃ পরন্তপঃ।
ন যোৎস্য ইতি গোবিন্দমুক্ত্বা তূষ্ণীং বভূব হ ॥৯

সঞ্জয়—

নিদ্রাজয়ী পার্থ তবে কহি এই কথা
হৃষীকেশে, রহে মৌন—ওহে পরন্তপ!
"যুদ্ধ করিব না" ইহা কহি গোবিন্দেরে ॥ ৯

(৯) মৌন রহে—(তূষ্ণীং বভূব)—তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন। পরন্তপ—ইহা ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি সম্বোধন।

তমুবাচ হৃষীকেশঃ প্রহসন্নিব ভারত।
সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে বিষীদন্তমিদং বচঃ ॥ ১০

উভয় সেনার মাঝে তবে হে রাজন্‌!
বিষাদিত অর্জ্জুনেরে যেন হাসি মুখে
কহিলেন হৃষীকেশ এরূপ বচন ॥ ১০

(১০) বিষাদিত—এই বিষাদের বিশেষ দৃষ্টান্ত দ্বারা এই গ্রন্থে প্রাণিগণের শোক-মোহ-বহুল সংসার অবিদ্যামূলক—ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে, (শঙ্কর ও হনু)।

যেন হাসি মুখে—ভ্রান্ত অর্জ্জুনের কথায় ঈষৎ লজ্জিত হইয়া ও ব্যাজচ্ছলে হাসিয়া (মধু ও বলদেব)। প্রসন্নমুখে (গিরি, হনু)। শেষ অর্থই অধিক সঙ্গত।

শ্রীভগবান্ উবাচ।

অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে।
গতাসূনগতাসূংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ ॥ ১১

শ্রীভগবান—

অশোচ্য যে—তার তরে করিতেছ শোক,
কহিছ বিজ্ঞের কথা ; কিন্তু পণ্ডিতেরা
মৃত কি জীবিত তরে নাহি করে শোক। ১১

(১১) অশোচ্য যে—ভীষ্ম দ্রোণাদি। তাঁহারা নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ-মুক্তস্বভাব আত্মা। সুতরাং তাঁহারা মরণের অধীন নহেন। তাঁহাদের ভাবী মৃত্যু সম্ভাবনায় শোক করাও কর্ত্তব্য নহে, (হনু)। যাঁহারা শোকের বিষয়ীভূত নহেন।

বিজ্ঞের কথা—নিজে বড় বিজ্ঞ এইরূপ অভিমান করিয়া কথা। রামানুজ অর্থ করেন, দেহাত্মস্বভাববিমুগ্ধ প্রজ্ঞা-বিক্ষিপ্ত বাক্য। মূলে আছে 'প্রজ্ঞাবাদান্'। মধুসূদন বলেন, "প্রজ্ঞা অবাদান্" বা জ্ঞানীর অবাচ্য বাক্য। পরমার্থ-জ্ঞান-নিমিত্ত বচন (হনু)।

শোক—স্থূল অথবা সূক্ষ্ম দেহের বিনাশ জন্য শোক, (বলদেব)। ইহা কিছু দূরার্থ। পণ্ডিতেরা অর্থাৎ পরমার্থবাদীরা শোক করেন না। তুমি প্রকৃত প্রজ্ঞাহীন এ জন্য শোক করিতেছ ; ইহাই সঙ্গত অর্থ। পণ্ডা—আত্মবিষয়িণী বুদ্ধি (শঙ্কর)।

গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের এই একাদশ শ্লোক হইতেই প্রকৃত ধর্ম্ম-তত্ত্ব আরম্ভ হইয়াছে। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে এই ধর্ম্মতত্ত্ব বুঝাইতেছেন। কেন ? কুরুক্ষেত্রে কৌরব ও পাণ্ডবগণ সসৈন্যে উপস্থিত হইয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিবেন, এমন সময় আত্মীয়গণের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে দেখিয়া

অর্জ্জুন শোকাভিভূত হইলেন, বলিলেন যুদ্ধ করিব না। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত করাইতেছেন, যুদ্ধ যে তখন নিতান্ত কর্ত্তব্য, তাহা অর্জ্জুনকে বুঝাইতেছেন। যাঁহারা মহাভারতের কথা জানেন, তাঁহাদের বলিতে হইবে না যে, যুদ্ধ যাহাতে না হয়, তাহার জন্য শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং দুর্য্যোধনের নিকট গিয়া পঞ্চ পাণ্ডবের জন্য পাঁচ খানি মাত্র গ্রাম চাহিয়াছিলেন। দুর্য্যোধন কিছুতেই সম্মত হন নাই। কিছু হইল না, শেষে যুদ্ধ অনিবার্য্য হইল। হয় পাণ্ডবদের যুদ্ধ করিয়া অন্যায়রূপে হৃত নিজ রাজ্যের পুনরুদ্ধার করিতে হইবে; নতুবা চিরকাল অরণ্যচারী হইয়া ভিক্ষা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হইবে। আবার যুদ্ধ করিয়া কৌরবের পাপ প্রবৃত্তির দমন না করিলে, তাহাদের পাপাচারের প্রশ্রয় দেওয়া হইবে। সুতরাং যুদ্ধ করিয়া জীবহত্যা করা ক্লেশকর হইলেও পাণ্ডবের পক্ষে এ ন্যায় যুদ্ধ নিতান্ত কর্ত্তব্য হইয়াছিল। এই জন্য এ যুদ্ধ যে ধর্ম্মকার্য্য, শ্রীকৃষ্ণ তাহাই অর্জ্জুনকে বুঝাইয়াছেন। মহাভারতে যতগুলি আদর্শ চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, তন্মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ ও ভীষ্ম ব্যতীত অর্জ্জুনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। সেই অর্জ্জুনকে যুদ্ধের কর্ত্তব্যতা বুঝাইবার জন্য সমস্ত ধর্ম্মতত্ত্বের অবতারণা করিতে হইয়াছিল।

সে বিষয়ের আর আলোচনার প্রয়োজন নাই। তবে এস্থলে আরও একটা কথা বলা আবশ্যক। করুণা ও দয়া প্রভৃতি কোমল বৃত্তি-যুক্ত লোকে 'যুদ্ধ' নামে ভয় পায়, ধর্ম্মযুদ্ধ যে সম্ভব তাহা বুঝে না। ধর্ম্মযুদ্ধ যে নিতান্ত কর্ত্তব্য, তাহা বুঝা প্রয়োজন। জগতে জীবন-সংগ্রাম (Struggle for existence) এবং যে যুক্ততম তাহার রক্ষা (Survival of the fittest) নিয়ম অপরিহার্য্য। বিবর্ত্তন নিয়মানুসারে জীবের উন্নতির জন্য উপযুক্ত (fittest) হইতে হইলে, আমাদের ধর্ম্মবৃত্তির স্ফূর্ত্তি ও অধর্ম্মবৃত্তির দমন করিতে হয়, জ্ঞান প্রভৃতি মানুষের শ্রেষ্ঠ বৃত্তি বা ধর্ম্মগুলির স্ফূর্ত্তি ও উন্নতি করিতে হয়। যাহা লোকের এই ধর্ম্মবৃত্তির

স্ফূর্ত্তির পথে বাধা দেয়, তাহার বিনাশ করিতে হয়। মনুষ্য-জগতের ক্রমোন্নতি জন্যও উপযুক্ত মানব-সম্প্রদায়ের রক্ষা ও অনুপযুক্ত মানবসমাজের লোপ অবশ্যম্ভাবী। যে মানব-সমাজ অধিক ধার্ম্মিক ও কর্ম্মঠ, জ্ঞানে কর্ম্মেও মার্জ্জিত বৃত্তি বিকাশে যে সমাজ যত অধিক অগ্রসর, সে সমাজ তত রক্ষার উপযুক্ত। সেই উন্নত সমাজেই ধর্ম্মরক্ষার জন্য ও সমাজবিশেষে উপযুক্ত ধর্ম্ম-বিকল্পের জন্য সকল উন্নত মানবের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। অধর্ম্ম বিনাশ জন্য যুদ্ধও যদি কর্ত্তব্য হয়, তবে তাহা ত্যাগ করিতে নাই। সেই যুদ্ধরূপ ঘৃণ্য কার্য্য করিতে গিয়াও কিরূপে মানুষে নিষ্কামভাবে কর্ত্তব্য সাধন করিতে পারে, গীতায় তাহা দেখান হইয়াছে। কর্ম্ম ও ধর্ম্মকে যে এক সূত্রে গ্রথিত করিতে পারা যায়, আর কোথায়ও তাহা এরূপে বুঝান নাই।

অর্জ্জুনের 'যুদ্ধ করিব না' বলিবার কারণ তিনটি। প্রথমতঃ, যুদ্ধ করিলে, স্বজনগণকে ও অন্য লোককে বধ করিতে হইবে,—লোকহত্যা বা লোককে কষ্ট দেওয়া অন্যায়। দ্বিতীয়তঃ, তাহাতে অর্জ্জুনের নিজের চির-জীবন মনে ক্লেশ থাকিবে ও কৃতপাপের জন্য পরকালে নরক-ভোগ হইবে। তৃতীয়তঃ যুদ্ধে লোকহত্যা করিলে, সমাজের ও কুলের ক্ষতি হইবে। ভগবান্‌কে এই তিনটি প্রশ্নেরই উত্তর দিতে হইয়াছিল। প্রথমতঃ কাহাকেও বধ করিলে, তাহার নিজের কোন ক্ষতি নাই। ইহা বুঝিতে হইলেই আত্মতত্ত্ব অর্থাৎ জীবাত্মার অমরতা ও জন্মান্তরবাদ বুঝিতে হয়, এবং শরীরের সহিত আত্মার সম্বন্ধ বুঝিতে হয়। এই (স্থূল) শরীরটা অসৎ আর আত্মা (বা জীবাত্মা) সৎ। জরাজীর্ণ শরীরটার ধ্বংস হইলে, অন্য নূতন শরীর লাভ করায় দেহীর লাভ ভিন্ন ক্ষতি নাই। শরীর-নাশ হইবার সম্ভাবনায় আপাততঃ কষ্ট মনে হয়। তাহা ক্ষণস্থায়ী, উহা আত্মাকে রঞ্জিত করিতে পারে না, ইহা বুঝিতে হয়। ইহা বুঝাইতে তই এই অধ্যায়ের ১২শ হইতে ৩০শ শ্লোকের অবতারণা।

দ্বিতীয়তঃ অর্জ্জুন নিজের পাপাশ্রয়ের কথা বলিয়াছেন, জীবহিংসাজনিত

ক্লেশ বা "অস্বর্গ্য ও অকীর্ত্তিকর মোহে" অভিভূত হইয়াছেন। এইজন্ত শ্রীকৃষ্ণকে বুঝাইতে হইয়াছে যে, ধর্ম্মযুদ্ধে পাপ নাই। অর্জ্জুনের স্বধর্ম্মই যুদ্ধ (৩১শ হইতে ৩৭শ শ্লোক)। ধর্ম্মযুদ্ধে পাপ ও নরকের পরিবর্ত্তে স্বর্গলাভই শাস্ত্র ও যুক্তিসঙ্গত এবং ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মী বা রাজসিক প্রকৃতিযুক্ত, সুখদুঃখ লাভালাভ গণনায় ব্যস্ত অর্জ্জুন যুদ্ধ-জয় করিলে, রাজ্য ও কীর্ত্তি লাভ করিয়া সুখী হইবেন, আজীবন দুঃখিত থাকিবেন না।

তাহার পর শ্রীকৃষ্ণ দেখাইয়াছেন যে, এ লাভালাভ পাপপুণ্য গণনা করিয়া কর্ম্ম করা বা ধর্ম্ম-কর্ম্ম হইতে বিরত হওয়া কর্ত্তব্য নহে। কর্ত্তব্য কর্ম্ম নিষ্কাম হইয়া করিতে হয়। বুদ্ধিকে কর্ম্মযোগে সমাহিত করিয়া, আসক্তি ও ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া, নির্দ্দ্বন্দ্ব হইয়া কর্ত্তব্য বোধে কর্ম্ম করিতে হয়। (এই সকল কথা ৩৮শ হইতে ৫৩শ শ্লোকে বুঝান আছে)। তাহার পর বুদ্ধি এইরূপে সমাহিত হইলে কি অবস্থা হয়, এবং কিরূপ কর্ম্ম করা যায়, তাহা ৫৫শ হইতে ৭২শ শ্লোকে বুঝাইয়া দ্বিতীয় অধ্যায় শেষ করা হইয়াছে।

অর্জ্জুনের 'যুদ্ধ করিব না' বলিবার যে তৃতীয় কারণ উপরে উল্লিখিত হইয়াছে, এই দ্বিতীয় অধ্যায়ে তাহার কোন উত্তর দেওয়া হয় নাই। সমস্ত গীতার মধ্যে তাহার কোন স্পষ্ট উত্তর নাই। তবে তাহার কতকটা আভাষ আছে। লোক-রক্ষার ভার ভগবানের। মানুষ কেবল লোকহিতার্থ কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিবে, কর্ম্মের গৌণফল দেখিয়া কর্ত্তব্যবুদ্ধিকে সংশয়যুক্ত করিবে না। ইহা এই প্রশ্নের এক উত্তর। কিন্তু ইহাই যথেষ্ট উত্তর নহে। যুদ্ধে লোকক্ষয় অনিবার্য্য এবং লোকক্ষয় হেতু কুল ও জাতি-বিশেষের অবনতিও অনিবার্য্য। তথাপি যুদ্ধের প্রয়োজন আছে। সংসারে সকল কর্ম্মেরই মিশ্র ফল। সকল কর্ম্মেরই সুফল ও কুফল উভয় ফলই আছে। যুদ্ধেরও সুফল ও কুফল উভয়ই আছে। যেখানে যুদ্ধ ধর্ম্মযুদ্ধ—যাহাতে কুফল অপেক্ষা সুফলের অধিক সম্ভাবনা, সেস্থলে যুদ্ধ কর্ত্তব্য। কালরূপে স্বয়ং ভগবান্‌ই লোকক্ষয়কারী। যুদ্ধ, মহামারী,

ভূমিকম্প দৈবদুর্ব্বিপাকাদি নানাপ্রকারে লোক ক্ষয় হয়। এই লোক-ক্ষয় ভগবানের কর্ম্ম। কখন বা মানুষ তাহাতে নিমিত্তমাত্র। এই কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে লোকক্ষয় ভগবানেরই অভিপ্রেত ; অর্জ্জুন তাহার নিমিত্ত-মাত্র। গীতায় পরে উক্ত হইয়াছে—

"কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো......
ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্ব্বমেব।
নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্।" ১১। ৩২, ৩৩।

ভগবানের কি অভিপ্রায় তাহা মানববুদ্ধির অগোচর। তাহার উপদেশ হয় না। এ জন্য গীতায় তাহার নির্দ্দেশ নাই। সে গূঢ়তত্ত্ব ভগবান অর্জ্জুনের নিকট ব্যক্ত করেন নাই। তবে ভগবান বলিয়াছেন, ধর্ম্মরক্ষার্থ ও অধর্ম্ম-দমনার্থ তিনি যুগে যুগে অবতীর্ণ হন। এই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ দ্বারা ধর্ম্ম-সংস্থাপন ও অধর্ম্ম-দমন অবশ্য তাঁহার অভিপ্রেত ছিল। তখন ক্ষত্রিয়-গণের অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছিল—ক্ষত্রিয় রাজারা অধর্ম্মাচারী হইয়াছিল। অতএব ধর্ম্মসংস্থাপনার্থ সেই ক্ষত্রিয় রাজ-শক্তির বিলোপ প্রয়োজন হইয়া-ছিল। ক্ষত্রিয় চন্দ্রবংশের ধ্বংসে ও পরে যদুবংশের বিনাশে ক্ষত্রিয়শক্তি (military power) নাশের সহিত অধর্ম্ম-দমন হইয়াছিল।

আর এই সময়ে ব্যাস এবং তাঁহার শিষ্যগণ বেদ-বিভাগ ও পুরাণ-দর্শনাদি শাস্ত্রের প্রচার দ্বারা যে ধর্ম্মসংস্থাপন করিয়াছিলেন, সে আশ্চর্য্য ধর্ম্মপ্রচার-ব্যাপারের তুলনা নাই। আর কোন যুগে, কোন কালে, কোন দেশে, সেরূপ ধর্ম্মসংস্থাপনের ব্যাপার সংঘটিত হয় নাই। কিন্তু এ সকলের মূল এই গীতা। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং যে ধর্ম্মের উপদেশ দেন, ভগবান্ ব্যাস ও তাঁহার শিষ্যগণ তাহারই অনুসরণ করিয়া, ধর্ম্ম-স্থাপন করিয়াছিলেন।

যাহা হউক, কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে ও যদুবংশ-ধ্বংসে ভারতে যে ক্ষত্রিয়-শক্তির লোপ হইয়াছিল, তাহা ভারতে আর বিকাশ হইতে পায় নাই। বুঝি

ক্ষত্রিয়-শক্তিকে অভিভূত করিয়া, কেবল ধর্ম্ম দ্বারা "মহাভারত"-রাজ্য সংস্থাপনই ভগবানের অভিপ্রেত ছিল। মানুষের কি সাধ্য যে ভগবানের গূঢ় অভিপ্রায়,—তাঁহার কল্পনা বুঝিতে পারে!

সে বিষয়ের আর আলোচনার প্রয়োজন নাই। যাহাহউক এস্থলে আর একটি কথার উল্লেখ প্রয়োজন। 'গীতা' ও 'চণ্ডী'র আরম্ভ একই প্রকারের। দুর্য্যোধন প্রভৃতি, যাহারা পাণ্ডবদের নিতান্ত আততায়ী, তাহাদের জন্যও অর্জ্জুনের মমতা হইতেছিল, যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্তি হইতেছিল না। সমগ্র ধর্ম্ম-তত্ত্বের সার মর্ম্ম বুঝাইয়া, তবে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের মোহ দূর করিলেন। ইহাই গীতার আরম্ভ। চণ্ডীতে আছে যে সুরথ রাজার অনুচরগণ বিশ্বাসঘাতক হইয়া তাঁহার রাজ্য লইল, সুরথকে বনবাসী করিল। আর সমাধি-নামক বৈশ্যের সংগৃহীত অর্থ তদীয় স্ত্রী পুত্র আত্মসাৎ করিল, তাহাকে বনে তাড়াইয়া দিল। তথাপি উহাদের সেই অনুচর ও স্ত্রী পুত্র জন্য মমতা রহিয়া গেল। যে প্রকৃতির গুণ বা শক্তি অথবা মায়া হইতে এই মমতা প্রভৃতি আসক্তি জন্মে, তাহার তত্ত্ব বুঝাইয়াই মেধস ঋষি সুরথ ও সমাধিকে মোহ হইতে নিবৃত্ত করিতে পারিয়াছিলেন। এই মমত্ব বা অহঙ্কারই ধর্ম্মের অন্তরায় এবং এই দুইখানি অপূর্ব্ব ধর্ম্মগ্রন্থেই সেই তত্ত্ব প্রধানতঃ বুঝান আছে। তাই বলিতেছিলাম, গীতার ও চণ্ডীর উপক্রমণিকায় অত্যন্ত সাদৃশ্য আছে।

আরও একটি কথা বুঝিতে হইবে। দুর্য্যোধনাদির ন্যায় যাহারা ঘোর আততায়ী, তাহাদের উপর ক্রোধ হওয়াই সাধারণ লোকের স্বভাব। চিত্তের সেই স্বাভাবিক বৃত্তির দমন করিয়া, দয়া প্রভৃতি ধর্ম্মের বীজভূত সাত্ত্বিক-সহানুভূতিবশে অর্জ্জুন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলেও তাঁহার ইন্দ্রিয় ও মন যে বশীভূত, তিনি যে 'দৈব-সম্পদযুক্ত" তাহার পরিচয় দিয়াছেন। সুতরাং তিনি ধর্ম্মের গূঢ় তত্ত্ব ধারণা করিবার অধিকারী ছিলেন। অনেক টীকাকারগণ যে তাঁহাকে নিম্নাধিকারী বলিয়াছেন, তাহা সঙ্গত নহে।

ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ।
ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্ব্বে বয়মতঃপরম্ ॥ ১২

আমি কিম্বা তুমি আর এই নৃপগণ,
না ছিলাম—নহে তাহা, কিম্বা সবে আর,
অতঃপর না রহিব—তা নহে কখন ॥ ১২

(১২) আমি কিম্বা তুমি—এই শ্লোকের অর্থ এই যে, কোন সময়েই আমি ছিলাম না—তাহা নহে, অর্থাৎ সর্ব্বদাই ছিলাম। সেইরূপ তুমি বা এই সব নরপতিগণ পূর্ব্বে ছিলেন না, তাহা নহে। সেইরূপ মৃত্যুর পরে আমরা থাকিব না—বিনষ্ট হইয়া যাইব—তাহাও নহে। অর্থাৎ জন্মে (দেহগ্রহণে) আত্মারি জন্ম হয় না, এবং মৃত্যুতে (দেহের বিয়োগে) আত্মার মৃত্যু হয় না। আত্মস্বরূপ সর্ব্বদেহীই ত্রিকালে নিত্য। এ স্থলে আমি, তুমি ও এই নৃপতিগণ—এই বহুবচন দেহভেদ-অভিপ্রায়ে উক্ত, আত্মভেদ-অভিপ্রায়ে উক্ত হয় নাই (শঙ্কর)। হনুমান তাঁহার পৈশাচ ভাষ্যে বলিয়াছেন, যে অতীত কালে আমাদের সকলের দেহের উৎপত্তি-বিনাশে আমাদের উৎপত্তি-বিনাশ হয় নাই, ভবিষ্যতেও দেহের উৎপত্তি-বিনাশে আমাদের উৎপত্তি-বিনাশের আশঙ্কা নাই। বহু দেহে জায়মান হেতু একই আত্মার বহুত্ব। দেহিরূপে—জীবাত্মরূপে আত্মার বহুত্ব, এবং দেহ-সংযোগ হেতু তাহার জন্ম, ও দেহ-নাশ হেতুই আত্মার নাশ প্রতীয়মান হয়। প্রকৃতপক্ষে আত্মা এক, তাহার জন্ম মৃত্যু নাই।

এস্থলে দ্বৈত, অদ্বৈত ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীদের মধ্যে মহাতর্ক উপস্থিত। রামানুজ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী। তিনি বলেন, "আমি সর্ব্বেশ্বর পরমাত্মা যেরূপ নিত্য, সেইরূপ তুমি প্রভৃতি ক্ষেত্রজ্ঞ জীবের আত্মা নিত্য।" এস্থলে তাঁহার মতে পরমাত্মায় ও জীবাত্মায় প্রভেদ করা হইয়াছে। শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি

অদ্বৈতবাদীদের ব্যাখ্যা খণ্ডন করিয়া, রামানুজ বলেন যে, এস্থলে অজ্ঞান-কৃত ভেদ-দর্শনমূলক ব্যবহারিক ভাবে উপাধি হেতু জীবাত্মার ও পরমাত্মার প্রভেদ করা হয় নাই। স্বয়ং ভগবান্ যখন অর্জ্জুনের ন্যায় শিষ্যের উপদেষ্টা, তখন তিনি এরূপ ব্যবহারিক ও মিথ্যা ভেদ করিতে পারেন না। আরও এই ভেদাভেদবাদ শ্রুতিসঙ্গত। শঙ্কর ও গিরি ইহার উত্তরে বলেন যে, অর্জ্জুন তখন যেরূপ মোহযুক্ত হইয়াছিলেন, তাহাতে অদ্বৈত জ্ঞান তাঁহার ধারণা হইবে না বলিয়া এরূপ উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। অথবা ব্যবহারিক অর্থে আত্মাকে ব্যষ্টিভাবে গ্রহণ করা হইয়াছে। আর পরমাত্মার যেমন উৎপত্তি বিনাশ নাই, সেইরূপ সৃষ্টির অবস্থায় আত্মার যে সকল অংশ অগ্নিস্ফুলিঙ্গবৎ ভিন্ন ভাবে জীবাত্মরূপে বিচরণ করে, তাহারও কখন জন্মমৃত্যু নাই। এইরূপ সৃষ্টির অবস্থায় জীবাত্মার নিত্যত্ব প্রভৃতি এই শ্লোকে ও পরের কয়টি শ্লোকে উল্লিখিত হইয়াছে।

আর এক কথা। এ স্থলে সাংখ্যের বহুপুরুষবাদ সূচিত হইয়াছে, এ কথা বলা যাইতে পারে। এই অধ্যায়ের নাম সাংখ্যযোগ। সাংখ্য শাস্ত্র মতে শুদ্ধ মুক্ত বুদ্ধ স্বভাব—"জ্ঞ" পুরুষ বহু। কতক পুরুষ মুক্ত, আর কতক পুরুষ—অবিদ্যাহেতু প্রকৃতিবদ্ধ। যাঁহারা প্রকৃতিবদ্ধ, তাঁহারা ক্রমে সাধনাবলে সাংখ্যজ্ঞান লাভ করিয়া, সিদ্ধ হইতে পারেন। সিদ্ধ হইয়া তাঁহারা ঐশ্বর্য্য লাভ করেন, জগতের নিয়ন্তৃত্ব গ্রহণ করেন, হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মাদি হয়েন। সাংখ্য মতে কোন নিত্যেশ্বর নাই।

যাহা হউক, সাংখ্যশাস্ত্র—প্রকৃতি হইতে এবং প্রকৃতির বিকার—বুদ্ধি, অহঙ্কার, মন প্রভৃতি হইতে পুরুষ যে সম্পূর্ণ বিভিন্ন, তাহাই প্রতিপন্ন করিয়াছেন। সেই পুরুষ—বেদান্তের আত্মা। আত্মার প্রকৃতস্বরূপ কি, তাহা বেদান্তদর্শনে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। গীতাতে পরে এই সাংখ্যের বহু পুরুষবাদের সহিত বেদান্তের ব্রহ্মবাদের সামঞ্জস্য করা হইয়াছে। ইহাতে পরে দেখান হইয়াছে যে, অব্যক্ত হইতেও অব্যক্ত পরব্রহ্মের এক

অংশ কলা বা পাদ চরাচর জগৎ; কারণ কূটস্থ অব্যক্ত অক্ষর, পরম অব্যয় ব্রহ্মরূপে ব্যাপ্ত হইয়া সৃষ্টিতে পুরুষোত্তম বীজপ্রদ পিতা ও ঈশ্বররূপে প্রকাশিত। তাঁহার দুইরূপ প্রকৃতি,—এক দৈবী, পরা বা জীবপ্রকৃতি, যাহা হইতে ভূত বা ভোক্তা ক্ষর পুরুষ, ক্ষেত্রজ্ঞ জীব রূপে উদ্ভূত। আর এক অপরা বা ত্রিগুণাত্মিকা, জড় জ্ঞেয় প্রকৃতি, যাহা হইতে জগদ্‌যোনি মহান্ বা চৈতন্য পরিণাম পর্য্যন্ত ক্ষেত্র উদ্ভূত হইয়া ও বিকৃত হইয়া এই জগৎরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রতিক্ষেত্রে বা দেহে, ভগবানই প্রকৃত ক্ষেত্রজ্ঞ, তাহা ঈশ্বরের সনাতন জীবভূত অধ্যাত্মভাব (গীতা ১৫।৭), তাহা জ্ঞাতা-রূপে জগৎ ধারণ করে (৭।৫), আবার মহালয় কালে ঈশ্বরে লীন হয় (৮।১৯)। অথচ এই পুরুষ-প্রকৃতিরূপ ঈশ্বরের ভাব অনাদি (১৩।১৯)। ইহা কেবল সৃষ্টিকালেই নিত্য ও প্রকট অবস্থায় থাকে (৯।৮)। এই তত্ত্ব বুঝিলে এই দ্বিতীয় অধ্যায়ে যে জীবাত্মার স্বরূপ বা সাংখ্যজ্ঞান কথিত হইয়াছে, এবং গীতার দ্বৈতাদ্বৈতবাদ ও বহুপুরুষবাদ প্রভৃতির কিরূপ সামঞ্জস্য হইয়াছে, তাহা বুঝা যাইবে। উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

এই শ্লোকে কেবল আত্মার অমরত্ব মাত্র বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। অন্য কোন তত্ত্ব উক্ত হয় নাই। আত্মা এক কি বহু, তাহা-সূচিত হয় নাই। জীব ও জগৎ সৎ অথবা পারমার্থিক ভাবে অসৎ, ইহার কিছুই উল্লিখিত হয় নাই। সুতরাং এই শ্লোক উপলক্ষে অন্য তত্ত্বের আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। এস্থলে কেবল বুঝিতে হইবে যে, তোমার বা আমার কাহারও আত্মার স্বরূপতঃ আদি নাই, অন্ত নাই, জন্ম দ্বারা তাহার উৎপত্তি হয় না ও দেহনাশে তাহার নাশ হয় না।

যাহা হউক এই অধ্যায়ে "তুমি আমি এই নরপতিগণ" প্রভৃতি বহু-ব্যক্তির কথা আছে, সেইরূপ ইহাদের সকলকে "দেহী" বলা হইয়াছে। অর্থাৎ বহু-দেহ-সংযোগ হেতু আত্মার পৃথক্ত্ব ব্যবহারিক ভাবে অঙ্গীকৃত হইয়াছে। তাহাতে অদ্বৈতবাদের সহিত বিরোধ হয় নাই।

দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি ॥ ১৩

কৌমার যৌবন জরা, এ দেহে যেমন—
দেহীদের সেইরূপ দেহান্তর হয়,
তাহে কভু ধীরগণ নহে মুগ্ধমন। ১৩

(১৩) দেহী—(১৮ শ্লোকে আছে শরীরী) লিঙ্গশরীরধারী জীবাত্মা (মধু)।

মধুসূদন আরও অদ্বৈতবাদ অবলম্বন করিয়া ইহার অর্থ করেন,—এক ব্রহ্মেরই ভোগ জন্য অধ্যাস হেতু সমস্ত জগতে নানারূপ শরীরধারী পরমাত্মাই দেহাভিমানী জীবাত্মা।

দেহান্তর—সাংখ্যমতে শরীর দুই প্রকার—সূক্ষ্ম শরীর এবং স্থূল বা মাতা-পিতৃজ শরীর। মৃত্যুতে কেবল স্থূল বা অন্নময় শরীরের ধ্বংস হয়। জীবাত্মা সূক্ষ্ম শরীরের সহিত এ জীবনের ও পূর্ব্ব জীবনের সংস্কার গুলিতে বদ্ধ হইয়া প্রয়াণ করে। বেদান্তমতে—কারণশরীর ও লিঙ্গশরীর আত্মাকে বদ্ধ করে। এই শরীর পাঁচটি কোষ বা আবরণ যুক্ত। যথা অন্ন, প্রাণ, মন, বিজ্ঞান ও আনন্দময় কোষ। মৃত্যুতে কেবল অন্নময় কোষের ধ্বংস হয়। মোক্ষ লাভেই সকল কোষ গুলির ধ্বংস হয়। পুরুষ এই শরীর হইতে ভিন্ন।

এই শ্লোকে জন্মান্তরবাদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পরে বিভিন্ন শ্লোকে এই জন্মান্তরতত্ত্ব বিশেষরূপে বিবৃত হইবে, তাহা এস্থলে উল্লেখের প্রয়োজন নাই। বেদ-সংহিতায় এ পৃথিবীতে পুনর্জন্মের কথা স্পষ্ট করিয়া উল্লিখিত হয় নাই। মৃত্যুর পর পরলোকে—বিশেষতঃ পিতৃলোকে অবস্থান এবং তথায় যথাভিলষিত শরীর ধারণের কথা বেদে পাওয়া যায়। কারণ

বেদে যজ্ঞাদি বৈদিক কর্ম্মফলে যে দেবযানে ও পিতৃযানে গতির কথা মাত্র উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাতে আর পৃথিবীলোকে পুনরাবর্ত্তন হয় না। তথাপি পৃথিবী-লোকে স্থিত পিতৃগণের কথা বেদে উক্ত হইয়াছে। (অথর্ব্ব-সংহিতা ১৮।২।৪১)। যাহা হউক, উপনিষদে, দেহান্তরের পর এ পৃথিবীতে পুনরাবর্ত্তনের কথা আছে (বৃহদারণ্যক ৬।৪)। পুণ্যবান্ লোকের রমণীয় ব্রাহ্মণাদি যোনি প্রাপ্তি এবং পাপাচারিগণের শ্বপাক, শূকর চণ্ডালাদি যোনিপ্রাপ্তিরও কথা আছে (ছান্দোগ্য উপ, ৫।৭।১০। সূত্র ধর্ম্ম-সংহিতা পুরাণাদি সকল শাস্ত্রেই এই জন্মান্তরবাদ বিবৃত হইয়াছে। বেদান্ত দর্শনে মৃত্যুর পর গতি ও পুনর্জ্জন্ম তত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এই জন্মান্তরবাদ আমাদের ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের মূল ভিত্তি।

আমাদের শাস্ত্র অনুসারে, মৃত্যুর পর মানুষ সাধারণতঃ আতিবাহিক শরীর গ্রহণ করে। তাহা সূক্ষ্ম ভৌতিক—বিশেষতঃ বায়বীয়। প্রথমে সেই বায়বীয় শরীরে অন্তরীক্ষে প্রেতলোকে মৃতের অবস্থান হয়। পরে কর্ম্মানুসারে স্বর্গাদিতে তাহার গতি হয়। কর্ম্মক্ষয়ে আবার মর্ত্ত্যলোকে তাহার জন্ম হয়। এইরূপে সংসারে তাহার গতায়াত চলিতে থাকে।

তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে আছে—"অন্নময়াদ্যানন্দময়াস্তং পঞ্চকোষান্ কল্পয়িত্বা তদধিষ্ঠানং কল্পিতং ব্রহ্মপুচ্ছং প্রতিষ্ঠা।" ব্যষ্টি পুরুষের ন্যায় সমষ্টি আত্মার বা অব্যয় পুরুষ ঈশ্বরের পঞ্চকোষময় দেহ আছে। যথা, (১) পঞ্চীকৃত পঞ্চমহাভূত ও তাহার কার্য্যাত্মক স্থূল সমষ্টিই অন্নময়কোষ, ইহাই বিরাট মূর্ত্তি। (২) উহার কারণ স্বরূপ অপঞ্চীকৃত পঞ্চসূক্ষ্মভূত ও তাহার কার্য্যাত্মক ক্রিয়াশক্তি সহ প্রাণময় কোষ। (৩) তাহার নামমাত্রাত্মক সমষ্টি জ্ঞানশক্তি মনোময় কোষ। এবং (৪) তাহার স্বরূপাত্মক বিজ্ঞানময় কোষ। এই প্রাণ, মন ও বিজ্ঞান কোষ বা সূক্ষ্ম সমষ্টিই হিরণ্য- গর্ভাখ্য লিঙ্গশরীর। আর (৫) উহার কারণাত্মক মায়া-

উপহিত চৈতন্য সর্ব্বসংস্কার শেষ আত্মাই অব্যক্ত নামক আনন্দময় কোষ। (মধু)।

বলদেব বলেন—দেহী অর্থাৎ দেহস্বভাব জীব, কর্ম্মবিপাক স্বরূপজ্ঞ জীব।

মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ।
আগমাপায়িনোঽনিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত ॥ ১৪

শীত গ্রীষ্ম, সুখ দুঃখ জন্মে ধনঞ্জয়!
ইন্দ্রিয়ে-বিষয়-বোধে ; অনিত্য এ সব,—
জন্মি'—হয় লয়, তাহে হ'য়ো না অধীর ॥ ১৪

(১৪) শীতগ্রীষ্ম—আত্মার অমরত্ব ও জন্মান্তর-তত্ত্ব যে বিশ্বাস করে, তাহার আত্মবিনাশ নিমিত্ত মোহ না হইতে পারে ; কিন্তু শীত-উষ্ণ বোধ ও সুখের বিয়োগ আর দুঃখের সংযোগ হেতু শোক তাহার পক্ষেও সম্ভব। আত্মজ্ঞানীর তাহাতে অভিভূত না হইবার উপদেশ এস্থলে দেওয়া হইয়াছে। (শঙ্কর)।

ইন্দ্রিয়ে-বিষয়-বোধে—মূলে আছে 'মাত্রা স্পর্শ,' অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয়ের অনুভব। স্বামী বলেন, মাত্রা অর্থাৎ ইন্দ্রিয়, তাহার সহিত বাহ্য-বিষয়ের স্পর্শ বা সম্বন্ধই আমাদের সুখ-দুঃখানুভূতির কারণ। শঙ্কর বলেন, যাহার দ্বারা শব্দাদি বাহ্য বিষয় সকল পরিমাণ বা মনন করা যায়, সেই ইন্দ্রিয়গণই মাত্রা এবং শব্দাদি বাহ্য-বিষয়ের সহিত সংযোগই স্পর্শ ; কিংবা যে বিষয়কে ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব করা যায়, তাহাই স্পর্শ। এই মাত্রা এবং স্পর্শ অর্থাৎ ইন্দ্রিয় এবং তাহার বিষয় (অথবা উভয়ের সংযোগ) এই উভয়ই আমাদের সুখ দুঃখের কারণ। রামানুজ বলেন, আশ্রয়হেতু ও কার্য্যহেতু ইন্দ্রিয়গণকে মাত্রা বলে। টীকাকার রাঘবেন্দ্র বলেন মাত্রা অর্থাৎ জ্ঞানের বিষয়। আমাদের অনুভবের কারণ দুই।

এক বাহ্যজ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারা বাহ্য-বিষয়-অনুভব, আর মনের দ্বারা দৈহিক বেদনাদি-অনুভব। সুতরাং মাত্রা অর্থে আন্তরিক অনুভব ও স্পর্শ অর্থে বাহ্য-বিষয়-অনুভব এরূপ অর্থ করাও অসঙ্গত নহে। তাহা হইলে বিষয় অর্থে বাহ্য ও আন্তর উভয়রূপ বিষয়ই বুঝিতে হইবে।

অনিত্য—যাহার উৎপত্তি ধ্বংস আছে, তাহাই অনিত্য। (শঙ্কর)

যং হি ন ব্যথয়ন্ত্যেতে পুরুষং পুরুষর্ষভ।
সমদুঃখসুখং ধীরং সোঽমৃতত্বায় কল্পতে॥ ১৫

হে পার্থ! যে জন ইথে নহে বিচলিত,
সেই ধীর,—সুখ দুঃখ সম জ্ঞান যার,
অমরতা লভিবার যোগ্য সেই জন॥ ১৫

(১৫) ইথে নহে বিচলিত—সাংখ্যদর্শনে আছে "ত্রিবিধ দুঃখ-নিবৃত্তিই পরম পুরুষার্থ।" আত্মার সহিত সুখদুঃখাদির কারণভূত প্রকৃতির সংযোগ উচ্ছেদ করিতে পারিলেই পুরুষার্থ সিদ্ধ হয়।

অমরতা…যোগ্য—সেই মোক্ষ লাভে সমর্থ হয় (হনু)। দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি রূপ যে পরম পুরুষার্থ, তাহা সে পরিণামে লাভ করে। অমরত্বের সাধারণ অর্থ দেবত্ব। ধীরেরা সে দেবভূমিও অতিক্রম করেন।

যাহার সুখ দুঃখে সমান ভাব অর্থাৎ, যাহার সুখ-প্রাপ্তিতে হর্ষ ও দুঃখ-প্রাপ্তিতে বিষাদ হয় না (শঙ্কর) সেই সুখ দুঃখে অবিচলিত থাকে। যে অপরিহার্য্য দুঃখকে সুখ মনে করে (রামানুজ); যে ধর্ম্মানুষ্ঠানে কর্ম্ম-জনিত দুঃখ ও তাহার সফলতার সুখ উভয়ের প্রতি সমভাব যুক্ত হয় (বলদেব) তাহাকে দুঃখ ব্যথা দিতে পারে না। যে ভগবানে সমাধিস্থ, তাহার সুখ দুঃখ সমান।

সুখ দুঃখ ইহারা দ্বন্দ্ব। সুখ ও দুঃখ নিত্যসম্বদ্ধ। এজন্য সুখ-দুঃখ

মিশ্রিত। নিরবচ্ছিন্ন সুখ বা দুঃখ অসম্ভব। এ জন্য দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তিতে সুখের ও নিবৃত্তি হয়। সুখদুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তিতে যে অবস্থা. তাহা নিরবচ্ছিন্ন আনন্দাবস্থা; তাহাকে "ভূমা" সুখের অবস্থাও বলে। মুক্তিতে সেই অবস্থা লাভ হয়। সে অবস্থা লাভের জন্য প্রথমে সুখ দুঃখকে সমজ্ঞান করিতে—দুঃখসহনশীল হইতে—শিক্ষা করিতে হয়। ইহাই তিতিক্ষা।

অর্জ্জুন দুঃখিত হইয়াছেন। আত্মীয় স্বজন সহ মিলনে সুখ, ও তাহাদের বিচ্ছেদে দুঃখ অনুভব করিতেছেন। যুদ্ধে আত্মীয় স্বজন নিহত হইবে, তাহাতে প্রিয়জন-বিচ্ছেদ হইবে, সেই ভাবী বিচ্ছেদ ভাবনাই অর্জ্জুনের দুঃখের কারণ। ভীষ্মাদি আত্মীয় স্বজন, অর্জ্জুনের জ্ঞানের বিষয়। তাঁহাদের প্রতি মমতাই তাঁহাদিগকে আত্মীয় বলিয়া বোধের কারণ। এই মমতা হেতুই তাঁহাদের বিচ্ছেদসম্ভাবনায় অর্জ্জুনের দুঃখ হইয়াছে। এই দুঃখের স্বরূপ বুঝাইয়া সে দুঃখ সহ্য করিতে ভগবান্ অর্জ্জুনকে উপদেশ দিতেছেন। এইরূপ দুঃখে ব্যথিত না হইবার অন্য কারণ পরবর্ত্তী শ্লোকে উক্ত হইয়াছে।

নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।
উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ ॥ ১৬

অসতের নাহি সত্ত্বা,—কিম্বা "সৎ" যাহা—
নাহিক অভাব তার; তত্ত্বদর্শিগণ
এই উভয়ের অন্ত করেছে দর্শন ॥ ১৬

(১৬) অসতের নাহি সত্ত্বা—।—অসৎ অর্থাৎ পরিণামী দেহাদি; সৎ, অর্থাৎ অপরিণামী আত্মা, (বলদেব)। সৎ অর্থাৎ অবিনাশ-স্বভাব আত্মা, অসৎ অর্থাৎ বিনাশ-স্বভাব দেহ (রামানুজ)। অসৎ = অবিদ্যমান রজ্জু সর্পবৎ

দৃষ্ট নষ্ট স্বভাব জগৎ, ভাব=সত্তা (হনু)। যাহার কারণ আছে, ও কারণ ব্যতীত উপলব্ধি হয় না, যাহা বিকারী—তাহা অসৎ ; এই জন্য শীতোষ্ণাদি অসৎ। এবং যাহা নিত্য, যাহা সৎ, সেই আত্মার বিনাশ বা অভাব হয় না, (শঙ্কর)। যাহা শূন্য, যাহার অস্তিত্ব নাই, তাহাই অসৎ, অথবা যাহার বিদ্যমানতা নাই, যাহা আত্মার ধর্ম্ম নহে, তাহাই অসৎ। এস্থলে শীতোষ্ণাদিকে অসৎ বলা হইয়াছে (গিরি)।

অতএব এই সকল অর্থ হইতে বুঝা যায় যে, যাহা কারণ হইতে জাত ও কারণে লীন হয় (নাশঃ কারণ-লয়ঃ—সাংখ্যদর্শন) (যেমন সুখ-দুঃখাদি) কিংবা যাহা পরিণামধর্ম্মী (যেমন দেহ), তাহাই অসৎ। আর আত্মা সৎ। সৎ বস্তুর ভাব বা অবস্থা নিত্য, অসৎ বস্তুর ভাব (বা অবস্থা) অনিত্য ও বিকারী। সৎ আত্মার ভাবের সহিত অসদ্বস্তু (দেহ বা সুখদুঃখাদি) নিত্য-সম্বন্ধ হইতে পারে না। সুতরাং রণে আত্মীয়দের মৃত্যু হইবে অর্থাৎ অসৎ দেহের বিনাশ বা অভাব সেই সকল লোকের আত্মাকে স্পর্শ করিবে, কিংবা আত্মারও ধ্বংস হইবে, এরূপ দুঃখের কারণ হইতে পারে না, এবং সেরূপ দুঃখ অর্জ্জুনের সৎ আত্মাকে নিত্যরূপে স্পর্শ করিতে পারিবে না, ইহাই এস্থানে উপদিষ্ট হইয়াছে।

এস্থলে অসৎ প্রচলিত অর্থ হইতে ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। "নাসতো সৎ জায়তে" "নাবস্তুনো বস্তুসিদ্ধিঃ" "Ex nihilo nihil fit" প্রভৃতি স্থানে অসৎ, অবস্তু বা nihil যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, এস্থলে অসতের অর্থ ঠিক সেরূপ নহে। অর্থাৎ "যৎ অসৎ শব্দেনাভি-ধানং তৎ অব্যাকৃতত্বাভিধানাভিপ্রায়ং ন তু অত্যন্তাভাবাভিপ্রায়ং। ইংরাজীতে যাহাকে Phenomenal বা Conditioned বলে, তাহাই অসৎ।

শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য ও মধুসূদন, "অসৎ কার্য্যবাদ" অনুসারে এই শ্লোকের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কার্য্যমাত্রই কারণ ব্যতিরেকে উপলব্ধি

হয় না। এ জন্য কার্য্য নিজরূপে অসৎ। উৎপত্তির পূর্ব্বে ও বিনাশের পরে, কোন কার্য্যেরই নিজরূপে অস্তিত্ব থাকে না বা তাহার উপলব্ধি হয় না। কারণের অস্তিত্ব স্বীকার না করিলে, শূন্যবাদ আসিয়া পড়ে। আরও এক কথা,—যে বস্তু-বিষয়ক জ্ঞান অব্যভিচারী—নিত্য—তাহা সৎ; যাহার জ্ঞান ব্যভিচারী—অনিত্য,—তাহা অসৎ। * * দেহ ও সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্ব—ইহারা সকারণ; সেই কারণ অবিদ্যা। অবিদ্যার কার্য্য দেহ ও সুখ দুঃখাদি, এজন্য তাহারা অসৎ। তাহাদের বাস্তবিক সত্ত্বা বা 'ভাব' বিদ্যমান নাই। আর সৎ আত্মারও অবিদ্যমানতা নাই।

রামানুজ ও বলদেব বলেন, যে অসৎ কার্য্যবাদ সঙ্গত নহে, এবং তাহা এ স্থলে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। সৎ কার্য্যবাদই স্থাপিত হইয়াছে। শঙ্করাচার্য্য ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে নানাস্থলে ব্রহ্ম-শক্তি স্বীকার করিয়াছেন, সেই ব্রহ্মকারণের আত্মভূত শক্তি হইতেই জগতের উৎপত্তি। জগৎ—শক্তির কার্য্যাবস্থা। প্রলয়ে জগৎ এই শক্তিতেই লীন হইয়া বীজরূপে থাকে। সে অবস্থাকে অসৎ বলা যায়। উৎপত্তির পূর্ব্বে এ জন্য কার্য্যমাত্রের অবস্থা অসৎ। অতএব যাহা বিনাশী—কারণে লয় হয় (যেমন দেহ ও সুখ দুঃখাদি) তাহা এই অর্থে অসৎ আর যাহা অবিনাশী (আত্মা) তাহা সৎ।

তত্ত্বদর্শী—তৎ বা ব্রহ্মের স্বরূপ জ্ঞানী (শঙ্কর)। বস্তুর যথার্থ তত্ত্বজ্ঞ (স্বামী)। নিত্যানিত্য বস্তুবিবেকী।

এ উভয়ের—অর্থাৎ সৎ—দেহীর এবং অসৎ—দেহের (মধু)।

অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্ত্তুমর্হতি ॥ ১৭

যাহে ব্যাপ্ত এই সব—জানিও নিশ্চয়
তাহা অবিনাশী ; কেহ কভু নাহি পারে
অব্যয় ইহার নাশ করিতে সাধন ॥ ১৭

(১৭) এই সব—অর্থাৎ এই সব দেহ (বলদেব)। এই জগৎ (শঙ্কর)।

যাহে—যে ব্রহ্মবস্তু দ্বারা, কেননা ব্রহ্মব্যতীত আর কিছুই সৎ নহে। (শঙ্কর, মধু)। "ঈশাবাস্য মিদং সর্ব্বং" এই শ্রুতি দ্রষ্টব্য। ঈশ্বর দ্বারাই এ জগৎ ব্যাপ্ত। তিনি ক্ষেত্রজ্ঞ, সূর্য্যের ন্যায় সমুদায় শরীরকে (ক্ষেত্র) প্রকাশ করেন, (গীতা, ১৩।৩৩)। বলদেব প্রভৃতি অর্থ করেন যে, যাহে= যে দেহী ও জীবতত্ত্ব দ্বারা এই জগৎ আবৃত সেই দেহী। গীতায় আছে, ভগবানের অপরা প্রকৃতি জীবভূত হইয়া এ জগৎ ধারণ করেন। (৭।৫)। জীব জ্ঞাতা (subject) রূপে সমুদায় বিষয় (object) ধারণ করেন। জগৎ ব্যাপক, জীব ব্যাপ্য।

নাশ—অদর্শন, অভাব, (শঙ্কর)। দেশ কাল বস্তু পরিচ্ছিন্নতা, (মধু)।

(বেদান্ত-সূত্রের ১।১।২২ ; ১।৩।৩৫ ; ১।৪।৩৫ ; ২।১।১৮ প্রভৃতি সূত্রের ভাষ্য দ্রষ্টব্য।)

অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ।
অনাশিনোঽপ্রমেয়স্য তস্মাদ্ যুধ্যস্ব ভারত ॥ ১৮

অবিনাশী অপ্রমেয় নিত্য এ দেহীর
বিনশ্বর এই দেহ আছয়ে কথিত ;
অতএব হে ভারত, করহ সমর ॥ ১৮

(১৮) অবিনাশী নিত্য—নিত্য=সর্ব্বদা একরূপে স্থিত, অবিনাশী =বিনাশরহিত (স্বামী)। শঙ্করাচার্য্য বলেন, আত্মাকে অবিনাশী ও নিত্য বলায় পুনরুক্তি দোষ হয় নাই। নিত্যত্ব ও নাশ দ্বিবিধ। যেমন দেহ ভস্মীভূত হইলে, তাহাকে নষ্ট হইয়াছে বলা যায়, আর দেহ ব্যাধিক্লিষ্ট হইয়া অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইলে, তাহাকেও নষ্ট হইয়াছে বলা যায়। আত্মার এ দ্বিবিধ নাশের কোনটিরই সম্ভাবনা নাই। পৃথিব্যাদি ভূত—নিত্য হইয়াও বিনাশী। আত্মা—সেরূপ নিত্য নহে। তাহা অবিনাশী ও নিত্য। যাহা কালান্তরে অন্য আখ্যা প্রাপ্ত হয় না, তাহা নিত্য; যাহা সর্ব্বদা প্রকাশমান, তাহা অবিনাশী।

অপ্রমেয়—শঙ্করাচার্য্য বলেন, আত্মজ্ঞান প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দ্বারা বা শাস্ত্রের দ্বারা পরিচ্ছেদ্য নহে, তাহা প্রমাণের বিষয়ীভূত নহে। জ্ঞানস্বরূপ আত্মা স্বপ্রকাশ, স্বতঃসিদ্ধ। আত্মা—অর্থাৎ জ্ঞাতা আমি—আমার নিকট কখন অজ্ঞাত নহেন। আমি জানিতেছি—চিন্তা করিতেছি—এ জন্য আমি আছি (cogito ergo sum)—ইহাই আমা সকল জ্ঞানের (প্রমা জ্ঞানের) ভিত্তি। কিন্তু ইহা আত্মার সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান; আত্মার বিশেষ জ্ঞান বা স্বরূপ জ্ঞান শাস্ত্রগম্য। শাস্ত্র দ্বারা আত্মা-ধ্যাস দূর হয় মাত্র। শ্রুতিতে আছে "অরে বিজ্ঞাতারং কেন বিজনীয়াৎ" (বৃহদারণ্যক উপঃ। ৪। ৪।১৪)।

মধুসূদন বলেন, আত্মা সর্ব্বপ্রকার পরিচ্ছেদশূন্য। পরিচ্ছেদ তিন প্রকার—দেশ, কাল ও বস্তু পরিচ্ছেদ। স্বজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগত-ভেদে বস্তুপরিচ্ছেদ তিন প্রকার। কেহ বলেন, বস্তু পরিচ্ছেদ পাঁচ প্রকার; যথা—জীব ঈশ্বরে ভেদ, জীব জগতে ভেদ, জীবে জীবে ভেদ, ঈশ্বর জগতে ভেদ ও জগৎ পরমাত্মায় ভেদ।

দেহীর—দেহীর (শরীরিণঃ)—শরীরাভিমানী আত্মার।

বিনশ্বর এই দেহ—(অন্তবন্তঃ ইমে দেহাঃ)—যাহার অন্ত আছে,

তাহা অন্তবান্। মৃগতৃষ্ণিকায় 'সৎ'-বুদ্ধির বিচ্ছেদেই তাহার অন্ত। এই দেহও স্বপ্নসিদ্ধ বা ঐন্দ্রজালিক দেহাদির ন্যায় অন্তবান্। দেহাঃ—এই বহুবচন থাকায় কেহ কেহ বলেন, ইহা দ্বারা স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণ শরীর বুঝাইতেছে। ইহা দূরার্থ। ভগবান্ বিনশ্বর দেহ ও অবিনাশী দেহী এই দুইয়ের বিবেকজ্ঞান এ স্থলে উপদেশ দিয়াছেন।

করহ সমর—যুদ্ধ করা কর্ত্তব্য বলিয়া ভগবান্ ইহা বিধিসিদ্ধ করিতেছেন না, প্রতিবন্ধকের অপনয়নমাত্র করিতেছেন, (শঙ্কর)। আপনাতে ও অপরেতে শস্ত্র-পাতাদি হেতু আঘাত ধৈর্য্যপূর্ব্বক সহ্য করিয়া অমরত্বপ্রাপ্তিপ্রভৃতি ফলাভিসন্ধি ত্যাগপূর্ব্বক যুদ্ধ আরম্ভ কর (রামানুজ)। বিনশ্বর দেহের প্রতি মমতাবশতঃ যুদ্ধরূপ স্বধর্ম্ম হইতে স্খলিত হইও না। ইহা অনুবাদ মাত্র, বিধি নহে (হনু)।

য এনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম্।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে ॥১৯

যে ইহারে ভাবে হন্তা, কিম্বা যেই ভাবে
নিহত ইহারে,—তারা উভয়ে না জানে
নাহি হয় হত ইহা, নহে হন্তারক ॥ ১৯

(১৯) যে……ইহারে—আত্মাকে হন্তা বা হত হওয়া মনে করা—মিথ্যা জ্ঞান। ভীষ্মাদিকে আমি হত্যা করিব—অর্জ্জুনের এ জ্ঞান মিথ্যা (শঙ্কর)। এই মিথ্যা জ্ঞান বা অবিদ্যা জন্যই হননাদি কর্ম্মে কর্তৃত্বের অধ্যাস হয় ও সেই জন্যই সে কর্ম্মের ফলভোগ করিতে হয়।

নহে হন্তারক—কর্ত্তা বা কর্ম্ম হয় না, অর্থাৎ সর্ব্ব-বিক্রিয়া-শূন্য, (মধু)।

নিম্নোদ্ধৃত কঠোপনিষদের দ্বিতীয়-বল্লীর ১৯শ শ্লোক এইরূপ ঃ—

"হন্তা চেন্মন্যতে হন্তুং হতশ্চেন্মন্যতে হতম্।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে॥

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ
নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥ ২০

নাহি জন্ম মৃত্যু ইহার কথা,
হয়ে পুনঃ নাহি ইহার বিনাশ।
অজ নিত্য ইহা শাশ্বত পুরাণ
দেহ নাশে ইহা নাহি হয় নাশ। ২০

(২০) কঠোপনিষদের দ্বিতীয়-বল্লীর ১৮শ শ্লোক এইরূপ :—
"ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিন্
নায়ং কুতশ্চিন্ন বভূব কশ্চিৎ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥"

হয়ে পুনঃ……—মূলে আছে, "নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ" কেহ কেহ পাঠ করেন "ভূত্বা অভবিতা বা ..."। আত্মার ভবন (জন্ম) ক্রিয়া অনুভবের পর পুনঃ তাহার অভাব (অভবিতা) হইবে না। কিংবা পূর্ব্বে তাহার অস্তিত্ব না থাকিয়া একেবারে জন্মগ্রহণ করিবে না। ইহার দ্বারা আত্মার জন্ম-মৃত্যুহীনতার কারণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, (শঙ্কর); অথবা আত্মা কখন জন্মে নাই, ভবিষ্যতেও কখন জন্মিবে না। কিংবা আত্মা একবার জন্মিয়া পুনর্ব্বার যে জন্মিবে, তাহা নহে। স্বামী বলেন,— জন্মগ্রহণ করিয়া সাধারণতঃ বস্তু সকল যেমন অস্তিত্ব লাভ করে, অন্যথা

তাহার অস্তিত্ব থাকে না, আত্মা সেরূপ নহে। রামানুজ বলেন, ইহা (দেহী) কল্পাদিতে জন্মিবে, পুনর্ব্বার কল্পান্তে বিনষ্ট হইবে—তাহা নহে।

শঙ্করাচার্য্য ও স্বামী দেখাইয়াছেন যে সাধারণ লৌকিক বিষয় যেমন ষড়্ভাব বিকারযুক্ত আত্মা সেরূপ নহে। সে ষড়্ভাব-বিকার এই—জন্ম, জন্মের পর অস্তিত্ব, বৃদ্ধি, ক্ষয়, বিপরিণাম ও মরণ। সাধারণতঃ ভাববিকার তিন প্রকার, যথা,—জন্ম, স্থিতি ও নাশ। এই জগৎ ও জগতের সকল পদার্থেরই আবির্ভাব, পরিণতি ও তিরোভাব আছে।

পুরাণ—অতীত কালে সদা বিদ্যমান (স্বামী)।

শাশ্বত—ভবিষ্যতে সর্ব্বদা একরূপ নিত্য। (স্বামী)। অথবা প্রকৃতির ন্যায় পরিণামী নহে, (রামানুজ)।

পূর্ব্বে যে ষড়ভাব-বিকারের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, এ শ্লোকে আত্মার সেই ষড়ভাব-বিকার প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে। যথা—(১) জন্ম বা উৎপত্তি—আত্মার উৎপত্তি নাই। (২) বিনাশ—আত্মার বিনাশ বা ধ্বংসও নাই। কদাচিৎ অর্থাৎ কোন কালেই আত্মার উৎপত্তি বা বিনাশ নাই। ইহাই বিশদ করিয়া আবার বলা হইয়াছে যে, আত্মা উৎপত্তিরূপ ক্রিয়া অনুভব করিয়া পরে আবার ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে না, অর্থাৎ তাহার অভাব হইবে না। অগ্রে থাকিয়া পুনর্ব্বার (ভূয়ঃ) দেহাদির ন্যায় উৎপন্ন হইবে না। এ জন্য ইহার জন্ম নাই। জন্ম নাই বলিয়া আত্মা অজ, বিনাশ নাই বলিয়া ইহা নিত্য। (৩) অপক্ষয়—আত্মাকে শাশ্বত বলায়, তাহার অপক্ষয়রূপ বিকার প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে। যাহা সর্ব্বদা বিদ্যমান তাহা শাশ্বত। নির্গুণ বলিয়া আত্মার অপক্ষয় নাই। (৪) বৃদ্ধি—অপক্ষয়ের বিপরীত। পুরাণ বলায়, আত্মার বৃদ্ধি বা উপচয় প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে। (৫) বিপরিণাম—শরীর পরিণামী; আত্মা বিপরিণামশূন্য—এই অর্থে বলা হইয়াছে, দেহ-নাশে আত্মার নাশ হয় না। (৬) স্থিতি—ষষ্ঠভাববিকার। এ স্থিতি

আপেক্ষিক—জন্মের পর মৃত্যু পর্য্যন্ত অবস্থা। 'জন্মি পুন না হয় বিনাশ' বলায়,—আত্মার সে স্থিতি প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে। হনুমান বলেন, ইহার অর্থ এই যে উৎপত্তির পর আবার উৎপত্তি—এরূপ অবস্থান্তর প্রাপ্তি আত্মার হয় না। আত্মা বিপরিণামশূন্য।

পূর্ব্বে ১৬শ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, অসতের 'ভাব' হয় না, আর সতের 'অভাব' হয় না। অসতের ভাব না হওয়ায় তাহার ভাব-বিকারও হয় না। অতএব যাহার ভাববিকার হয়, তাহা অবশ্য সৎ। জন্মের পূর্ব্বে তাহার অভাব থাকে না, এবং নাশের পরেও তাহার অভাব হয় না। জন্মের পূর্ব্বে তাহা কারণে বীজভাবে লীন থাকে, আর নাশের পরে তাহা কারণে লীন হয়। কারণের কার্য্যাবস্থায়ই তাহার ভাববিকার হয়। দেহের কারণ প্রকৃতি। প্রকৃতি হইতে দেহের উৎপত্তি এবং প্রকৃতিতে দেহের লয় হয়। প্রকৃতিজ দেহাদির ভাববিকারে দেহীর বা পুরুষের ভাববিকার হয় না। পুরুষ ও প্রকৃতি উভয়ই সৎ, উভয়ই নিত্য, উভয়ই অনাদি (গীতা, ১৩।১৯)। সাংখ্যদর্শন অনুসারে উভয়েই সৎ ও অনাদি হইলেও উভয়ে পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্মযুক্ত। প্রকৃতি—পরিণামী, পুরুষ—অপরিণামী। গুণ ও বিকার প্রকৃতি হইতে জাত (১৩।১৯), প্রকৃতিই কার্য্যকারণ ও কর্ত্তৃত্বের হেতু (১১।২০)। পুরুষ প্রকৃতিস্থ বা প্রকৃতিজ দেহে বদ্ধ হইয়াই প্রকৃতির গুণ ও কর্ম্মের ভোক্তা হয় (১৩।২১)। ইহাই প্রকৃতি ও পুরুষের পার্থক্য। পরিণামী বলিয়া সৎ প্রকৃতির ও প্রকৃতিজ দেহের ভাববিকার হয়। পুরুষ অপরিণামী বলিয়া, তাহার ভাববিকার হয় না। প্রকৃতিতে বা দেহে বদ্ধ থাকিলেও দেহী পুরুষের কোন ভাববিকার হয় না। ইহাই এ শ্লোকের অর্থ।

এই দুই (১৯শ ও ২০শ) শ্লোক—কঠোপনিষদের মন্ত্র, প্রমাণ স্বরূপ এস্থানে গৃহীত হইয়াছে—ইহা শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন। সর্ব্বোপনিষদ সার গীতায় এই উপনিষদের মন্ত্র যে উদ্ধৃত হইয়াছে—ইহা সকল শিষ্ট জনের

অভিমত। কিন্তু ইহাতে সংশয় হয়। উপনিষদের মধ্যে ছান্দোগ্য-উপনিষদ প্রাচীন। ইহা কঠোপনিষদ্ অপেক্ষাও প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়। সেই ছান্দোগ্য-উপনিষদে দেবকীপুত্র শ্রীকৃষ্ণ ঘোর ঋষি কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়াছিলেন—এরূপ কথা আছে। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ-প্রবর্ত্তিত গীতাশাস্ত্র কঠোপনিষদ্ অপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া আপাততঃ মনে হয়। বিশেষতঃ এই দুই শ্লোকের সঙ্গতি ও পারম্পর্য্য সম্বন্ধ যেরূপ গীতায় আছে, কঠোপনিষদে সেরূপ নাই। অতএব এই দুই মন্ত্র কঠোপনিষদ হইতে গীতায় সংগৃহীত, কিংবা গীতা হইতে কঠোপনিষদে সংগৃহীত—এ বিষয়ে সন্দেহ আছে।

বেদাবিনাশিনং নিত্যং য এনমজমব্যয়ম্।
কথং স পুরুষঃ পার্থ কং ঘাতয়তি হন্তি কম্॥ ২১

হেন নিত্য অবিনাশী অজ ও অব্যয়—
ইহাকে জেনেছে যেই, কেমনে সে জন
সাধিবে কাহার বধ, বধিবে বা কারে? ২১

(২১) জেনেছে—আত্মাকে বা দেহীকে নিত্য (বিপরিণামরহিত), অবিনাশী (বিনাশরূপ ভাববিকার-রহিত), অজ (জন্ম-রহিত) ও অব্যয় (অপক্ষয়-রহিত) বলিয়া যে জানিয়াছে (শঙ্কর)।

সাধিবে…কারে—কিরূপে হনন ক্রিয়া করিবে, বা হনন-কর্ত্তাকে হনন করিবার জন্য প্রেরণা করিবে?—এই স্থলে আক্ষেপই অর্থ—ইহা প্রশ্ন নহে (শঙ্কর)। শঙ্করাচার্য্য বলেন, এই হনন ক্রিয়ার উদাহরণ দ্বারা—সাধারণ ভাবে আত্মার অকর্ত্তৃত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। যে বিদ্বান আত্মবিৎ—আত্মাকে অকর্ত্তা বলিয়া জানে,—সে আত্মাকে হনন করিবে বা করাইবে—এরূপ মোহযুক্ত হইতে পারে না। তাহার

পক্ষে কোনরূপ কর্ম্মানুষ্ঠান অসম্ভব। সে সর্ব্বদা সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসী। সে কর্ম্ম করে না বা কাহাকেও কর্ম্মে নিযুক্ত করে না। সে সাংখ্যজ্ঞানী। এস্থলে এ অর্থ হইলে, অর্জ্জুনকে যুদ্ধ করিবার উপদেশ সঙ্গত হইত না। গীতায় পরে (১৮।১৭) উক্ত হইয়াছে যে, "যাহার অহঙ্কার ভাব নাই ও যাহার বুদ্ধি কর্ম্মে লিপ্ত হয় না, সে এই সকল লোককে হনন করিয়াও হনন করে না।" অতএব, নিরহঙ্কার নিষ্কাম হইয়া কর্ম্ম করিলে কর্ম্মে বন্ধন হয় না। নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী সহজ ও স্বাভাবিক কর্ম্মে আপনাকে নির্লিপ্ত বোধ করিলে, সেই জ্ঞানের ফলে কর্ম্মে বন্ধন হয় না—ইহাই গীতার উপদেশ। অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মাই কর্ম্মে বদ্ধ হয়।

এস্থলে সাংখ্যজ্ঞান উপদিষ্ট হইয়াছে। সাংখ্যশাস্ত্র অনুসারে পুরুষ প্রকৃতিবদ্ধ হইয়া দেহী হইয়াছে। মূল প্রকৃতি তাহার কারণ-শরীর। বুদ্ধি মন, দশ ইন্দ্রিয় পঞ্চতন্মাত্র হইতে তাহার সূক্ষ্ম-শরীর। আর স্থূল পঞ্চভূত হইতে তাহার স্থূল-শরীর। পুরুষ ও প্রকৃতি পরস্পর বিরুদ্ধ-ধর্ম্মী। পুরুষ অকর্ত্তা 'জ্ঞ'-স্বরূপ। প্রকৃতি জড় পরিণামী। প্রকৃতি হইতে কর্ম্ম হয়। যে অবিবেকী সে প্রকৃতির কর্ম্ম আপনাতে আরোপ করিয়া আপনাকে কর্ত্তা, হর্ত্তা বা হত মনে করে। সে প্রকৃতির সুখ দুঃখ আপনাতে আরোপ করিয়া তাহার ভোক্তা হয়। আর যে বিদ্বান্ প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেক-জ্ঞানী, পুরুষ ও প্রকৃতির স্বরূপ জানে, সে প্রকৃতির কর্ম্ম আপনাতে আরোপ করে না, সে মোহযুক্ত হয় না।

পূর্ব্বে ১৯শ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে আত্মা বা দেহী, হত হন না, এবং হত্যা ও করেন না। ২০শ শ্লোকে বুঝান হইয়াছে যে আত্মা হত হন না। এই ২১শ শ্লোকে দেখান হইল যে, দেহী অন্যকে বধ করেন না বা করান না। কেন না দেহী অবিনাশী, নিত্য, অজ ও অব্যয়। যাহার জন্ম, নাশ, অপক্ষয় পরিণাম নাই—তাহার কর্ম্মের সহিত সম্বন্ধ হইতে পারে না। হইলে পরিণামাদি ভাববিকার অবশ্যম্ভাবী হইত।

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥ ২২

জীর্ণ বাস যথা করি পরিহার
অন্য নব বাস পরে নরগণ—
দেহী তথা ত্যজি জীর্ণ কলেবর
অন্য নব দেহ করয়ে ধারণ ॥ ২২

(২২) শ্রীভাগবতে আছে—
"ব্রজংস্তিষ্ঠন্ পদৈকেন যথা বৈকেন গচ্ছতি।
যথা তৃণজলৌকেবং দেহী কর্ম্মগতিং গতঃ ॥"

পূর্ব্বে আত্মার অবিনাশিত্ব উক্ত হইয়াছে; তাহা কি প্রকার এ শ্লোকে উক্ত হইল, (শঙ্কর)। পূর্ব্ব শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে দেহের ভাব-বিকার থাকিলেও দেহীর ভাব-বিকার নাই। এ শ্লোকে দেহের সহিত দেহীর কি সম্বন্ধ তাহা উক্ত হইয়াছে। যতক্ষণ অবিদ্যা থাকে, প্রকৃতি বন্ধন থাকে, ততক্ষণ পুরুষ দেহাভিমানী। ভাববিকার হেতু এক দেহের নাশ হইলে, সেই দেহাভিমান বশে, তাহাকে অন্য দেহ গ্রহণ করিতে হয়। ইহাই দেহ সংযোগের কারণ। পূর্ব্বে ১৩শ শ্লোকে দেহান্তরের কথা উক্ত হইয়াছে। এস্থলে দেহান্তরের পরে অন্য দেহ গ্রহণের কথা অর্থাৎ জন্মান্তরের তত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে। যেমন লোকে বস্ত্রান্তর গ্রহণ করে, সেইরূপ অবিক্রিয় ভাবে জীর্ণ দেহ ত্যাগ করিয়া, দেহী দেহান্তর গ্রহণ করে। ইহাতে তাহার অবস্থান্তর হয় মাত্র। বলদেব বলেন যে যুদ্ধে ভীষ্ম দ্রোণাদির

মৃত্যু হইলে, তাঁহারা জীর্ণ দেহ ত্যাগ করিয়া, (যুদ্ধে মৃত্যুহেতু) স্বর্গে দেব-শরীর লাভ করিবেন। ইহাতে দুঃখের কারণ নাই।

অর্জ্জুন মনে করিতে পারেন যে এক দেহ ত্যাগ করিয়া দেহান্তর গ্রহণ করিবার কালে আত্মা বা দেহী অবিক্রিয় থাকেন; বিশেষতঃ জীর্ণ শরীর ত্যাগে দেহীর কোন ক্ষতি হয় না বটে, কিন্তু তিনি কেন দেহীদের বর্ত্তমান দেহ ত্যাগ করাইবার কারণ হইবেন? দেহত্যাগে দেহী অবিক্রিয় থাকিলেও ত দেহে অধ্যাস বশে, দেহত্যাগ দেহীর পক্ষে দুঃখকর। এ দুঃখ অবিদ্যা বা অজ্ঞান-প্রসূত। সেই অজ্ঞান দূর করিবার জন্যই এ স্থলে আত্মতত্ত্বের উপদেশ দেওয়া হইতেছে। এ জন্য বিশেষ ভাবে এরূপ আপত্তির উত্তর দেওয়া হয় নাই। তবে ভগবান অর্জ্জুনকে স্বধর্ম্মাচরণের কর্ত্তব্যত্ব বুঝাইয়াছেন। সেই স্বধর্ম্ম পালন করিতে যদি অজ্ঞান বশতঃ অপরে দুঃখ পায়, তাহা ভাবিয়া একান্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম ত্যাগ করিতে নাই।

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ॥ ২৩

নারে অস্ত্র ছেদিতে ইহারে, নাহি পারে
দহিতে পাবক, আর্দ্র নাহি করে বারি,
না পারে পবন ইহা করিতে শোষণ॥ ২৩

(২৩) আত্মার অবয়ব নাই বলিয়া কুঠার প্রভৃতি শস্ত্র ইহার অবয়ব ছেদ বা বিভাগ করিতে পারে না। অগ্নি তাহাকে দাহ করিতে পারে না। জল তাহাকে আর্দ্র করে না। সাবয়ব বস্তুকে আর্দ্র করিয়া অবয়ব বিশ্লেষ করাই জলের সামর্থ্য। বায়ু স্নেহবিশিষ্ট দ্রব্যের স্নেহ শোষণ করিয়া

তাহাকে নষ্ট করে। আত্মা স্নেহযুক্ত বস্তু নহে, এ জন্য বায়ু কখন তাহাকে শোষণ করে না। আত্মা ভৌতিক পদার্থ নহে, এজন্য পৃথিব্যাদি কোন ভৌতিক পদার্থ আত্মার ক্ষতি বা নাশ করিতে পারে না। (শঙ্কর)। স্থূলদেহ যেরূপ অস্ত্রে ছেদ করা যায়, অগ্নিতে দগ্ধ করা যায়, জলে আর্দ্র ও বায়ুতে শুষ্ক করা যায়, দেহাতিরিক্ত দেহীকে সেরূপ করা যায় না।

...নারে অস্ত্র—অস্ত্র—খড়্গাদি শস্ত্র। পাবক—আগ্নেয়াস্ত্র। বারি—বরুণাস্ত্র। পবন—বায়ব্যাস্ত্র এই সকল অস্ত্র যুদ্ধে প্রযুক্ত হয়, (বলদেব)।

অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ॥ ২৪

অচ্ছেদ্য অদাহ্য ইহা, ক্লেদন শোষণ
কিছুরই নহেক যোগ্য, ইহা সর্ব্বগত,
নিত্য ও অচল স্থির, ইহা সনাতন॥ ২৪

(২৪)—পূর্ব্ব শ্লোকে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহাই এস্থলে সংগ্রহ করিয়া পুনরুক্ত হইল। অচ্ছেদ্য ইত্যাদি আত্মার লক্ষণ। নিত্য সর্ব্বগত ইত্যাদি আত্মার বিশেষ লক্ষণ। যে কারণে পৃথিব্যাদি ভূতসকল আত্মাকে বিনষ্ট করিতে পারে না, সেই কারণে ইহা নিত্য সর্ব্বগত ইত্যাদি লক্ষণযুক্ত (শঙ্কর)। আত্মা নিত্য বলিয়াই সর্ব্বগত, সর্ব্বগত বলিয়াই স্থাণু বা স্থির, স্থাণু বলিয়াই অচল, অচল বলিয়াই সনাতন—কোন কার্য্য হইতে নিষ্পন্ন নহে (শঙ্কর ও হনু)। এস্থলে পূর্ব্বোক্ত আত্মার লক্ষণ পুনরুক্ত হইয়াছে। শঙ্কর বলেন ইহা পুনরুক্তি নহে। আত্মবস্তু দুর্জ্ঞেয়, বারংবার প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়া কি প্রকারে সংসারাসক্ত ব্যক্তির নিকট এই আত্মতত্ত্ব প্রকাশ হইয়া সংসার-নিবৃত্তির কারণ

হইবে, তাহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া এইরূপে ভগবান্‌ আত্মতত্ত্ব নিরূপণ করিতেছেন।

সর্ব্বগত—স্বকর্ম্মের নিমিত্ত পর্য্যায় ক্রমে দেবমনুষ্য তির্য্যগাদি দেহগত —পর্য্যায় ক্রমে বুদ্ধদেবাদি সকল শরীর গত (বলদেব)। কিন্তু সর্ব্বগত অর্থে সর্ব্বব্যাপ্ত। পূর্ব্বে ১৭শ শ্লোকে, 'যেন সর্ব্বমিদং ততম্‌' বলা হইয়াছে। বেদান্তমতে একই আত্মা সমুদায় ব্যাপিয়া অবস্থিত—আকাশের ন্যায় সকলে অনুপ্রবিষ্ট। সাংখ্যমতে পুরুষ বহু। কিন্তু প্রত্যেক পুরুষই সর্ব্বব্যাপক। তাহা না হইলে পুরুষ, অন্যের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হইত। প্রত্যেক পুরুষই দেশ-কাল-বস্তু-পরিচ্ছেদ শূন্য। দেহী বা পুরুষ সর্ব্বগত সর্ব্বব্যাপ্ত হইলে, কিরূপে সাংখ্যের বহুপুরুষবাদ সিদ্ধ হয়, তাহা সহজে বুঝা যায় না। পরবর্ত্তী শ্লোক দ্রষ্টব্য।

স্থির (স্থাণু)—রূপান্তরতা প্রাপ্তি শূন্য।

অচল—অপ্রকম্প্য, পূর্ব্বরূপ অপরিত্যাগী।

সনাতন—শাশ্বত, পুরাতন, নিত্য একরূপ।

অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়মবিকার্য্যোঽয়মুচ্যতে।
তস্মাদেবং বিদিত্বৈনং নানুশোচিতুমর্হসি ॥ ২৫

অব্যক্ত অচিন্ত্য ইহা হয় অবিকারী ;—
অতএব এইরূপ জানিয়া ইহায়,
শোক করা কভু নহে উচিত তোমার ॥ ২৫

(২৫) অব্যক্ত—আত্মা চক্ষুরাদি কোন ইন্দ্রিয়ের বিষয় নহে। এ জন্য আত্মা অভিব্যক্ত হইতে পারেন না (শঙ্কর)। কোন প্রমাণের দ্বারা তিনি ব্যক্ত নহেন।

অচিন্ত্য—চিন্তার অবিষয়। যে বস্তু প্রমাণ-গোচর তাহাই চিন্তার বিষয়। আত্মা প্রমাণ গোচর নহে বলিয়া অচিন্ত্য, তর্কের অগোচর (শঙ্কর)।

অবিকারী (অবিকার্য্য)—অম্ল-সংযোগে দুগ্ধ যেরূপ বিকার প্রাপ্ত হয়—আত্মা কিছুতেই সেরূপ বিকার প্রাপ্ত হয় না। নিরবলম্ব জন্যও আত্মা অবিকৃত (শঙ্কর)।

এই রূপ জানিয়া—অতএব আত্মা উৎপত্তি, প্রাপ্তি, বিকৃতি ও সংস্কৃতিরূপ ক্রিয়ার অধীন নহে, এইরূপ জানিয়া। কেহ কেহ অর্থ করেন যে এ আত্মা পরমাত্মা—জীবাত্মা নহে।

পূর্ব্বোক্ত কয় শ্লোকের কোন স্থানে 'আত্মা' কথার উল্লেখ নাই। 'দেহী', 'শরীরী' আর 'ইহা' এই তিনটি কথা মাত্র ব্যবহৃত আছে। সুতরাং দেহে অবস্থিত জীবাত্মাই ইহা দ্বারা লক্ষিত হইয়াছে। এই জীবাত্মা বা পুরুষের যে সকল বিশেষণ কঠোপনিষদে ও সাংখ্যদর্শনে আছে, এই সব শ্লোকে তাহাই পাওয়া যায়।

সাংখ্য দর্শনে আছে, পুরুষ অসঙ্গ (১।১৫), নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্তস্বভাব (১।১৯), নিষ্ক্রিয় (১।৪৯), নির্গুণ (১।৫৪), দ্রষ্টা বা সাক্ষী (১।৩৬১), উদাসীন (১।১৬৩), সাংখ্য তত্ত্বসমাসের ব্যাখ্যায় আছে, "পুরুষ অনাদি, সূক্ষ্ম, সর্ব্বগত, চেতন, অগুণ, নিত্য, দ্রষ্টা, ভোক্তা, অকর্ত্তা, ক্ষেত্রবিৎ, অমল ও অপ্রসবধর্ম্মী। পুরাণ বলিয়া, পুরীতে (দেহ বা প্রকৃতিতে) শয়ন করে বলিয়া, অথবা পুরোহিত বা সর্ব্বাগ্রবর্ত্তী বলিয়া ইহাকে "পুরুষ" বলে। ইহার আদি, অন্ত মধ্য নাই বলিয়া ইহা 'অনাদি'; নিরবয়ব ও অতীন্দ্রিয় বলিয়া ইহা 'সূক্ষ্ম'; সর্ব্বস্থানে বিরাজমান বলিয়া এবং গগনবৎ অনন্ত ব্যাপ্ত বলিয়া ইহা 'সর্ব্বগত'। (জর্ম্মন পণ্ডিত ক্যান্ট যেমন দেখাইয়াছেন, যে 'দেশ' ও 'কালের' অস্তিত্ব মায়াজনিত, তাহার পারমার্থিক অস্তিত্ব নাই, সেইরূপ শ্রুতি অনুসারে আত্মা হইতেই আকাশের সৃষ্টি হয়। সাংখ্যকার বলেন, "দিক্‌কালাবাকাশাদিভ্যঃ" অর্থাৎ 'দিক্‌কাল' প্রকৃতিজ আকাশাদিরূ

গুণ। উহার নিত্যত্ব বা স্বাধীন অস্তিত্ব নাই।) আত্মা এই দিক্ কাল অতিক্রম করিয়া অবস্থান করেন বলিয়া, দিক্‌কালের দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন বলিয়া ইহা 'সর্ব্বগত'। সুখ দুঃখ মোহ উপলব্ধি করে বলিয়া এই আত্মা 'চেতন'। ইহাতে সত্ত্ব রজঃ তমঃ গুণ আশ্রয় করে না বলিয়া ইহা 'নির্গুণ'। ইহা সৃষ্ট বা উৎপাদ্য নহে বলিয়া 'নিত্য'। প্রকৃতির বিকার উপলব্ধি করে বলিয়া 'দ্রষ্টা'। চেতন জন্য সুখ দুঃখ পরিজ্ঞাত হয় বলিয়া 'ভোক্তা'। উদাসীন ও অগুণ বলিয়া ইহা 'অকর্ত্তা'। ক্ষেত্র ও গুণ বুঝিতে পারে বলিয়া ইহা 'ক্ষেত্রজ্ঞ'। ইহাতে শুভাশুভ কর্ম্ম নাই বলিয়া 'অমল'। নির্ব্বীজ বলিয়া ইহা অপ্রসবধর্ম্মী। এই পুরুষের নামান্তর আত্মা, পুমান্, পুংগুণজন্তুজীব, ক্ষেত্রজ্ঞ, নর, কবি, ব্রহ্ম, অক্ষর, প্রাণ, যে, কে, সে, এই, ইহা। (সাংখ্যতত্ত্বসমাস ভাষ্য)।

অথ চৈনং নিত্যজাতং নিত্যং বা মন্যসে মৃতম্।
তথাপি ত্বং মহাবাহো নৈনং শোচিতুমর্হসি ॥ ২৬

কিম্বা যদি মহাবাহু ভাবহ ইহার,
নিত্য জন্ম হয়, আর নিত্য হয় নাশ,—
তথাপি ইহার তরে শোক অনুচিত ॥ ২৬

(২৬) নিত্য জন্ম হয়—আর যদি তুমি লোক-প্রসিদ্ধি অনুসারে এই প্রকৃতিবদ্ধ আত্মাকে বা দেহীকে প্রতিশরীরের উৎপত্তির সহিত জাত, এবং প্রতিদেহ নাশের সহিত মৃত বিবেচনা কর; এই লোক-প্রসিদ্ধ সাধারণ বিশ্বাসে যদি তোমার আস্থা থাকে। (শঙ্কর)। অথবা যদি পাঞ্চভৌতিক (স্থূল ভূত হইতে মদশক্তির ন্যায় জাত) বলিয়া আত্মাকে ধরিয়া লও—কিংবা বৌদ্ধদের মত দেহ হইতে ভিন্ন বিজ্ঞানস্বরূপ আত্মা প্রতিক্ষণ বিনাশ হইতেছে মনে কর (বলদেব); দেহের সঙ্গে আত্মার

জন্ম ভাবিয়া লও, ও দেহ নাশে আত্মার নাশ হয় মনে কর (স্বামী),— সৌগত লোকায়তিক ও চার্ব্বাকদিগের মত গ্রহণ কর।

অনুগীতা হইতে জানা যায় যে সেই সময়ে বিভিন্নমত প্রচলিত ছিল। (১) জড়বাদী বলিতেন মদ শক্তির ন্যায় বিভিন্ন ভূতের সংযোগ বিশেষ হইতে চৈতন্যের উৎপত্তি। (২) ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদী বলিতেন, প্রতি মুহূর্ত্তে বিজ্ঞান বিশেষের সহিত চৈতন্যের উৎপত্তি ও বিনাশ হয়। (৩) কেহ বলিতেন আত্মা নিত্য বটে, কিন্তু জড়। মনঃসংযোগে উহা চৈতন্য-যুক্ত হয়। ইন্দ্রিয় সংযোগে উহার জন্ম বলা যায়।

অনুগীতা যথা—

ঊর্দ্ধং দেহাৎ বদন্ত্যেকে নৈতদস্তীতি চাপরে।

* * * *

অনিত্যং নিত্যমিত্যেকে নাস্ত্যস্তীত্যাপি চাপরে।
মন্যন্তে ব্রাহ্মণা এব ব্রহ্মজ্ঞস্তত্ত্ববাদিনঃ॥
এবমেকে পৃথক্ চান্যে বহুত্বমপি চাপরে।
দেশকালাবুভৌ কেচিৎ নৈতদস্তীতি চাপরে॥

(মহাভারত—অশ্বমেধ পর্ব্বাধ্যায় ৫১।১—৫)।

জাতস্য হি ধ্রুবোমৃত্যু ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।
তস্মাদপরিহার্য্যেঽর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি॥ ২৭

জন্মিলে নিশ্চয় মৃত্যু, মরিলে জনম ;
অতএব কভু নাহি পরিহার যার—
তার তরে শোক তব নহে ত উচিত॥ ২৭

(২৭) জন্মিলে নিশ্চয় মৃত্যু—রামানুজ বলেন, উৎপত্তি বিনাশ উভয়ই সদ্বস্তর অবস্থাবিশেষ মাত্র। নষ্ট হইয়া উৎপত্তি, সতের উৎপত্তির

ন্যায় বোধ হয়—অসতের উৎপত্তি সেরূপে উপলব্ধ হয় না। দ্রব্যের পূর্ব্বাবস্থা হইতে উত্তরাবস্থা প্রাপ্তিই বিনাশ ; যথা—সাংখ্যে আছে—'নাশঃ কারণ-লয়ঃ'। স্বামী বলেন, আত্মা যদি অমর না হয়, তবে কেহ পাপ পুণ্যের ভাগী নহে। বলদেব বলেন, অপূর্ব্ব শরীরে ইন্দ্রিয়-যোগই জন্ম, ও পূর্ব্ব শরীরে ইন্দ্রিয়-বিয়োগই মৃত্যু। এইজন্য 'জন্মিলে' অর্থে, স্বকর্ম্ম বশে শরীর পাইলে। মধুসূদন বলেন, ধর্ম্মাধর্ম্ম বশে লব্ধ শরীরে কর্ম্মক্ষয় হইলে শরীর ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, এবং পূর্ব্বজন্মকৃত পাপপুণ্যাদির ভোগদ্বারা স্বর্গে বা নরকে থাকিয়া এই ভোগের ক্ষয় হয়। সেই পাপপুণ্যাদি ক্ষয়ের পরে পুনর্ব্বার জন্ম হয়। কিন্তু এ ব্যাখ্যা এস্থলে তত সঙ্গত বোধ হয় না। জন্ম, মৃত্যু এখানে পূর্ব্ব শ্লোক অনুসারে গ্রহণ করা যাইতে পারে।

পূর্ব্ব শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে দেহীকে নিত্যজাত ও নিত্যমৃত সিদ্ধান্ত করিলেও মৃত্যুতে শোক করা উচিত নহে। কেন উচিত নহে তাহাই এ শ্লোকে বলা হইয়াছে। যদি লব্ধজন্মা জীবের মৃত্যু ও মৃতের জন্ম অব্যভিচারী বা অবশ্যম্ভাবী হইল, তবে যে মরণ অপরিহার্য্য, তাহার জন্ম শোক করা কর্ত্তব্য নহে। যাহা হউক এস্থলে মৃতের জন্ম অবশ্যম্ভাবী বলায় জন্মান্তর উল্লিখিত হইয়াছে ; ইহাতে দেহনাশের সহিত দেহীর নাশ উক্ত হয় নাই, ইহা বলা যায়। আর ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদ অনুসারে এরূপ অর্থও করা যায় যে, নিত্যজাত ও নিত্যমৃত অর্থাৎ প্রতিক্ষণে জাত, ও প্রতিক্ষণে মৃত। আত্মা ক্ষণিক বিজ্ঞানপ্রবাহ মাত্র ; অতএব মরণানন্তর জন্ম—অর্থাৎ প্রতিক্ষণে জীবাত্মার মরণানন্তর জন্ম হয়। এ অর্থও ঠিক সঙ্গত নহে।

শোক করা নহেত উচিত—রামানুজ বলেন, পরিণাম স্বভাব দেহের উৎপত্তি বিনাশ অবশ্যম্ভাবী বলিয়া শোক করা অনুচিত।

পূর্ব্বে সাংখ্যজ্ঞান বুঝাইয়া, তদনুসারে অর্জ্জুনের শোক করা উচিত নহে, ইহা উপদিষ্ট হইয়াছে। অর্জ্জুনের যদি সে জ্ঞান না হয়, আত্মতত্ত্ব শ্রবণ করিয়াও আশ্চর্য্য হইয়া যদি কিছু বুঝিতে না পারেন, এবং দেহীর

দেহের সহিত জন্মমৃত্যু অবশ্যম্ভাবী ও অপরিহার্য্য মনে করেন, তাহা হইলেও তাঁহার শোক করা কেন কর্ত্তব্য নহে, তাহা এই ২৬শ—২৭শ শ্লোকে বুঝান হইয়াছে। যে দেহাভিমানী—দেহাত্মবাদী—যে প্রকৃতিবদ্ধ, সেই পুরুষের অজ্ঞানে যেরূপ দেহের জন্ম মৃত্যুতে তাহার জন্মমৃত্যু অনুভূত হয়, সেই এই জন্মমৃত্যু অবশ্যম্ভাবী জানিয়াও শোক করে। যাহা অবশ্যম্ভাবী, তাহার জন্য শোক করা উচিত নহে।

অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।
অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা ॥ ২৮

আদিতে অব্যক্ত রহে, ব্যক্ত মধ্যকালে,
নিধনে অব্যক্ত পুনঃ হয় ভূতগণ;
তবে কেন, হে ভারত, এ শোক-বিলাপ ? ২৮

(২৮) ভূত—জীব। পুত্র মিত্রাদি কার্য্যকারণ সংঘাতাত্মক প্রাণী (শঙ্কর)। দেহ বা পৃথিব্যাদি ভূতময় শরীরী (স্বামী ও মধু)। গীতায় প্রায় সর্ব্বত্র 'ভূত'—জীব বা প্রাণী অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। ভূত অর্থে দেহাভিমানী ক্ষর পুরুষ (১৫।১৬) এস্থলে শঙ্করাচার্য্য সেই অর্থ করেন।

অব্যক্ত—অর্থাৎ অদর্শন বা অনুপলব্ধি (শঙ্কর, হনু)। শাস্ত্রে আছে—

"অদর্শনাদাপতিতঃ পুনশ্চাদর্শনং গতঃ।
নাসৌ তব ন তস্য ত্বং বৃথা কা পরিদেবনা ॥"

জন্মের পূর্ব্বে ও পরে স্থূল শরীর থাকে না—সুতরাং সূক্ষ্ম শরীরের উপলব্ধি হয় না। অথবা অবিদ্যা-উপহিত পুরুষ সৃষ্টির প্রথমে (আদিতে) অব্যক্ত থাকে, লয়ের পরেও অব্যক্ত হয় (মধু)। স্বামী প্রভৃতি ব্যাখ্যাকারগণ বলেন

যে, অব্যক্ত—এখানে সাংখ্য-কথিত সূক্ষ্ম ও ইন্দ্রিয়ের অগোচর মূল প্রকৃতি বা প্রধান। এবং এ শ্লোকের অর্থ এই যে, আদিতে বা সৃষ্টিকালে প্রধান 'অব্যক্ত', মধ্য বা সৃষ্টিকালে 'ব্যক্ত' বা ভূতময় শরীরাদিরূপে প্রকাশিত, ও শেষে বা লয়ে পুনর্ব্বার "অব্যক্ত", হইয়া প্রধানে মিশিয়া যায় (বলদেব)।

গীতার অব্যক্ত অর্থে অব্যক্ত বা কূটস্থ পুরুষ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ক্বচিৎ অব্যক্ত অর্থে ব্রহ্মের জীব ও জড় প্রকৃতি উক্ত হইয়াছে। (৭।৫ ও ৮।১৮ ইত্যাদি শ্লোক দৃষ্টব্য)। এস্থলে অব্যক্ত অর্থে যাহা ব্যক্ত নহে (Unmanifest)। সাংখ্যমতে তাহা মূল প্রকৃতি। যিনি অব্যক্ত হইতেও অব্যক্ত তিনি পরমেশ্বর। অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে সমুদায় ব্যক্ত হয়, এবং সেই অব্যক্তে শেষে লয় প্রাপ্ত হয়। (গীতা ৮।১৮)। এস্থলে অর্থ ভূতগণ বা দেহাভিমানী জীব, দেহযুক্ত অবস্থায় ব্যক্ত (manifest) আর দেহগ্রহণের পূর্ব্বে ও পরে অব্যক্ত (unmanifest) থাকে। অব্যক্ত এখানে বিশেষণ।

মধ্যকাল—জন্ম-মরণান্তরাল কাল (স্বামী) দেহযুক্ত জীবিত অবস্থায়।

আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেনম্
আশ্চর্য্যবদ্ বদতি তথৈব চান্যঃ।
আশ্চর্য্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি
শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ॥ ২৯

কেহ হেরে এরে আশ্চর্য্যের ন্যায়,
আশ্চর্য্যের প্রায় কেহ কহে তায়,
কেহ শুনে আর আশ্চর্য্য হইয়া,
নাহি জানে এরে—কেহ ত শুনিয়া॥ ২৯

(২৯) কঠোপনিষদের দ্বিতীয় বল্লীর ৭ম শ্লোক ও এইরূপ—

"শ্রবণায়াপি বহুভির্যো ন লভ্যঃ
শৃণ্বন্তোঽপি বহবো যং ন বিদ্যুঃ।
আশ্চর্য্যো বক্তা কুশলোঽস্য লব্ধা
আশ্চর্য্যো জ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ॥"

আশ্চর্য্যের ন্যায়—যাহা অকস্মাৎ দৃষ্ট হয়, যাহা অদ্ভুত ও অদৃষ্টপূর্ব্ব তাহা আশ্চর্য্য। অদৃষ্ট-পূর্ব্ব আত্মার কথা জানিতে গিয়া লোকে আশ্চর্য্য হয়। আত্মাকে (অর্থাৎ দেহীকে) কেহ আশ্চর্য্যের ন্যায় দেখে, কেহ বা আশ্চর্য্যের ন্যায় বলে, কেহ বা আশ্চর্য্যের ন্যায় শুনে। অথবা যে আত্মাকে দেখিতে পায় বলিতে পারে এবং শুনিতে পারে সে আশ্চর্য্যতুল্য, (শঙ্কর)। অথবা শাস্ত্র ও আচার্য্যের উপদেশ পাইয়া আত্মজ্ঞান লাভ করিলেও লোকে বিস্মিত হইয়া ইহার' বিষয় আলোচনা করে—ইহার স্বরূপ সহজে ধারণা করিতে বা ইহার নিশ্চয় জ্ঞানলাভ করিতে পারে না। অর্থাৎ "শরীরাতিরিক্ত আশ্চর্য্যস্বরূপ আত্মার দ্রষ্টা, বক্তা, শ্রোতা কাহারও আত্ম-নিশ্চয় করা সহজ হয় না।" অবিদ্যা হেতু আত্মাকে বিরুদ্ধধর্ম্মী অর্থাৎ মুক্ত বদ্ধ, জড় চৈতন্য ইত্যাদি দেখিয়া আশ্চর্য্য হয়। (মধু)। আশ্চর্য্যবৎ শব্দটি ক্রিয়ার বিশেষণ বা কর্ত্তার বিশেষণ রূপে গ্রহণ করা যায়। তাহাতে উক্তরূপ ভিন্ন অর্থ হয়।

সাধনা দ্বারা (যোগ-বলে) আত্ম-সাক্ষাৎকার হইলে তবে আত্মার স্বরূপ বিজ্ঞান হয়। কেবল শ্রবণ দ্বারা তাহা কদাচিৎ সম্ভব হয়।

কেহ নারে জানিতে—অর্থাৎ উপযুক্ত লোকের মধ্যে কত সহস্রের ভিতর কদাচিৎ দুই এক জন মাত্র আত্মাকে উল্লিখিত স্বরূপে জানিতে পারে (শঙ্কর)। আত্মা বাক্য মনের অগোচর বলিয়া, ইহাকে সহজে কেহ দেখিতে, বলিতে বা শুনিতে পারে না। শ্রবণ-মননাদি দ্বারা সাধনা বলে ইহার জ্ঞান হইলে, আশ্চর্য্য হইতে হয় (মধু)। কেন উপনিষদে আছে

আত্মা বা ব্রহ্ম জ্ঞেয়ও নহেন অজ্ঞেয়ও নহেন। "অন্যদেব তদ্বিদিতাদথো অবিদিতাদধি" কেন, ১ম খণ্ড ৪। (৩ এবং ৯, ১০ মন্ত্রও দ্রষ্টব্য)। অতএব অর্জ্জুন আত্মতত্ত্ব শুনিয়াও—ইহার স্বরূপ জানিতে বা বুঝিতে পারিবেন না, ইহা ইঙ্গিত করা হইয়াছে। (গীতার ৭।৩ শ্লোক দ্রষ্টব্য।)

দেহী নিত্যমবধ্যোঽয়ং দেহে সর্ব্বস্য ভারত।
তস্মাৎ সর্ব্বাণি ভূতানি ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ॥ ৩০

দেহী নিত্য, অবধ্য সে সবাকার দেহে
অতএব হে ভারত সর্ব্বভূত তরে
শোক করা কভু নহে তোমার উচিত ॥ ৩০

(৩০) সর্ব্ব ভূত তরে—সকল প্রাণিগণের জন্য (শঙ্কর)। ভীষ্মাদি সকলের জন্য (স্বামী)। যাঁহারা ভীষ্মাদি ভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহাদের জন্য (মধু)। দেবাদি স্থাবরান্ত সমুদয় প্রাণীর জন্য (রামানুজ)।

পূর্ব্বের কয় শ্লোকে যে "সাংখ্যজ্ঞান" উপদিষ্ট হইয়াছে, সাংখ্যদর্শনে তাহার বিস্তারিত বিবরণ আছে। ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তির উপায় নির্ণয় করাই সংখ্যদর্শনের উদ্দেশ্য। পুরুষ-প্রকৃতি-বিবেক জ্ঞান হইতেই দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি হয়। অর্জ্জুন দুঃখে অভিভূত হইয়াছিলেন। এই জন্য সেই দুঃখ নিবৃত্তির প্রধান উপায় যে সাংখ্যজ্ঞান, তাহাই অর্জ্জুনকে ভগবান্ প্রথমে উপদেশ দিয়াছেন।

পুরুষ—প্রকৃতি হইতে ভিন্ন। প্রকৃতি হইতে দেহের উৎপত্তি। দেহ—ক্ষেত্র, দেহী পুরুষ—ক্ষেত্রজ্ঞ (১৩।১, ৪, ৫) দেহের ধর্ম্ম—পুরুষের নহে। প্রকৃতি-বদ্ধ হইয়া পুরুষ দেহী হয়, দেহাভিমানী হয়। পুরুষ অতীত বর্ত্তমান ভবিষ্যৎ তিন কালেই নিত্য (২।১২)। দেহের কৌমার

যৌবন জরা প্রভৃতি অবস্থান্তরের ন্যায় দেহীরও দেহান্তর হয় (২।১৩), অন্য দেহ গ্রহণ হয় (২।২২)। সুখদুঃখাদি দেহের ধর্ম্ম—ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়-সম্পর্কে জাত, তাহা আত্মার ধর্ম্ম নহে (২।১৫)। দেহী অবিনাশী, সর্ব্বব্যাপ্ত (২।১৭), অপ্রমেয়, জন্ম স্থিতি মৃত্যু প্রভৃতি কোন ভাববিকারের অধীন নহে। দেহী পুরুষ,—অজ, নিত্য, শাশ্বত, পুরাণ, স্থাণু, অচল, সনাতন, অব্যক্ত, অচিন্ত্য অবিকারী। পুরুষ অকর্ত্তা, এজন্য তাহা কাহারও হন্তা নহে, কাহাকেও হননাদি কর্ম্মে প্রবৃত্তও করে না।

অজ্ঞান-বশতঃই দেহী দেহের ধর্ম্ম আপনাতে আরোপ করিয়া বা অধ্যাস করিয়া দুঃখ পায়। যখন আপনাকে দেহ হইতে পৃথক্ বলিয়া জানিতে পারে, আত্মা কর্ত্তা নহে ইহা বুঝিতে পারে, তখন তাহার দুঃখনিবৃত্তি হয়। এইরূপে দুঃখ-নিবৃত্তির জন্য ভগবান্ অর্জ্জুনকে সাংখ্যজ্ঞান উপদেশ দিয়াছেন। কিন্তু সাংখ্যজ্ঞানে বহু পুরুষবাদ প্রসিদ্ধ আছে। ভগবান্ এই শ্লোকে সেই বহু পুরুষবাদের পরিবর্ত্তে এক পরমাত্মতত্ত্বের ইঙ্গিত করিয়াছেন। একই দেহী সর্ব্বভূত-দেহে অবস্থিত, একই আত্মা সর্ব্বভূতান্তরে অবস্থিত—সর্ব্বভূতাত্মা—পরমাত্মা—পরমপুরুষ (১৩।২২)। তিনিই সর্ব্বক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞ (১৩।২)। তিনি সর্ব্বভূতে অবিভক্ত হইলেও বিভক্তের ন্যায় স্থিত বোধ হয় (১৩।১৬)। পরে ১৩ অধ্যায়ে ইহা বিবৃত হইয়াছে। দেহী অজ্ঞানবশতঃ আপনাকে অন্য দেহী হইতে পৃথক্ (ক্ষর পুরুষ) মনে করে। সে অজ্ঞান সম্পূর্ণ দূর হইলে, তবে এই একত্ব জ্ঞান হয়।

স্বধর্ম্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমর্হসি।
ধর্ম্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োঽন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে॥ ৩১

তার পর ভাবি দেখি' স্বধর্ম্ম আপন,
নাহি হ'য়ো বিচলিত ; ধর্ম্ম-যুদ্ধ বিনা,
ক্ষত্রিয়ের শ্রেয়তর নাহি কিছু আর ॥ ৩১

(৩১) তার পর—কেহ দেহান্তে আত্মার স্থিতি বিশ্বাস করিতেন, কেহ বা বিশ্বাস করিতেন না—ইত্যাদিরূপ আত্মতত্ত্ব বিষয়ে বিভিন্ন মত প্রচলিত আছে জানিয়া, এবং ইহার মধ্যে কোন না কোন মতে অর্জ্জুন বিশ্বাসবান্ হইতে পারেন মনে করিয়া, অথবা অর্জ্জুন শোক-মোহ-যুক্ত—প্রকৃত আত্মতত্ত্ব ধারণায় অসমর্থ এবং আত্মার নিত্যত্ব সর্ব্বব্যাপিত্ব প্রভৃতি স্বরূপ ধারণায় অক্ষম বিবেচনা করিয়া, ভগবান্ অন্য উপদেশ দিতেছেন। এই সংক্ষিপ্ত আত্মতত্ত্বের উপদেশ শ্রবণমাত্র অর্জ্জুনের অজ্ঞান দূর হইয়া আত্মজ্ঞান লাভ হইবে না, কারণ তাহা অতি কঠোর সাধনা-সাধ্য ; ইহা জানিয়া ভগবান্ অর্জ্জুনকে স্বধর্ম্ম সাধনের কর্ত্তব্যতা বুঝাইয়া, ধর্ম্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত করাইবার জন্য এই উপদেশ দিয়াছেন।

ধর্ম্মযুদ্ধ—ক্ষত্রিয়ের স্বাভাবিক প্রকৃতির অনুযায়ী বা আত্মস্বভাবানু-যায়ী যে যুদ্ধ, যাহাতে পৃথিবী জয়ের দ্বারা ধর্ম্ম স্বার্থ ও প্রজারক্ষণরূপ সৎকর্ম সম্পাদিত হয় (স্বামী)। রাজ্য-রক্ষার্থ, আপনা হইতে উপস্থিত এবং ধর্ম্মের জন্য যে যুদ্ধ কর্ত্তব্য—কেবল তাহাই ধর্ম্মযুদ্ধ। এই তত্ত্বই গীতায় পরে বুঝান হইবে।

ক্ষত্রিয়ের স্বাভাবিক বর্ণোচিত কর্ম্ম যুদ্ধ, এবং এই জন্য এ যুদ্ধ যে ধর্ম্মযুদ্ধ, একথা বলা যায় না। ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধ-প্রবৃত্তি স্বাভাবিক ; কিন্তু সে যুদ্ধ—ধর্ম্মযুদ্ধও হইতে পারে এবং অধর্ম্মযুদ্ধও হইতে পারে। লোভে বা বলাদি-জনিত দর্পে পররাজ্য-অপহরণজন্য বা পরের উদ্বেগ-সাধনজন্য যে যুদ্ধ—যাহা নীচবাসনা-মূলক, তাহা অধর্ম্ম যুদ্ধ। যুদ্ধ ব্যতীত, যেখানে প্রবলের অত্যাচার প্রশমিত হয় না, যেখানে আত্মরক্ষা বা পররক্ষা সম্ভব হয় না, যেখানে এক পক্ষ অন্যায় আচরণ করিয়া, তাহার সমর্থন জন্য যুদ্ধে কৃতনিশ্চয়, সে স্থলে সে পক্ষকে বাধা দিবার জন্য—আত্ম রক্ষা ও পররক্ষার জন্য, অধর্ম্ম দমনকরিয়া ধর্ম্ম-সংরক্ষণ জন্য যে যুদ্ধ—তাহা ধর্ম্ম যুদ্ধ। যাহারা শান্তির পক্ষপাতী, তাহাদের পক্ষেও এরূপ

যুদ্ধ ন্যায়সঙ্গত ও কর্ত্তব্য। কারণ, যুদ্ধদ্বারা প্রতিপক্ষকে দমন না করিলে, পাপের প্রশ্রয় দেওয়া হয়। এরূপ যুদ্ধ বিনা যত্নে উপস্থিত হয়। (ইহা offensive বা aggressive নহে, ইহা defensive)। এইরূপ যুদ্ধই ধর্ম্মযুদ্ধ। ইহাই স্বর্গের কারণ। ভগবান্ অর্জ্জুনকে এইরূপ যুদ্ধ করিতেই উপদেশ দিতেছেন। শাস্ত্রে আছে—

আহবেষু মিথোঽন্যোন্যং জিঘাংসন্তো মহীক্ষিতঃ।
যুধ্যমানাঃ পরং শক্ত্যা স্বর্গং যান্ত্যপরাঙ্মুখম্ ॥

পরাশর-স্মৃতিতে আছে—

"ক্ষত্রিয়ো হি প্রজা রক্ষন্ শস্ত্রপাণিঃ প্রদণ্ডয়ন্।
নির্জ্জিতং পরসৈন্যাদি ক্ষিতিং ধর্ম্মেণ পালয়েৎ ॥

মানব ধর্ম্মশাস্ত্রে আছে,—

"সমোত্তমাধমৈ রাজা চাহূতঃ পালয়ন্ প্রজাঃ।
ন নিবর্ত্তেত সংগ্রামাৎ ক্ষাত্রধর্ম্মমনুস্মরন্ ॥"

(গীতায় ১৮।৪৩ শ্লোক দ্রষ্টব্য।)

স্বধর্ম্ম—ক্ষত্রিয়ের স্বাভাবিক ধর্ম্ম—যুদ্ধ তাহার আত্ম-ধর্ম্ম (শঙ্কর)। জীবমাত্রেই প্রকৃতির সহিত নিত্য সম্বন্ধযুক্ত। দেহীর বা জীবাত্মার স্বরূপতঃ কোন ধর্ম্ম নাই। সুতরাং স্বধর্ম্ম অর্থে আত্মার ধর্ম্ম হইতে পারে না। প্রকৃতি-সংযোগে আত্মার বা পুরুষের বদ্ধ ভাব হয়। জীব প্রকৃতি-বদ্ধ হইয়া প্রকৃতির ধর্ম্ম আপনাতে আরোপ করে বলিয়া, সেই জীবেরই ধর্ম্ম থাকে। প্রকৃতি—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই ত্রিগুণাত্মিকা। এই গুণের ইতর বিশেষ হয়। তদনুসারে প্রতিজীবের ধর্ম্মেরও ইতর বিশেষ হয়। যাহার যেরূপ প্রকৃতি, তাহার ধর্ম্মও সেইরূপ। যে জীবে প্রকৃতির গুণের যেরূপ বিকাশ থাকে, তাহার ধর্ম্মেরও সেইরূপ বিকাশ হয়। এই গুণভেদে ধর্ম্ম ভেদ হয়। গুণ ও ধর্ম্ম-ভেদ অনুসারে কর্ম্ম-ভেদ হয়। গুণ ও কর্ম্মের বিভাগ অনুসারে মানুষের মধ্যে স্বাভাবিক বর্ণভেদ হয়। এ জন্য পৃথিবীর

সর্ব্বত্রই বর্ণবিভাগ স্বাভাবিক বা ঈশ্বর-নির্দ্দিষ্ট। (গীতার ৪।১৩ ও ১৮।৪১—৪৫ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। সত্ত্ব প্রকৃতির লোক ব্রাহ্মণধর্ম্মী; সত্ত্ব-রজঃ প্রকৃতির লোক ক্ষত্রিয়ধর্ম্মী; রজ-স্তমঃ প্রকৃতির লোক বৈশ্যধর্ম্মী এবং তমঃ প্রকৃতির লোক শূদ্রধর্ম্মী। প্রকৃতি প্রভাবেই কর্ম্মের উৎপত্তি। স্বাভাবিক কর্ম্মবিভাগ অনুসারে বর্ণ বিভাগ হইয়াছে। তন্মধ্যে ক্ষত্রিয়ের স্বাভাবিক কর্ম্ম বা স্বধর্ম্ম—শৌর্য্য, তেজ, ধৃতি, দক্ষতা, যুদ্ধে অপলায়ন, দান ও ঈশ্বর ভাব। এ সব কথা গীতার ১৮শ অধ্যায়ে ৪১শ হইতে ৪৪শ শ্লোকে বুঝান আছে।

অতএব যাঁহার যাহা স্বাভাবিক ধর্ম্ম, তাহাই তাঁহার স্বধর্ম্ম। বঙ্কিম বাবু বুঝাইয়াছেন, আমাদের সকল বৃত্তির অনুশীলনই ধর্ম্ম। অর্থাৎ জ্ঞানবৃত্তি, কর্ম্মবৃত্তি ও চিত্তবৃত্তির সম্যক্‌ অনুশীলনই আমাদের ধর্ম্ম। যাঁহারা জ্ঞানপ্রধান, যাঁহাদের জ্ঞানের বিশেষ বিকাশ হইয়াছে, তাঁহাদের জ্ঞানবৃত্তির অনুশীলন জন্য অন্য কর্ম্মের প্রয়োজন নাই। তাঁহারা কর্ম্ম-সন্ন্যাস করিতে পারেন। কিন্তু গীতায় দেখান হইয়াছে, জ্ঞান ও কর্ম্মবৃত্তির সামঞ্জস্য করিয়া অনুশীলনই ধর্ম্ম। প্রথমে কর্ম্ম আত্মোন্নতির জন্য,—জ্ঞান-মার্গে যাইবার জন্য। পরে জ্ঞানপথ পাইলে নিজের জন্য কর্ম্মের প্রয়োজন না থাকিলেও, সমাজের জন্য, লোকহিত দৃষ্টান্ত দেখাইবার জন্য—কর্ম্ম করিতে হইবে। প্রথমে সমাজে জ্ঞান ও ধর্ম্মরক্ষা ও ধর্ম্মপ্রচার জন্য কর্ম্ম করিতে হয় (ইহা ব্রাহ্মণের কর্ম্ম)। তাহার পর সমাজরক্ষার জন্য যুদ্ধাদি করিতে হয় (ইহা ক্ষত্রিয়ের কর্ম্ম)। পরে শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি ও তদানুষঙ্গিক গোরক্ষণাদি করিতে হয় (ইহা বৈশ্যের কর্ম্ম)। আর এই সব কর্ম্মে নিযুক্ত লোক যাহাতে আপনার পরিচর্য্যা আপনি না করিয়া, তাঁহাদের উচ্চতর শক্তিকে অপ্রতিহতরূপে কর্ত্তব্য কার্য্যসাধনে নিযুক্ত করিতে পারেন, তজ্জন্য (নিম্ন) হীনবুদ্ধিসম্পন্ন লোকের কর্ত্তব্য, যে সেই সব লোকের পরিচর্য্যা করিবে। (ইহা তমঃপ্রকৃতি শূদ্রের কর্ম্ম)। যাঁহার যেরূপ প্রকৃতি ও শক্তি,

তিনি সমাজ রক্ষার্থ সেইরূপ কর্ম্মের অনুসরণ করিবেন। কারণ সেই কর্ম্মই তাঁহার সহজ ও অনায়াসসাধ্য। ইহার মধ্যে যিনি যে কার্য্য করিবার উপযুক্ত, তাহাই তাঁহার অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম বা Duty। সেই কর্ম্মদ্বারাই সমাজরক্ষা ও সমাজের উন্নতি হয়; সুতরাং যিনি যে কর্ম্মের উপযুক্ত, সমাজমধ্যে অবস্থান অনুসারে যিনি যে কর্ম্মে নিয়োজিত সেই কর্ম্ম তাঁহার অনুষ্ঠেয়। ইহাই স্বধর্ম্মাচরণ। ইহা দ্বারাই সিদ্ধিলাভ হয়, ইহা দ্বারাই ঈশ্বরার্চ্চনা হয়। ইহাই পরম তপস্যা। ইহাই ভগবৎ-সেবার প্রকৃষ্ট পথ (গীতা ১৮।৪৫—৪৬)। আমাদের শাস্ত্রে এইরূপ প্রকৃতি অনুসারে বর্ণ বিভাগ ও প্রত্যেক বর্ণের স্বধর্ম্ম বিধিবদ্ধ হইয়াছে। এবং মানুষ মাতাপিতৃজ শরীর হইতে তাহাদের অনুরূপ প্রকৃতি পায় বলিয়াই সাধারণতঃ এই বর্ণ-বিভাগ পুরুষ-পরম্পরাগত বা hereditary হইয়াছে। গীতার তৃতীয় অধ্যায়ের ৩৫শ শ্লোকে আছে, পরধর্ম্মানুষ্ঠান অপেক্ষা স্বধর্ম্মানুষ্ঠান সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়ঃ। টীকাকার বলদেব কতকগুলি স্বধর্ম্ম ত্যাগের দৃষ্টান্ত দিয়া এই কথা বুঝাইয়াছেন। তিনি বলেন, পরশুরাম বিশ্বামিত্র প্রভৃতি স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছিলেন। শাস্ত্রে এরূপ আরও দৃষ্টান্ত কখন কখন দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাতে এই সাধারণ বিধির কোন ব্যতিচার হয় না। তাঁহারা যে কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই কুলোচিত কর্ম্ম প্রবৃত্তি দমন করিয়া, তাঁহারা ঘটনাচক্রে অন্য রূপ কর্ম্ম করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। শাস্ত্রে বুঝান আছে যে, এরূপ করিতে তাঁহাদের বিশেষ কষ্ট হইয়াছিল। স্বধর্ম্মের পরিবর্ত্তে দ্রোণাদির ক্ষাত্র ধর্ম্ম গ্রহণ কষ্টসাধ্য ছিল। ক্ষত্রিয় দেবরাত প্রভৃতি আশ্রম-ধর্ম্মাচরণ দ্বারা বাসনা ক্ষীণ হইলে, তবে পরিব্রাজকের ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন। বঙ্কিম বাবু তাঁহার গীতা-ব্যাখ্যায় এই কর্ম্মবিভাগ ও কর্ম্মানুসারে বর্ণবিভাগ-তত্ত্ব বুঝাইয়াছেন। তাহা এস্থলে উল্লেখের আবশ্যক নাই।

যদৃচ্ছয়া চোপপন্নং স্বর্গদ্বারমপাবৃতম্।
সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ পার্থ লভন্তে যুদ্ধমীদৃশম্ ॥ ৩২

যে যুদ্ধ আপনা হ'তে হয় উপস্থিত—
মুক্ত-স্বর্গ-দ্বার যাহা,—লভে যে ক্ষত্রিয়
এ হেন সমর পার্থ, সুখী সেই জন ॥ ৩২

(৩২) আপনা হ'তে—স্বপ্রযত্ন-ব্যতিরেকে (মধু)। বিনা প্রার্থনায় আগত (শঙ্কর)। প্রযত্ন বিনা উপস্থিত যুদ্ধ ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্মসঙ্গত যুদ্ধ। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, এ যুদ্ধ যাহাতে না হয়, এবং বিনা যুদ্ধে যাহাতে দুর্য্যোধন পাণ্ডবদিগের নিকট হইতে অন্যায়-পূর্ব্বক হৃত রাজ্য তাঁহাদিগকে ফিরাইয়া দেন, অন্ততঃ তাঁহাদিগকে পাঁচখানি মাত্র গ্রাম দেন, সে জন্ম স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ সবিশেষ চেষ্টা করিয়া ছিলেন। কিন্তু দুর্য্যোধন কোন কথা শুনেন নাই। এ জন্য যুদ্ধ অপরিহার্য্য হইল। (মহাভারত উদ্যোগপর্ব্ব দ্রষ্টব্য)। সুতরাং পাণ্ডবেরা যত্ন করিয়া এ যুদ্ধ উপস্থিতকরেন নাই।

মুক্ত স্বর্গ-দ্বার—কীর্ত্তি, রাজ্য বা স্বর্গ-লাভরূপ ফলসাধক যে যুদ্ধ (মধু)। যুদ্ধে হত হইলেও যে স্বর্গে গতি হয়, তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। (পূর্ব্ব শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য)।

সুখী—মূলানুযায়ী অর্থ—সুখী ক্ষত্রিয়গণ এ রূপ যুদ্ধ লাভ করিয়া থাকেন। নিজ প্রবৃত্তি বা প্রকৃতির অনুযায়ী যে কর্ম্ম সেই কর্ম্ম করিতে পারিলেই মানুষে সুখী হয়। যুদ্ধ—বীর শৌর্য্যসম্পন্ন ক্ষত্রিয়ের প্রকৃতির অনুযায়ী। সেই প্রকৃতির চরিতার্থতাতেই তাহার সুখ। কর্ত্তব্য পালনেই সুখ। ধর্ম্মযুদ্ধ ক্ষত্রিয়ের কর্ত্তব্য। ধর্ম্মযুদ্ধেই ক্ষত্রিয় বীর ইহকালে আপন কর্ত্তব্য পালন করিয়া সুখী হন। পরকালেও স্বর্গ লাভ করিয়া সুখী হন। ধর্ম্মযুদ্ধে যিনি পরাঙ্মুখ না হন, তিনি হয় যুদ্ধ-জয় করিবেন,

অথবা যুদ্ধে হত হইবেন। রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন ক্ষত্রিয়-ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ। যুদ্ধ-জয় করিলে ইহকালে সুখ লাভ হয়, এবং পরকালে স্বধর্ম্মাচরণ ফলে স্বর্গ লাভ হয়। যুদ্ধে হত হইলে সদ্যঃ স্বর্গে গতি হয়।

অথ চেৎ ত্বমিমং ধর্ম্ম্যং সংগ্রামং ন করিষ্যসি।
ততঃ স্বধর্ম্মং কীর্ত্তিঞ্চ হিত্বা পাপমবাপ্স্যসি ॥ ৩৩

হেন ধর্ম্মযুদ্ধ তুমি নাহি কর যদি,—
তা হলে স্বধর্ম্ম আর সুকীর্ত্তি তোমার
পরিহরি,—পাপ তুমি করিবে অর্জ্জন ॥ ৩৩

(৩৩) স্বধর্ম্ম…অর্জ্জন—মানবধর্ম্মশাস্ত্রে আছে—

"যস্তু ভীতঃ পরাবৃত্তঃ সংগ্রামে হন্যতে পরৈঃ।
ভর্ত্তুর্যদ্দুষ্কৃতং কিঞ্চিৎ তৎ সর্ব্বং প্রতিপদ্যতে।
যচ্চাস্য সুকৃতং কিঞ্চিদমুত্রার্থমুপার্জ্জিতম্।
ভর্ত্তা তৎ সর্ব্বমাদত্তে পরাবৃত্তহতস্য তু॥"

স্বধর্ম্ম সম্বন্ধে পূর্ব্বে ৩১শ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য।

সুকীর্ত্তি—মহাদেবাদির সহিত সংগ্রাম-জনিত কীর্ত্তি (শঙ্কর)।

অর্জ্জুনের কীর্ত্তি অনেক। মহাভারতে তাহা বর্ণিত আছে। তাহা এস্থলে বিবৃত করিবার প্রয়োজন নাই। এই সকল কীর্ত্তি হইতে অর্জ্জুন যুদ্ধে অজেয়, অপরাজিত, এই খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি স্বধর্ম্ম পালন দ্বারা ক্ষত্রিয়ের আদর্শ হইয়াছিলেন।

পাপ অর্জ্জন—স্বধর্ম্ম আচরণে পরাঙ্মুখ হইলে, যেমন পাপ হয়' সেইরূপ যে কীর্ত্তিমান্, সে অকীর্ত্তিকর কার্য্য করিলে, অর্থাৎ যাহাতে তাহার সে কীর্ত্তির লোপ হয়, এরূপ আচরণ করিলেও তাহার পাপ হয়।

সৎকার্য্য দ্বারাই কীর্ত্তিলাভ হয়। অসৎ বা অনুচিত কার্য্যেই অকীর্ত্তি হয়। অতএব অকীর্ত্তিকর কার্য্য পাপ-জনক।

অকীর্ত্তিঞ্চাপি ভূতানি কথয়িষ্যন্তি তেঽব্যয়াম্।
সম্ভাবিতস্য চাকীর্ত্তির্ম্মরণাদতিরিচ্যতে ॥ ৩৪

অক্ষয় অকীর্ত্তি তব ঘোষিবে সংসার—
মানীর অকীর্ত্তি হয় মরণ অধিক ॥ ৩৪

(৩৪) অক্ষয় (অব্যয়ম্)—দীর্ঘকালব্যাপী (শঙ্কর); চিরস্থায়ী।

সংসার—মূলে আছে "ভূতানি"। প্রাণিগণ (শঙ্কর)।

মানীর (সম্ভাবিতস্য)—ধর্ম্মাত্মা শূর ইত্যাদি গুণের দ্বারা সম্মানিত যে তাহার (হনু)।

মরণ অধিক—মানীর পক্ষে অপমানই তাহার মৃত্যু। অপমানে তাহাকে জীবন্মৃত হইয়া থাকিতে হয়। যে হেতু অপমান মৃত্যু অপেক্ষাও অধিক ক্লেশকর, অতএব অপমান অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়।

ভয়াদ্রণাদুপরতং মংস্যন্তে ত্বাং মহারথাঃ।
যেষাঞ্চ ত্বং বহুমতো ভূত্বা যাস্যসি লাঘবম্ ॥ ৩৫

মহারথগণ ইহা ভাবিবে নিশ্চয়—
ভয় হেতু রণ হ'তে হইলে বিরত ;
সম্মান করিত যারা ঘৃণিবে তোমায় ॥ ৩৫

(৩৫) মহারথগণ—দুর্য্যোধন প্রভৃতি (শঙ্কর)। দুর্য্যোধন পক্ষ সমস্ত মহারথগণ (রামানুজ)।

ভয়হেতু—কর্ণ প্রভৃতির ভয়ে (শঙ্কর)।

ঘৃণিবে (লাঘব)—অনাদর করিবে (স্বামী)। লঘু বা সামান্য মনে করিবে, যুদ্ধে পরাঙ্মুখ মনে করিবে।

অবাচ্যবাদাংশ্চ বহূন্ বদিষ্যন্তি তবাহিতাঃ।
নিন্দন্তস্তব সামর্থ্যং ততো দুঃখতরং নু কিম্ ॥ ৩৬

অবাচ্য বচন কত তোমার অহিত
কহিবে,—নিন্দিবে আর সামর্থ্য তোমার,—
ইহা হ'তে দুঃখকর কিবা আছে আর ? ৩৬

(৩৬) অহিত—অহিতকর। অবাচ্যবচন—অবজ্ঞাসূচক বাক্য।

সামর্থ্য—তুমি বিপক্ষগণের সহিত যুদ্ধ করিতে অসমর্থ, এই বলিয়া শত্রুগণ তোমার নিন্দা করিবে (রামানুজ)।

দুঃখকর—এবংবিধ নিন্দাদি শ্রবণে 'মরণই শ্রেয়', অবশ্যই এইরূপ মনে হইবে (রামানুজ)। তুমি যুদ্ধ করিয়া ভীষ্মাদিকে বধ করিয়া যে দুঃখ পাইবে মনে করিতেছ, যুদ্ধ না করায় এইরূপ নিন্দা শ্রবণে তোমার ততোধিক দুঃখ হইবে (মধু)।

হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্।
তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ ॥ ৩৭

পাবে স্বর্গ হত হও যদি, জয়ী হ'লে
ভুঞ্জিবে ধরার রাজ্য ! তবে হে কৌন্তেয়
সংগ্রাম সংকল্প করি করহ উত্থান ॥ ৩৭

(৩৭) স্বর্গ—পরম নিঃশ্রেয়স (রামানুজ)। যুদ্ধে মৃত্যু হইলে যে স্বর্গ-লাভ হয়, তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে।

রামানুজ বলেন যে ফলাভিসন্ধি ত্যাগ পূর্ব্বক যে স্বধর্ম্ম যুদ্ধ, তাহা পরম ধর্ম্ম, এজন্য তাহা নিঃশ্রেয়স বা মুক্তি লাভের উপায়। স্মৃতি বিধান পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। যথা—

"দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে সূর্য্যমণ্ডলভেদিনৌ।
পরিব্রাড়্‌ যোগযুক্তশ্চ রণে চাভিমুখো হতঃ।"

সংগ্রাম সংকল্প করি—যুদ্ধই যে পরমপুরুষার্থ-লক্ষণ নিঃশ্রেয়স-সাধন, ইহা স্থির নিশ্চয় করিয়া (রামানুজ)। যুদ্ধে জয় হউক, পরাজয় হউক, উভয়েই লাভ ইহা স্থির করিয়া (মধু)।

অর্জ্জুন পূর্ব্বে যুদ্ধ করা বা না করায় কি লাভ বা ক্ষতি, তাহা গণনা করিতেছিলেন ও যুদ্ধ শ্রেয় নহে, ইহা ভগবান্‌কে বলিতেছিলেন। অর্জ্জুন লাভালাভ বিচার পূর্ব্বক যুদ্ধ করা কর্ত্তব্য কি অকর্ত্তব্য স্থির করিতেছেন দেখিয়া ভগবান্ তাঁহাকে এই লাভ ও ক্ষতি বিষয়েও উপদেশ দিতেছেন। অর্জ্জুন যুদ্ধ শ্রেয় কি না তাহাই বিবেচনা করিতেছিলেন—যুদ্ধ করিয়া গুরু ও বন্ধু বধ করা অন্যায়, তাহাতে কোন সুখ বা প্রীতি হইবে না ভাবিতেছিলেন,—কুলক্ষয়ে দোষ দেখিতেছিলেন,—কুলক্ষয়কারীর পাপ চিন্তা করিতেছিলেন ও এই সব মনে করিয়া শোক পাইতেছিলেন। তিনি স্পষ্ট করিয়া লাভালাভের কথা বলেন নাই। তাহার ইঙ্গিত করিয়াছিলেন মাত্র।

(৩২-৩৭)—বঙ্কিমবাবু বলিয়াছেন, গীতার এ শ্লোকগুলি যেরূপ অসংলগ্ন ও হেয় ধর্ম্মনীতিজ্ঞাপক, তাহাতে এগুলিকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু সেরূপ অনুমান করিবার কোন কারণ নাই। পূর্ব্বে ১১শ শ্লোকের টীকায় ইহার প্রয়োজন দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি। এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু তাহা ব্যতীত আরও কথা

আছে। গীতার প্রথম অধ্যায়ে দেখান হইয়াছে যে, অর্জ্জুন তখন ভ্রান্ত ও মোহযুক্ত। তিনি যে লোক-সাধারণ দয়া প্রভৃতি কোমল বৃত্তিবশে মুগ্ধ হইয়া, প্রকৃত ধর্ম্মপথ বুঝিতে না পারিয়া বৃথা পাণ্ডিত্যাভিমান করিতেছিলেন, তাহা ক্ষণস্থায়ী। কিছুক্ষণ পরে ক্ষত্রিয়ের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিবশে তিনি তাহা ভুলিয়া গিয়া যুদ্ধে নিশ্চয়ই প্রবৃত্ত হইবেন। এই কথা গীতার ১৮ অধ্যায়ের ৫৯ম ও ৬০ম শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। যথা—

"যদহঙ্কারমাশ্রিত্য ন যোৎস্য ইতি মন্যসে।
মিথ্যৈব ব্যবসায়স্তে প্রকৃতিস্ত্বাং নিযোক্ষ্যতি॥
স্বভাবজেন কৌন্তেয় নিবদ্ধঃ স্বেন কর্ম্মণা
কর্ত্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যস্যবশোঽপি তৎ॥"

এই ক্ষত্রিয়-প্রকৃতি কিরূপে অর্জ্জুনকে কর্ম্মে নিয়োজিত করিবে? লোকে তাঁহাকে ছোট করিবে,—তাঁহার কীর্ত্তি-লোপ হইবে এবং যুদ্ধে তাঁহার যশঃ বিলুপ্ত হইবে,— এই সকল রাজসিক ভাবনা পরে তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়া কর্ম্মে নিয়োজিত করিবে। তাহাই এই কয় শ্লোকে বুঝান আছে। অথবা অর্জ্জুন প্রথমে যতটুকু বুঝিবার অধিকারী, এখানে ততটুকু মাত্র বুঝান হইয়াছে, ইহাও বলা যায়।

শঙ্করাচার্য্য বলেন, লৌকিক ন্যায় বা নীতির অনুসরণ করিয়া এই উপদেশ দেওয়া হইয়াছে।

এই কয় শ্লোক হইতে বুঝা যায় যে, এ যুদ্ধে পাণ্ডবদের যে নিশ্চয়ই জয় হইবে, ভগবান্ এখানে অর্জ্জুনকে এরূপ আশা দেন নাই। যুদ্ধে জয়ও হইতে পারে, পরাজয়ও হইতে পারে। শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদের পক্ষ বলিয়া যে জয় নিশ্চিত, তাহা ভগবান্ বলেন নাই, অর্জ্জুনও বুঝেন নাই। তথাপি ভগবান্ অর্জ্জুনকে যুদ্ধ করা কর্ত্তব্য বলিয়া বুঝাইতেছেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এক স্থলে সঞ্জয়কে বলিয়াছিলেন, "পাণ্ডবেরা পৈতৃক ধর্ম্মে স্থিতি করিয়া যদি বিপদ্‌গ্রস্ত হন, মৃত্যুমুখে পতিত হন, তথাপি যথাশক্তি

স্বধর্ম্ম পালন করাতে, তাঁহাদের মৃত্যুও প্রশংসিত হইবে।” ভগবান্ অন্যত্র (উদ্যোগ পর্ব্বে) বলিয়াছেন যে,“দৈব ও পুরুষকার—এই দুইয়ে লোকস্থিতি সংযুক্ত হইয়া রহিয়াছে। পুরুষকার-সহকারে যাহা হইতে পারে, আমি সেই পর্য্যন্ত করিব। দৈব হইতে যে কার্য্য হয়, তাহা করিতে আমি কিছুতেই সমর্থ নহি।”

অতএব যুদ্ধে জয় বা পরাজয় উভয়ই হইতে পারে। অর্জ্জুন যদি সাধারণ লোকের ন্যায় লাভ ও ক্ষতি গণনা করিয়া কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হন, এজন্য এস্থলে উক্ত হইয়াছে যে জয়ে ও পরাজয়ে—উভয়েই তাঁহার লাভ হইবে। ক্ষত্রিয় রণে পরাজিত হইয়া পলায়ন করে না। পরাজিত হইলে তাহার মৃত্যু নিশ্চয়, সম্মুখ সমরে সে হত হইবে। তাহার ফল স্বর্গ। আর জয় হইলে ত রাজ্যলাভ হইবেই। যাহা হউক, এরূপ লাভালাভ স্থির করিয়া কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত বা তাহা হইতে নিবৃত্ত হওয়া উচিত নহে। ফলাফল, লাভালাভ, নিজের সুখ দুঃখ, শ্রেয় অশ্রেয় এমন কি পাপ পুণ্য পর্য্যন্ত বিচার করিয়া কর্ত্তব্য কর্ম্ম বা স্বধর্ম্মের আচরণ বা অনাচরণ স্থির করা কর্ত্তব্য নহে। কর্ত্তব্য কর্ম্ম সর্ব্বা-বস্থায়ই কর্ত্তব্য। তবে কর্ত্তব্য কর্ম্ম কি তাহা প্রথমে স্থির করিতে হয়। তাহাতেও ব্যক্তি বিশেষের বিচারশক্তির উপর নির্ভর করা উচিত নহে। মানুষের সীমাবদ্ধ জ্ঞান ভ্রমশূন্য নহে। এ জন্য শাস্ত্র হইতে তাহা স্থির করিতে হয়। বর্ণ ও আশ্রমোচিত ধর্ম্ম, এবং দেশকালপাত্র অনুসারে যে ধর্ম্ম আচরণীয় বা কর্ত্তব্য, তাহা শাস্ত্রে বিহিত আছে। শাস্ত্র অগ্রাহ্য করিয়া ইহা বিচারের বিষয় নহে। গীতায় উক্ত হইয়াছে (১৬ অধ্যায়ের ২৩,২৪ শ্লোক)—

যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামকারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্ ॥
তস্মাৎ শাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম্ম কর্ত্তুমিহার্হসি ॥

অতএব ধর্ম্মযুদ্ধ যে শাস্ত্র অনুসারে বিহিত, তাহা জানিয়া লাভালাভাদি-গণনা না করিয়া, তাহার অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। কর্ত্তব্যকর্ম্ম করিতেই হইবে, তাহাতে লাভালাভ প্রভৃতি সমজ্ঞান করিতে হইবে। এজন্য পরবর্ত্তী শ্লোকের অবতারণা।

সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।
ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি ॥ ৩৮

সুখ দুঃখ, লাভালাভ, জয় পরাজয়,
সমজ্ঞান করি, তবে রণে যুক্ত হও ;—
তা হ'লে কখন পাপ হবে না তোমার ॥৩৮

পাপ হবে না—পূর্ব্বে অর্জ্জুন বলিয়াছেন (১।৩৬) যে যুদ্ধে লোক-হত্যা জন্য পাপ আছে। আততায়ীদেরও যুদ্ধে বধ করিলে পাপ হয়। যুদ্ধে লোকক্ষয় করিয়া জাতিধর্ম্ম ও কুলধর্ম্ম নষ্ট করার জন্য পাপ হয়। ভগবান ইহারই উত্তরে বলিতেছেন যে, যদি নিষ্কাম ভাবে সুখ দুঃখ লাভালাভ প্রভৃতি বিবেচনা না করিয়া অর্থাৎ তাহাতে নিরপেক্ষ হইয়া কেবল কর্ত্তব্য বুদ্ধিতে অনুষ্ঠেয় বলিয়া ধর্ম্মাধর্ম্ম আচরণ করা যায়, তবে তাহাতে পাপ নাই। সকাম হইয়া, কর্ম্মযোগ আশ্রয় না করিয়া, এই যুদ্ধরূপ স্বধর্ম্মের আচরণে পাপ আছে। অতএব পাপ হইতে মুক্ত হইতে হইলে, নিষ্কাম ভাবে কর্ত্তব্য বুদ্ধিতে এই যুদ্ধ করিতে হইবে।

এস্থানে পূর্ব্ব কথা স্মরণ করা উচিত। অর্জ্জুনের প্রকৃতি এরূপে গঠিত যে তাঁহাকে যুদ্ধ করিতেই হইবে। মহাভারতে তাহা, দৃষ্টান্ত দিয়া দেখান আছে। প্রথমে শ্রীকৃষ্ণের উপদেশেও অর্জ্জুনের মোহ যায় নাই। তিনি প্রথম কয় দিন অত্যন্ত অনিচ্ছার সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। পরে যখন

অভিমন্যুর বধ সংবাদ পাইলেন, তখন তাঁহার ক্রোধ হইল। তিনি সব ভুলিয়া গিয়া রীতিমত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং শত্রুবিনাশে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। এই স্বাভাবিক প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া স্বধর্ম্মাচরণ করিবার পরিবর্ত্তে এস্থানে অর্জ্জুনকে প্রবৃত্তি সংযত করিয়া কর্ম্মযোগ সাধনের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে।

অতএব যখন ক্ষত্রিয়স্বভাব অর্জ্জুনকে প্রকৃতিবশে যুদ্ধ করিতেই হইবে—তখন উক্তরূপ লোক নিন্দাভয় বা স্বর্গাদি কামনারূপ নিকৃষ্ট বুদ্ধিযুক্ত হইয়া যুদ্ধে রত হইবার পরিবর্ত্তে, এইরূপ বুদ্ধিতে তাঁহার কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য যে, তাহাতে তাঁহার ধর্ম্মের স্ফূর্ত্তি হইবে, অধর্ম্ম হইবে না। শুধু স্বধর্ম্ম ভাবিয়া যুদ্ধ করিলেও বিশেষ লাভ নাই। তাহাতে কামনা থাকিলে স্বর্গাদি ফললাভ হয় মাত্র। তাহা এই অধ্যায়ের ৩১ ও ৩২ শ্লোকে দেখান আছে। নিষ্কামভাবে, ফলাকাঙ্ক্ষা ও আসক্তি ত্যাগ করিয়া, চিত্তকে অবিকৃত রাখিয়া বা সমতাযুক্ত হইয়া, এই স্বধর্ম্ম আচরণ করিতে হইবে। তাহা হইলে স্বধর্ম্ম আচরণে পাপ পুণ্যরূপ কর্ম্ম বন্ধন হইবে না, ইহাই গীতোক্ত কর্ম্মযোগ। ইহা এই অধ্যায়ের ৩৮ হইতে ৫৩ শ্লোক পর্য্যন্ত ব্যাখ্যাত হইয়াছে, এবং পরের কয় অধ্যায়ে আরও বিস্তারিত বুঝান হইয়াছে।

মধুসূদন বলেন, স্বধর্ম্ম বুদ্ধিতে কর্ত্তব্য ভাবিয়া উক্ত রূপে যুদ্ধ করিয়া জীবহিংসা করিলেও তাহাতে পাপ হয় না। ফল কামনা করিয়া নিজের স্বার্থের জন্য যুদ্ধ করিলেই পাপ হয়। পূর্ব্ব শ্লোকে যে যুদ্ধের আনুষঙ্গিক ফল স্বর্গাদির কথা বলা হইয়াছে, তাহাতে দোষ নাই। আপস্তম্ব স্মৃতিতে আছে, "ফলের জন্য আম্রবৃক্ষ রোপণ করিলেও যেমন তাহা হইতে ছায়া গন্ধ ইত্যাদি আনুষঙ্গিক রূপে পাওয়া যায়, সেইরূপ উক্তপ্রকারে ধর্ম্ম আচরণ করিলে তাহার আনুষঙ্গিক কোন গৌণ ফলে কোন দোষ হয় না।" এই অধ্যায়ের ৭০শ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

শঙ্করাচার্য্য বলেন, পূর্ব্বে "স্বধর্ম্ম অবলোকন করিয়া ইত্যাদি হইতে, অর্থাৎ ৩১শ শ্লোক হইতে ৩৭শ শ্লোক পর্য্যন্ত মোহ অপনয়নের কারণ লোকসিদ্ধ যুক্তি মাত্র উক্ত হইয়াছে। ঐ সকল যুক্তিতে তাৎপর্য্য নাই। পরমার্থ দর্শনই গীতা শাস্ত্রের প্রকৃত প্রতিপাদ্য বিষয়। তাহার বিভাগ প্রদর্শন করিবার জন্য "এষা সাংখ্যে বুদ্ধিঃ" ইত্যাদি শ্লোকের অবতারণা। এই স্থানেই শাস্ত্রের বিষয়-বিভাগ দর্শিত হইয়াছে সাংখ্যজ্ঞান ও কর্ম্মযোগ উভয় নিষ্ঠার বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। পর শ্লোকে তাহা দ্রষ্টব্য।

এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণু।
বুদ্ধ্যা যুক্তো যয়া পার্থ কর্ম্মবন্ধং প্রহাস্যসি॥ ৩৯

এই সাংখ্যে বুদ্ধি আমি—কহিনু তোমায়;
যোগে বুদ্ধি যাহা পার্থ, করহ শ্রবণ—
ছেদিবে কর্ম্মবন্ধন যেই বুদ্ধিযোগে॥ ৩৯

(৩৯) সাংখ্য বুদ্ধি—সাংখ্য বা পরমার্থ-বস্তু-বিষয়ক বুদ্ধি বা জ্ঞান, যাহা হইতে সংসারে শোক-মোহাদি সাক্ষাৎ নিবৃত্ত হয়। (শঙ্কর)। যাহা সম্যক্ প্রকারে বস্তুতত্ত্ব প্রকাশ করে, তাহাই সাংখ্য বা সম্যক্ জ্ঞান; তাহার দ্বারা যে আত্মতত্ত্ব প্রকাশিত হয়, তাহাই নিরুক্তকার-মতে সাংখ্য-জ্ঞান (বলদেব, স্বামী)। অথবা সাংখ্য অর্থে আত্মতত্ত্ব বা ঔপনিষদ পুরুষতত্ত্ব (রামানুজ)। নিরুপাধিক পরমাত্মতত্ত্ব-প্রতিপাদক উপনিষদই সাংখ্য। অথবা ঔপনিষদ পুরুষই সাংখ্য (মধু)। শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—এই গ্রন্থে যে পরমার্থতত্ত্ব নিরূপণ করা হইয়াছে, তাহাই সাংখ্য—তদ্বিষয়ে যে বুদ্ধি,—অর্থাৎ আত্মা জন্মাদি ছয় প্রকার (পূর্ব্বোল্লিখিত) বিকারের অতীত এবং অকর্ত্তা,প্রভৃতি আত্মার যে স্বরূপ উপদিষ্ট আছে,তাহার সম্যক্

বুদ্ধি বা জ্ঞানই সাংখ্য জ্ঞান। সাংখ্য দর্শনে পুরুষ বা জীবাত্মার স্বরূপ ও প্রকৃতির সহিত তাহার সম্বন্ধ ত্যাগ রূপ মোক্ষের যে তত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে, তাহা হইতে এই আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে যে জ্ঞান হয়, এস্থলে বোধ হয় তাহাই সাংখ্য জ্ঞান বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। মহর্ষি কপিল সাংখ্যদর্শনের প্রবর্ত্তক। গীতায় তাঁহার নাম পাওয়া যায়। এজন্য বলা যায় যে, গীতার পূর্ব্বেও সংখ্যাদর্শন প্রবর্ত্তিত ছিল। সংখ্যা হইতে সাংখ্য। সম্যক্ খ্যায়তে ইতি সংখ্যা; সংখ্যার ভাব সাংখ্য। এক দুই ইত্যাদি—সংখ্যা (Number)। সংখ্যার দ্বারা প্রধানতঃ বস্তুতত্ত্ব-বিবেক হয়। সাংখ্য দর্শনে তত্ত্ব সকল সংখ্যা দ্বারা বুঝান আছে। সাংখ্যতত্ত্বসমাস হইতে তাহা পাওয়া যায়। যথা, মূলতত্ত্ব পঞ্চবিংশতি, প্রমাণ তিন প্রকার, অশক্তি ৫০ প্রকার ইত্যাদি। এইরূপ সংখ্যা দ্বারা তত্ত্ব নিশ্চয় করা হইয়াছে বলিয়া কাপিল দর্শনের নাম সাংখ্যদর্শন। এই সাংখ্য দর্শন হইতে আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে যে জ্ঞান হয়, তাহা সাংখ্য জ্ঞান। সাংখ্য দর্শনের পুরুষ, আর গীতার দেহী, একই। দেহরূপ পুরে অবস্থান হেতু পুরুষ, তিনিই দেহী। পুরুষ-প্রকৃতি-বিবেক-জ্ঞান সাংখ্যদর্শন হইতে লব্ধ হয় এবং তাহার ফলে দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি হয়। এ স্থলে এই সাংখ্যতত্ত্ব বুঝান হইয়াছে। বুদ্ধি এই জ্ঞানে স্থির হইলে, তাহা সাংখ্য বুদ্ধি।

যোগবুদ্ধি যাহা—যোগে অর্থাৎ কর্ম্মযোগে যে বুদ্ধি। সাংখ্যেরা বা জ্ঞানীরা আত্মজ্ঞান লাভের উপায়ভূত আসক্তি ও ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগপূর্ব্বক সুখদুঃখ লাভালাভ প্রভৃতি দ্বন্দ্ব জ্ঞান দূর করিয়া (তাহা সমান জ্ঞান করিয়া) কেবল কর্ত্তব্য বুদ্ধিতে যে কর্ম্মানুষ্ঠানে ও সমাধিতে মনোনিবেশ করেন, তাহাই কর্ম্মযোগ। ইহার বৃত্তান্ত পরে (৪০শ হইতে ৫৩ম) শ্লোকে ব্যাখ্যাত হইয়াছে (শঙ্কর)। অথবা সাংখ্যজ্ঞান জন্মাইবার পূর্ব্বে দেহাদি হইতে ভিন্ন, আত্মার কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদি হইতে জাত ধর্ম্মাধর্ম্মাদিরূপ সংস্কার সকলের স্বরূপ নিরূপণপূর্ব্বক মোক্ষসাধনের যে অনুষ্ঠান, তাহাই যোগ। সাংখ্য

মতে, পণ্ডিতগণ যোগের অনুষ্ঠান দ্বারাই আত্মজ্ঞান লাভ করেন। "বৃত্তি-নিরোধাৎ তৎসিদ্ধিঃ।" (সাংখ্য সূত্র, ৩।৩১) গীতায় এই যোগ প্রথম অর্থে—অর্থাৎ নিষ্কাম কর্ম্মযোগ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। নিষ্কাম হইয়া ও সমতা প্রাপ্ত হইয়া আসক্তি ত্যাগ পূর্ব্বক কেবল কর্ত্তব্যবোধে কর্ম্ম করিবার যে কৌশল—তাহাই এই যোগ।

বাহ্য-বিষয়-সম্পর্কে সুখদ বিষয়ে রাগ (আকর্ষণ) এবং দুঃখদ-বিষয়ে দ্বেষ উৎপন্ন হয়। সাধারণতঃ সুখদ বিষয় লাভ ও দুঃখদ বিষয় ত্যাগ করিবার জন্য আমাদের কর্ম্মে প্রবৃত্তি হয়। এই কর্ম্মপ্রবৃত্তি কামনা বা বাসনা-মূলক। বাসনা বা কামনাকে নিগৃহীত বা সংযত করিয়া (denial of the will)—কেবল কর্ত্তব্যবোধে (I ought এই বুদ্ধিতে) প্রবৃত্তি সংযত করিয়া ও কেবল জ্ঞান-পরিচালিত হইয়া, কর্ম্ম করিতে সাধনা করাই কর্ম্মযোগ। এইরূপে কর্ম্ম করিবার বুদ্ধিই যোগবুদ্ধি। অর্থাৎ জ্ঞানে যুক্ত হইয়া পূর্ব্বোক্তরূপে কর্ম্ম করিবার যে বুদ্ধি, তাহাই যোগবুদ্ধি।

যোগ—এস্থলে উল্লেখ করা আবশ্যক যে, সগুণ ঈশ্বরের সহিত, অথবা পরমাত্মার সহিত সম্মিলিত হইবার কিংবা ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থান করিবার বিভিন্ন প্রকার সাধনাকে গীতায় "যোগ"—এই সাধারণ নাম দেওয়া হইয়াছে। যথা,—ঈশ্বরে সমাহিতচিত্ত হইয়া, চিত্তের বিক্ষেপ সংযত করিয়া কর্ম্ম-সাধনা, অথবা ঈশ্বরে সমাহিতচিত্ত হইবার জন্য, নির্ম্মম নিষ্কামভাবে এবং মন ও ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া, সমতাযুক্ত হইয়া, কর্ম্ম করিবার কৌশলই—কর্ম্মযোগ। সেইরূপ আত্মজ্ঞানবিরোধী কর্ম্মপ্রবৃত্তিকে এবং মন ও ইন্দ্রিয়কে দমন করিয়া, নিয়ত আত্মজ্ঞানে স্থির হইবার যে সাধনা—তাহা সাংখ্যযোগ। সেইরূপ ঈশ্বরে চিত্তকে সমাহিত ও অনুরক্ত করিবার উপায়—ভক্তিযোগ। ব্রহ্মে (নির্গুণ) সমাহিতচিত্ত হইলে—জ্ঞানযোগ। ইহার উপায়স্বরূপ চিত্তসংযমজন্য—কর্ম্মসন্ন্যাসযোগ চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিয়া আত্মস্বরূপে অবস্থান ধ্যানযোগ। অতএব গীতায় এইরূপে উল্লিখিত

ঈশ্বরে কিংবা ব্রহ্মের সহিত যুক্ত হইবার বিভিন্ন উপায়স্বরূপ যে সকল পন্থা আছে—সকলই যোগ।

ইহা ব্যতীত গীতায় আমাদের জ্ঞাতব্য মূল তত্ত্বগুলিকে বা সেই যোগ-সাধনার উপায়সকলকেও যোগ বলা হইয়াছে,—যথা বিভূতি-যোগ, গুণত্রয়-বিভাগ যোগ, দৈবাসুর-সম্পদ্-বিভাগ যোগ। সুতরাং গীতায় সাধারণতঃ প্রতি অধ্যায়-নির্দ্দিষ্ট তত্ত্বগুলিকে যোগ বলা যাইতে পারে।

কর্ম্মবন্ধন—ধর্ম্ম ও অধর্ম্মস্বরূপ বন্ধন (শঙ্কর)। সংসার (রামানুজ)। কর্ম্মাত্মকবন্ধন (স্বামী)। পাপ পুণ্যাত্মক নানারূপ কর্ম্ম হইতে, ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম নামক যে আত্মার বন্ধন উৎপন্ন হয়, তাহাই কর্ম্মবন্ধন। আমরা যখন যে কর্ম্ম করি না কেন, সকলই আমাদের সূক্ষ্ম শরীরে একরূপ ক্রিয়াফল অঙ্কিত করিয়া দেয়, তাহার কখন লোপ হয় না। এই জন্য আমরা আমাদের পূর্ব্ব কর্ম্ম বা মনোভাব পরে স্মরণ করিতে পারি; স্মরণ না করিতে পারিলেও, এ গুলি আমাদের মনে সংস্কারাবস্থায় থাকিয়া যায়। ইহাই আমাদের ভবিষ্যৎ জীবনকে রঞ্জিত করে। মৃত্যুর পরেও এই সকল সংস্কার সূক্ষ্মশরীরে থাকিয়া যায়। এই সংস্কার-সমষ্টি পরজন্মে আমাদের 'স্বভাব' রূপে পরিণত হয়—আমাদের প্রকৃতিকে সংগঠিত করে। ইহাতে যে বাসনা-বীজ উপ্ত থাকে, পরজন্মে তাহার কতকগুলি অঙ্কুরিত হয়, আমরা তদনুসারে জাতি আয়ু ও ভোগ লাভ করি। ইহাই কর্ম্মবন্ধন।

ছেদিবে—এই কর্ম্ম-বন্ধন ছেদের কথা 'প্রয়োজনার্থ' বলা হইয়াছে। প্রকৃত অর্থ এই যে, ঈশ্বর-প্রসাদে জ্ঞানলাভ করিয়া কর্ম্মবন্ধন পরিত্যাগ করিতে পারিবে, (শঙ্কর)। আত্মজ্ঞান-পূর্ব্বক কর্ম্মানুষ্ঠানই মোক্ষের উপায়। ইহাই পরে বুদ্ধিযোগ বলিয়া উল্লিখিত (রামানুজ)। ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে কর্ম্ম করিয়া শুদ্ধান্তঃকরণ হইলে, তৎপ্রসাদে যে অপরোক্ষ জ্ঞান জন্মে, সেই জ্ঞানেই কর্ম্মাত্মক বন্ধন সম্পূর্ণরূপে পরিহার করিবে (স্বামী)। ভগবানের আজ্ঞায় মহা আয়াস সাধ্য কর্ম্ম করিতে করিতে সেই সেই

উদ্দেশ্যের মহিমায় আত্মজ্ঞান-নিষ্ঠা জন্মে, তাহা দ্বারা সংসার হইতে উত্তীর্ণ হইবে (বলদেব)। কর্ম্ম নিমিত্ত যে জ্ঞানের প্রতিবন্ধ, তাহা বুদ্ধিযোগে চিত্তশুদ্ধিকর ধর্ম্মার্থ্য কর্ম্ম আচরণে দূর হইবে, (মধু)। ভোক্তৃত্ব ও কর্ত্তৃত্বের অভিমান হেতুই কর্ম্মবন্ধন হয়। ভক্তিযোগে তাহা ছিন্ন হয় (বিশ্বনাথ)। কর্ম্মযোগ দ্বারা চিত্ত সম্পূর্ণ শুদ্ধ হইলে, তবে জ্ঞানের বিকাশে আত্মদর্শন হয়। তখন কর্ম্মবন্ধন ছিন্ন হয়। গীতায় পরে এ সকল কথা বুঝান হইয়াছে।

নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে।
স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ ॥ ৪০

অনুষ্ঠানে নিষ্ফলতা কিম্বা প্রত্যবায়
নাহিক ইহাতে ; এ ধর্ম্মের আচরণ-
অল্পেতেও ত্রাণ করে, মহাভয় হ'তে ॥ ৪০

(৪০) এই কর্ম্মযোগের আরও বিশেষত্ব আছে। যথা (১) ইহার অনুষ্ঠানে নিষ্ফলতা নাই, (২) অঙ্গ-বৈকল্য জন্য কোন বিঘ্ন বা প্রত্যবায় নাই, (৩) ইহার অল্প অনুষ্ঠানেও সংসারভয় দূর হয়। ইহাই এ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে, (শঙ্কর)।

অনুষ্ঠানে নিষ্ফলতা—(অভিক্রম-নাশঃ)—অভিক্রম অর্থে প্রারম্ভ, তাহার নাশ। কৃষি প্রভৃতি কর্ম্মে আরম্ভ-নাশ সম্ভব। ইহার আরম্ভে অন্তরায় উপস্থিত হইতে পারে। তৎপরে হলচালন, বীজবপন, জলসেচন ইত্যাদি কোন অনুষ্ঠানের ত্রুটি হইলে, ফল পাওয়া যায় না। সেইরূপ ফলাভিসন্ধি-মূলক সকল কর্ম্মের প্রারম্ভনাশের সম্ভাবনা আছে। কর্ম্ম-যোগ বিষয়ে প্রারম্ভে সেরূপ নিষ্ফলতার বা নাশের সম্ভাবনা নাই। ফলাভি-সন্ধি না করিয়া কেবল কর্ত্তব্য বুদ্ধিতে কর্ম্ম করিলে যদি কোন প্রতিবন্ধক

হেতু তাহা সম্পূর্ণ না হয়,—তবে তাহাতে নিষ্ফলতা-জনিত ক্ষোভের কারণ থাকে না।

প্রত্যবায় নাহিক—কাম্য কর্ম্মে হিংসাদি-জনিত পাপ হয়। মন্ত্রাদিতে অঙ্গবৈকল্য হইলে, তাহাতে কেবল যে কর্ম্ম নিষ্ফল হয় এমন নহে, পরন্তু তাহাতে পাপ হয়। শঙ্করাচার্য্য বলেন,—চিকিৎসাকর্ম্মের ন্যায় ইহাতে প্রত্যবায় নাই।

ইহাতে—এই মোক্ষ মার্গে যে কর্ম্ম-যোগ তাহাতে (শঙ্কর, হনু)

এ ধর্ম্মের—কর্ম্মযোগের (শঙ্কর)। নিষ্কাম কর্ম্মযোগের (স্বামী)। শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্তিযোগের (বিশ্বনাথ)। শেষের অর্থ সঙ্গত নহে।

আচরণ-অল্পেতেও—যদি চেষ্টা করিয়াও কর্ম্ম সম্পূর্ণ করা না যায়, অথবা যদি অল্প পরিমাণেও আচরণ করা যায়। অন্তর্য্যামী ভগবান্ নিষ্কামকর্ম্ম-প্রবৃত্তি জনিত যে অনুষ্ঠান, তাহা অল্প হইলেও, তাহার ফল (চিত্তবিশুদ্ধি) প্রদান করেন। ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে ৪০—৪৭ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

মহাভয়—সংসারভয়, বা জন্ম-মরণাদি-রূপ দুঃখভয় (শঙ্কর)।

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন।
বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্ ॥ ৪১

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি হে কুরুনন্দন
হয় এক হেথা; কিন্তু অব্যবসায়ীর
বুদ্ধি হয় অন্তহীন—বহু শাখাময় ॥ ৪১

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি—পূর্ব্বে যে সাংখ্যে বুদ্ধি ও যোগে বুদ্ধির কথা উক্ত হইয়াছে, তাহা কি প্রকার ইহাই এস্থলে বিবৃত হইয়াছে। ব্যবসায়াত্মিকা অর্থাৎ নিশ্চয়স্বভাবা বুদ্ধি, প্রমাণজনিত বিবেকবুদ্ধি (শঙ্কর)। অথবা ঈশ্বরারাধনা-লক্ষণযুক্ত কর্ম্মযোগে বা ঈশ্বরভক্তি-যোগে

নিশ্চয়ই পরিত্রাণ পাইব (স্বামী), বা আত্মতত্ত্ব অনুভব করিব (বলদেব), এরূপ এক নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিই ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি। শঙ্করাচার্য্য আরও বলিয়াছেন, যাহাকে সাংখ্যবুদ্ধি বলা হইয়াছে, এবং বক্ষ্যমাণ লক্ষণযুক্ত যে (কর্ম্ম) যোগ বুদ্ধির কথা বলা হইবে—উভয়ই ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি। মধুসূদন বলেন—এ সংসারে শ্রেয়োমার্গে "সেই ইহা" এইরূপ নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি। সাংখ্য ও কর্ম্মযোগ এক (মোক্ষরূপ) ফলসাধক বলিয়া এ উভয় বুদ্ধিই ব্যবসাত্মিকা। সর্ব্বাপেক্ষা রামানুজের অর্থই নিম্নোক্ত ৪৪ শ্লোকের সহিত অধিক সঙ্গত। তিনি বলেন, মুমুক্ষুর অনুষ্ঠেয় কর্ম্মে বুদ্ধি, এবং অনাত্মজ্ঞের কাম্যকর্ম্মে (কামনাধিকারে) ফলসাধন বিষয়ে যে স্থির-নিশ্চয় বুদ্ধি (৪৪ শ্লোক দেখ) উভয়ই ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি। কেন না, সকলপ্রকার কর্ম্মেই বুদ্ধি একনিষ্ঠ ও স্থির হইতে পারে, যদি তাহা একরূপ ফলসাধনার্থ প্রয়োজন মনে করিয়া, একমনে করা হয়। এ কারণ যে এ জীবনে ধনোপার্জ্জনই একমাত্র উদ্দেশ্য করিয়া তাহার জন্য কর্ম্ম করে—তাহার বুদ্ধিও এই অর্থে ব্যবসায়াত্মিকা বলা যায়। বুদ্ধি নিশ্চয়াত্মিকা (সাংখ্যদর্শন)। পাতঞ্জল দর্শন মতে বুদ্ধি চিত্তের অন্তর্গত। সমাহিত, একাগ্র, বিক্ষিপ্ত, ক্ষিপ্ত, মূঢ়, ভেদে চিত্তবৃত্তি পাঁচ প্রকার। যাহাদের বুদ্ধি একাগ্র—তাহাদিগের বুদ্ধিকে এ স্থলে ব্যবসায়াত্মিকা বলা হইয়াছে। বিক্ষিপ্ত বুদ্ধি বহুশাখাবিশিষ্ট—অনন্ত।

হেথা—শ্রেয়োমার্গে (শঙ্কর)—এই সাংখ্য ও যোগমার্গে।

অব্যবসায়ীর—অস্থিরচিত্ত ব্যক্তির; যাহার বুদ্ধি স্থির নহে। অস্থিরচিত্ত ব্যক্তি সকামকর্ম্মপ্রবৃত্তিবশে স্বর্গ পুত্র ধন প্রভৃতি নানারূপ ফল কামনা করে বলিয়া, তাহার বুদ্ধি নানারূপে বিক্ষিপ্ত হয়—কোন একটিতে একাগ্রতা লাভ করিতে পারে না। এই অর্থ রামানুজের। বলদেব প্রভৃতি বলেন, কাম্যকর্ম্মানুষ্ঠানকারীর বুদ্ধি ব্যবসায়াত্মিকা নহে। শঙ্করাচার্য্য বলেন, "যাহাদের শ্রবণজনিত বিবেকবুদ্ধি হয় নাই,

তাহারাই অব্যবসায়ী, তাহাদের বুদ্ধি ব্যবসায়াত্মিকা নহে।" এই ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি—কোথাও এক, কোথাও বা বহুশাখাযুক্ত ও অনন্ত। "ইহ" অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত সাংখ্যে যে বুদ্ধি এবং যোগে যে বুদ্ধি—তাহাই "এক" অর্থাৎ এক বিষয়ে অভিনিবিষ্ট। গীতোক্ত জ্ঞানযোগ, কর্ম্মযোগ, ও ভক্তিযোগ বিষয়ে যে অভিনিবিষ্ট বুদ্ধি, তাহার পরিণামফল মোক্ষ। এজন্য তাহা এক,—তাহার লক্ষ্য একই। ইহা "ব্যবসায়ীর বুদ্ধি" (গীতা ৯।৩০ দ্রষ্টব্য)। আর যাহারা কামাত্মা, ভোগৈশ্বর্য্যে প্রসক্তিযুক্ত, স্বর্গ পুত্র পশু দারা-ধনাদি-কামনাসক্ত, তাহাদেরও বুদ্ধি ব্যবসায়াত্মিকা বটে (পরে ৪৪শ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। কিন্তু তাহা বিবিধ ফলের কামনাবশতঃ বহু শাখায় বিভক্ত ও অনন্ত। তাহারা বৈদিক ও লৌকিক নানারূপ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। এ সকল লোককে অব্যবসায়ী বলা হইয়াছে। কেন না তাহারা একমাত্র যে পরম পুরুষার্থ মোক্ষ—সেই মোক্ষার্থী নহে। বিবেকজনিত একনিষ্ঠ বুদ্ধি তাহাদের হয় নাই। গীতায় (১৮।৩০—৩২ শ্লোকে) সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক ভেদে ত্রিবিধ বুদ্ধির বিষয় উক্ত হইয়াছে। বলা বাহুল্য যে এই অর্থ শঙ্করাচার্য্যের অর্থ হইতে ভিন্ন কিন্তু সাংখ্যদর্শনসম্মত। শঙ্করাচার্য্যের অর্থ এই যে, ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি সর্ব্বদাই একমুখী—একাগ্র। আর সে লক্ষ্য—মুক্তি। ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি বহুশাখাযুক্ত ও অনন্ত হইতে পারে না। যাহা বহুশাখাযুক্ত ও অনন্ত, তাহা ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি নহে। কিন্তু সাংখ্যদর্শনে বুদ্ধির সাধারণ লক্ষণই "অধ্যবসায়"। (determination, fixity of purpose)। পরে ৪৪শ শ্লোক হইতেও এই অর্থ বোধ হয়।

অন্তহীন (অনন্ত)—উক্ত কামীদের কামনা অনন্ত বলিয়া এবং কর্ম্মফল গুণফলহেতু বহুপ্রকারভেদে বহুশাখাবিশিষ্ট বলিয়া, অনন্ত (স্বামী)। শঙ্করাচার্য্য বলেন, নিশ্চয়স্বভাবা একই বুদ্ধি অন্য প্রকার বুদ্ধির শাখাভেদের বাধক। এই শ্রেয়োমার্গে অন্য যে সকল বুদ্ধি

তাহা নানাবিধ শাখার প্রচার বশতঃ সর্ব্বদা বিস্তৃত সংসারে অনন্ত হইয়া থাকে। এই অনন্ত ভেদবুদ্ধি বহুশাখাবিশিষ্ট। প্রতি শাখাভেদে এই বুদ্ধিও অনন্ত।

যামিমাং পুষ্পিতাং বাচাং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতিবাদিনঃ॥ ৪২
কামাত্মানঃ স্বর্গপরাঃ জন্মকর্ম্মফলপ্রদাম্।
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি॥ ৪৩

অবিবেকী যেই জন, বেদ-বাদ রত,
হে অর্জ্জুন! কহে যারা নাহি কিছু আর,
কামী যারা হয় সুধু স্বর্গ পরায়ণ,—
কহে তারা এইরূপ পুষ্পিত বচন,—
জন্মকর্ম্মফলপ্রদ, ভোগৈশ্বর্য্যকর—
বহুল বিশেষ ক্রিয়া হয় যার সার। ৪২।৪৩

(৪২।৪৩) অবিবেকী যেই (অবিপশ্চিতঃ)—অপণ্ডিত অল্প মেধাযুক্ত (শঙ্কর)।

বেদবাদ—বহু অর্থবাদ বা ফল-সাধন-প্রকাশক বেদবাক্য (শঙ্কর ও মধু)। অর্থাৎ ইহারা বেদবাক্যের প্রকৃত তাৎপর্য্য পরিজ্ঞাত, নহে (গিরি)। চাতুর্ম্মাস্য প্রভৃতি ব্রত বা যজ্ঞাদি বেদবিহিত কর্ম্মে অক্ষয় পুণ্য লাভ হয়, এইরূপ বেদার্থবাদ (স্বামী)। বেদের স্বর্গাদিফলবাদ (রামানুজ)। কর্ম্মমীমাংসা-প্রভৃতি বাদ। তাহাতে আসক্ত বেদবাদরত—বেদবাক্য-প্রতিপাদিত স্বর্গাদিফল-লাভরূপ আশাপাশে বদ্ধ (হনু)। বেদ অর্থাৎ বেদের কর্ম্মকাণ্ড। বেদের অর্থবাদ, বিধিবাদ প্রভৃতি নানা বাদ প্রচ-

লিত আছে। মীমাংসা দর্শন মতে যাহা বিধিবাদ ও অর্থবাদ, তাহাই প্রামাণ্য। "স্বর্গকামো যজেত"—এইরূপ যে বিধি বেদে আছে, তাহাই প্রামাণ্য। বেদের অপর অংশ প্রামাণ্য নহে। ইহাই বেদবাদ।

নাহি কিছু আর—স্বর্গ-পশ্বাদি-ফলসাধক বেদোক্ত কর্ম্মব্যতীত আর কিছু নাই (শঙ্কর, রামানুজ ও বলদেব)। কর্ম্মকাণ্ড নিষ্ঠার ফল ব্যতীত আর কিছুই নাই (মধু)। স্বর্গাদি ফল হইতে ভিন্ন অপবর্গাখ্য সুখ নাই, (হনু)। ইঁহাদের কর্ম্ম ভিন্ন আর কিছুই নাই। ব্রহ্ম-প্রতি-পাদক শ্রুতিকে ইঁহারা প্রামাণ্য বলেন না। ইঁহাদের মতে সে শ্রুতি বাক্য যজ্ঞকর্ত্তার স্তুতিবাদ মাত্র।

যাহা হউক, স্বর্গই যে পরম পুরুষার্থ নহে, ইহাই এস্থানে প্রতিপাদিত হইয়াছে। যেখানে স্বর্গাদি কামনা ত্যাগপূর্ব্বক মুক্তির ইচ্ছায় সাধনার আরম্ভ, তাহাই গীতোক্ত সাধনার প্রথম সোপান। গীতা মুক্তি-শাস্ত্র। মুমুক্ষুর পক্ষে গীতা শাস্ত্র। যতক্ষণ পর্য্যন্ত কামনা বা বাসনা থাকে, ততক্ষণ গীতোক্ত সাধনার অধিকার হয় না। স্বর্গ যে পরমপুরুষার্থ নহে, তাহা সাংখ্যাদি শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। সাংখ্যদর্শনে স্বর্গসুখকে ক্ষয়শীল দুঃখমিশ্রিত ও তারতম্য-যুক্ত বলা হইয়াছে। শ্রুতিতেও আছে,—

"তদ্‌যথেহ কর্ম্মজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে।"
এবমেব অমুত্র পুণ্যজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে।" (ছান্দোগ্য, ৮।১।৬)

অন্য শ্রুতিতে আছে,—

"প্লবা হ্যেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপা
অষ্টাদশোক্ত অবরং যেষু কর্ম্ম।
এতচ্ছ্রেয়ো যেঽভিনন্দন্তি মূঢ়া
জরা মৃত্যুং তে পুনরেবাপি যন্তি।" (মুণ্ডক, ১।২।৭)।

কামী যারা—(কামাত্মানঃ) কামস্বভাব (শঙ্কর)। সকাম কর্ম্মপরায়ণ। বিষয়-সুখ-বাসনা-গ্রস্ত (বলদেব)। ইহ পরকালে সুখভোগের কামনাকারী। স্বর্গকামনাকারী।

স্বর্গ-পরায়ণ—(স্বর্গপরা) স্বর্গই যাহাদের পরম পুরুষার্থ (শঙ্কর)। স্বর্গ-প্রধান যাহারা (হনু)।

পুষ্পিত বচন—পুষ্পিত বৃক্ষের ন্যায় শোভমান ও শ্রবণ-রমণীয় (শঙ্কর)। বিষলতাবৎ আপাত-রমণীয় (স্বামী)। বেদোক্ত দ্রব্যগুণ কর্ম্মের স্বর্গাদি ফলোৎপাদন-সামর্থ্য হেতু, ফলপূর্ব্বভাবীহেতু তাহা পুষ্পের ন্যায়, ও সেই ভাবী ফলপ্রতিপাদক বেদবাক্যও সেই জন্য পুষ্পিত (হনু)।

জন্মকর্ম্মফলপ্রদ—যে সকল কর্ম্মফলে পুনর্জ্জন্ম হয় (শঙ্কর)। জন্ম এবং কর্ম্মফল (স্বামী)। জন্ম (দেহ-সম্বন্ধ), কর্ম্ম (আশ্রমবিহিত ইত্যাদি কর্ম্ম), এবং ফল (স্বর্গলাভাদি) এই তিন—ইহাই বলদেব অর্থ করেন। জন্ম, তদধীন কর্ম্ম ও তদধীন ফল (মধু)।

বৈদিক-কর্ম্মকাণ্ডোক্ত কর্ম্ম দুই রূপ। কাম্য কর্ম্ম এবং নিত্য বা নিষ্কাম কর্ম্ম। এক প্রবৃত্তি মার্গে কর্ম্ম আর এক নিবৃত্তি মার্গে কর্ম্ম। মনু-সংহিতায় আছে—

সুখাভ্যুদয়িকং চৈব নৈঃশ্রেয়সিকমেবচ।
প্রবৃত্তং চ নিবৃত্তং চ দ্বিবিধং কর্ম্ম বৈদিকম্॥
ইহ চামুত্র বা কাম্যং প্রবৃত্তং কর্ম্ম উচ্যতে।
নিষ্কামং জ্ঞানপূর্ব্বং তু নিবৃত্তমুপদিশ্যতে॥
প্রবৃত্তং কর্ম্ম সংসেব্য দেবানামেতি সাম্যতাম্।
নিবৃত্তং সেবমানস্তু ভূতান্যত্যেতি পঞ্চ বৈ॥ মনু ১২।৮৮।৯০

যজ্ঞ, দান ও তপঃ কর্ম্ম কর্ত্তব্য বুদ্ধিতে নিষ্কামভাবে আচরণ করিলে, তাহা চিত্তশুদ্ধির কারণ হয়। এজন্য তাহা কখন ত্যাজ্য নহে

(গীতা ১৮।৫)। যাহা কাম্য কর্ম্ম, তাহাই এস্থলে উক্ত হইয়াছে। সেই কর্ম্মফলে যে পুণ্য বা অপূর্ব্ব অথবা অদৃষ্ট সঞ্চিত হয়—তাহাই স্বর্গপ্রদ এবং স্বর্গে ভোগক্ষয়ে পুনর্জ্জন্মপ্রদ। কর্ম্মের দ্বারা যেরূপ ফল হয় তাহা ত্রিবিধ—ইষ্ট, অনিষ্ট ও মিশ্র (গীতা ১৮।১২)। এই কর্ম্ম দ্বারা আমাদের সংস্কার গঠিত হয়। ইহাই কর্ম্ম-ফলবীজ। জন্মের পূর্ব্বে যে সংস্কার-বীজ স্ফুটনোন্মুখ হয়—ক্রিয়মাণ হয়, সেই প্রারব্ধ কর্ম্মদ্বারা আমাদের জাতি, আয়ু ও ভোগ নিরূপিত হয়। ("সতি মূলে তদ্বিপাকো জাত্যায়ুর্ভোগাঃ"—ইতি পাতঞ্জল সূত্র, ২।১৩)। ইহা দ্বারা আমাদের প্রকৃতি স্বভাব বা প্রবৃত্তি নিরূপিত হয়। সেই প্রবৃত্তি-বশে আমরা তদনুরূপ কর্ম্ম করি। এবং তদনুসারে আবার যে সংস্কার সংগ্রহ করি তাহা ভবিষ্যতে ফলদান করে। সুতরাং বৈদিক সকাম কর্ম্ম, যাহা ক্রিয়া-বিশেষ-বহুল, তাহা এইরূপে জন্ম, কর্ম্ম ও ফলপ্রদ।

ক্রিয়া—যাহাতে স্বর্গ পশু, পুত্রাদি লাভ নিমিত্ত অনেক ক্রিয়া বাহুল্য প্রকাশিত হইয়াছে (শঙ্কর), অর্থাৎ দেশ কাল ও অধিকারী বিবেচনায় প্রকাশিত হইযাছে (গিরি)। অগ্নিহোত্র প্রভৃতি যজ্ঞাদি ক্রিয়া—এইরূপ অর্থ করিলেও হয়। মধুসূদন এই অর্থ করেন।

ভোগৈশ্বর্য্য—স্বর্গের সুখভোগ ও ইন্দ্রত্বাদি ঐশ্বর্য্য (মধু)।

ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে ॥ ৪৪

তাহে বিমোহিত চিত্ত হয় যাহাদের
ভোগৈশ্বর্য্যকামী যারা—না হয় তাদের
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি সমাধিতে স্থিত ॥ ৪৪

তাহে বিমোহিত চিত্ত—ক্রিয়া-বিশেষ-বহুল বেদবাক্য সকল দ্বারা

যাহাদের চিত্ত অপহৃত বা বিবেক-প্রজ্ঞা অচ্ছাদিত হয়, (শঙ্কর)। সে বাক্যের দ্বারা অপহৃত অর্থাৎ আচ্ছাদিত চেতঃ বা বিবেক জ্ঞান যাহাদের। বেদের তদ্রুপ অর্থবাদ স্তুতি জন্য, বা কর্ম্মে প্ররোচনার জন্য। অন্য প্রমাণ দ্বারা ব্যাহত সেই অর্থবাদের প্রকৃত তাৎপর্য্যার্থ বুঝিতে যাহারা অক্ষম (মধু)। সেই বেদের অর্থবাদ দ্বারা ও ভোগ ঐশ্বর্য্য-বিষয়ের দ্বারা যাহাদের আত্মজ্ঞান অপহৃত (রামানুজ)। সেই পুষ্পিত বাক্যে আকৃষ্ট চিত্ত যাহাদের (স্বামী)।

ভোগৈশ্বর্য্যকামী— ভোগ ও ঐশ্বর্য্য সাধনেই যাহাদের প্রসক্তি। তাহাতে যাহারা প্রণয়বান্, এবং তাহাই যাহাদের আত্মভূত (শঙ্কর)।

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি—পূর্ব্ব শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য। ইহাদেরও বুদ্ধি ব্যবসায়াত্মিকা বা নিশ্চয়াত্মিকা ; কেননা, ইহারা ভোগৈশ্বর্য্য লাভ জন্য তৎসাধন কর্ম্মে প্রযত্নবান। ইহাদেরও কর্ম্মফল লাভের জন্য লক্ষ্য স্থির থাকে।

সমাধিতে স্থিত—পুরুষের উপভোগের জন্য সকল বস্তু যাহাতে সমাহিত হয়—সেই অন্তঃকরণকেই সমাধি বলে, তাহাই বুদ্ধিতত্ত্ব। অতএব অর্থ—ইহাদের অন্তঃকরণে সাংখ্যে বা যোগে ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি হয় না অর্থাৎ উৎপন্ন হয় না (শঙ্কর)। (সমাধির এই অর্থ কিছু কষ্টকল্পিত)। সমাধি—অর্থাৎ সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত উভয় প্রকার চিত্তের একাগ্রতা (গিরি)। পরমেশ্বরে একাগ্রতা (স্বামী। ব্রহ্মে অবস্থান (মধুসূদন)। আত্মজ্ঞান হইতে আত্মনিশ্চয় পূর্ব্বক মোক্ষসাধনভূত কর্ম্ম (রামানুজ)। যাহাতে সম্যক্ আত্মস্বরূপ জানা যায়, তাহাই সমাধি—নিরুক্তকার এই অর্থ করেন, (বলদেব)। টীকাকারগণ এই শ্লোকের শেষ অংশের এই অর্থ করেন যে—এইরূপ লোকে সমাধিতে বা আত্মজ্ঞানে ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিস্থির করিতে পারে না। রামানুজকে অনুসরণ করিয়া এস্থলে অর্থ করা হইয়াছে।

ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন।
নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্॥ ৪৫

ত্রিগুণ বিষয় বেদ,—ত্রিগুণ অতীত,
নির্দ্বন্দ্ব, নিত্যসত্ত্বস্থ হও হে অর্জ্জুন!
যোগ ক্ষেম পরিহরি হও আত্মবান্। ৪৫

(৪৫) ত্রিগুণ—(মূলে আছে ত্রৈগুণ্য)—সংসার (শঙ্কর)। গিরি ও মধুসূদন বলেন,—এস্থলে বেদের কর্ম্মকাণ্ডকে বুঝাইতেছে। বেদোক্ত কর্ম্মানুষ্ঠানে নিশ্চয়ই সংসারে লিপ্ত হইতে হয়—তাই বেদ ত্রিগুণ বা সংসার ব্যাপারের প্রকাশক। স্বামী বলেন, সকাম অধিকারীর কর্ম্মফল-সম্বন্ধ বেদ হইতে প্রতিপন্ন হয়। সত্ব, রজ, তম, এই ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতির বিকারেই সংসারের উৎপত্তি। সংসারে জীব স্বাত্বিক রাজসিক ও তামসিক প্রকৃতি-যুক্ত হয়। স্বাত্বিক, রাজসিক, তামসিক অধিকারিভেদে স্বাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ক্রিয়াকাণ্ড ও তদুপযুক্ত কর্ম্মফলের ব্যাপার বেদে বর্ণিত আছে। তাহার ফলে এই ত্রিগুণাত্মক সংসারে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিতে হয়। রামানুজ বেদের কর্ম্মকাণ্ডের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে গিয়া ভিন্ন অর্থ করিয়াছেন। তিনি বলেন, ত্রৈগুণ্য অর্থে সত্ব-রজস্তম-প্রচুর পুরুষ। রাজসিক তামসিক লোক স্বর্গাদি সাধনরূপ হিত বুঝে না। স্বাত্বিক লোক প্রবৃত্তি মার্গে বৈদিক কর্ম্মে অধিকারী বটে, কিন্তু তাহারা মোক্ষবিমুখ হইলে কামনাবশে উদ্‌ভ্রান্ত হয়। এইজন্য বেদ ত্রৈগুণ্য বিষয়। হনুমান বলেন, 'সত্ব রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণের কার্য্য রাগ দ্বেষাদি। এই অনুরাগ ও দ্বেষযুক্ত বিষয় যাহাতে আছে, সেই বেদ ত্রৈগুণ্য বিষয়।

ত্রিগুণ অতীত—(নিস্ত্রৈগুণ্য) অর্থাৎ ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতির বশীভূত না হইয়া আত্মার স্বরূপে অবস্থান কর। শঙ্করাচার্য্য ও স্বামী অর্থ করেন—নিষ্কাম হও। রামানুজ বলেন, ইদানীং অর্জ্জুনের সত্ত্ব-প্রাচুর্য্য বশতঃ রজঃ

ও তমোগুণ সঙ্কীর্ণ হওয়ায়, তাঁহার এ দুই গুণ যাহাতে আর বৃদ্ধি না হয়, কেবল তিনি এক সত্ত্বগুণেই যুক্ত থাকেন, ইহাই উপদিষ্ট হইয়াছে। বলদেব বলেন, সমুদয় বেদের শিরোভূত বেদান্তনিষ্ঠাই নিস্ত্রৈগুণ্য বা নিষ্কামভাব। হনুমান বলেন রাগদ্বেষহীন হও।

এই ত্রিগুণ দেহেরই গুণ, দেহী এই ত্রিগুণের অতীত। দেহাভিমান বা দেহাধ্যাস না থাকিলে ত্রিগুণাতীত হওয়া যায়। (গীতা ১৪।২০ শ্লোক)

কিরূপে ত্রিগুণাতীত হওয়া যায়, এবং গুণাতীতের চিহ্ন কি, তাহার আচার কিপ্রকার তাহা পরে (১৪।২২-২৬ শ্লোকে) বিবৃত হইয়াছে।

নির্দ্বন্দ্ব—সুখ দুঃখ, লাভালাভ, শীতগ্রীষ্ম প্রভৃতি বিপরীত অর্থবাচক বা প্রতিপক্ষীয় পদার্থকে দ্বন্দ্ব বলে। রামানুজ অর্থ করেন—নির্গত সকল সাংসারিক স্বভাব। সংসারের সকল বিষয়েই দ্বন্দ্বযুক্ত। অর্থাৎ পরস্পর বিরোধী ধর্ম্মযুক্ত যুগ্ম পদার্থ বিশিষ্ট। ইহারা পরস্পর আপেক্ষিক। ইহাদের দ্বন্দ্ব বলিবার কারণ এই যে, ইহাদের মধ্যে কোন একটি অপরটী ব্যতীত থাকিতে পারে না। যথা সুখ ছাড়া দুঃখ থাকে না। ইত্যাদি। ইহাদিগকে 'pair of opposites বলে। ইহাকে দর্শন শাস্ত্রে Law of contradictions বলে। কোন একটি থাকিলে তাহার বিপরীত বা বিরুদ্ধ ধর্ম্ম আর একটী অবশ্য থাকিবে। দুঃখ ব্যতীত সুখের ধারণাই হয় না। সুখ দুঃখাদি দ্বন্দ্বের উপরের ভূমিতে তাহাদের সামঞ্জস্য হয়, তাহারা একীভূত হয়। সে অবস্থা ত্রিগুণাতীত অবস্থা। সুখ দুঃখের ত্রিগুণাতীত অবস্থা আনন্দাবস্থ। জ্ঞান অজ্ঞানের অতীত অবস্থা চিৎঘন জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম। ইত্যাদি। এই দ্বন্দ্বাতীত অবস্থা নির্গুণ Absolute অবস্থা।

সত্ত্বস্থ—সত্ত্বগুণাশ্রিত (শঙ্কর, মধু)। সদ্‌গুণাশ্রিত (গিরি)। সত্ত্বগুণ-প্রধান (হনু)। ধৈর্য্যযুত (স্বামী)। রজঃ ও তমো গুণদ্বয় রহিত করিয়া নিত্য প্রবৃদ্ধ সত্ত্ব বা সত্ত্বগুণে স্থিত (রামানুজ)। বলদেব বলেন,

জীবে যে নিত্য সত্ত্ব অর্থাৎ অপরিণামিত্ব বা অবস্থান্তরপ্রাপ্তিশূন্যত্ব আছে, তাহাতে স্থিতি, অর্থাৎ নিত্য অবিকারী ব্রহ্ম বা আত্মস্বরূপে স্থিতি। বিকাররহিত ভাব। বোধ হয় এস্থলের এই 'সত্ত্বযুক্ত' ও পূর্ব্বের 'নিস্ত্রৈগুণ্য' এই দুইটির সামঞ্জস্য করিতে গিয়া রামানুজ 'ত্রিগুণ বিষয় বেদ', ইহার পূর্ব্বোক্তরূপ অর্থ করিয়াছেন। এস্থলে গিরি ও স্বামীর অর্থ ধরিলেও চলে। তবে বলদেবের অর্থ অধিক সঙ্গত। সত্ত্বস্থ অর্থাৎ "সৎ" স্বরূপে অবস্থিত। যাহা হউক, বৈষ্ণব দার্শনিকগণের মতে প্রকৃতির এ সত্ত্বাদি ত্রিগুণের অতীত যে শুদ্ধ সত্ত্ব আছে, তাহা নির্ব্বিকার, নিরঞ্জন, নির্ম্মল। তাহা পুরুষোত্তমের লীলাস্থল শুদ্ধ মায়া। এস্থলে সে অর্থ করিবার প্রয়োজন নাই।

যোগক্ষেম—অপ্রাপ্ত বিষয় উপার্জ্জনই যোগ; আর প্রাপ্ত বিষয় রক্ষাই ক্ষেম। (মিতাক্ষরা ১।১০০ ও মনু ৭।২২৭ দ্রষ্টব্য)। 'যোগক্ষেম' ও 'সত্ত্বস্থ' এই দুই বিশেষণের সামঞ্জস্য করিয়া রামানুজের মত গিরিও অর্থ করেন যে, এই যোগক্ষেম ও দ্বন্দ্বে অভিভূত হওয়া রজঃ ও তমো গুণের কার্য্য; তাই এ সমস্ত ত্যাগ করিয়া সত্ত্বগুণস্থ হইবার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে।

যাহা হউক, অলব্ধ প্রয়োজনীয় বস্তুর লাভ-চেষ্টা ও সেই লব্ধবস্তু-রক্ষণে প্রযত্ন—আমাদের স্বভাবসিদ্ধ। আহার্য্য বস্তুর সংগ্রহ না থাকিলে, তাহার সংগ্রহের প্রয়োজন হয়। (গীতা ৩।৮)। তবে কিরূপে নির্যোগক্ষেম হওয়া যায়? গীতায় (৯।২২ শ্লোকে) ভগবান্ বলিয়াছেন, তাঁহার ভক্তের যোগক্ষেম তিনিই বহন করেন। যোগক্ষেম জন্য মনকে বিচলিত করিতে নাই, কাল কি হইবে ভাবিবার প্রয়োজন নাই। সেজন্য ভগবানের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে হয়, যদৃচ্ছালাভে সন্তুষ্ট থাকিতে হয়। কোনরূপ বিষয়ের অভাব বোধে মনকে বিচলিত করিতে নাই।

আত্মবান্—অপ্রমত্ত (শঙ্কর), জিতচিত্ত, বিষয়-পরবশতাশূন্য ও আত্মস্বরূপান্বেষণ-পরায়ণ। অনাত্ম অনিত্য বস্তু ত্যাগপূর্ব্বক কেবল

নিত্য আত্মাতে বা পরমেশ্বরে যোগযুক্ত। যে ঈশ্বরে ভক্তিমান্, সে যেরূপ যোগক্ষেম সম্বন্ধে ও সুখদুঃখ সম্বন্ধে উদাসীন, সেইরূপ যে ব্রহ্মনিষ্ঠ বা আত্মনিষ্ঠ (জ্ঞানী) সেও যোগক্ষেমাদি সম্বন্ধে উদাসীন। মধুসূদন বলেন, "সমুদায় কামনা পরিত্যাগ করিয়া আমি যখন পরমেশ্বরের আরাধনা করিতেছি, তখন তিনি আমার দেহযাত্রা সম্বন্ধে যাহা প্রয়োজন, তাহা আপনি নির্ব্বাহ করিবেন, আত্মবান্ ব্যক্তি এইরূপ স্থির করিয়া নিশ্চিন্ত হন।" এই অর্থ অনুসারে আত্মা অর্থে পরমাত্মা।

এই শ্লোকের ভাবার্থ এই যে, ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি হইতে এই যে সংসার, সেই সংসারে ভোগৈশ্বর্য্য সুখাদি যাহাতে লাভ হয়,—ইহ-পরকালে যাহাতে অভ্যুদয় হয়, তাহাই বৈদিক কাম্যকর্ম্মকাণ্ডের প্রতিপাদ্য বিষয় ; গীতা, ৪।১২শ ও ৯।২০,২১ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। মোক্ষার্থীকে উহা ত্যাগ করিতে হইবে, কেন না, তাহাই প্রধান পুরুষার্থ নহে। কিন্তু যে ব্যক্তি সুখ ভোগ করিতে ও দুঃখ পরিহার করিতে চায়, সে সংসার ত্যাগ করিতে পারে না। বৈদিক কর্ম্মত্যাগও তাহার কর্ত্তব্য নহে। কেন না তাহা ইহ-পরকালে 'প্রেয়'লাভের উপায়। কিন্তু এই মোক্ষার্থীর বা শ্রেয়ঃপ্রার্থীর নির্দ্বন্দ্ব হইতে হইবে—সুখদুঃখবোধের অতীত হইতে হইবে—কেবল দ্বন্দ্ব সহিষ্ণু (২।১৪) হইলেই যথেষ্ট হইবে না। তাহাকে সাত্ত্বিক বা দৈবী-প্রকৃতি সম্পন্ন হইতে হইবে (১৬।৫) ; এবং যোগক্ষেম সম্বন্ধে নিশ্চেষ্ট হইয়া সর্ব্বদা আত্মবান্ বা অপ্রমত্ত হইতে হইবে।

মানুষ যতক্ষণ প্রকৃতির ও প্রকৃতিজ গুণের বশীভূত থাকে, ততক্ষণ সে স্ব স্ব প্রকৃতির বশে রাগদ্বেষ দ্বারা পরিচালিত হইয়া কর্ম্ম করে। বেদ সেই কর্ম্মকে নিয়মিত করিয়া যাহাতে তাহার অভ্যুদয় হয়, তাহার উপদেশ দিয়াছেন। প্রকৃতিকে বশীভূত করিতে পারিলে বা ত্রিগুণাতীত হইলে তবে সকাম কর্ম্ম সমুদায় ত্যাগ করিয়া বেদের অধিকার হইতে মুক্ত হইয়া গীতোক্ত বা বেদান্তোক্ত সাধনমার্গে প্রবেশের অধিকারী হওয়া যায়।

নির্দ্বন্দ্ব, নিত্যসত্ত্বস্থ আত্মবান্ ও যোগক্ষেমের ভাবনাহীন হইলে তবে ত্রিগুণের অধিকারমুক্ত হইয়া গীতোক্ত সাধনার অধিকার হয়, শ্রেয়ো-মার্গ লাভ হয়।

যাবানর্থ উদপানে সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে।
তাবান্ সর্ব্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ ॥৪৬

সর্ব্বত্র প্লাবিলে জলে, ক্ষুদ্র সরসীর
যেই প্রয়োজন—তত্ত্বজ্ঞানী ব্রহ্মজ্ঞের,
থাকে সেই প্রয়োজন—বেদে সমুদায় ॥ ৪৬

(৪৬) সর্ব্বত্র প্লাবিলে জলে—মূলে আছে, "সর্ব্বতঃ (ত্র) সংপ্লুতোদকে।" রামানুজ, স্বামী ও বলদেব সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকের অর্থ করেন—বৃহৎ হ্রদ। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাশয়ে স্নানপানাদি যে যে প্রয়োজন স্বতন্ত্ররূপে সিদ্ধ হয়, এক বৃহৎ জলাশয়ে তাহা সমস্তই একত্র সম্পন্ন হইতে পারে। কিন্তু এস্থলে 'সর্ব্বত্র' পাঠ অনুসারে অনুবাদ করা হইয়াছে, অর্থ এই যে যখন সর্ব্বত্র জলপ্লাবন হয়, তখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাশয় সব একাকার হইয়া যায়, তাহাদের আর স্বতন্ত্র প্রয়োজন বা অস্তিত্ব থাকে না। এ অর্থও সঙ্গত। এ শ্লোকের অপরার্দ্ধ লইয়াও ব্যাখ্যাকারগণ এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ করিয়াছেন। শঙ্কর অর্থ করেন, সমস্ত বেদোক্ত কর্ম্মে যে ফল, তাহা পরমার্থতত্ত্বজ্ঞ সন্ন্যাসীর জ্ঞানফলের অন্তর্ব্বর্ত্তী হয়। গিরি বলেন, সমস্ত বেদোক্ত কর্ম্ম হইতে বিষয়বিশেষের উপভোগ জন্য যে সুখ জন্মে, তাহাও আত্মজ্ঞানের আনন্দের অন্তর্গত হয়। স্বামী বলেন—ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণের ব্রহ্মানন্দে কর্ম্মজনিত সমস্ত ক্ষুদ্রানন্দ ডুবিয়া যায়। রামানুজ বলেন, সর্ব্বতঃ পরিপূর্ণ জলাশয়ে পিপাসুর যেটুকু প্রয়োজন, সেটুকুমাত্র সে গ্রহণ করে। সেইরূপ জ্ঞানী ব্রহ্মজ্ঞ যাহা কিছু হইতে মোক্ষসাধন হয়, তাহাই গ্রহণ করেন, আর কিছু গ্রহণ করেন না। কেহ অর্থ করেন—সকল প্রকার কর্ম্মের তথ্যই বেদে পাওয়া

যায়। কেহ বলেন, ব্রহ্মজ্ঞানে, কেহ বলেন এক ঈশ্বর ভক্তিতে সকল অর্থ-সিদ্ধি হয়। এস্থলে সঙ্গত অর্থ এই বোধ হয় যে, জ্ঞান লাভ করিলে পরে আর বেদোক্ত সকাম কর্ম্মের আবশ্যক থাকে না। "নৈব তস্মিন্ কৃতেনার্থঃ" ইত্যাদি শ্লোকে ইহা বিবৃত হইয়াছে। "জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন"—জ্ঞানাগ্নি সমুদায় কর্ম্মকে দগ্ধ করে। (৪।১৯ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। জ্ঞান লাভ হইলে বেদোক্ত কাম্যকর্ম্মের প্রয়োজন থাকে না। বেদোক্ত কর্ম্মফলে স্বর্গাদি লাভ হয়। জ্ঞানীর কাছে স্বর্গাদি পদ তুচ্ছ।

মধুসূদন শঙ্করাচার্য্যকে অনুসরণ করিয়া যে অর্থ করেন, তাহাও এস্থলে উল্লেখের প্রয়োজন। তিনি বলেন, (উদপানে) ক্ষুদ্র জলাশয়ে (যাবান্) স্নানপানাদিরূপ যে যে (অর্থ) প্রয়োজন সিদ্ধ হয়, (সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে) পর্ব্বত-নির্ঝরিণী গুলি সকল দিক্ হইতে নির্গত হইয়া, কোন উপত্যকায় সম্মিলিত হইলে যে বৃহৎ হ্রদ উৎপন্ন হয়, সেই মহান্ জলাশয়ে (তাবান্ অর্থ) সেইরূপ সর্ব্ব প্রয়োজন সিদ্ধ হয়। সর্ব্ববেদোক্ত কর্ম্মকাণ্ড-সাধনে যে হিরণ্যগর্ভানন্দ ভোগ পর্য্যন্ত ফল পাওয়া যায়, সেই সমস্ত ক্ষুদ্রানন্দ ব্রহ্মজ্ঞানীর ভূমা ব্রহ্মানন্দের সামান্য অংশমাত্র। অতএব এই ভূমানন্দ লাভ করিলে, আর কোন ক্ষুদ্রানন্দের প্রয়োজন হয় না। শ্রুতিতে আছে, "সর্ব্বং তৎ অভিসমেতি যৎ কিঞ্চ প্রজাঃ সাধু কুর্ব্বন্তি যস্তদ্বেদ যৎ স বেদ ইতি।" গীতায় আছে, "সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে।" (গীতা, ৪।৩৭ শ্লোকে দ্রষ্টব্য)।

যাহা হউক জ্ঞানী নিজ প্রয়োজন না থাকিলেও কর্ম্ম ত্যাগ করেন না। তিনি কর্ত্তব্য বোধে বিহিত কর্ম্ম করেন। কর্ম্ম করিবার কৌশল এই গীতোক্ত কর্ম্মযোগ হইতে পাইলে, বেদোক্তাদি সমুদায় কর্ম্মই কর্ত্তব্য বলিয়া—যোগ বুদ্ধিতে অনুষ্ঠান করিলে, আর কর্ম্মবন্ধন থাকে না। পর শ্লোক দ্রষ্টব্য।

তত্ত্বদর্শী ব্রহ্মজ্ঞের—(মূলে আছে,—বিজানতঃ 'ব্রাহ্মণস্য')। অর্থাৎ

ব্রহ্মনিষ্ঠের (স্বামী), সন্ন্যাসীর (শঙ্কর)। বিজানতঃ অর্থাৎ যিনি জ্ঞান-বিজ্ঞানবান্ তাঁহার। যিনি বিজ্ঞানবান্ তিনি ব্রহ্মবিদ্। ব্রহ্মবিদই ব্রাহ্মণ।

কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূর্ম্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি ॥ ৪৭

কর্ম্মে শুধু অধিকার তব—নহে কভু
কর্ম্মফলে; কর্ম্মফলহেতু নাহি হও;
অকর্ম্মে আসক্তি যেন না থাকে তোমার ॥ ৪৭

(৪৭) কর্ম্মে শুধু অধিকার তব—তত্ত্বজ্ঞানার্থী অর্জ্জুনের (নিষ্কাম)-কর্ম্মব্যতীত জ্ঞাননিষ্ঠায় অধিকার নাই (শঙ্কর)। তবে নিত্যসত্ত্বস্থ মুমুক্ষু অর্জ্জুনের শ্রুত্যুক্ত নিত্য নৈমিত্তিক কাম্যাদি সর্ব্বকর্ম্ম ফল-বিশেষের সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়া অনুষ্ঠান করিবার অধিকার আছে (রামানুজ)। মধুসূদন অর্থ করেন, পূর্ব্বশ্লোকোক্ত পরমানন্দ যখন কেবল নিষ্কাম কর্ম্ম দ্বারা লাভ করা যায় না, যখন তাহা কেবল আত্মজ্ঞাননিষ্ঠাতেই লাভ করা যায়, তখন আয়াসসাধ্য বহিরঙ্গ সাধনযুক্ত কর্ম্মে প্রয়োজন নাই। কিন্তু কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া জ্ঞানই সম্পাদ্য—একথা অর্জ্জুনের ন্যায় স্বভাবযুক্ত ব্যক্তিকে কেহ বলিতে পারে না। কেন না নিষ্কাম কর্ম্ম দ্বারা প্রথমতঃ চিত্তশুদ্ধি ও তৎসঙ্গে ইন্দ্রিয় ও মনের জয় না হইলে, জ্ঞানের অধিকারী হওয়া যায় না। গীতায় পরে উক্ত হইয়াছে "আরুরুক্ষো মুর্নের্যোগং কর্ম্ম কারণমুচ্যতে" (৬৷৩)। অর্জ্জুনের চিত্তশুদ্ধি জন্য বুদ্ধিযুক্ত হইয়া নিষ্কাম ভাবে স্বধর্ম্ম পালন করিবারই অধিকার আছে। কর্ম্মফলে তাঁহার অধিকার নাই। কেন না ফলাকাঙ্ক্ষা থাকিলে, কর্ম্মের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইবে না, কর্ম্ম বন্ধনের কারণ হইবে।

স্বামী বলেন,—যখন সর্ব্বকর্ম্মফল ঈশ্বরারাধনায় পাওয়া যায়, তখন বন্ধন হেতু কর্ম্মফলের প্রবৃত্তি বা কামনা ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করিবে। বলদেবও

এইরূপ সহজ অর্থ করেন। তিনি বলেন, শুদ্ধচিত্ত হইয়া স্বধর্ম্ম ও কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে অর্জ্জুনের যুদ্ধ করা কর্ত্তব্য—এস্থলে ইহাই উপদিষ্ট হইয়াছে। এ অর্থ সঙ্কীর্ণ কিন্তু বেশ সঙ্গত।

শঙ্করাচার্য্য বলেন,—অর্জ্জুনের জ্ঞাননিষ্ঠায় অধিকার নাই, এজন্য ভগবান্ বলিতেছেন যে, অর্জ্জুন কর্ম্মের অধিকারী। কিন্তু কোন অবস্থাতেই যেন কর্ম্মফলে তাঁহার তৃষ্ণা বা অধিকার না হয়। কর্ম্মফলে তৃষ্ণাই কর্ম্মফল-প্রাপ্তির হেতু। অর্জ্জুন যেন কর্ম্মফল-প্রাপ্তির হেতু না হন। কর্ম্মফলেই যদি অধিকার না থাকে, যদি তাহা ত্যাগ করিতে হয়, তবে কর্ম্ম কেন ত্যাগ করিব না, অর্জ্জুন এ প্রশ্ন করিতে পারেন। ইহার উত্তরে ভগবান বলিয়াছেন যে, অকর্ম্মেও বা কর্ম্মসন্ন্যাসেও যেন তোমার আসক্তি বা অভিলাষ না হয়। অথবা কর্ম্ম করিলে ফল অবশ্যম্ভাবী, এইরূপ মনে করিয়া কর্ম্মে যেন অপ্রবৃত্তি না হয়। কেন না কর্ম্ম অপরিহার্য্য। কর্ম্মব্যতীত শরীর-যাত্রাই নির্ব্বাহ হয় না (৩।৮)। গ্রাহ্য, দৃষ্ট ও শাস্ত্রোক্তভেদে এই কর্ম্ম তিন প্রকার (অনুগীতা ২০।৬)। অথবা বৈদিক ও লৌকিকভেদে দুই প্রকার। ইহলোকে কেহ মুহূর্ত্ত জন্যও নৈষ্কর্ম্ম্য লাভ করিতে পারে না (অনুগীতা ২০।৭)। অতএব অর্জ্জুনের কেবল কর্ম্মে অধিকার, জ্ঞানে নহে,—এ অর্থ তত সঙ্গত হয় না। কর্ম্মফলে অর্জ্জুনের অধিকার নাই—ইহাই বলা এস্থলে মুখ্য উদ্দেশ্য। অর্জ্জুন জ্ঞানোপদেশের অধিকারী না হইলে, গীতার জ্ঞানোপদেশ ব্যর্থ হইত। জ্ঞানী হইলেই যে কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইতে হইবে, এরূপ কথা গীতায় নাই। জ্ঞানী হইলে কর্ম্মফল-ত্যাগই হয়, অনাসক্ত হইয়া কর্ত্তব্য কর্ম্ম করা ত্যাগ হয় না,—গীতায় ইহাই উপদিষ্ট হইয়াছে।

———

যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে ॥৪৮

আসক্তি করিয়া ত্যাগ, যোগযুক্ত হয়ে,
কর্ম্ম কর—সিদ্ধ্যসিদ্ধি সমজ্ঞান করি ;
কহে যোগ,—ধনঞ্জয়! এই সমতাকে। ৪৮

(৪৮) আসক্তি—কর্ম্মফলে আসক্তি (সঙ্গ), অথবা শব্দাদি বিষয়ে প্রীতি, কিংবা পুত্র মিত্র স্ত্রী গৃহ ধন প্রভৃতিতে মমতা। (পরে ১৩।৯ শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

যোগযুক্ত—পরমেশ্বরে একপরতা (স্বামী)। কেবল ঈশ্বরার্থ বা তাঁহাকে তুষ্ট করিবার জন্য কর্ম্ম করা, এবং কর্ম্ম করিতেছি বলিয়া ঈশ্বর আমার শুভ করুন, এরূপ কামনা ত্যাগ করাই যোগস্থ হইয়া কর্ম্ম করা (শঙ্কর)। সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে সমত্বরূপ চিত্ত-সমাধানই যোগ, সেই যোগযুক্ত হইয়া (রামানুজ)। যাহা হউক, এস্থলে যোগযুক্ত অর্থে ঈশ্বরে যোগযুক্ত নহে। ঈশ্বরে যোগযুক্ত হইবার কথা দ্বাদশাধ্যায়ে প্রধানতঃ উক্ত হইয়াছে। এ স্থলে বরং যোগযুক্ত অর্থে আত্মযোগযুক্ত হইতে পারে। বুদ্ধিযোগে অবস্থান পূর্ব্বক কর্ম্ম করাই যোগ। যাহা হউক, এই যোগের অর্থ এই শ্লোকেই বুঝান আছে। সমত্বই যোগ। সমত্বযুক্ত হইয়া এবং মনকে স্থির রাখিয়া সিদ্ধি বা অসিদ্ধিতে বিচলিত না হইয়া কর্ম্ম করাই কর্ম্মযোগ।

সিদ্ধ্যসিদ্ধি—শঙ্কর ও গিরি বলেন,—সত্ত্বশুদ্ধি ও তাহার পরিণামে জ্ঞানপ্রাপ্তিই কর্ম্মের সিদ্ধি, তাহার বিপর্য্যয়ে কর্ম্মের অসিদ্ধি। ইহাতে এই অর্থ হয় যে, কর্ম্ম করিয়া আমার চিত্তশুদ্ধি হইবে, বা আমি জ্ঞান লাভ করিব, এরূপ কামনাও ত্যাগ করিবে। যে অভিপ্রায়ে (end) কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলে, তাহাতে তুমি সিদ্ধি লাভ করিতে পারিবে কি না, তাহাও দেখিবার আবশ্যক নাই। কর্ত্তব্য বুঝিলেই কর্ম্ম করিবে। এই সহজ অর্থও এখানে অসঙ্গত হয় না।

সমতা—সিদ্ধি অসিদ্ধি, লাভালাভ, জয় পরাজয়, সুখ দুঃখ এই

সকলকে (দ্বন্দ্বকে) সমজ্ঞান করা। সুখ দুঃখাদি দ্বারা বিচলিত না হওয়া—ইহা Equanimity of the mind। মধুসূদন বলেন,—ফলসিদ্ধিতে হর্ষ ও ফলের অসিদ্ধিতে বিষাদ ত্যাগ করাই সমত্ব জ্ঞান।

কর্ম্মফলে অধিকার বা আসক্তি ত্যাগ করিয়া কিরূপে কর্ম্ম করা যায়, তাহার তত্ত্ব এই শ্লোকে উক্ত হইয়াছে (শঙ্কর)। সে তত্ত্ব—যোগস্থ হইয়া কর্ম্ম করা। ঈশ্বরার্থ (বা যজ্ঞার্থ) কর্ম্ম করিবে, অথচ ঈশ্বর তুষ্ট হইয়া তোমার শুভ করিবেন, এরূপ ভাবনাও ত্যাগ করিবে। অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম করিবে, কিন্তু তাহার সিদ্ধি বা অসিদ্ধি সমজ্ঞান করিবে। সিদ্ধিতে হৃষ্ট হইবে না, অসিদ্ধিতেও দুঃখিত হইবে না। ইহাই যোগ অথবা কর্ম্মযোগ। এই যোগে বুদ্ধির কথাই পূর্ব্বে ৩৯শ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। এই যোগবুদ্ধিতে কর্ম্ম করিতে পারিলে, কাম ক্রোধ জয় করা যায়, চিত্তের বিক্ষেপ বিদূরিত হয়, বাসনা বা কামনা সংযত হয়, স্বার্থ বুদ্ধি সঙ্কীর্ণ হয় এবং নিজের সুখের জন্য, লাভের জন্য, প্রবৃত্তিবশে কর্ম্ম করিবার ইচ্ছা সংযত হয়। Denial of the will সাধনা হয়।

এই শ্লোকে কেবল অনুষ্ঠেয় কর্ত্তব্য কর্ম্ম (Duty) উক্ত হইয়াছে। I ought—এ কর্ম্ম আমার কর্ত্তব্য—এইরূপ বুদ্ধিযুক্ত হইয়া ফলাভিসন্ধি ত্যাগ পূর্ব্বক কর্ম্ম করিতে হইবে। এই কর্ত্তব্যের আদেশ ঈশ্বরের হইতে পারে, শাস্ত্রের শাসন হইতে পারে, সমাজের বিধান অনুসারে হইতে পারে, আমার বিবেকের বাণীও হইতে পারে। যাহা কর্ত্তব্য বা অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম, তাহা গীতায় পরে উক্ত হইয়াছে। সে কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে, তাহার সিদ্ধি বা অসিদ্ধিতে হর্ষ বা ক্ষোভের উদয় হয় না; সুতরাং চিত্তবিক্ষেপও উপস্থিত হয় না। তাহাতে চিত্তের স্বার্থমল বিদূরিত হয়, সমত্ব ভাব আইসে, সন্তোষলাভ হয়। এইরূপ কর্ত্তব্য বোধে নিষ্কাম কর্ম্ম আচরণ করিতে করিতে জ্ঞানেরও বিকাশ হইতে থাকে। ইহা চিত্তশুদ্ধি ও জ্ঞানোৎপত্তির কারণ।

দূরেণ হ্যবরং কর্ম্ম বুদ্ধিযোগাৎ ধনঞ্জয়।
বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ ॥ ৪৯

বুদ্ধিযোগ বিনা কর্ম্ম অপকৃষ্ট অতি ;
এই বুদ্ধি, ধনঞ্জয়! করহ আশ্রয়,
ফলহেতু কর্ম্ম করে কৃপণ যে জন। ৪৯

(৪৯) বুদ্ধিযোগ—উক্তরূপ সমত্বাদিজ্ঞানে ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি-যুক্ত হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান। বুদ্ধি—সমত্ববুদ্ধি (শঙ্কর)। ব্যবসায়াত্মিকা-বুদ্ধিযুক্ত কর্ম্মযোগ (স্বামী)। ঈশ্বরার্পিতচিত্ত হইয়া সমত্ববুদ্ধিযুক্ত কর্ম্ম-যোগ, আত্মবুদ্ধিসাধনভূত নিষ্কাম কর্ম্মযোগ (মধু)।

কর্ম্ম—কাম্য কর্ম্ম (শঙ্কর ও মধু)। ফলার্থী পুরুষ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠীয়মান কর্ম্ম (শঙ্কর)। সমত্ববুদ্ধিযুক্ত ঈশ্বরারাধনার্থ কর্ম্ম ব্যতীত অন্য কর্ম্ম (হনু)। লৌকিক বৈদিক সমুদায় 'ফলহেতু' কাম্য কর্ম্ম।

অপকৃষ্ট অতি—মূলে আছে "দূরেণ হ্যবরম্"। এই সমস্ত কাম্যকর্ম্ম অপকৃষ্ট হইলেও তাহাদের তারতম্য আছে। ইহাদের মধ্যে পরকালে সুখ বা স্বর্গ কামনায় কর্ম্ম শ্রেষ্ঠ। ইহকালের সুখের জন্য কর্ম্ম তদপেক্ষা নিকৃষ্ট। তাহাতে ভবিষ্যৎ দৃষ্টি সঙ্কীর্ণ হয়। ইহকালে সুখ লাভার্থ কর্ম্ম মধ্যে আবার কেবল বর্ত্তমানকালে আপাত-সুখজনক কর্ম্ম অতি নিকৃষ্ট। বিশেষ যদি তাহা পরিণামে দুঃখজনক হয়, তবে তাহা আরও নিকৃষ্ট। বলা বাহুল্য যে সর্ব্বাবস্থায়ই পুণ্য কর্ম্ম অপেক্ষা পাপ কর্ম্ম অতি হেয়। পরের ক্ষতি করিয়া নিজের লাভের জন্য যে কর্ম্ম তাহা অতিশয় হেয়।

যাহা হউক, এ সকল হেয় কর্ম্ম-অকর্ম্ম বা অপকর্ম্ম। যাহা কর্ম্ম, তাহা বৈদিক ও লৌকিক বিহিত কর্ম্ম; এই কর্ম্মই বুদ্ধিযোগে নিষ্কামভাবে

অনুষ্ঠান করিলে উৎকৃষ্ট, আর ফলাভিসন্ধি পূর্ব্বক আচরণ করিলে নিকৃষ্ট। ইহাই এস্থলে উক্ত হইয়াছে।

কৃপণ—কর্ম্মফলপ্রার্থী (রামানুজ)। এই অধ্যায়ের ৭ম শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য। শ্রুতিতে আছে "যো বা এতদক্ষরং গার্গি অবিদিত্বা অস্মাৎ লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণঃ।" (বৃহদারণ্যক, ৩।৮।১০)।

এই বুদ্ধি—মূলে আছে "বুদ্ধৌ"। উক্তরূপ বুদ্ধি। যোগবুদ্ধি, (স্বামী)। কিংবা তাহার পরিপাক-জাত সাংখ্য-বুদ্ধি (শঙ্কর)। সাংখ্যদর্শন অনুসারে প্রকৃতি হইতে প্রথমে বুদ্ধিতত্ত্বের উৎপত্তি। বুদ্ধি হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে মন, মন হইতে ইন্দ্রিয়। মন গুণভেদে শুদ্ধও হইতে পারে, কামনাযুক্ত এবং মলিনও হইতে পারে। ইন্দ্রিয়, তাহার বিষয়, মন ও অহঙ্কারের অতীত হইলে, তবে কেবল শুদ্ধ বুদ্ধিতত্ত্বে অবস্থান করা যায়। সেই বুদ্ধি—নিশ্চয়াত্মিকা বা ব্যবসায়াত্মিকা। বুদ্ধি শুদ্ধ সাত্ত্বিক হইলে জ্ঞান, বৈরাগ্য ধর্ম্ম ও ঐশ্বর্য্যের বিকাশ হয়। এই বুদ্ধিতেই সাংখ্যজ্ঞানের বা কর্ম্মযোগের সম্ভব হয়।

তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম শ্লোক বুঝিবার জন্য এই শ্লোক এবং ইহার পরবর্ত্তী শ্লোক বিশেষ করিয়া বুঝা আবশ্যক। সেই স্থানে এই দুই শ্লোকের বিস্তারিত উল্লেখ প্রয়োজন হইবে।

বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃত-দুষ্কৃতে।
তস্মাদ্ যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্ ॥৫০

সুকৃত দুষ্কৃত দুই—বুদ্ধি-যুক্ত হয়ে,
করে হেথা পরিত্যাগ; তাই যুক্ত হও
এই যোগে; যোগ হয় কর্ম্মেতে কৌশল। ৫০

(৫০) সুকৃত দুষ্কৃত—পাপপুণ্য (শঙ্কর)। সুকৃত ও দুষ্কৃত

অর্থে সুকর্ম্ম বা দুষ্কর্ম্ম নহে; সুকৃত বা দুষ্কৃত কর্ম্মের ফলমাত্র। কৃত কর্ম্মফলে যে সংস্কার—যে অদৃষ্ট যে অপূর্ব্ব উৎপন্ন হয়, তাহাই সুকৃত অর্থাৎ পুণ্য, অথবা দুষ্কৃত অর্থাৎ পাপ, কিংবা উভয় মিশ্রিত। ধর্ম্মাচরণ হইতে পুণ্য এবং অধর্ম্মাচরণ হইতে পাপ হয়। পাপাচরণ না করিবার বুদ্ধি সহজে হইতে পারে। কিন্তু সুকৃতি ত্যাগ করিবার বুদ্ধি সহজে হয় না। ধর্ম্মাচরণ দ্বারা পুণ্যোপার্জ্জন ও তৎফলে স্বর্গাদি লাভে অভিলাষ সহজে দূর হয় না। ভগবান বলিতেছেন যে, সমত্ব বুদ্ধিযুক্ত হইয়া স্বধর্ম্মে অবস্থান করিলে, সেই বুদ্ধিযোগে সুকৃতিও ত্যাগ করা যায়। কর্ম্মযোগ দ্বারা সর্ব্ব কর্ম্মফল পরিত্যাগ হয়, ইহাই এস্থলে উপদিষ্ট হইয়াছে। দুষ্কৃতির ন্যায় সুকৃতিও মোক্ষের প্রতিবন্ধক। তবে প্রথমে সুকৃতি দ্বারা দুষ্কৃতি নষ্ট করিয়া চিত্তশুদ্ধ করিতে হয়। পরে জ্ঞানোৎপত্তি জন্য নিষ্কাম কর্ম্ম দ্বারা চিত্তনির্ম্মল করিতে হয়। কিন্তু সেই কর্ম্মে যে সুকৃতি হয়, তাহা ত্যাগ-বুদ্ধি দ্বারা ত্যাগ করিতে হয়। সুকৃতির অভিমান ত্যাগ করিতে হয়। জ্ঞানের পরিপাকে অথবা বুদ্ধিযোগ দ্বারা যেরূপ সুকৃত দুষ্কৃত কর্ম্মফল ত্যাগ করা যায়, সেইরূপ ভক্তি যোগেও তাহা ত্যাগ করা যায়। যে ব্যক্তি ভগবানের শরণ লয়েন, তিনিও সর্ব্বধর্ম্মপরিত্যাগ করিতে পারেন। (গীতা ১৮।৬৬)।

বুদ্ধিযুক্ত হ'য়ে—সমত্ববুদ্ধিযুক্ত হইয়া (শঙ্কর)। এই বুদ্ধিযুক্ত হইয়া কর্ম্ম করিলে সত্ত্বশুদ্ধি হয়, তাহার ফলে জ্ঞানপ্রাপ্তি হয়। সেই জ্ঞান দ্বারা সুকৃত দুষ্কৃত উভয়ই দূর করা যায়।

যুক্ত হও এই যোগে—স্বধর্ম্মাখ্য কর্ম্মে বর্ত্তমান থাকিয়া সিদ্ধা-সিদ্ধিতে ঈশ্বরার্পিত চিত্ত' নিবন্ধন যে সমত্ব বুদ্ধি, তাহাতে যুক্ত হও (শঙ্কর, হনু)। এস্থলে 'ঈশ্বরাপিত চিত্ত' সম্বন্ধে কিছুই উক্ত হয় নাই। পরে তাহা বিবৃত হইয়াছে। ঈশ্বরার্পিতচিত্ত না হইলেও কেবল সমত্ব-বুদ্ধিযোগেই এই কর্ম্মযোগে যুক্ত হওয়া যায়। কেবল কর্ত্তব্যজ্ঞানে অনাসক্ত হইয়া কর্ম্ম করিলেই এই যোগে যুক্ত হওয়া যায়।

কর্ম্মেতে কৌশল—(মূলে আছে 'কর্ম্মসু কৌশলং') স্বধর্ম্ম-নিরত, সমত্বজ্ঞানযুক্ত, ঈশ্বরার্পিত-চিত্ত হইয়া কর্ম্ম করিবার যে কৌশল—তাহাই যোগ (শঙ্কর)। কর্ম্মের ফল বন্ধন হইলেও, ঈশ্বরার্থে নিষ্কাম হইয়া কর্ম্ম করতঃ কর্ম্মের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া মোক্ষলাভ করিবার যে কৌশল, —তাহাই যোগ (স্বামী)। সংসার-বন্ধনকারক দুষ্ট কর্ম্ম-নিবারণ-চতুরতা (মধু)। কর্ম্ম করিয়াও যাহাতে কর্ম্মফল ভোগ করিতে না হয়, তাহার কৌশল। বঙ্কিম বাবু অর্থ করেন,—যিনি আপনার অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম যথাবিধি নির্ব্বাহ করেন, তিনিই যোগী। কেহ পাঠ করেন 'কর্ম্ম সুকৌশলং' অর্থাৎ সুকৌশলযুক্ত কর্ম্ম। ইহাতে বিশেষ অর্থভেদ হয় না।

—— ——

কর্ম্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি ফলং ত্যক্ত্বা মনীষিণঃ।
জন্মবন্ধবিনির্ম্মুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্ ॥ ৫১

এই বুদ্ধিযুক্ত হয়ে মনীষী সকল,
কর্ম্মজাত ফল ত্যজি—জন্ম-বন্ধ হ'তে
মুক্ত হ'য়ে—প্রাপ্ত হয় পদ শান্তিময় ॥ ৫১

(৫১) এই বুদ্ধিযুক্ত—সমত্ব-বুদ্ধিযুক্ত (শঙ্কর)।
মনীষী—মননশীল, জ্ঞানী (শঙ্কর)।

জন্মবন্ধ-মুক্ত—জন্মরূপ বন্ধন (শঙ্কর)। সুকৃত দুষ্কৃত কর্ম্মফলেই জন্মলাভ হয়। এ উভয় দূর হইলে আর জন্ম হয় না। পুণ্য কর্ম্মফলেও পুনর্জন্ম হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায় না। পুণ্যফলে মৃত্যুর পর স্বর্গে গতি হয়। সেখানে সেই সুকর্ম্মফলের অনুপাতে ভোগান্তে কর্ম্মক্ষয়ে পুনর্জ্জন্ম হয়। শ্রুতিতে আছে,—"এবমেব অমুত্র পুণ্যজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে।" (ছান্দোগ্য, ৮।১।৬)। এই পুনর্জ্জন্মের বিবরণ ছান্দোগ্য

উপনিষদে পঞ্চাগ্নি বিদ্যায় বিবৃত হইয়াছে। পাপপুণ্যরূপ কর্ম্মফলে যে জন্ম হয়, তাহা পাতঞ্জল দর্শনে আছে—"সতি মূলে তদ্বিপাকো জাত্যায়ুর্ভোগাঃ" (২।১৩)।

পদ শান্তিময়—(মূলে আছে 'পদম্ অনাময়ম্') বিষ্ণুর মোক্ষাখ্য পরমপদ, বিষ্ণুলোক (শঙ্কর ও স্বামী)। নিষ্কাম ভাবে সমত্ব-বুদ্ধিতে কর্ম্ম করিয়া অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইলে, মেঘমুক্ত সূর্য্যের ন্যায় "তত্ত্বমসি" জ্ঞান, অজ্ঞান মেঘ বিনষ্ট করিয়া, আপনিই প্রকাশিত হইবে এবং তাহাতে ব্রহ্মপ্রাপ্তি রূপ মোক্ষ লাভ হইবে (মধু)। অনাময়=সর্ব্বপ্রকার উপদ্রব শূন্য (শঙ্কর)।

যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধির্ব্যতিতরিষ্যতি।
তদা গন্তাসি নির্ব্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ ॥ ৫২

—:*:—

যেইকালে বুদ্ধি তব, হইবেক পার
মোহের কলুষ হ'তে—হইবে নির্ব্বেদ
সেইকালে, শ্রুত আর শ্রোতব্য বিষয়ে ॥ ৫২

(৫২) বুদ্ধি—যোগানুষ্ঠানজনিত সত্ত্বশুদ্ধিজাত বুদ্ধি (শঙ্কর)।

মোহের কলুষ—মোহাত্মক অবিবেকরূপ কালুষ্য (কলিল) যদ্দ্বারা আত্মা ও অনাত্মার বিবেক-বোধকে কলুষিত করিয়া, অন্তঃকরণকে বিষয়ের প্রতি প্রবর্ত্তিত করে। (শঙ্কর, হনু)। দেহাদিতে আত্মজ্ঞান হেতু যে অবিবেক তাহাই মোহ। এই মোহ চিত্তকে কলুষিত করে—বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ করে, ফলাকাঙ্ক্ষা উৎপাদন করে, হৃদয়কে অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন করে। এই মোহ অতিক্রম করিতে পারিলে চিত্ত নির্ম্মল হয়, অবিদ্যা দূরীভূত হয়, আত্মবিবেক প্রজ্ঞা লাভ হয় এবং কর্ম্মযোগের ফল পরমার্থ যোগ লাভ হয় (শঙ্কর)।

নির্ব্বেদ—বৈরাগ্যযুক্ত, আসক্তি রহিত, (শঙ্কর)। উপেক্ষ্যভাবযুক্ত।

শ্রুত আর শ্রোতব্য বিষয়—যে উপদেশ পূর্ব্বে শ্রুত হইয়াছে বা হইবে (শঙ্কর ও স্বামী)। আধ্যাত্মিক শাস্ত্র ব্যতিরিক্ত শাস্ত্রের উপদেশ, (গিরি)। শ্রুত ও শ্রোতব্য কর্ম্ম ফলের বিষয়, (মধু)। সর্ব্বকর্ম্মের উপলক্ষণ (রাঘবেন্দ্র যতি)। কেহ অর্থ করেন, বেদ ও স্মৃতি শাস্ত্র। এ অর্থ সঙ্গত হয় না। যাহা হউক, শ্রুতির সাধারণ অর্থ বেদ। 'শ্রুত' অর্থে বেদোক্ত বিষয়, অর্থাৎ বেদোক্ত কর্ম্মকাণ্ড বিষয় ও বেদোক্ত কর্ম্মের ফল বিষয়। এ স্থলে অর্থ—শাস্ত্রে যে কর্ম্ম ও তৎফলের বিধান আছে, সেই কাম্য কর্ম্ম সম্বন্ধে শাস্ত্রের উপদেশ যাহা শুনিয়াছ বা শুনিবে, সেই বিষয়। যখন অজ্ঞান মোহ দূর হইবে, তখন সেই শ্রুত বা শ্রোতব্য বিষয়ের আবশ্যকতা থাকিবে না। তখন শাস্ত্র শ্রবণ বা শাস্ত্রালোচনাও নিষ্ফল। মোহ-নাশে নির্ম্মল চিত্তে জ্ঞান-সূর্য্যের বিকাশ হয়। (গীতা ৫।১৬) সকল তত্ত্ব প্রকাশিত হয়। পরমাত্মবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান লাভ হয়। তখন আর কিছুই অবিজ্ঞাত থাকে না, এবং কোন শ্রুত বা শ্রোতব্য বিষয়ের প্রয়োজনও থাকে না। তাহাতে উপেক্ষা বুদ্ধি হয়।

শ্রুতিবিপ্রতিপন্না তে যদা স্থাস্যতি নিশ্চলা।
সমাধাবচলা বুদ্ধিস্তদা যোগমবাপ্স্যসি ॥ ৫৩

শ্রুতিতে বিক্ষিপ্ত তব বুদ্ধি যেই কালে
হবে স্থির, সমাধিতে হইবে অচল—
সেই কালে যোগ তুমি লভিবে নিশ্চয় ॥ ৫৩

শ্রুতিতে—নানা শ্রুতি দ্বারা। অনেক প্রকার সাধ্যসাধন-সম্বন্ধ-বোধক নানাবিধ শ্রুতি বা শ্রবণ দ্বারা (শঙ্কর)। নানাবিধ লৌকিক ও

বৈদিক কার্য্যের ফলশ্রুতি দ্বারা (স্বামী)। নানাবিধ ফল শ্রবণে কাম্য কর্ম্মে আসক্তি দ্বারা (মধু)। শ্রবণমাত্র দ্বারা (রামানুজ)।

বিক্ষিপ্ত—(বিপ্রতিপন্না)—নানাভাবে প্রতিপন্ন, বিক্ষিপ্ত, কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় (শঙ্কর)। বিশেষরূপে প্রতিপন্ন (রামানুজ), বা বিশেষরূপে স্থির-নিশ্চয়কৃত। অর্থাৎ বেদোক্ত কর্ম্মকাণ্ডকে একমাত্র প্রামাণ্য ও সেই কর্ম্মই ফলার্থে অনুষ্ঠেয়, এইরূপ নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি। (পূর্ব্বে ৪২-৪৪ শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

কোন কোন আধ্যাত্মিক টীকাকারের মতে বিপ্রতিপন্ন অর্থে 'বিক্ষিপ্ত' নহে। 'শ্রুতি' অর্থাৎ ওঙ্কারধ্বনি শ্রবণে চিত্ত বিশেষরূপে প্রতিপন্ন বা নিশ্চল অর্থাৎ অবিচলিত। এ অর্থ সঙ্গত বোধ হয় না।

হবে স্থির (নিশ্চল)—বিক্ষেপরূপ চলন-বর্জ্জিত হইয়া স্থির হইবে।

সমাধিতে হইবে অচল—যাহাতে চিত্ত সমাহিত হয়, সেই আত্মাতে অবিচলিত বা বিকল্পবর্জ্জিত (শঙ্কর)। পরমেশ্বরে নিশ্চল (স্বামী)। পরমাত্মায় সমাহিত (মধু)। জাগ্রৎ স্বপ্নাবস্থা বা বিক্ষেপাবস্থা-রহিত সুষুপ্তির অবস্থা (মধু)। (পূর্ব্বে ৪৪ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য)।

এই যোগ—বিবেক প্রজ্ঞা-নামক সমাধি (শঙ্কর)। যোগফল তত্ত্বজ্ঞান (স্বামী)। আত্মসাক্ষাৎকার 'সোঽহং' জ্ঞানরূপ যোগ (মধু)। স্থিতপ্রজ্ঞ অবস্থা। আত্মাবলোকনরূপ যোগ (রামানুজ)। অর্থ এই বোধ হয় যে যখন তোমার বুদ্ধি সমাধিতে (অর্থাৎ পরমেশ্বরে বা আত্মাতে) স্থিত হইবে, তখন তুমি কর্ম্মযোগ-সিদ্ধ হইবে। কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠান যেরূপেই আরব্ধ হউক, তাহাতে সিদ্ধি লাভ করিতে হইলে, সমাধিতে বুদ্ধিকে অচল, স্থির, বিক্ষেপ বিহীন, সমত্বযুক্ত করিতে হয়। যখন বুদ্ধি এইরূপ সমাহিত হয়, তখন কর্ম্মযোগ-সিদ্ধি হয়। কর্ম্ম সাধন দ্বারা এ যোগে আরোহণ করিতে হয়। এ যোগে স্থিত হইলে কর্ম্মযোগ-সিদ্ধি হয়। (৬৷৩ শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

অর্জ্জুন উবাচ—

স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা সমাধিস্থস্য কেশব।
স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেত কিম্ ॥৫৪

—:*:—

অর্জ্জুন—

সমাধিতে স্থিত-প্রজ্ঞ যে জন কেশব!—
কিরূপ লক্ষণ তার? হয় কি প্রকার
অধিষ্ঠান তার কিম্বা বচন চলন? ৫৪

(৫৪) স্থিতপ্রজ্ঞ—নিশ্চলা বুদ্ধি যাহার (স্বামী)। উক্ত সমাধি-প্রভাবে পরমার্থ-বিজ্ঞান-লাভকারী। যাঁহার সমাধি লাভ হইয়াছে, অথবা পরব্রহ্মে আমি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছি এইরূপ জ্ঞান হইয়াছে, ও যিনি প্রথমে কর্ম্মযোগ দ্বারা, অথবা কর্ম্মত্যাগ করিয়া, জ্ঞানযোগনিষ্ঠায় প্রবৃত্ত, তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ, (শঙ্কর)।

পাতঞ্জল দর্শনের তৃতীয় পাদের ৫ম সূত্রে আছে, "তজ্জয়াৎ (সংযম জয়াৎ) প্রজ্ঞালোকঃ" অন্যত্র (১ম পাদের ৪৮ সূত্রে) আছে, "তত্র ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা", অর্থাৎ ধ্যান ধারণা ও সমাধি সিদ্ধ হইলে, যে প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয়, তাহা প্রত্যক্ষ, শ্রুতি, অনুমান প্রভৃতি প্রমাণজ সামান্য প্রজ্ঞা অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ (শ্রুতানুমান-প্রজ্ঞাভ্যাম্ অন্যবিষয়াবিশেষাৎ—পাতঞ্জল দর্শন ১।৪৯) যিনি এইরূপ প্রজ্ঞার আলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনিই স্থিত-প্রজ্ঞ।

সমাধিতে বুদ্ধি অচল হইলে, তবে 'যোগ' প্রাপ্ত হইবে—ভগবানের এই উপদেশ শ্রবণ করিয়া অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিতেছেন, স্থিতপ্রজ্ঞ কাহারা? অর্থাৎ সমাধিতে যাঁহাদের অচলা বুদ্ধি, তাঁহাদের লক্ষণ কি? স্থিতপ্রজ্ঞ বা সমাধিতে অচলা বুদ্ধি হইলে এই অধ্যায়োক্ত যোগ-সিদ্ধি হয়। এই অধ্যায়ে কর্ম্মযোগ উক্ত হইয়াছে। সেই কর্ম্মযোগে সিদ্ধির কথাই

বলা হইয়াছে। তাহার পূর্ব্বে সাংখ্য জ্ঞান বিবৃত হইয়াছে; সুতরাং বলা যায় যে, সাংখ্যজ্ঞান লাভ করিয়া সেই জ্ঞানে যাঁহার বুদ্ধি সমাহিত বা স্থির হইয়াছে, তিনি কর্ম্ম যোগে সিদ্ধি লাভের উপযুক্ত। অতএব স্থিরপ্রজ্ঞ অর্থে,—সাংখ্যজ্ঞান বা আত্মজ্ঞান অর্থাৎ পুরুষ প্রকৃতি বিবেক জ্ঞান যাঁহার লাভ হইয়াছে, যিনি সেই জ্ঞানে সর্ব্বদা অবস্থান করিতে পারেন, সে জ্ঞান হইতে কখন প্রচ্যুত হন না। সেই জ্ঞানে স্থিত হইলেই কর্ম্মযোগ সিদ্ধি হয়।

কিরূপ লক্ষণ—মধুসূদন বলেন, স্থিতপ্রজ্ঞের দুই অবস্থা—সমাধি ও ব্যুত্থান অবস্থা। এই শ্লোকে চারিটি প্রশ্ন আছে। প্রথম প্রশ্নে, সমাধিযুক্ত স্থিত-প্রজ্ঞের লক্ষণ জিজ্ঞাসা হইয়াছে। তাহার পর তিন প্রশ্নে ব্যুত্থিত অবস্থায় (১) স্থিত-প্রজ্ঞের বাক্য, (২) তাহার অবস্থান বা মনের ও ইন্দ্রিয়ের নিগ্রহকার্য্য, এবং (৩) তাহার বিষয়-বিচরণের অবস্থা বা কর্ম্ম কিরূপ—তাহাই জিজ্ঞাসা হইয়াছে।

কর্ম্মযোগ অনুষ্ঠান করিবার উপযুক্ত হইবার জন্য, এবং কর্ম্মযোগে সিদ্ধির জন্য যে সমাধিতে অচল বুদ্ধি বা স্থিতপ্রজ্ঞ হইতে হয়, সে স্থিতপ্রজ্ঞের অভিধা বা লক্ষণ (ভাষা) কি? লোকের সহিত তাঁহার ব্যবহার কিরূপ? স্তুতি বা নিন্দা শুনিয়া তিনি কি বলেন? বাহ্যেন্দ্রিয়-বিষয় সমুদায়ই বা তিনি কি প্রকারে গ্রহণ করেন?—ইহাই জিজ্ঞাসা হইয়াছে, (মধু)।

শ্রীভগবানুবাচ—

প্রজহাতি যদা কামান্ সর্ব্বান্ পার্থ মনোগতান্।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে॥ ৫৫

—:*:—

শ্রীভগবান্—

ত্যজে যেই মনোগত কামনা সকল,

আত্ম-বলে রহে তুষ্ট আত্মাতে আপন,—

স্থিত-প্রজ্ঞ কহে, পার্থ, তখন তাহারে। ৫৫

(৫৫) মনোগত কামনা—কামনা মনেরই ধর্ম্ম (বলদেব)। মন—চিত্ত। চিত্তবৃত্তি—"প্রমাণ, বিপর্য্যয়, বিকল্প, নিদ্রা, স্মৃতি" ভেদে পাঁচ প্রকার। (পাতঞ্জল দর্শন ১।৬) কামনা ত্যাগ অর্থাৎ সর্ব্বচিত্তবৃত্তি শূন্য হওয়া। কারণ 'যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ' (মধুসূদন)। হৃদয়স্থিত সকল প্রকার কাম (শঙ্কর)। মনোগত সমুদায় ভোগাভিলাষ, (স্বামী)।

কাম মনেরই ধর্ম্ম। শ্রুতি অনুসারে তাহা মনের স্বরূপ,—"কামঃ সংকল্পোবিচিকিৎসা শ্রদ্ধা অশ্রদ্ধা ধৃতি অধৃতি হ্রীঃ ধীঃ ভীঃ ইত্যেতৎ সর্ব্বং মন এব।" (ইতি বৃহাদারণ্যক, ১।৫।৩)।

আত্মবলে—(আত্মনা) আত্মা অর্থে এস্থানে চিত্ত। চিত্ত বলে চিত্তকে জয় করিয়া, প্রবৃত্তি নিরোধ করিতে হয়। উভয়দিকে প্রবাহিত চিত্তনদীর উর্দ্ধস্রোত দ্বারা তাহার অধঃস্রোত রুদ্ধ করিয়া সমাহিত হইতে হয়।

রহে তুষ্ট—যে বাহ্য বস্তু লাভে নিরপেক্ষ হইয়া, কেবল নিজ আত্মাতেই তুষ্ট অর্থাৎ পরমাত্ম-দর্শনরূপ অমৃতের আস্বাদনে পরিতুষ্ট সে আত্মারাম সন্ন্যাসী, (শঙ্কর)। আত্মাবলোকন তুষ্ট, (রামানুজ)। পরমাত্মাতে তদেকচিত্ত হইয়া তৎপ্রসাদে সন্তোষ-যুক্ত (রাঘবেন্দ্র যতি)। শ্রুতিতে আছে—

"যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদি স্থিতাঃ।

অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতোভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে ॥" (কঠঃ উপঃ, ৬।১৪)।

যাহার কোন আশা নাই, কোন বিষয়ে কামনা নাই, সেই সুখী। সাংখ্যদর্শনে আছে—"নিরাশঃ সুখী পিঙ্গলাবৎ।" উপনিষদে আছে—আত্মাই ভূমা। আত্মাতেই ভূমা সুখ ভোগ হয়। অন্য বিষয়ে সুখ অল্প, ক্ষণিক। এজন্য আত্মনিষ্ঠ বিষয়-সুখাভিলাষত্যাগী ব্যক্তিই আত্মতৃপ্ত।

এই শ্লোকে অর্জ্জুনের প্রথম প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হইয়াছে। বঙ্কিম বাবু বুঝাইয়াছেন যে, আত্মাতে আনন্দযুক্ত বা আত্মারাম হইলে যে বহির্বিষয়ে আনন্দ উপভোগ করিতে হইবে না—এই শ্লোকে বা ইহার পরের কয় শ্লোকে এমন কথা নাই। সেই সকল ন্যায় মত উপভোগের বিঘ্নকারী কামনা ও ইন্দ্রিয় বশ করিতে হইবে, ইহাই উদ্দেশ্য। কিন্তু কোনরূপ উপভোগের ইচ্ছা বা প্রবৃত্তি থাকিলে নিষ্কাম হওয়া যায় না। অন্যায় উপভোগ অপেক্ষা ন্যায়সঙ্গত উপভোগ উপাদেয় হইলেও কোনরূপ উপভোগের ইচ্ছাই বন্ধন কারণ। উপভোগে ইচ্ছা বা প্রবৃত্তি না থাকিলেও কর্ত্তব্য কর্ম্ম সাধন জনিত যে ফল আপনি উপস্থিত হয়। যে সন্তোষ আপনিই আসে, তাহার অবশ্যই উপভোগ হয়। কিন্তু তাহাতে আকৃষ্ট হইতে নাই। তাহা হইলে সমত্ব বুদ্ধি যুক্ত হওয়া যায় না।

দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে ॥ ৫৬
যঃ সর্ব্বত্রানভিস্নেহস্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্।
নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৫৭

—:*:—

দুঃখে অনুদ্বিগ্নচিত, সুখে স্পৃহাহীন,
বীতরাগভয়ক্রোধ—স্থিতধী সে মুনি ॥ ৫৬
সর্ব্বত্র যে স্নেহশূন্য, নহে উল্লাসিত,
লভি শুভ, কিম্বা দ্বেষযুক্ত নাহি হয়
অশুভ লভিয়া,—তার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত ॥ ৫৭

(৫৬, ৫৭)—মধুসূদন বলিয়াছেন, ব্যথিত স্থিত-প্রজ্ঞ "কি বলেন"—এই দুই শ্লোকে সেই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হইয়াছে। কামনা মনের ধর্ম।

অতএব কামনা ত্যাগ করিতে হইলে বা নিষ্কাম হইতে হইলে, মনের কতকগুলি বৃত্তিকে দমন করা প্রথম কর্ত্তব্য। কারণ, সেই গুলিই কামনার আধার। সে বৃত্তিগুলি কি, তাহা এই দুই শ্লোকে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যথা,—দুঃখ, উদ্বেগ, সুখ, স্পৃহা, রাগ, ভয়, ক্রোধ, উল্লাস ও দ্বেষ। পাতঞ্জল দর্শন অনুসারে চিত্তের বৃত্তি মাত্রই দুই রূপ—ক্লিষ্ট ও অক্লিষ্ট, (১।৫)। বুদ্ধিতে যে যে বিষয়ের গ্রহণ হয়, তন্মধ্যে কোনটি সুখদ, কোনটি বা দুঃখদ। সুখদ বিষয়ে অনুরাগ ও দুঃখদ বিষয়ে দ্বেষ উৎপন্ন হয় বলিয়া, চিত্তবৃত্তি ক্লিষ্ট বা অক্লিষ্ট হয়। দুঃখদ বিষয়ের পরিহার জন্য ও সুখদ বিষয়-লাভ জন্য ইচ্ছা-বশে কর্ম্মবৃত্তি পরিচালিত হয়। ইহাই কর্ম্মপ্রবৃত্তির মূল। সুখ দুঃখে উদ্বেগ না থাকিলে আর প্রবৃত্তি-বশে কর্ম্ম করিতে হয় না—বুদ্ধি স্থির হয়। স্থির বুদ্ধিতে কর্ত্তব্য স্থির করিয়া কর্ম্ম করিতে পারা যায়।

দুঃখ—আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক—এই ত্রিবিধ রজোগুণজ সন্তাপাত্মক চিত্তবৃত্তি, (মধু)।

উদ্বেগ—সেই দুঃখ হেতু অনুতাপাত্মক ভ্রান্তিরূপ তামস বৃত্তি, (মধু)।

সুখ—উক্তরূপ ত্রিবিধ সাত্বিক প্রীতিজনক চিত্তবৃত্তি, (মধু)।

স্পৃহা—সুখজ ধর্ম্মানুষ্ঠান বিনা সুখের লালসারূপ তামস চিত্তভ্রান্তি, অথবা হর্ষাত্মক চিত্তবেগ, (মধু)।

রাগ—অনুরাগ—শোভন-অধ্যাস-নিবন্ধন বিষয়ে রঞ্জনাত্মক রাজসী চিত্তবৃত্তি, (মধু)।

ভয়—অনুরাগের বিষয়ে বিঘ্নকারী বা নাশক কিছু উপস্থিত হইলে, তাহাকে বাধা দিবার অসামর্থ্য জন্য চিত্তের তামসিক দীনতা, (মধু)।

ক্রোধ—সেই বাধা নিবারণের ক্ষমতা থাকিলে, আপনাকে বড় মনে করিয়া তাহাকে বাধা দিবার চেষ্টায় যে চিত্তজ্বালা সেই রাজস বৃত্তি, (মধু)।

স্নেহ—অন্য বিষয়ে প্রেমাপরপর্য্যায় তামস বৃত্তি বিশেষ। অন্যের সুখ-দুঃখ, বা ক্ষতি-বৃদ্ধি হইলে, আপনাতে তাহা আরোপ করা স্নেহের

ধর্ম্ম, (মধু)। বলদেব বলেন, ইহা ঔপাধিক প্রীতিশূন্যতা—নিরুপাধিক প্রীতিশূন্যতা নহে। শঙ্কর বলেন, দেহজীবনাদিতে স্নেহ। স্বামী বলেন, পুত্রমিত্রাদিতে স্নেহ। ভক্তেরা বলেন, ঈশ্বর ব্যতীত অন্য পদার্থে স্নেহ। 'আমার' এই অভিমানে স্ত্রীপুত্র-দেহাদিতে যে মমতা—তাহাই এস্থলে উদ্দিষ্ট হইয়াছে বোধ হয়। নতুবা সর্ব্বভূতে আত্মাকে বা ঈশ্বরকে দর্শন করিয়া, তাহাতে যে প্রীতি, তাহা দোষাবহ নহে। শ্রুতিতে আছে—"ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি, আত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি।" (বৃহদারণ্যক, ২।৪।৫ দ্রষ্টব্য)। প্রীতিকে স্নেহ বলা যায় না। স্নেহকে নিম্নগামী বলে। পুত্রাদিই স্নেহের পাত্র। সমানের সম্বন্ধে প্রীতি হয়। তবে স্নেহ প্রীতিরই অন্তর্গত।

দ্বেষ—দুঃখহেতু অশুভ বিষয়ে অসূয়াজনিত নিন্দাদি-প্রবর্ত্তক ভ্রান্ত তামস বৃত্তি. (মধু)।

উল্লাস—(মূলে আছে অভিনন্দন)। সুখহেতু স্ত্রী-পুত্র-গৃহ-ধনাদি শুভ বিষয়ে প্রশংসা-প্রবর্ত্তক ভ্রান্ত চিত্ত-বৃত্তি. (মধু)।

যদা সংহরতে চায়ং কূর্ম্মোঽঙ্গানীব সর্ব্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৫৮

করে যেই প্রত্যাহার ইন্দ্রিয় সকল
ইন্দ্রিয়-বিষয় হ'তে,—কূর্ম্ম করে যথা
নিজ অঙ্গ সঙ্কুচিত—স্থিত প্রজ্ঞা তার ॥ ৫৮

(৫৮)—মধুসূদন বলেন,—স্থিতপ্রজ্ঞ কিরূপে অবস্থান করেন, এই প্রশ্নের উত্তর ৫৮শ হইতে ৬৩শ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। প্রারব্ধ কর্ম্মবশে ব্যুত্থিত অবস্থায় ইন্দ্রিয়গণ বিক্ষিপ্ত হইলে, তাহাদিগকে সমাধি

জন্য পুনর্ব্বার বিষয় হইতে আকর্ষণ বা নিরোধ করিতে হয়। তাহাই এই ৫৮শ শ্লোকে বুঝান হইয়াছে।

প্রত্যাহার করে (সংহরতে)—সম্যক প্রকারে সংবরণ করে। ইন্দ্রিয় বিষয়াভিমুখী হইলে, সেই বিষয় হইতে তাহাকে ফিরাইয়া লয়। পাতঞ্জল-দর্শন অনুসারে, ইহা অষ্টাঙ্গযোগের এক অঙ্গ। "স্ববিষয়াসম্প্রয়োগে চিত্তস্য স্বরূপানুকার ইব ইন্দ্রিয়াণাং প্রত্যাহারঃ।" (পাতঞ্জল দর্শন, ২।৫৪)। অর্থাৎ স্ব স্ব বিষয়ে অসংযুক্ত হইলে, ইন্দ্রিয়গণ নিরুদ্ধ চিত্তের স্বরূপ হয়। তাহাই প্রত্যাহার।

ইন্দ্রিয় বিষয় হ'তে—চক্ষুর গ্রাহ্য বিষয়—রূপ, কর্ণ গ্রাহ্য বিষয়—শব্দ, নাসিকাগ্রাহ্য বিষয়—গন্ধ, রসনাগ্রাহ্য বিষয়—রস ও ত্বক্‌গ্রাহ্য বিষয়—স্পর্শ। এই রূপরসাদি গ্রহণ দ্বারাই বাহ্য ভৌতিক পদার্থ জ্ঞানেন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ হয়। রূপরসাদি গ্রহণ না করিলে, বাহ্য জগতের জ্ঞান হয় না। তখন সমাধিস্থ হওয়া যায়। এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ে অনুরাগ না থাকিলে, বাহ্য কোন বস্তুর প্রতি অনুরাগ উৎপন্ন হয় না। তাহা গ্রহণে প্রবৃত্তিও হয় না। বাহ্য জগৎ আমাদের জ্ঞানে এই রূপরসাদি বিষয়াত্মক। তাহার প্রকৃত স্বরূপ আমরা জানিতে পারি না। ইন্দ্রিয়েতেই এই বিষয়-গ্রহণ শক্তি নিহিত। বাহ্য জগতের সহিত সম্বন্ধ হইলে, সেই শক্তির ক্রিয়া হয়। এই জন্য বাহ্যজগতের সহিত সম্পর্ক বা স্পর্শ হইলে, ইন্দ্রিয়গণ বিষয় গ্রহণ করে, এবং গ্রহণ করিয়া মনকে অর্পণ করে। মন তাহা বুদ্ধিকে অর্পণ করে। তখন বুদ্ধি সেই ইন্দ্রিয়স্পৃষ্ট পদার্থের অর্থ নিশ্চয় করে। অথবা বুদ্ধি বিষয় গ্রহণ করিবার জন্য যখন ইচ্ছা করে, তখন মনের সহিত যুক্ত হয়, মন ইন্দ্রিয়ের সহিত এবং ইন্দ্রিয় বিষয়ের সহিত যুক্ত হয়। শাস্ত্রে আছে,—"আত্মা মনসা সংযুজ্যতে, মন ইন্দ্রিয়েণ, ইন্দ্রিয়মর্থেন, তজ্‌জ্ঞানং" বাহ্যজ্ঞান ও বিষয় জ্ঞান লাভ করিবার ইহাই নিয়ম। যাহা হউক, যদি মন বা বুদ্ধি ইন্দ্রিয়-আহরিত বিষয় গ্রহণ না

করে, অথবা ইন্দ্রিয় বিষয়াভিমুখী হইবার পূর্ব্বেই যদি মন তাহাদের বাহ্য পদার্থের অভিমুখে যাইতে না দেয়, অথবা মন যদি ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়-ব্যাপারের সহিত সংযুক্ত না হয়, তবে আর বাহ্য পদার্থের প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইতে পারে না। শ্রুতিতে আছে "মনসা হি এষ পশ্যতি মনসা শৃণোতি (বৃহদারণ্যক, ১।৫।৩)। আমরা যখন একান্ত মনে কোন চিন্তা করি, তৎ-কালে মন শ্রুত শব্দ বা দৃষ্ট রূপ গ্রহণ করিতে পারে না। অথবা তখন ইন্দ্রিয়-ক্রিয়াই বন্ধ হয়। মনের স্বভাবই এই যে, ইহাতে যুগপৎ অনেক জ্ঞানের উৎপত্তি হয় না। ন্যায়দর্শনে আছে,—"যুগপদ্ জ্ঞানানামনুৎপত্তিঃ মনসো সিদ্ধম্।" কাজেই কোন এক বিষয় গ্রহণ ফলে মন অন্য বিষয় গ্রহণ করিতে পারে না। এজন্য একাগ্রভাবে কোন বিষয় ভাবনা কালে, চিত্তে আর বিষয়ান্তরের জ্ঞান গৃহীত হয় না।

এইরূপে বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়ের প্রত্যাহার হয়। ইন্দ্রিয়গণকে মনে লয় করিতে পারিলে প্রত্যাহার-সিদ্ধি হয়। ইন্দ্রিয়গণকে বহির্মুখ হইতে না দিয়া অন্তর্মুখ করিলে বা মনে তাহাদিগকে টানিয়া লইলে, এই প্রত্যাহার-সিদ্ধি হয়। এস্থলে আরও এক কথা বুঝিতে হইবে। জ্ঞানেন্দ্রিয়-প্রত্যাহারের এই নিয়ম। জ্ঞানেন্দ্রিয়ের প্রত্যাহার অবস্থায় বাহ্য জগতের জ্ঞান হয় না। জ্ঞানেন্দ্রিয়গণকে প্রত্যাহার না করিয়া, বাহ্য বিষয়ের প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করিয়াও কেবল কর্ম্মেন্দ্রিয়ের প্রত্যাহার করা যায়। জ্ঞানেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয়ে যদি অনুরাগ না হয়, তাহার সম্বন্ধে রাগ-দ্বেষাদি না থাকে, তবে তাহার ত্যাগ বা গ্রহণে প্রবৃত্তি হয় না। তাহাতে কর্ম্মেন্দ্রিয় বিষয়াভিমুখ হয় না, প্রত্যাহৃত হয়। এস্থলে বিষয়-জ্ঞান ও বিষয়-গ্রহণাদি ব্যাপার উভয়ই চিত্ত-বিক্ষেপকর এবং যোগবিরোধী বলিয়া সর্ব্বেন্দ্রিয়-প্রত্যাহারের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। এস্থলে উল্লেখ করা উচিত যে, বাহ্য ইন্দ্রিয়গণের প্রত্যাহার সিদ্ধ হইলে, যে অন্তর্দৃষ্টি বা যোগজ দৃষ্টি লাভ হয়, তাহা যোগের অন্তরায় নহে।

বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জ্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে॥ ৫৯

বিষয়-সম্ভোগ-হীন দেহীর ত হয়
বিষয়-নিবৃত্তি ; কিন্তু আসক্তি না যায়,
সে আসক্তি হয় দূর পরমার্থ হেরি॥ ৫৯

বিষয়সম্ভোগহীন—(মূলে আছে 'নিরাহারস্য,') অর্থাৎ যে ইন্দ্রিয় দ্বারা বাহ্য বিষয় আহরণ করিতে পারে না—বা করে না (শঙ্কর)। বিষয়-গ্রহণই ইন্দ্রিয়ের আহার। ইন্দ্রিয়ের বৈকল্য হেতু যে বিষয় গ্রহণে অশক্ত —যেমন জড় আতুর প্রভৃতি—তাহারা নিরাহার। এই সকল লোক, এবং যাহারা চিত্তশুদ্ধির পূর্ব্বে কর্ম্মসন্ন্যাস করিতে যায় বলিয়া বিষয় ভোগ করে না, সেই কষ্ট সন্ন্যাসী (রস) আসক্তিটুকু (বর্জ্জং) বাদ দিয়া বিষয় ভোগত্যাগ করে। তাহাদিগকেও নিরাহার বলা হইয়াছে। (মধু)। পূর্ব্বে চারি শ্লোকে জ্ঞাননিষ্ঠা ক্রমে ক্রমে কিরূপে নিষ্পাদিত হয়, তাহা উক্ত হইয়াছে। ইদানীং জ্ঞাননিষ্ঠা কিরূপ দুঃসাধ্য তাহা বিবৃত হইতেছে। ইন্দ্রিয়গণের আহার বিষয়। বিষয় হইতে যাহার ইন্দ্রিয়গণ প্রত্যাহৃত হইয়াছে, সে নিরাহার। সে রস বর্জ্জন না করিয়াই বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়-গণকে প্রত্যাহার করে, তাহার বিষয়ে অনুরাগ বা অভিলাষ থাকিয়া যায়। তাহা নিবৃত্ত হয় না, (রামানুজ, স্বামী,)।

পরমার্থ হেরি—(মূলে আছে "পরং দৃষ্ট্বা") অর্থাৎ বিষয় হইতে শ্রেষ্ঠ পরমাত্মাকে দেখিয়া। পরমার্থতত্ত্ব ব্রহ্ম উপলব্ধি করিয়া, (শঙ্কর), ব্রহ্ম সাক্ষাৎ করিয়া (মধু), পরমাত্মাকে সাক্ষাৎ করিয়া (স্বামী), ভাগবতীয় রসাস্বাদন করিয়া কেবল স্থিতপ্রজ্ঞের পক্ষেই প্রকৃত বিষয়ত্যাগ ও বিষয়ের রসত্যাগ উভয়ই হইতে পারে। অন্যে সে সুখ পায় না, তাহা

হইতে (পরং) শ্রেষ্ঠ ভূমাতেই সে প্রকৃত সুখ আস্বাদন করে। (ছান্দোগ্য ৭।২৩।১ দ্রষ্টব্য)। ব্রহ্মই প্রকৃত রসস্বরূপ। ("রসঃ বৈ সঃ' —তৈত্তিরীয় উপঃ, ২।৬।১)। সেই পরমাত্মা সর্ব্বরসের শ্রেষ্ঠ রস ("স এষ রসানাং রসতমঃ" —ছান্দোগ্য ১।১।৪)। তিনি পরমব্রহ্ম বা পরমপুরুষ।

আত্মদর্শনই যে ইন্দ্রিয়ের এই বিষয়াকর্ষণ নিবারণের মুখ্য উপায়—এই শ্লোকে ইহা বুঝান হইয়াছে। আত্মাতে চিত্ত স্থির হইলেই ইন্দ্রিয় দমন হয়, বাসনার কোনরূপ চিত্তবিক্ষেপ-ক্ষমতা থাকে না। তাহা পরবর্ত্তী ৭০ম শ্লোকে বুঝান হইয়াছে।

যততোহ্যপি কৌন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ।
ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ ॥ ৬০

প্রমত্ত ইন্দ্রিয়গণে নিগ্রহের তরে
বিবেকী যতন করে,—তথাপি তাহারা
করে মন হে অর্জ্জুন, সবলে হরণ ॥ ৬০

(৬০) ইন্দ্রিয়নিগ্রহ প্রথমে না করিলে—৫৬শ ও ৫৭শ শ্লোকোক্ত সুখ দুঃখাদি মনোবৃত্তির দমন করা যায় না—ইহাই এই শ্লোকে বুঝান হইয়াছে। মূলোচ্ছেদ করিলে তবে বৃক্ষ নষ্ট হয়। নদীর গতিরোধ করিতে হইলে, তাহার উৎপত্তিস্থান রুদ্ধ করিতে হয়। সেই জন্য প্রথমে ইন্দ্রিয়-প্রবর্ত্তক মনের দমন দ্বারা এই ইন্দ্রিয়-বিক্ষেপের দমন করিতে হয়।

"যস্ত্ববিজ্ঞানবান্ ভবত্যযুক্তেন মনসা সদা।
তস্যেন্দ্রিয়াণ্যবশ্যানি দুষ্টাশ্বা ইব সারথেঃ ॥" (কঠঃ-৩।৫)

শঙ্কর বলেন যাহারা সম্যক্‌দর্শন-লক্ষণ প্রজ্ঞাকে "স্থির" বা স্থৈর্য্যযুক্ত করিতে ইচ্ছা করেন, সর্ব্বাগ্রে তাঁহাদের ইন্দ্রিয়গণকে স্ববশে আনিতে

চেষ্টা করা কর্ত্তব্য, নতুবা যে দোষ হয়, তাহা এস্থলে দেখান হইতেছে। রামানুজ বলেন, আত্মদর্শন বিনা বিষয়রাগ যায় না তাহাই বুঝান হইয়াছে।

প্রমত্ত—প্রমথনশীল। কারণ ইন্দ্রিয়গণ আত্মাকে বিষয়াভিমুখে লইয়া তাহাকে বিক্ষোভিত করে—আকুল করে (শঙ্কর)। বলবান্ (রামানুজ)।

বিবেকী—(বিপশ্চিতঃ) মেধাবী (শঙ্কর)। অত্যন্ত বিবেকী (স্বামী, মধু)। আত্মানাত্ম-বিবেকী (বলদেব)। নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকী।

যতন করে—ইন্দ্রিয় জয় করিবার জন্য যত্ন করে (শঙ্কর, বলদেব)। মোক্ষার্থ যত্ন করে (স্বামী)। বিষয়-দোষ-দর্শনার্থ যত্ন করে (মধু)। এস্থলে শঙ্করের অর্থ অবলম্বন করিয়া অনুবাদ করা হইয়াছে। যে বুদ্ধিমান্ প্রথমে ইন্দ্রিয় জয় করিবার জন্য যত্ন করেন, তাঁহারও সহজে ইন্দ্রিয় জয় হয় না। আর ইন্দ্রিয় জয় না করিয়া মোক্ষার্থ কোনরূপ সাধনাই সম্ভব হয় না। সে ইন্দ্রিয়ের বশীভূত হইয়া পড়ে। রামানুজ বলেন, আত্মদর্শন ইন্দ্রিয়জয়-সাপেক্ষ।

করে মন সবলে হরণ—মন ইন্দ্রিয় হইতে শ্রেষ্ঠ বটে এবং মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়গণ প্রবর্ত্তিত হয় বটে, তথাপি মন যদি ইন্দ্রিয়গণকে জয় করিতে না পারে, তবে ইন্দ্রিয়গণই মনকে জয় করে। ইন্দ্রিয়গণ জোর করিয়া মনকে বিষয়াভিমুখে লইয়া যায়, ও বাধ্য করিয়া বিষয় গ্রহণ করায়। তখন ইন্দ্রিয়গণ আত্মা (বুদ্ধি) ও মনের বশে না থাকিয়াও তাহাদের দ্বারা প্রযুক্ত হইয়া বিষয় গ্রহণ করে না। তাহারা সংস্কারবশে স্বতঃপ্রবর্ত্তিত হইয়া বিষয় গ্রহণ করিতে ধাবিত হয়, ও মনকে সঙ্গে টানিয়া লইয়া যায়।

তানি সর্ব্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ।
বশে হি যস্যেন্দ্রিয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৬১

সে সব সংযত করি হয়ে সমাহিত
হয় মম পরায়ণ, ইন্দ্রিয় যাহার
রহে বশে,—প্রজ্ঞা তার হয় প্রতিষ্ঠিত । ৬১

সংযত করি—(সংযম্য)—সেই ইন্দ্রিয়গণকে বশীকৃত করিয়া (শঙ্কর)। তাহাদের প্রত্যাহার পূর্ব্বক মনে স্থাপন করিয়া। বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গণকে টানিয়া লইয়া—মনে তাহাদিগকে স্থির ভাবে স্থাপন করিয়া (রামানুজ)। নিগৃহীত করিয়া (মধু)।

হয়ে সমাহিত (যুক্ত আসীত)—সমহিত হইয়া (শঙ্কর)। নিগৃহীত-মনাঃ ও নির্ব্যাপার হইয়া (মধু।) আত্মসমাধিতে স্থিত হইয়া (বলদেব)।

মম পরায়ণ (মৎপরঃ),—আমি বাসুদেব সকলের অন্তরাত্মা (প্রত্যগাত্মা), আমিই একমাত্র আশ্রয় জানিয়া, এই ভাবে যে আমাতে অবস্থিতি করে, (শঙ্কর)। আমি চিত্তের শুভ আশ্রয়, আমাতে মন স্থাপন করিয়া, অবস্থান করে (রামানুজ)। সর্ব্বাত্মা বাসুদেব আমিই যাহার একমাত্র উৎকৃষ্ট উপাদেয়—সেই একান্ত ভক্তই মৎপর (মধু)। মন্নিষ্ঠ (বলদেব)।

এস্থলে "মৎপরঃ" এই বাক্য দ্বারা ভগবান্ বাসুদেবে অনন্য-ভক্তির ইঙ্গিত করা হইয়াছে। যিনি স্থিতপ্রজ্ঞ হইতে চাহেন, তাঁহাকে ভক্তি-যুক্ত হইতে হইবে। অনন্য-যোগে ভগবানের প্রতি অব্যভিচারিণী ভক্তি—জ্ঞানেরই লক্ষণ। (১৩।১০ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। ভক্তিযোগের কথা—ভগবানের স্বরূপ-তত্ত্ব পরে বিবৃত হইয়াছে। অর্জ্জুন তখনও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে আপনার সখা সারথি রূপেই জানিতেন। যখন পরে চতুর্থ অধ্যায়ে ভগবান বলিলেন যে, তিনি পূর্ব্বে বিবস্বান্‌কে এই তত্ত্ব উপদেশ দিয়াছিলেন, তখন অর্জ্জুন আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন ; বলিলেন, আপনি ত সূর্য্যদেবের পরে জন্মিয়াছেন, তবে কিরূপে তাঁহাকে উপদেশ দিলেন ? (৪।৪)। পরে সপ্তম অধ্যায় হইতে যখন ভগবান্ তাঁহার স্বরূপ বলিতে আরম্ভ করিলেন

ও অর্জ্জুনকে বিশ্বরূপ দেখাইলেন, তখন অর্জ্জুন ভয়ে বিহ্বল হইয়া গেলেন; বলিলেন—'প্রভু, আপনার স্বরূপ না জানিয়া, যে সখা ভাবিয়া ব্যবহার করিয়াছি, সে অপরাধ মার্জ্জনা কর।' অতএব এস্থলে অর্জ্জুন এই 'মৎপরঃ' কথার অর্থ বুঝিবার যোগ্য ছিলেন না।

এস্থলে ভগবানে একান্ত ভক্তিপূর্ব্বক সমাহিত থাকিবার কথা বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, এই ভক্তিযোগে ভগবানে যুক্ত হইবার অভ্যাস না করিলে, ইন্দ্রিয়গণকে সহজে বশীভূত করা যায় না। পূর্ব্ব শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, যাহারা কেবল ইন্দ্রিয়জয়ের জন্য চেষ্টা করে, তাহারা সহজে ইন্দ্রিয় জয় করিতে পারে না। কেন না, ইন্দ্রিয়গণ বড়ই বলবান্। তাহারা জোর করিয়া মনকে বিষয়ে লইয়া যায়। সেই ইন্দ্রিয়জয়ের একমাত্র উপায় মনকে এমনই জোর করিয়া এরূপ বস্তুর ধ্যানে বাঁধিয়া রাখিতে হইবে যে, যেন ইন্দ্রিয়গণ বলপূর্ব্বক চেষ্টা করিয়াও আর সে বন্ধন ছেদন পূর্ব্বক, মনকে বিচলিত করিয়া, কোন বিষয়াভিমুখে লইয়া যাইতে না পারে। সেই এক বস্তু পরমাত্মা—ভগবান্। ভগবানে একান্ত ভক্তি পূর্ব্বক তাঁহাতে যদি মনকে স্থির করিয়া রাখা যায়, তবে আর ইন্দ্রিয়গণ কিছুতেই মনকে বিষয়ান্তরে টানিয়া লইয়া যাইতে পারেনা। পুনঃ পুনঃ অভ্যাসের দ্বারা ভগবানে মন স্থির হয়। আর এই অভ্যাসের প্রণোদক ভক্তি—ভগবানে একান্ত পরানুরক্তি। সেই ভক্তি বা অনুরাগ জন্মিলে, তাহা দ্বারা ভগবানে আকৃষ্ট হওয়া যায়। সেই আকর্ষণ যতই প্রবল হয়, মনের চাঞ্চল্য ততই দূর হয়। ক্রমে মন ভগবানে স্থির হইয়া আইসে। তখন ইন্দ্রিয় বশীভূত হয়, ইন্দ্রিয়জয় সিদ্ধ হয়। ইন্দ্রিয়গণ আর মনকে বিষয়াভিমুখে আকর্ষণ করিতে পারে না। মন আর বহির্মুখ হয় না। ইন্দ্রিয়গণ বশীভূত হইলে, তবে স্থিতপ্রজ্ঞ হওয়া যায়।

অতএব এই শ্লোকে ইন্দ্রিয় জয় করিবার মুখ্য উপায় উক্ত হইয়াছে। মধুসূদন বলিয়াছেন, যেমন বলবান্ রাজার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া দস্যু-

দিগকে নিবারণ করা যায়, অথবা দস্যুগণ আপনিই পলাইয়া যায়, সেইরূপ ভগবানের আশ্রয় লইলে দুষ্ট ইন্দ্রিয়গণ আপনিই নিগৃহীত হয়। তাহার জন্য আর বিশেষ চেষ্টা করিতে হয় না। আত্মজ্ঞানে স্থিত হইলে, ইন্দ্রিয় জয় সিদ্ধ হয়। শ্রুতিতে আছে,—

যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি যুক্তেন মনসা সদা।
তস্যেন্দ্রিয়াণি বশ্যানি সদশ্বা ইব সারথেঃ॥ (কঠোপনিষৎ, ৩।৬)।

ভগবান্ "মৎপরঃ" বলিয়া যে আপনাকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এবং পরে বহু জন্মের পর জ্ঞানবান্ আমাকে প্রাপ্ত হয় এবং 'আমি বাসুদেবই এ সমুদয়', এই জ্ঞান সিদ্ধ হয়—এইরূপে যে আপনাকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেই ভগবত্তত্ত্ব দ্বিতীয় ষট্‌কে অর্থাৎ সপ্তম হইতে দ্বাদশ অধ্যায়ে ভগবান স্বয়ং বুঝাইয়াছেন। এস্থলে তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে ॥৬২
ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি ॥ ৬৩

করিলে বিষয় ধ্যান, জন্মে মানবের
আসক্তি তাহাতে, সেই আসক্তি হইতে
জন্মে কাম,—কাম হ'তে ক্রোধের উদ্ভব, ৬২
ক্রোধ হ'তে জন্মে মোহ, ভ্রম—মোহ হ'তে,
স্মৃতির বিভ্রম হ'তে হয় বুদ্ধি নাশ,—
বুদ্ধি-নাশ হ'তে হয় বিনষ্ট সে জন ॥ ৬৩

(৬২-৬৩) শঙ্কর বলেন,—এস্থলে সকল অনর্থের মূল উক্ত হইয়াছে। রামানুজ বলেন—পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ইন্দ্রিয়গণকে নিয়মিত করিতে না পারিলে যে অনর্থ হয়, তাহা উক্ত হইয়াছে। মনকে উক্তরূপে নিবেশিত না করিয়া, যে স্বকীয় গৌরবে ইন্দ্রিয় জয় করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহার চেষ্টা বিফল হয়, সে বিনষ্ট হয়, ইহাই উক্ত হইয়াছে। মনকে সমাহিত না করিলে, ইন্দ্রিয়-জয় হয় না। অনাদিকাল-প্রবর্ত্তিত বাসনাহেতু মনে বিষয়-ধ্যান অবর্জ্জনীয়। স্বামী বলেন,—পূর্ব্বে বাহেন্দ্রিয় সংযমের অভাবে যে দোষ হয়, তাহা উক্ত হইয়াছে। এস্থলে মনকে সংযত না করিলে কি দোষ হয়, তাহা উক্ত হইতেছে। বলদেব বলেন,—ইন্দ্রিয় জয় না হইলে, তাহার কি ফল হয়, তাহা এই দুই শ্লোকে বুঝান হইয়াছে। আমাদের মন যদি আত্মাতে নিবিষ্ট না হইয়া বিষয়াভিমুখ হয়, তবে বিষয়ে অনুরাগ বশতঃ তাহা ধ্যান করিলে বা তাহাতে অভিনিবিষ্ট হইলে, তাহাতে কি অনর্থ হয় তাহা উক্ত হইয়াছে।

ঈশ্বরে মন সমাহিত না করিয়া ইন্দ্রিয় নিগ্রহের চেষ্টা করিলে, বিষয়ে মন আকৃষ্ট হয় এবং বিষয়ে অলক্ষ্য অনুরাগ হেতু বিষয় ভাবনা আপনিই উপস্থিত হয়। আমাদের বাহ্যদিকে বিষয়, আর অন্তরে আত্মা অবস্থিত। মধ্যে আছে বুদ্ধি, মন ও ইন্দ্রিয়, অথবা অন্তঃকরণ ও বহিঃকরণ। এক দিকে বাহ্যবিষয় এ গুলিকে আকর্ষণ করিতেছে; অন্য দিকে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি তাহাদিগকে আত্মাভিমুখে লইবার চেষ্টা করিতেছেন। চিত্তের কাম বা বাসনা হেতু বিষয়-আকর্ষণই তন্মধ্যে প্রবলতর। কেন না, বিষয় আমাদের প্রত্যক্ষসিদ্ধ, আপাত-রমণীয় ও দিবালোকের ন্যায় প্রকাশ-মান। আত্মা অপ্রত্যক্ষ, অথবা কেবল অন্তঃ-প্রত্যক্ষ-সাপেক্ষ, কষ্টকর সাধনলভ্য ও রাত্রির ন্যায় অজ্ঞান-অন্ধকারে আবৃত। কাজেই বিষয়া-কর্ষণ বড়ই প্রবল। অনেকরূপ কৌশল করিয়া সাধনা করিলে, আত্মার আকর্ষণ প্রবল করা যায়। এই আকর্ষণ যতই প্রবল হয়, বিষয়াকর্ষণ

ততই ক্ষীণ হয়। বিষয়াকর্ষণ প্রবল হইলে, আত্মার আকর্ষণ ক্ষীণ হয়। বিষয়ের এই টান মনে প্রবল হইয়া কিরূপে আমাদিগকে ক্রমে ক্রমে অজ্ঞাতসারে মৃত্যুর দিকে লইয়া যায়, তাহাই এই দুই শ্লোকে দেখান হইয়াছে।

পাতঞ্জল দর্শনের ব্যাসভাষ্যে আছে,—"চিত্তনদী নাম উভয়তো বাহিনী। বহতি কল্যাণায় বহতি পাপায় চ। যা তু কৈবল্যপ্রাগ্‌ভারা বিবেক-বিষয়-নিম্না সা কল্যাণবহা। সংসারপ্রাগ্‌ভারা অবিবেক-বিষয়-নিম্না পাপবহা। তত্র বৈরাগ্যেণ বিষয়স্রোতঃ খিলীক্রিয়তে, বিবেক-দর্শনা-ভ্যাসেন বিবেক-স্রোতঃ উদ্‌ঘাটাতে।" (১।১২ সূত্রের ভাষ্য)। অতএব এই উভয় দিকে প্রবাহিত—চিত্ত নদী। ইহার একটি নিবৃত্তি-পথে উর্দ্ধস্রোতঃ, আর একটি প্রবৃত্তিপথে অধঃস্রোতঃ। এই অধঃস্রোতো-বৃত্তি পাপের দিকে লইয়া যায়, মনকে বিষয়াভিমুখে ধাবিত করায়। এই সংসার-প্রাগ্‌ভারা অবিবেক-বিষয়নিম্না বৃত্তি, কিরূপে চিত্তকে ক্রম-বৰ্দ্ধিত-গতিতে পাপের পথে মৃত্যু মুখে লইয়া যায়, তাহা এস্থলে বর্ণিত হইয়াছে। বঙ্কিমবাবু তাঁহার সীতারাম উপন্যাসে সীতারাম-চরিত্রে দৃষ্টান্ত দ্বারা এই শ্লোকোক্ত তত্ত্ব বুঝাইয়াছেন।

এই বিষয়প্রবণতা চিত্তের স্বভাব। শ্রুতিতে আছে,—

"পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূঃ
তস্মাৎ পরাঙ পশ্যতি নান্তরাত্মন্।
কশ্চিৎ ধীরঃ প্রত্যগাত্মানম্ ঐক্ষৎ
আবৃত্তচক্ষুঃ অমৃতত্বমিচ্ছন্॥" (কঠ উপঃ, ৪।১)।

অর্থাৎ স্বয়ম্ভু ইন্দ্রিয় সমূহকে বহির্মুখ করিয়াছেন; এজন্য মানুষ সম্মুখ দিকে দেখে, অন্তরাত্মাকে দেখে না। কোন কোন জ্ঞানী নিবৃত্তচক্ষুঃ হইয়া অমৃতত্ব ইচ্ছা করিয়া প্রত্যগাত্মাকে দর্শন করেন। অতএব প্রত্য-গাত্মার মধ্যে ভগবানকে দর্শন করিলে, তবে ইন্দ্রিয়গণের বিষয়-প্রবণতা

দূর হয়। নতুবা মহতী বিনষ্টিঃ (কেন উপঃ ১৩) বা "প্রণাশ" অনিবার্য্য !

বিষয় ধ্যান—শব্দাদি বিষয়-বিশেষের চিন্তা বা আলোচনা, (শঙ্কর)। মধুসূদন বলেন, বাহ্য ইন্দ্রিয় নিগৃহীত করিয়াও মনে মনে বিষয় ধ্যান বা পুনঃ পুনঃ চিন্তা। গুণ বুদ্ধিতে চিন্তা (স্বামী) শব্দাদি বিষয় সুখজনক হেতু বুদ্ধিতে পুনঃ পুনঃ চিন্তা (বলদেব)।

আসক্তি—(সঙ্গ)—মমতা-উৎপাদক আসক্তি। শোভন-অধ্যাস-লক্ষণযুক্ত প্রীতি (মধু)। সেই সকল বিষয়ে প্রীতি (শঙ্কর)।

কাম—তৃষ্ণা, বাসনা, মমতা (মধু)। তৃষ্ণা (শঙ্কর)। 'সঙ্গ' বা আসক্তির বিপাক দশা—কাম (রামানুজ)। এই 'কাম' শব্দের অর্থ এস্থলে সুখদ বিষয় লাভ করিবার ইচ্ছা বা প্রবৃত্তি। ইহা সংসারের মূল যে কাম বা বাসনা-বীজ, তাহা নহে। ইহা বিষয়-বিশেষ পাইবার জন্য সেই মূল কামেরই অভিব্যক্তি বা প্রকাশ ভাব মাত্র।

ক্রোধ—এই বাসনা বা ইচ্ছা কাহারও দ্বারা প্রতিহত হইলে, সেই প্রতিঘাতরূপ চিত্তজ্বালাই ক্রোধ, তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, (মধু)। কাম-ভোগের অবস্থায় স্থির থাকা যায় না। কামনার বিষয় অপরে যদি ভোগ করে, তবে তাহার প্রতি ক্রোধ হয়। অথবা যে আমার কামনার বিষয়ভোগে বাধা দেয়, তাহার প্রতি ক্রোধ হয় (রামানুজ)।

মোহ—কার্য্যাকার্য্য বিষয়ে অবিবেক (শঙ্কর, রামানুজ, স্বামী, মধু)। হিতাহিত বুদ্ধির আবরক তামসিক ভাব।

ভ্রম, স্মৃতির বিভ্রম—শাস্ত্র ও আচার্য্যের উপদেশ-জনিত যে সংস্কার তাহা স্মৃতি। সেই স্মৃতির ভ্রংশ (শঙ্কর, স্বামী ও মধু)। ইন্দ্রিয়জয় জন্য প্রারব্ধ যত্নের স্মৃতি (রামানুজ)। ভগবৎস্মরণে ভ্রম (বল্লভ)।

বুদ্ধিনাশ—আত্মজ্ঞানার্থ অধ্যবসায়-নাশ (রামানুজ)। চেতনা

নাশ,—বৃক্ষের ন্যায় জড়ভাব প্রাপ্তি (স্বামী)। অন্তঃকরণে কার্য্যাকার্য্য বিষয়ে বিবেক-যোগ্যতার অভাব (শঙ্কর)। একাত্ম আকার যে বুদ্ধি, বিপরীত ভাবনার উপচয়-দোষে তাহার অনুৎপত্তি (মধু)।

বিনষ্ট—পুরুষার্থের অযোগ্য হইয়া বিনষ্ট হয় (শঙ্কর)। পুনর্ব্বার সংসারে নিমগ্ন হইয়া নষ্ট হয়, (রামানুজ)। মৃত তুল্য হয় (স্বামী)। সর্ব্ব-প্রকার পুরুষার্থ লাভের অযোগ্য হইয়া মৃততুল্য হয় (মধু)। সাধন বুদ্ধি-রাহিত্যই নাশ (বল্লভ)। বিষয়ভোগে নিমগ্ন হওয়ায় ধর্ম্মপথ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সংসারাবর্ত্তন বা নরকগতি (বলদেব)।

রাগদ্বেষবিযুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্।
আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি ॥ ৬৪

রাগদ্বেষ-বিরহিত—আত্মবশে স্থিত
ইন্দ্রিয়ের দ্বারা করি বিষয় সম্ভোগ,—
আত্ম-জয়ী জন করে প্রসন্নতা লাভ ॥ ৬৪

(৬৪) মন ও ইন্দ্রিয়কে প্রথমে বিষয় হইতে আত্মাভিমুখে আকর্ষণ করিতে অভ্যাস করিলে, যখন বৈরাগ্য জন্মিয়া চিত্ত বশ হইবে, তখন চিত্তকে বিক্ষিপ্ত না করিয়া, অর্থাৎ আসক্তি ও ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য হইয়া সমত্বজ্ঞানে নিষ্কামভাবে ও কর্ত্তৃত্বাভিমান ত্যাগ করিয়া কেবল ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয়ভোগ করিলেও চিত্তের নির্ম্মলতা জন্য প্রসন্নভাব (আত্ম-প্রসাদ) দূর হয় না। কাজেই দুঃখাদি চিত্তবিকার থাকে না। বুদ্ধি স্থির হয়। ইহাই এই শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। এই শ্লোক হইতে আট শ্লোকে "কিং ব্রজেত"—এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হইয়াছে। (মধু, বলদেব ও স্বামী)। গীতায় পরে উক্ত হইয়াছে,—

"কায়েন মনসা বাচা কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈরপি।
যোগিনঃ কর্ম্মকুর্ব্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে॥ (৫।১১)।

রাগ দ্বেষবিরহিত—অর্থাৎ সুখকর বিষয়ে আসক্তি ও দুঃখকর বিষয়ে বিরক্তি। পাতঞ্জল সূত্রে আছে—"সুখানুশয়ী রাগঃ, দুঃখানুশয়ী দ্বেষঃ।" (২।৭,৮)। রাগ ও দ্বেষ ইন্দ্রিয়গণের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হইতে উৎপন্ন (শঙ্কর)। উক্ত প্রকারে সর্ব্বেশ্বর আমাতে আশ্রয় করিলে মনের কলুষ দগ্ধ হওয়ায় রাগদ্বেষ-বিহীন হওয়া যায় (রামানুজ)। মধুসূদন ও বলদেব বলেন,—মন উক্ত প্রকারে নিগৃহীত হইলে, বাহ্য ইন্দ্রিয় নিগ্রহ না করিলেও যে দোষ হয় না, তাহাই এস্থলে উক্ত হইয়াছে। রাগ দ্বেষ মনের বা চিত্তের ধর্ম্ম, চিত্ত যাহার বশীভূত, তাহার মনে রাগ-দ্বেষ বা ইচ্ছা-দ্বেষ আর বিকাশিত হইতে পারে না। চিত্ত আত্মাতে অবস্থিত হইলে, তবে বশীভূত হয়। তখন রাগ দ্বেষ সকল ধ্বংস প্রাপ্ত হয়।

আত্মবশে স্থিত—আত্মার বশীভূত (শঙ্কর)। মনের বশীভূত (স্বামী, মধু, বলদেব)। ইন্দ্রিয়গণকে আত্মা অর্থাৎ নির্ম্মল বুদ্ধি বা জ্ঞানের বশীভূত করিয়া।

ইন্দ্রিয়ের দ্বারা—রাগদ্বেষ-মলাহীন মনের বশীভূত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা।

বিষয় সম্ভোগ (চরন্)—অবর্জ্জনীয় বিষয় অন্নপানাদি-সমূহের ভোগ (শঙ্কর)। অনিষিদ্ধ বিষয়ভোগ (বলদেব, মধু)। বিষয় সকলকে তিরস্কার করিয়া বর্ত্তমান (রামানুজ)। এস্থলে সমাধির উত্তরাবস্থা বর্ণিত হইয়াছে (বল্লভ)। মূল অনুসারে অর্থ—বিষয়ে বিচরণ সুতরাং এস্থলে নিষ্কামকর্ম্মাচরণার্থ বিষয়ে বিচরণ অর্থও হইতে পারে।

আত্মজয়ী জন (বিধেয়াত্মা)—যাহার অন্তঃকরণ বশীভূত (শঙ্কর), বা যাহার মন বশীভূত (স্বামী)। এস্থলে আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা দ্বারা যে

'আত্মা' উক্ত হইয়াছে, তাহা প্রকৃত আত্মা নহে। চিত্তে যে আত্মার প্রতিবিম্ব হেতু আত্মাধ্যাস হয়—সেই আত্মা। তাহা অন্তঃকরণ বা মন।

প্রসন্নতা—বিষয়াসক্তি-রূপ মলা দূর হওয়ায় চিত্তের নির্ম্মলতা। মূলে আছে "প্রসাদ"—সুস্থভাব। প্রসাদাৎ স্বাস্থ্য (শঙ্কর)। নির্ম্মল অন্তঃকরণ (রামানুজ)। চিত্তের স্বচ্ছতা (মধু)।

প্রসাদে সর্ব্বদুঃখানাং হানিরস্যোপজায়তে।
প্রসন্নচেতসোহ্যাশু বুদ্ধিঃ পর্য্যবতিষ্ঠতে॥ ৬৫

এই প্রসন্নতা লভি তার দুঃখ সব
হয় দূর; যেই জন প্রসন্ন-অন্তর,—
ত্বরায় তাহার বুদ্ধি হয় প্রতিষ্ঠিত॥ ৬৫

দুঃখ সব—আধ্যাত্মিক আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক ত্রিবিধ দুঃখ (শঙ্কর)। সাংখ্যদর্শন অনুসারে ত্রিবিধ দুঃখের বা ত্রিতাপের একান্ত ও অত্যন্ত নিবৃত্তিরূপ যে পরম পুরুষার্থ, তাহা সিদ্ধ হয়। সাংখ্য-দর্শন অনুসারে ত্রিবিধ দুঃখের একান্ত ও অত্যন্ত নিবৃত্তিই পরম পুরুষার্থ। ইহার আর পুরুষার্থ নহে। ইহার পর যে পুরুষার্থ, তাহা বেদান্তে ও গীতায় উক্ত হইয়াছে, তাহা পরে বিবৃত হইবে।

বুদ্ধি প্রতিষ্ঠিত—আকাশের ন্যায় সকল দিকেই আত্মস্বরূপে স্থিত বুদ্ধি নিশ্চল হয় (শঙ্কর)। বুদ্ধি আত্মাতে পর্য্যবসিত হয় (রামানুজ)। বুদ্ধি প্রতিষ্ঠিত হয় (স্বামী)। ব্রহ্মাত্মৈক্য সাক্ষাৎকারে সর্ব্বদিকে স্থির হয় (মধু)। আত্মবিষয়া বুদ্ধি স্থির হয় (বলদেব)।

এ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, চিত্তের রাগদ্বেষাদি মলা দূর হইলে, যে প্রসন্নতা, যে সন্তোষ, যে ভূমা সুখভাব হয়, তাহাতেই প্রকৃতিজ বা অজ্ঞানজ সর্ব্বপ্রকার দুঃখ দূরীভূত হয়, ও বুদ্ধি পরমাত্মাতে স্থির হইয়া অবস্থিত হয়। তাহার জন্য আর অন্য সাধনার প্রয়োজন হয় না।

নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য নচাযুক্তস্য ভাবনা।
ন চাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্য কুতঃ সুখম্ ॥ ৬৬

নহে যুক্ত যেই জন—নাহি বুদ্ধি তার,
না থাকে ভাবনা তার,—ভাবনাহীনের
নাহি শান্তি,—অশান্তের সুখ বা কোথায় ? ৬৬

(৬৬) নহে যুক্ত যেই—অসমাহিত-চিত্ত (শঙ্কর)। অবশীকৃত ইন্দ্রিয় যাহার (স্বামী)। আমাতে সমাহিত চিত্ত যে নহে (রামানুজ)।

বুদ্ধি—আত্মস্বরূপ-বিষয়া বুদ্ধি (শঙ্কর)। শাস্ত্র ও আচার্য্যের উপদেশ-জাত আত্মবিষয়া বুদ্ধি (স্বামী)। নির্ম্মল সাত্ত্বিক অধ্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি,—তাহার স্বরূপ জ্ঞান, ধর্ম্ম, ঐশ্বর্য্য ও বৈরাগ্য। এই বুদ্ধি অহঙ্কার মন ও ইন্দ্রিয়ের অতীত, তাহাদের অপেক্ষা পর বা শ্রেষ্ঠ-তত্ত্ব। সাংখ্যদর্শন অনুসারে তাহাই মহত্তত্ত্ব। এই বুদ্ধি ব্যবসায়াত্মিকা, সমাধিতে বিহিত (গীতা ২।৪১, ৪৪)।

ভাবনা—আত্মজ্ঞানাভিনিবেশ (শঙ্কর ও গিরি)। ধ্যান (স্বামী)। নিদিধ্যাসনাত্মক আত্মবিষয়ে ভাবনা (মধু)। শাস্ত্রে আছে "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।" চিত্তের একাগ্র চিন্তা-ধারাই ভাবনা।

শান্তি—উপশম (শঙ্কর)। অবিদ্যাজনিত সমস্ত লৌকিক ও

অলৌকিক (বা বৈদিক) কর্ম্মে বিক্ষেপ-নিবৃত্তি (মধু)। বিষয়-চেষ্টা নিবৃত্তি হেতু প্রসাদ (বলদেব)।

সুখ—ইন্দ্রিয়গণের বিষয়-সেবা-তৃষ্ণার নিবৃত্তি-জনিত সুখ (শঙ্কর)। বিষয়-স্পৃহার শান্তিহেতু নিরতিশয় সুখ (রামানুজ)। স্বপ্রকাশ আত্মানুভব লক্ষণ সুখ (বলদেব)। মধুসূদন বলেন,—এই শ্লোকে নিষেধ-মুখে পূর্ব্বোক্ত তত্ত্ব বুঝান হইয়াছে। এই সুখ মোক্ষানন্দ (মধু, স্বামী)।

সুখ দুই প্রকার। এক আত্মার ভূমা সুখ, তাহা আনন্দস্বরূপ। আর এক প্রকৃতির সত্ত্বগুণ হইতে চিত্তে প্রকাশিত সুখ। এই প্রকৃতিজ সুখ—সুখ-দুঃখ এই দ্বন্দ্বযুক্ত। আত্মার আনন্দ বা ভূমা অপরিচ্ছিন্ন সুখ—দুঃখের অতীত। ইহা চিত্তধর্ম্ম যে সুখ-দুঃখ, তাহা হইতে ভিন্ন। তবে আত্মানন্দের প্রতিবিম্ব যে চিত্তে পতিত হয়, তাহা হইতে চিত্তের এ সুখ-দুঃখ ভাব হয়, ইহা বলিতে পারা যায়।

ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং যন্মনোঽনুবিধীয়তে।
তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিবাম্ভসি ॥ ৬৭

স্ববিষয়ে প্রবর্ত্তিত ইন্দ্রিয়গণের
মনই অনুগামী, তারা হরে প্রজ্ঞা তার,—
বায়ু যথা হরে তরি বারিধি মাঝারে ॥ ৬৭

(৬৭) এই শ্লোকের অর্থ এইরূপ,—যদি কোন একটি ইন্দ্রিয়ের বিক্ষেপ নিবৃত্ত হইতে বাকি থাকে, তাহা হইলে, ইহাই মনকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া শেষে বুদ্ধিকে পর্য্যন্ত বিচলিত করিতে পারে। সুতরাং সকল ইন্দ্রিয় গুলিকেই প্রথমে সংযত করিতে হইবে—নিগৃহীত করিতে হইবে। ইহা পরের শ্লোকে উক্ত হইয়াছে।

অনুগামী—(অনুবিধীয়তে) ইন্দ্রিয়ের পশ্চাৎ প্রবৃত্ত হয় (শঙ্কর)। বিষয়ে বর্ত্তমান ইন্দ্রিয়ের অনুবর্ত্তন করে (রামানুজ)। কোন একটি ইন্দ্রিয়, তাহার বিষয়ে প্রবর্ত্তিত হইলে, তৎপশ্চাৎ মনও তাহাতে প্রবর্ত্তিত হয় (মধু)।

প্রজ্ঞা—আত্মানাত্ম বস্তুর বিবেক-জনিত প্রজ্ঞা (শঙ্কর)। ইন্দ্রিয়-গণ সহ মনোজয়েই প্রজ্ঞার প্রকাশ হয়। পাতঞ্জল দর্শনে আছে,—"তজ্জয়াৎ প্রজ্ঞালোকঃ"। বুদ্ধিতে যে বিষয় নিশ্চয় হয়, তাহা প্রমা জ্ঞান। (তাহা প্রজ্ঞা নহে। চিৎস্বরূপ জ্ঞানস্বরূপ আত্মার প্রতিবিম্ব যখন নির্ম্মল চিত্ত গ্রহণ করিতে পারে, তখন তাহাতে প্রজ্ঞার প্রকাশ হয়। বুদ্ধিতত্ত্ব—অহঙ্কার মন ও ইন্দ্রিয়গণের অতীত, তাহাদের শ্রেষ্ঠতত্ত্ব। সাংখ্যদর্শন অনুসারে বুদ্ধিই অহঙ্কারাদির কারণ। যখন এই অহঙ্কার মন ও ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া, বুদ্ধি স্বরূপে অবস্থিত হয়, তখন সেই নির্ম্মল বুদ্ধিতেই প্রজ্ঞার প্রতিষ্ঠা হয়।

হরে—নাশ করে (শঙ্কর)। বিষয়প্রবণ করে (রামানুজ)। বিষয়ে বিক্ষিপ্ত করে (স্বামী)। বিষয়গ্রহণকারী মানবের বুদ্ধিতে প্রজ্ঞার প্রকাশ হয় না, অথবা যে প্রজ্ঞার প্রকাশ হইয়াছিল,তাহা আবরিত হয়—নষ্ট হয়।

বায়ু—প্রমত্ত কর্ণধারের ন্যায় বায়ু (স্বামী)।

এই সংসার-সাগর পার হইবার একমাত্র তরণী এই প্রজ্ঞা। গীতার ১৩ অধ্যায়ে ৭ হইতে ১১ শ্লোকে যে জ্ঞানের স্বরূপ উক্ত হইয়াছে, তাহাই এই প্রজ্ঞা। মন ও ইন্দ্রিয়ের বিষয় আহরণও বিষয়াক্রান্তি হেতু বিক্ষেপ ফলে চিত্ত রাগদ্বেষ-চালিত হয়। ইহাই সেই সংসার-সাগরের ঝড় তুফান। ইহাতেই প্রজ্ঞার বিনাশ হয়। নির্ম্মল চিত্তে যে আত্মার প্রতিবিম্ব পড়ে, চিত্ত আবিল ও চঞ্চল হইলে তাহাতে সে প্রতিবিম্ব প্রকাশিত হয় না, আর তাহাতে আত্মজ্ঞান বা প্রজ্ঞাও প্রকাশিত হয় না।

তস্মাদ্ যস্য মহাবাহো নিগৃহীতানি সর্ব্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥ ৬৮

অতএব সমুদয় ইন্দ্রিয় যাহার
হইয়াছে নিগৃহীত বিষয় হইতে,—
হে অর্জ্জুন, প্রতিষ্ঠিত হয় প্রজ্ঞা তার॥ ৬৮

(৬৮) নিগৃহীত—ভগবান্‌কে দৃঢ়রূপে আশ্রয় করিয়া যাঁহার মন ও সমুদায় ইন্দ্রিয় সর্ব্বদিক হইতে সর্ব্বরূপে নিগৃহীত হইয়াছে, (শঙ্কর, রামানুজ)। নিঃশেষে বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত ও স্ববশীভূত।

প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত—ইন্দ্রিয়-সংযম এবং যে স্থিতপ্রজ্ঞের সাধন-লক্ষণ পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে এস্থলে ;তাহার উপসংহার করা হইতেছে, (স্বামী)। প্রজ্ঞা অবিচলিতভাবে আত্মাতে প্রতিষ্ঠিত।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, পাতঞ্জল-দর্শন অনুসারে যখন ধ্যান ধারণা বা সমাধি অথবা এই তিন যোগাঙ্গ যে 'সংযম' তাহার জয় হইলে, বা সংযম সিদ্ধ হইলে, প্রজ্ঞার আলোক প্রকাশিত হয় (পাতঞ্জল সূত্র ৩।৫)। এই প্রজ্ঞা সমাধিজ প্রজ্ঞা। ইহার ফলে যে ভূত ভবিষ্যৎ ও দূর দর্শনাদি (Clairvoyance এবং Clairaudience) সিদ্ধি হয়, এস্থলে গীতায় তাহা সংযত করিবার কথা নাই। তবে শাস্ত্র অনুসারে এ সকল সিদ্ধিও যোগের অন্তরায়।

যাহাতে ও যেরূপে এই প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হইলে, স্থিতপ্রজ্ঞ হওয়া যায়, সে প্রজ্ঞা "নির্ম্মল" পরিশুদ্ধ অজ্ঞানমুক্ত প্রকৃষ্ট জ্ঞান। চিত্ত সম্পূর্ণ নির্ম্মল হইলে, সূর্য্যের ন্যায় জ্ঞান প্রকাশিত হয়। (গীতা, ৫।১৬)। সে চিত্তে যদি কোন রূপ মলিনতা বা চাঞ্চল্য না আসিতে পায়, তবে সে প্রজ্ঞার প্রতিষ্ঠা সিদ্ধ হয়। চিত্তকে নির্ম্মল করিতে হইলে এবং নির্ম্মল রাখিতে হইলে

মন ও ইন্দ্রিয় সকলকে সর্ব্বদিক্ হইতে সর্ব্বরূপে নিগৃহীত করিতে হয়। মন ও ইন্দ্রিয়গণ নিগৃহীত হইলেই বুদ্ধি নির্ম্মল এবং সাত্ত্বিক ও প্রকাশ-স্বরূপ —সুখ-স্বরূপ হয়। এই বুদ্ধি তখন জ্ঞান-স্বরূপ আত্মার প্রতিবিম্ব গ্রহণ করিয়া জ্ঞানস্বরূপ হয়, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। এই জ্ঞান-স্বরূপে অবস্থান করিতে পারিলেই প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হয়। যে এইরূপে প্রজ্ঞাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে না পারে—এই গীতোক্ত সাংখ্যযোগ, কর্ম্মযোগ, ধ্যানযোগ বা ভক্তিযোগ তাহার অধিগম্য হয় না। অথবা তাহাতে সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না। এ তত্ত্ব পরে ত্রয়োদশ অধ্যায়ে বিবৃত হইবে। এই প্রজ্ঞার প্রতিষ্ঠা লাভ, কেবল মন ও ইন্দ্রিয়ের নিগ্রহ দ্বারা সম্ভব। অতএব তাহাই প্রথম সাধনা করিতে হইবে। তবে গীতোক্ত যোগের অধিকারী হওয়া যাইবে।

যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ ॥ ৬৯

সর্ব্বভূত কাছে যাহা নিশার আঁধার—
সংযমী জাগ্রত তাহে, যাহে জাগে জীব
সেই নিশা, তত্ত্বদর্শী মুনির নিকট ॥ ৬৯

(৬৯) নিশার আঁধার—অজ্ঞানান্ধকারে বা মায়ায় মোহিত হইয়া, অবিবেকী আত্মাকে সম্পূর্ণ অন্ধকারবৎ দর্শন করে, অথবা তাহার কিছুই দেখিতে পায় না। বিবেকীর মোহাবরণ না থাকায়, তিনি আত্ম-দর্শন করেন। অতএব এই তমোগুণজাত অন্ধকার বা অজ্ঞানমোহ, সকল ভূতেই বা সকল জীবেই অবিবেক উৎপাদন করে বলিয়া ইহাকে রাত্রির সহিত তুলনা করা হইয়াছে। এই অজ্ঞানরূপ নিদ্রায় লোকে অভিভূত বা

নিদ্রিত থাকে—কিন্তু যোগী অজ্ঞান দূর করিয়া সে নিদ্রা হইতে জাগরিত হন—তাঁহার আত্ম-সাক্ষাৎকার হয়। আর এই অবিবেকী লোকেরা বাহ্য ইন্দ্রিয়-ব্যাপারে লিপ্ত থাকে—ও তাহাতেই কেবল মনকে প্রবর্ত্তিত করে। কিন্তু যোগী সে সকল বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গণকে প্রত্যাহৃত করিয়া, সে সকল একেবারেই উপেক্ষা করেন—বা সে বিষয় সম্বন্ধে নিদ্রিত থাকেন (স্বামী)। আত্মনিষ্ঠের আত্মবিষয়ে বুদ্ধি সর্ব্বভূতে অপ্রকাশিত, আর সর্ব্বভূতের ইন্দ্রিয়-বিষয়ক বুদ্ধি সংযমীর নিকট অপ্রকাশিত, (রামানুজ)।

শঙ্কর বলেন:—"রাত্রি সকল পদার্থের অবিবেককরী। তমঃ-স্বভাব বশতঃ প্রাণিগণের নিকট পরমার্থ আত্মতত্ত্ব জ্ঞানের অগোচর। আমাদের কাছে যাহা দিন, পেচকাদি নিশাচরদের নিকট তাহা রাত্রি। আর তাহাদের কাছে যাহা দিন, আমাদের কাছে তাহা রাত্রি। সেইরূপ অজ্ঞানীর নিকট যে আত্মতত্ত্ব নিশার ন্যায় অগোচর বা অন্ধ-কারাবৃত, পরমার্থ জ্ঞানীর নিকট তাহা দিবার ন্যায় প্রকাশিত। সংযমী অজ্ঞানরূপ নিদ্রা হইতে প্রবুদ্ধ হইয়া আত্মাতে জাগরণ করিয়া থাকেন।

"অজ্ঞানরূপ মোহ-রাত্রিতে প্রসুপ্ত জীবগণ স্বপ্নদর্শীর ন্যায় যাহাতে জাগিয়া থাকে মনে করে, পরমার্থদর্শীর সে স্বপ্ন দূর হয়। গ্রাহ্য-গ্রাহক ভেদ, (কর্ত্তৃ-কর্ম্ম-ভেদ, ভোক্তৃ-ভোগ্য-ভেদ, জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়-ভেদ) সকলই অবিদ্যা কার্য্য। এই অবিদ্যাবস্থায় কর্ম্মের বিধান আছে। বিদ্যা-বস্থায় তাহা বিহিত নহে। কর্ত্তার কর্ম্মে প্রবৃত্তি পরমার্থ বস্তুর আবরক। সর্ব্বপ্রকার ভেদ-ব্যবহার অবিদ্যামূলক। যাঁহার এই জ্ঞান হইয়াছে, সর্ব্বকর্ম্ম সন্ন্যাসেই তাঁহার অধিকার, কর্ম্মে অধিকার নাই।

শঙ্করাচার্য্যের এই অর্থ সঙ্গত বোধ হয় না। এস্থলে ইন্দ্রিয়-জয় ও মনকে সমাহিত করিয়া "সংযমী" হইবার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে; সংযমীকে সংযত হইয়া, সর্ব্বরূপ কামনা ত্যাগ করিয়া, নিস্পৃহ নির্ম্মম হইয়া, বিষয়ে বিচরণ করিবার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে মাত্র। সর্ব্বকর্ম্ম সন্ন্যাসের

উপদেশ দেওয়া হয় নাই। এস্থলে সহজ অর্থ—আত্মজ্ঞান—ইন্দ্রিয়জয়ী সংযমীর নিকট দিবার ন্যায় প্রকাশিত। কাম-মানসে বিষয় যেরূপ প্রকাশিত হয়, সে বিষয় সংযমীর নিকট রাত্রির ন্যায় অপ্রকাশিত থাকে। আর সকাম ব্যক্তির কাছে,—যে ইন্দ্রিয় জয়ে অসমর্থ, তাহার কাছে,—বিষয় দিবার ন্যায় প্রকাশিত, কিন্তু আত্মজ্ঞান রাত্রির ন্যায় অপ্রকাশিত। রামানুজের অর্থ এস্থলে সঙ্গত। স্বামীও সেই অর্থ করেন। চণ্ডীতে আছে,—

"দিবান্ধাঃ প্রাণিনঃ কেচিদ্ রাত্রাবন্ধাস্তথাপরে।
কেচিদ্দিবা তথা রাত্রৌ প্রাণিনস্তুল্যদৃষ্টয়ঃ॥ ১।৪৩॥

সংযমী—যিনি যোগের অষ্টাঙ্গ সাধন করিয়া সমাধি লাভ করেন, তিনি সংযমী। কোন ব্যাপারের প্রতি ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই ত্রিবিধ মানস প্রক্রিয়া প্রয়োগ করাকে সম্প্রজ্ঞাত সমাধি বলে। পাতঞ্জল দর্শন অনুসারে যে এইরূপ সমাধিসিদ্ধ সে সংযমী। ধ্যান, ধারণা ও সমাধি এই তিনকে সমষ্টিভাবে সংযম বলা হয়। পাতঞ্জল দর্শনে আছে,—"ত্রয়মেকত্র সংযমঃ"। (৩।৪)। এই সংযম-সিদ্ধি হইতে প্রকাশ-স্বভাব, নিশ্চল, উৎকৃষ্ট প্রজ্ঞার আলোক আবির্ভূত হয়,—তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। যাহা হউক, সংযমের এ অর্থ এস্থলে গ্রহণ না করিলেও চলে। যাহার ইন্দ্রিয় নিগৃহীত, মন সমাহিত, যে সংযতচিত্ত, সেই সংযমী। এস্থলে যাহার প্রজ্ঞা উক্তরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে—সেই সংযমী। এস্থলে যোগাঙ্গ যে সংযম, তাহা উক্ত হয় নাই।

আপূর্য্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং
সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।

তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্ব্বে
স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী ॥ ৭০

সদা আপূরিত স্থিরভাবে স্থিত—
সাগরে সলিল প্রবেশের প্রায়,
কাম সমুদায় প্রবেশে যাহায়
সেই শান্তি লভে,—কামী তা না পায়। ৭০

(৭০) সদা আপূরিত—বহু বারি দ্বারা পরিপূর্য্যমাণ (শঙ্কর)। স্বয়ং আপূর্য্যমাণ (রামানুজ)। নানা নদ-নদী সর্ব্ব দিক হইতে প্রবেশ হেতু সদা পূর্ণভাবে স্থিত (স্বামী, মধু)। স্বরূপেই আপূর্য্যমাণ (বলদেব)। এস্থলে রামানুজ ও বলদেবের অর্থ সঙ্গত। সাগর আপনিই সদা পূর্ণ থাকে, তাহার জন্য নদীর জল প্রবেশের অপেক্ষা রাখে না।

স্থির ভাবে স্থিত—যে অচলভাবে প্রতিষ্ঠিত বা অবস্থিত (শঙ্কর)। অনতিক্রান্ত-মর্য্যাদাযুক্ত (স্বামী)। অথবা মৈনাকাদি পর্ব্বত যাহাতে স্থিত,—'অচল-প্রতিষ্ঠ' শব্দের এরূপ অর্থও হইতে পারে (মধু)।

সলিল—সর্ব্বদিক্ হইতে প্রসৃত নদ নদীর জল রাশি (শঙ্কর)।

প্রবেশ—জল প্রবেশ দ্বারা সমুদ্রের গাম্ভীর্য্য, নির্ব্বিকারত্ব যেরূপ নষ্ট হয় না, তাহা যেরূপ বিচলিত হয় না (মধু)। সে জল-প্রবেশ হইলেও সমুদ্র যেমন আত্মভাবেই থাকে, কোন বিকার প্রাপ্ত হয় না, (শঙ্কর)।

সেই শান্তি পায়—কাম অথবা সর্ব্ব প্রকার কামনার বিষয় সন্নিহিত হইলেও, কোনরূপ বিকার বা ভোগের ইচ্ছার উদ্রেক না করিয়া, কোনরূপ রাগ দ্বেষ উৎপাদন না করিয়া, চিত্তকে বিকৃত বিক্ষিপ্ত না করিয়া, যাহার অন্তঃকরণে বিলীন হইয়া যায়, সেই পুরুষই শান্তি

লাভ করে, বা স্থিতপ্রজ্ঞ হয়। কিন্তু যাহারা কামনা দ্বারা উপহতচিত্ত, বিষয় যাহাদিগকে কামনাযুক্ত করে, রাগ-দ্বেষযুক্ত করে—সেই কাম-কামিগণ সে শান্তি পায় না। কাম বা কামনার বিষয়ীভূত বস্তু যে কামনা করে সেই কামকামী। (শঙ্কর)।

শব্দাদি বিষয় ইন্দ্রিয়গোচর হইলে, যে আত্মাবলোকন-তৃপ্ত সংযমী ব্যক্তি, তাহাতে বিকারপ্রাপ্ত না হন, তিনিই শান্তি পান, আর যে ব্যক্তি বিকার প্রাপ্ত হয়, সে পায় না (রামানুজ)।

শান্তি=মোক্ষ (মধু, শঙ্কর)। কৈবল্য (রামানুজ)। শান্তি নিরতিশয় সুখভাব। সর্ব্বপ্রকার বিক্ষেপ-রাহিত্যহেতু স্থিরভাব।

কাম—প্রারব্ধাকৃষ্ট বিষয় (বলদেব)। কামনার বিষয় (শঙ্কর)। এই কামনার বিষয়ে যে আকৃষ্ট সেই কামকামী বা কামী।

বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি ॥ ৭১

যে পুরুষ করি ত্যাগ কামনা সকল,
নির্ম্মম নিস্পৃহ হয়ে, ত্যজি অহঙ্কার
করে বিচরণ, সেই শান্তি করে লাভ ॥ ৭১

(৭১) যে পুরুষ—যে সন্ন্যাসী, (শঙ্কর)। এস্থলে বিশেষভাবে 'সন্ন্যাসী'কথা উক্ত হয় নাই। এস্থলে অর্থ যে সংযমী পুরুষ—যে স্থিতপ্রজ্ঞ।

ত্যাগ —একেবারে সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ (শঙ্কর)। প্রাপ্ত কামনার বিষয় ত্যাগ (স্বামী। এস্থলে কামনা ত্যাগই উক্ত হইয়াছে, বিষয় ত্যাগ উক্ত হয় নাই।

নির্ম্মম—জীবন মাত্র রক্ষার জন্য, লব্ধ বস্তুর উপরও যাহার মমতা

বোধ নাই—সে নির্ম্মম (শঙ্কর)। অনাত্মদেহে যে আত্মাভিমানশূন্য, সে নির্ম্মম। (রামানুজ)। কোন বস্তুতে "আমার" এই বুদ্ধি যাহার নাই।

নিস্পৃহ—শরীর জীবন-মাত্রেও যাহার স্পৃহা নিবৃত্ত হইয়াছে (শঙ্কর)। সর্ব্ব বিষয়ে স্পৃহারহিত। (সর্ব্বকামনা শূন্য)।

ত্যজি অহঙ্কার—(নিরহঙ্কার) বিদ্যাবত্তাদি জন্য আত্মাভিমান যাহার ত্যাগ হইয়াছে, যে অহংভাব ত্যাগ করিয়াছে (শঙ্কর)। অনাত্মদেহে আত্মাভিমান-রহিত হইয়া, (রামানুজ, মধু)।

অহংজ্ঞান, অর্থাৎ পরমাত্মা হইতে এবং জীব ও জড় জগৎ হইতে সর্ব্ব 'ইদং' হইতে আপনার পৃথক্ অস্তিত্ব আছে—এইরূপ অহংভাব বা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বোধ। এই অহং বোধ ত্যাগ করিয়া যে পরমাত্মায় আপনাকে লীন করিতে পারিয়াছে—সেই নিরহঙ্কার অহংভাবশূন্য। যে আপনাকে স্বতন্ত্রভাবে জ্ঞাতা বা কর্ত্তা বোধ করে না—সে নিরহঙ্কার।

প্রকৃত আত্মজ্ঞানী সমাধিযুক্ত নির্ব্বিকল্প যোগি-ব্যতীত এরূপ অহংভাব দূর করিয়া শান্তিলাভ করিতে পারে না। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, বুদ্ধিতত্ত্ব অহংকারের কারণ। বুদ্ধিতত্ত্বে অবস্থান করিতে হইলে, তাহার কার্য্য এই অহঙ্কারকে ত্যাগ করিতে হয়। যাহার অহন্তা মমতা আছে, সে নির্ম্মল বুদ্ধি বা প্রজ্ঞালাভ করিতে পারে না। আত্মস্বরূপ না বুঝিলে এ তত্ত্ব বুঝা যাইবে না।

যাহা হউক, এস্থলে অহঙ্কারের এ অর্থ গ্রহণ না করিলেও চলে। সাংখ্যদর্শন অনুসারে অভিমানই অহঙ্কার। অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা আপনাকে কর্ত্তা বোধ করে। (গীতা, ৩।২৭)। অহঙ্কার দূর হইলে 'আমি কর্ত্তা', এ অভিমান থাকে না।

বিচরণ—প্রাণধারণে অনুরূপ ব্যাপার মাত্র সম্পাদন পূর্ব্বক পর্য্যটন করেন (শঙ্কর)। প্রারব্ধবশে ভোগ্য বিষয় ভোগ করে, (স্বামী, বলদেব,

মধু)। এস্থলে "ব্রজেত কিং" এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হইয়াছে। যাহা হউক বিচরণ শব্দের এ অর্থ সঙ্কীর্ণ। সর্ব্ব-ব্যবহার-বিরহিত হইয়া পর্য্যটন অর্থ সঙ্গত নহে। স্থিতপ্রজ্ঞ হইলে যে অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম নিষ্কামভাবে কর্ত্তব্য বোধে সম্পাদন করিতে হয় না, এমন কোন কথাই গীতায় উক্ত হয় নাই। কেবল শরীরযাত্রা নির্ব্বাহার্থ কর্ম্মই যে সন্ন্যাসীর অনুষ্ঠেয়, তাহা নহে। স্বয়ং শঙ্করাচার্য্য আর্য্যধর্ম্ম ও অদ্বৈতমত স্থাপন জন্য কঠোর কর্ম্মযোগ অবলম্বন করিয়াছিলেন।

এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি।
স্থিত্বাস্যামন্তকালেঽপি ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃচ্ছতি ॥ ৭২

ব্রহ্মে স্থিতি এই পার্থ! যাহা প্রাপ্ত হ'লে
নাহি থাকে মোহ আর। অন্তকালে ইথে
লভিলেও স্থিতি—হয় ব্রহ্মেতে নির্ব্বাণ ॥ ৭২

(৭২) ব্রহ্মে স্থিতি—মূলে আছে—'ব্রাহ্মী স্থিতি"। ব্রহ্মজ্ঞান-নিষ্ঠা (স্বামী)। ব্রহ্ম-প্রাপিকা কর্ম্মে স্থিতি (রামানুজ ও বলদেব)। ব্রহ্মরূপে অবস্থান (শঙ্কর)।

ব্রাহ্মী-স্থিতি অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপে স্থিতি—বা ব্রহ্ম-সম্বন্ধীয় স্থিতি। ব্রহ্ম কি? ইহার উত্তরে গীতায় উক্ত হইয়াছে যে ব্রহ্ম অক্ষর পরম (৮।৩)। তিনি অনির্দ্দেশ্য অব্যক্ত সর্ব্বত্রই অচিন্ত্য কূটস্থ অচল ধ্রুব (১২।৩) জ্ঞেয় ব্রহ্মতত্ত্ব ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ১২শ হইতে ১৭শ শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে। যাহা হউক, এস্থলে ব্রহ্ম অর্থে পরব্রহ্ম নহে। এস্থলে ব্রহ্ম—নির্গুণ, অক্ষর, অব্যক্ত অচল ধ্রুব সর্ব্বত্রগ সর্ব্বব্যাপী। যিনি সাধনাবলে এই অচল অটল অবিচলিত স্থির ভাব লাভ করেন, যিনি পরিচ্ছিন্ন 'ব্যক্তিত্ব' বোধের

পরিবর্ত্তে, সর্ব্বত্ববোধ লাভ করিয়া সর্ব্বভূতান্তর্ভূতাত্মা হইয়াছেন— তাঁহারই এই ব্রাহ্মী স্থিতি লাভ হয়। উক্ত লক্ষণ স্থিতপ্রজ্ঞ হইলে এই ব্রাহ্মীস্থিতি সম্ভব হয়। তাহার সর্ব্বত্র সমদর্শন হয়, সর্ব্বত্র ব্রহ্মদর্শন হয়। তিনি নির্ব্বিকার, নিরহঙ্কার নির্ম্মম হইয়া অবিচলিতভাবে অবস্থান ও বিচরণ করেন।

গীতায় পরে উক্ত হইয়াছে, "নির্দ্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্ ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ" (৫।১৯)। স্থিতপ্রজ্ঞ যে ব্রহ্মভূত হইয়া ব্রহ্মে নির্ব্বাণ লাভ করেন, ইহাও গীতায় উক্ত হইয়াছে (৫।২৪—২৬ শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

যাহা হউক, এই ব্রাহ্মীস্থিতি—গীতা অনুসারে পরম-পুরুষার্থ নহে। সগুণ নির্গুণ—পরব্রহ্মের এই উভয় ভাব লাভই পরম-পুরুষার্থ। গীতা অনুসারে প্রথমে আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া, সেই আত্মার যে কূটস্থ তুরীয় স্থির নিশ্চল ও প্রকৃতি হইতে বিযুক্ত অবস্থা; তাহার প্রাপ্তি সাধন করিতে হয়। প্রথম ছয় অধ্যায়ে সেই সাধন বিবৃত হইয়াছে। সেই সাধনার সিদ্ধিতে ব্রাহ্মীস্থিতি সিদ্ধি হয়। তাহার পরে সগুণ ব্রহ্মের বা পরমেশ্বর স্বরূপ জ্ঞান লাভ করিয়া সেই পরমেশ্বর স্বরূপ লাভ করিতে হয়। এইরূপে সগুণ ও নির্গুণ পূর্ণ পরব্রহ্মে নির্ব্বাণ লাভ করাই গীতা অনুসারে পরম পুরুষার্থ। এ তত্ত্ব পরে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

মোহ—সংসার-প্রত্যাবর্ত্তন-কারণ অজ্ঞান (রামানুজ)। ব্যক্তিত্ববোধ, পরিচ্ছিন্ন ভাব, বিভক্তের ন্যায় বোধ, 'ইদং' হইতে 'অহং'কে পৃথক্ ভাবাই অজ্ঞান মোহ। ইহাই সর্ব্বপ্রকার মোহের মূল।

অন্তকালে—চরম বয়সে (শঙ্কর, রামানুজ, মধু, বলদেব)। মৃত্যু-কালে (স্বামী)। শেষ অর্থ সঙ্গত।

শঙ্কর বলেন যে, যখন শেষ বয়সে এই নিশ্চল ব্রহ্মরূপে অবস্থান করিলে ব্রহ্মে নির্ব্বাণ মুক্তি হয়, তখন বাল্যকাল হইতেই অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম হইতেই সন্ন্যাস গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। এ সিদ্ধান্ত সঙ্গত নহে।

ব্রহ্মেতে নির্ব্বাণ— জীবাত্মার পরিচ্ছন্ন ভাব দূর করিয়া অপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মভাব প্রাপ্তি। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে আপনার বিশেষত্বের লয়।

পরে ৮।৫ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, অন্তকালে যে ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া প্রয়াণ করে, সে ঈশ্বরভাব প্রাপ্ত হয়। এস্থলে উক্ত হইয়াছে, অন্তকালেও ব্রহ্মভাবে স্থিত হইলে ব্রহ্ম-নির্ব্বাণ লাভ হয়। অন্তকালে ব্রহ্মভাবে বা ঈশ্বরভাবে স্থিত হওয়া সহজ নহে। আজন্ম বা অতি দীর্ঘকাল ধরিয়া সাধনা না করিলে তাহা সম্ভব হয় না। [উক্ত ৮।৫ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য]।

গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়—শেষ হইল। এই অধ্যায়ে কোন্ কোন্ তত্ত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে এবং ইহা হইতে কি শিক্ষা পাওয়া যায়, তাহা স্থলে আলোচনা করা আবশ্যক। তাহার পূর্ব্বে মধুসূদন এ সম্বন্ধে যাহা লিয়াছেন, তাহার উল্লেখ করিতে হইবে।

মধুসূদন বলেন—দ্বিতীয় অধ্যায়ই গীতার সার। এই অধ্যায়েই মস্ত শাস্ত্রার্থ ও ধর্ম্মতত্ত্ব একত্র সূচিত হইয়াছে। পরবর্ত্তী অধ্যায় গুলিতে াহাই আরও বিস্তারিত ভাবে বুঝান হইয়াছে। প্রথম—সাধনমার্গে নষ্কাম কর্ম্মনিষ্ঠা ফল অন্তঃকরণশুদ্ধি। দ্বিতীয়,—শমদমাদি সাধন ূর্ব্বক কর্ম্ম-সন্ন্যাস—ফল জীবাত্মা ও পরমাত্মার স্বরূপ বেদান্তাদি ইতে জানিয়া পরম বৈরাগ্য প্রাপ্তি। তৃতীয়—ভগবদ্ভক্তিনিষ্ঠা— ল মৃত্যুকে অতিক্রম পূর্ব্বক ঈশ্বর বা ঈশ্বরভাব-প্রাপ্তি। চতুর্থ— জ্ঞাননিষ্ঠা—ফল জীবন্মুক্তি ও শেষ বিদেহ-লয়। এই সাধন-মার্গের অনুকূল দৈবী সম্পদ্ ও তাহার অন্তরায়—আসুরী সম্পদ্।

এই দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রথমে "কর্ম্ম কর 'যোগযুক্ত হয়ে', বলিয়া যে নিষ্কাম কর্ম্মনিষ্ঠা সূচিত হইয়াছে, তাহাই তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। পরে 'সর্ব্ব কর্ম্ম ত্যাগ কর' বলিয়া যে কর্ম্মসন্ন্যাসনিষ্ঠা

ও ধ্যানযোগ সূচিত হইয়াছে, তাহা পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়ে বিস্তারিত হইয়াছে। তৎপরে 'মম পরায়ণ হও' যে বলা হইয়াছে, তাহাতে ভগবন্নিষ্ঠা সূচিত হইয়াছে,—এবং তাহা সপ্তম হইতে দ্বাদশ অধ্যায় পর্য্যন্ত বিস্তারিত হইয়াছে। এস্থলে দ্বাদশ হইতে ষোড়শ শ্লোক পর্য্যন্ত যে আত্মতত্ত্বজ্ঞান বা সাংখ্যজ্ঞান-নিষ্ঠা উক্ত হইয়াছে, তাহা ত্রয়োদশ অধ্যায়ে বিস্তারিত হইয়াছে। 'ত্রিগুণ-বিষয় বেদ—ত্রিগুণাতীত হও' যে বলা হইয়াছে, সেই ত্রিগুণতত্ত্ব চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে বিস্তারিত হইয়াছে। শ্রুতি ও শ্রোতব্য বিষয়ে নির্ব্বেদ হইবার ফলে যে বৈরাগ্য তত্ত্ব সূচিত হইয়াছে, তাহা পঞ্চদশ অধ্যায়ে বুঝান হইয়াছে। 'দুঃখে অনুদ্বিগ্ন চিত্ত' বলিয়া যে দৈবী সম্পদ্ সূচিত হইয়াছে ও 'পুষ্পিত বচন' বলিয়া যে সেই সম্পদের বিরোধী আসুরী সম্পদ সূচিত হইয়াছে—তাহা ষোড়শ অধ্যায়ে বিস্তারিত হইয়াছে। সেই আসুরী সম্পদ ত্যাগ করিয়া "দ্বন্দ্বহীন" ও নিত্য-সত্ত্বস্থ হইবার উপায় স্বরূপ শ্রদ্ধাদির কথা সপ্তদশ অধ্যায়ে বুঝান আছে। অষ্টাদশ অধ্যায়ে উক্ত সমস্ত বিষয় সঙ্ক্ষেপে একত্র পুনরুল্লেখ করিয়া বুঝাইয়া দিয়া গীতার উপসংহার করা হইয়াছে।

এই দ্বিতীয় অধ্যায়ে সাংখ্যবুদ্ধি আশ্রয় করিয়া জ্ঞান-নিষ্ঠার কথা বলিয়া ভগবান্ পরে যোগবুদ্ধি আশ্রয় করিয়া কর্ম্ম-নিষ্ঠার কথা বলিয়াছেন। অধিকারিভেদে এই দুই রূপ নিষ্ঠার কথা উক্ত হইয়াছে। একই সাধকের পক্ষে এই দুই নিষ্ঠা সমুচ্চয় করিয়া আশ্রয় করিবার কথা এস্থলে উক্ত হয় নাই। বরং কর্ম্ম-নিষ্ঠা অপেক্ষা জ্ঞান-নিষ্ঠা শ্রেষ্ঠ ইহারই আভা দেওয়া হইয়াছে। এবং এই জ্ঞান-নিষ্ঠাতেই স্থিতপ্রজ্ঞ হওয়া যায় ও তাহা পরিণামে ব্রাহ্মীস্থিতিরূপা মুক্তি হয়,—ইহা দ্বারা জ্ঞান নিষ্ঠার শ্রেষ্ঠ প্রতিপাদিত হইয়াছে।

এইরূপে মধুসূদন শঙ্করকে অনুসরণ করিয়া জ্ঞাননিষ্ঠা হইতে কর্ম্মনিষ্ঠা শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন করিয়াছেন। এবং জ্ঞাননিষ্ঠা ও কর্ম্মনিষ্ঠা সমুচ্চ

করিয়া বা বিকল্পে যে অবলম্বনীয় নহে, কর্ম্মনিষ্ঠা নিম্নাধিকারীর অবলম্বনীয়—ইহাই তিনি প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এই কথা কতদূর সঙ্গত, তাহা এস্থলে বিচার্য্য নহে। মধুসূদনের ব্যাখ্যা হইতে এইমাত্র বুঝিতে হইবে যে এই অধ্যায়ে কর্ম্মযোগ ও জ্ঞানযোগ প্রধানতঃ উপদিষ্ট হইলেও ইহাতে সংক্ষেপে যে সমুদয় তত্ত্ব পরবর্ত্তী কয় অধ্যায়ে বিবৃত আছে, তাহার ইঙ্গিত করা হইয়াছে। এজন্য এ অধ্যায়কে গীতার সার বলা যায়।

রামানুজ বলিয়াছেন,—নিত্য,আত্মজ্ঞান পূর্ব্বক অসঙ্গভাবে যে কর্ম্ম-যোগে স্থিতি, তাহাই স্থিতধী মুনির লক্ষণ এবং তাহাই ব্রাহ্মীস্থিতি;—ইহাই এই দ্বিতীয় অধ্যায়ের উপসংহারে প্রতিপাদিত হইয়াছে। এইরূপ আত্মযাথার্থ্য জ্ঞান পূর্ব্বক যুদ্ধরূপ কর্ম্মও সেই মোক্ষ প্রাপ্তি সাধন। অজ্ঞান হেতু শরীরাত্মজ্ঞান মোহিত অর্জ্জুনের মোহ দূর করিয়া স্বধর্ম্ম অনুষ্ঠান জন্য আত্মতত্ত্ব বিষয়া সাংখ্য বুদ্ধি এবং সেই বুদ্ধি পূর্ব্বক অসঙ্গভাবে কর্ম্মানুষ্ঠানরূপ কর্ম্মযোগবিষয়াবুদ্ধি ও যোগসাধনভূত স্থিতপ্রজ্ঞতা—এই দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে।

রামানুজের এই অর্থ যে সমধিক সঙ্গত, তাহা আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিব। বিশেষতঃ এস্থলে যে সাংখ্যজ্ঞানের কথা উক্ত হইয়াছে, তাহার লক্ষণ কি—তাহার ফল কি, তাহা বুঝিয়া দেখিব। ইহা ব্যতীত গীতার এই দ্বিতীয় অধ্যায়ে যে সকল তত্ত্ব প্রধানতঃ বিবৃত হইয়াছে, তাহাও বুঝিতে চেষ্টা করিব।

গীতার আরম্ভে আমরা দেখিতে পাই যে, অর্জ্জুন ধর্ম্মযুদ্ধ উপস্থিত হইলে, যুদ্ধ করিয়া স্বধর্ম্ম পালন করিবার সময়, দুঃখে শোকে ও মোহে অভিভূত হইয়া ধর্ম্মে সংশয়যুক্ত ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। অর্জ্জুনের এই দুঃখ, শোক ও মোহ দূর করিয়া তাঁহাকে কর্ত্তব্য কর্ম্মে নিয়োজিত করিবার জন্য শ্রীভগবান্ গীতার উপদেশ আরম্ভ

করিয়াছিলেন। যে কেহ এইরূপে দুঃখ, শোক ও মোহবশে স্বধর্ম্মে সংশয়-যুক্ত ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়, তাহার পক্ষে এই গীতার উপদেশ প্রশস্ত।

সাংখ্যজ্ঞান—এই দুঃখ শোক মোহ দূর করিবার জন্য প্রথমে সাংখ্য-জ্ঞান সংক্ষেপে উপদিষ্ট হইয়াছে। কারণ সাংখ্যজ্ঞান লাভ হইলে দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি হয়। দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তির উপায় আবিষ্কার করাই সাংখ্যশাস্ত্রের উদ্দেশ্য ও প্রয়োজন। সাংখ্যদর্শনের মূল গ্রন্থ সাংখ্যতত্ত্ব-সমাসের ব্যাখ্যার প্রথমেই আছে,—"এই সংসারে কোন ব্রাহ্মণ ত্রিবিধ দুঃখের দ্বারা অভিভূত হইয়া সাংখ্যাচার্য্য মহর্ষি কপিলের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। * * * তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—'এ সংসারে শ্রেয়ঃ কি, সত্য কি, এবং কি উপায়ে কৃতকৃত্য হইব?' মহর্ষি কপিল সাংখ্য-জ্ঞান সংক্ষেপে বুঝাইয়া বলিলেন,—'এই কয়টিই যথাতথ্য; ইহাই সম্যক্ রূপে জানিলে কৃতকৃতার্থ হওয়া যায়, আর পুনর্ব্বার ত্রিবিধ দুঃখে অভিভূত হইতে হয় না।' সিদ্ধগণ মধ্যে শ্রেষ্ঠ কপিল মুনির প্রবর্ত্তিত ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তির প্রকৃষ্ট উপায় যে সাংখ্যজ্ঞান, শ্রীভগবান্ প্রথমেই অর্জ্জুনের দুঃখ শোক মোহ দূর করিবার জন্য তাহার উপদেশ দিয়াছেন।

সাংখ্যজ্ঞান সম্যক্‌রূপে লাভ হইলে কিরূপে দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি হয়? তাহা বুঝিতে হইলে সাংখ্যদর্শনের মূল তত্ত্বগুলি জানিতে হইবে। সাংখ্যজ্ঞানের অর্থ পুরুষ-প্রকৃতি-বিবেক জ্ঞান;—পুরুষ যে প্রকৃতি হইতে, সুতরাং প্রকৃতিজ দেহ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন—(দেহব্যতিরিক্তঃ অসৌ পুমান্)—এই তত্ত্বের সম্যক্ জ্ঞান। এই তত্ত্বের অভ্যাস দ্বারা সাংখ্যজ্ঞান লাভ হইলে দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি হয়। সাংখ্যকারিকায় আছে—

"এবং তত্ত্বাভ্যাসাৎ নাহস্মি ন মে নাহমিত্যপরিশেষম্।
অবিপর্য্যায়াদ্‌বিশুদ্ধং কেবলম্ উৎপদ্যতে জ্ঞানম্॥" ৬৪

অর্থাৎ এই তত্ত্ব বারংবার অভ্যাস করিতে করিতে 'আমি হই না, আমার না, আমি না,' অর্থাৎ আত্মার ব্যাপার নাই, আমি কর্ত্তা নহি

আমি কোন বিষয়ের ফলভোগী নহি এইরূপ অভিমানের অভাব হইয়া অপরিশেষ ও অবিপর্য্যয় হেতু বিশুদ্ধ ও 'কেবল' জ্ঞান জন্মে।

গীতায়ও এইস্থলে প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেক জ্ঞান উক্ত হইয়াছে। পুরুষ বা দেহীর স্বরূপ কি, তাহা গীতায় এস্থলে ইঙ্গিত করা হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃতি বা প্রকৃতিজ দেহের তত্ত্ব বিবৃত হয় নাই। পুরুষ প্রকৃতি-তত্ত্ব পরে ত্রয়োদশ অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। প্রকৃতি ও তাহার বিকারে যে ত্রয়োবিংশতি তত্ত্বের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহাদের বিষয় এস্থলে উক্ত হয় নাই। পুরুষ প্রকৃতি এবং প্রকৃতির বিকার ত্রয়োবিংশতি—সর্ব্বসমেত সাংখ্যের তত্ত্ব পঞ্চবিংশতি।

ঋষি কপিল বলিয়াছেন,—এই কয়টি তত্ত্ব যথাযথ জানিলে, কৃতকৃত্য হওয়া যায়।

> "মূলপ্রকৃতিরবিকৃতি-মহদাদ্যাঃ প্রকৃতিবিকৃতয়ঃ সপ্ত।
> ষোড়শকস্তু বিকারো ন প্রকৃতি র্ন বিকৃতিঃ পুরুষঃ।
>
> ইতি কারিকা, ৩।

প্রকৃতিজ সপ্ত প্রকৃতি-বিকৃতি—বুদ্ধি, অহঙ্কার এবং পঞ্চতন্মাত্র। আর প্রকৃতির ষোড়শ বিকার—মন, পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পাঁচ কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং পাঁচ ভূত। এই প্রকৃতি এবং তাহার ত্রয়োবিংশতি বিকৃতি এই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বে আমাদের শরীর। গীতায় পরে এই শরীরকে ক্ষেত্র বলা হইয়াছে—

> "ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে।" (১৩১)

স্থূল পঞ্চভূত হইতে আমাদের স্থূল-শরীর। বুদ্ধি, অহঙ্কার, মন, দশ-ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চতন্মাত্র হইতে আমাদের সূক্ষ্ম বা লিঙ্গ-শরীর। মূল প্রকৃতি হইতে আমাদের কারণ-শরীর। বুদ্ধি অহঙ্কার মন ও পঞ্চতন্মাত্র—এই অষ্টধা অপরা প্রকৃতিই (৭।৪) আমাদের লিঙ্গ শরীরের মূল উপাদান।

এই প্রকৃতি সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণযুক্ত। প্রকৃতিজ প্রত্যেক পদার্থ এই ত্রিবিধ ভাব যুক্ত। প্রকৃতি—

"ত্রিগুণমবিবেকি বিষয়ঃ সামান্যমচেতনং প্রসবধর্ম্মি।
ব্যক্তং তথা প্রধানং তদ্বিপরীতস্তথা চ পুমান্॥

ইতি কারিকা, ১১।"

এই প্রকৃতি অব্যক্ত, তাহার ব্যক্তরূপ—উক্ত প্রকৃতি-বিকৃতি। তাহাদের মূল কারণ প্রকৃতিকে নির্দ্দেশ করে বলিয়া, তাহারা লিঙ্গ। প্রকৃতি সে লিঙ্গ হইতে ভিন্ন। এই লিঙ্গ ও অহঙ্কারোৎপন্ন একাদশ ইন্দ্রিয় লইয়া সূক্ষ্ম শরীর, তাহারা প্রকৃতির বিকৃতি; তাহারাও লিঙ্গের অন্তর্গত।

"হেতুমৎ অনিত্যম্ অব্যাপি, সক্রিয়ম্ অনেকম্ আশ্রিতং লিঙ্গম্।
সাবয়বং পরতন্ত্রং ব্যক্তং, বিপরীতম্ অব্যক্তম্॥"—কারিকা, ১০।

ইহা হইতে আমরা জানিতে পারি যে, পুরুষ হইতে প্রকৃতি ভিন্ন। দেহী হইতে দেহ অন্য। প্রকৃতির বিকার হইতে যে বুদ্ধি অহঙ্কারাদি সপ্তদশ তত্ত্বে গঠিত লিঙ্গ বা সূক্ষ্মদেহ, এবং পঞ্চভূত-গঠিত স্থূলদেহ, তাহা হেতুমৎ অর্থাৎ মূল প্রকৃতি বা প্রধান হইতে উৎপন্ন; তাহা অনিত্য, অব্যাপক, পরিস্পন্দন-ক্রিয়াযুক্ত, অনেক; তাহা স্বকারণে অবস্থিত, প্রধানের অনুমাপক অবয়বযুক্ত বা অপ্রাপ্ত প্রাপ্তিরূপ সংযোগবিশিষ্ট এবং পরতন্ত্র বা প্রধানের অধীন। অব্যক্ত বা মূলপ্রকৃতি ইহার বিপরীত। আর পুরুষ প্রকৃতি হইতেও সম্পূর্ণ ভিন্ন। এজন্য উক্ত দেহাদির ধর্ম্ম পুরুষের নাই। এই সব দেহমধ্যে লিঙ্গ-দেহ মৃত্যুর পরেও থাকে। মৃত্যুতে কেবল স্থূল পাঞ্চভৌতিক শরীরের নাশ হয়। মৃত্যুর পর দেহী সূক্ষ্ম-শরীর লইয়া আতিবাহিক বা অধিষ্ঠান-দেহ-সাহায্যে প্রয়াণ করে। এই আতিবাহিক বা অধিষ্ঠান-দেহও (astra body) পঞ্চভূতের সূক্ষ্মাংশে গঠিত। তাহাও পাঞ্চ-ভৌতিক। ইহা সাংখ্যদর্শনের সিদ্ধান্ত। বেদান্তেরও এক অর্থে ইহাই সিদ্ধান্ত।

যাহা হউক, এই পুরুষ-প্রকৃতি-বিবেক দ্বারা কেন দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি হয়, তাহা এক্ষণে বুঝিতে চেষ্টা করিব। কারিকায় আছে—

"তস্মাচ্চ বিপর্য্যাসাৎ সিদ্ধং সাক্ষিত্বম্ অস্য পুরুষস্য।
কৈবল্যং মাধ্যস্থ্যং দ্রষ্টৃত্বম্ অকর্ত্তৃভাবশ্চ॥" ১৯

অর্থাৎ প্রকৃতি ও প্রকৃতিজ সমুদায় হইতে বিপরীত ধর্ম্মযুক্ত পুরুষ—সাক্ষী, দুঃখাদিরহিত কৈবল্য বা মুক্তস্বভাব, উদাসীন, দ্রষ্টা ও অকর্ত্তা। তবে পুরুষের কর্ত্তৃত্বাভিমান, সুখদুঃখবোধ হয় কেন? তাহার একমাত্র কারণ অজ্ঞানবশতঃ পুরুষ প্রকৃতিবদ্ধ হয়। পুরুষের সম্বন্ধ হেতু অচেতন বুদ্ধি অহঙ্কার প্রভৃতির চেতনবৎ ব্যবহার হয়, আর পুরুষও প্রকৃতিজ দেহের ধর্ম্ম, ভ্রান্ত দেহাত্মজ্ঞানে আপনাতে আরোপ করিয়া কর্ত্তৃত্ব, ভোক্তৃত্বের অভিমানযুক্ত হয়। কারিকায় আছে,—

"তস্মাৎ তৎসংযোগাৎ অচেতনং চেতনাবৎ ইব লিঙ্গম্।
গুণকর্ত্তৃত্বে চ তথা কর্ত্তেব ভবত্যুদাসীনঃ॥" ২০

এই প্রকৃতি পুরুষ পরস্পরের সংযোগ হেতু, পুরুষের অধিষ্ঠানে প্রকৃতি চেতনবৎ হয়। ('তৎসন্নিধানাৎ অধিষ্ঠাতৃত্বং মণিবৎ'—ইতি সাংখ্যদর্শন) আর পুরুষও প্রকৃতির কার্য্যে আপনাকে কর্ত্তা মনে করে, এবং প্রকৃতি-গুণজ সুখ দুঃখ আপনাতে আরোপ করে। সুখ দুঃখ—বুদ্ধি অহঙ্কার মন যুক্ত লিঙ্গশরীরের ধর্ম্ম। অজ্ঞান-বদ্ধ অবস্থায়, লিঙ্গ শরীরের সহিত পুরুষের ভেদজ্ঞান আদৌ থাকে না। অবিদ্যা হেতু আমার বুদ্ধি, অহঙ্কার মন বা ইন্দ্রিয় হইতে আমি পুরুষ বা আত্মা যে পৃথক্,—সে জ্ঞান আদৌ হয় না। এজন্য সংসার দশায়, এই কর্ত্তৃত্ব বোধ ও দুঃখভোগ স্বভাবসিদ্ধ এবং অপরিহার্য্য। কারিকায় আছে—

তত্র জরামরণকৃতং দুঃখং প্রাপ্নোতি চেতনঃ পুরুষঃ।
লিঙ্গস্যাবিনিবৃত্তে স্তস্মাদ্দুঃখং স্বভাবেন॥ ৫৫

এই লিঙ্গ-শরীর অর্থাৎ সূক্ষ্ম-শরীরের সহিত স্থূল-শরীরের সম্বন্ধ যতক্ষণ

থাকে, ততক্ষণ সুখ দুঃখ ভোগ হয়। মোক্ষ পর্য্যন্তও সে সম্বন্ধ যায় না। এই সূক্ষ্ম-শরীরেই ধর্ম্মাধর্ম্মাদি সমুদায় সম্পৃক্ত হয়, এবং মৃত্যুর পরেও এই সূক্ষ্ম-শরীরের সহিত সম্বন্ধ থাকায়, এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের সংস্কার এই সূক্ষ্ম-শরীরের অন্তর্ভূত থাকায়, সেই সংস্কার ফলোন্মুখ হইলে, পুরুষের আবার স্থূল-শরীর গ্রহণ হয়।

সংসরতি নিরুপভোগং ভাবৈরধিবাসিতং লিঙ্গম্।

—কারিকা, ৪০।

সুখদুঃখবোধের কারণ।—এই স্থূল-শরীর সম্পর্কে সূক্ষ্ম শরীরে যে সুখদুঃখাদি বোধ হয়, তাহার তত্ত্ব সংক্ষেপে বুঝিতে চেষ্টা করিব। প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকা; সুতরাং প্রকৃতিজ সমুদায় পদার্থই ত্রিগুণাত্মক। প্রকৃতিজ সূক্ষ্ম-শরীরও—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণাত্মক। এই ত্রিগুণতত্ত্ব পরে গীতায় ১৪, ১৭ ও ১৮ অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। এস্থলে তাহা সংক্ষেপে বুঝিতে হইবে। এই ত্রিগুণের মধ্যে সত্ত্ব সুখাত্মক, রজঃ দুঃখাত্মক ও তমঃ মোহাত্মক। সত্ত্বের কার্য্য প্রকাশ, রজোগুণের কার্য্য ক্রিয়া, এবং তমোগুণের কার্য্য আবরণ। তমঃ প্রকাশ ও ক্রিয়া—উভয়কেই অভিভূত করে। আমাদের মধ্যে সত্ত্বের প্রকাশ ভাবের বিশেষ অভিব্যক্তি বুদ্ধি-তত্ত্বে, রজোগুণের প্রধান অভিব্যক্তি মনের কাম ইচ্ছা ও কর্ম্মপ্রবৃত্তিতে, তমোগুণের অভিব্যক্তি আবরণাত্মক মোহ ও জড়তা ভাবে। এই ত্রিগুণতত্ত্ব বুঝা অতি কঠিন। এস্থলে তাহা বুঝিবারও প্রয়োজন নাই। এ সংসারে সকল বস্তুই ত্রিগুণাত্মক। সকলই ত্রৈগুণ্য ভাব যুক্ত। কেবল পুরুষ ত্রিগুণাতীত। ইহা গীতাতে পরে (১৪।২২-২৬ শ্লোকে) উক্ত হইয়াছে।

এই ত্রিগুণের ধর্ম্ম এই যে, কোন একটি গুণ অপর গুণ দুইটি ব্যতীত থাকিতে পারে না। অথচ ইহারা পরস্পর পরস্পরকে অভিভব করিতে চেষ্টা করে। ইহারা পরস্পর আশ্রিত এবং স্বকীয় কার্য্য জননে অপরের

সাহায্য-প্রার্থী এবং পরস্পর মিথুন বা নিত্য সহচর হইয়া ও প্রত্যেকে অপর দুইটিকে অভিভূত করিয়া নিজে প্রকটিত হইতে চেষ্টা করে। কারিকায় আছে—

প্রীত্যপ্রীতিবিষাদাত্মকাঃ প্রকাশপ্রবৃত্তিনিয়মার্থাঃ।
অন্যোন্যাভিভবাশ্রয়জননমিথুনবৃত্তয়শ্চ গুণাঃ॥ ১২

গীতায় পরে উক্ত হইয়াছে (১৪।৫—১০)—

সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ।
নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম্॥
তত্র সত্ত্বং নির্ম্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম্।
সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ॥
রজোরাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবম্।
তন্নিবধ্নাতি কৌন্তেয় কর্ম্মসঙ্গেন দেহিনম্॥
তমস্ত্বজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সর্ব্বদেহিনাম্।
প্রমাদালস্যনিদ্রাভিস্তন্নিবধ্নাতি ভারত॥
সত্ত্বং সুখে সঞ্জয়তি রজঃ কর্ম্মণি ভারত।
জ্ঞানমাবৃত্য তু তমঃ প্রমাদে সঞ্জয়ত্যুত॥
রজস্তমশ্চাভিভূয় সত্ত্বং ভবতি ভারত।
রজঃ সত্ত্বং তমশ্চৈব তমঃ সত্ত্বং রজস্তথা॥

অতএব এই ত্রিগুণের ধর্ম্ম এই যে পরস্পর মিলিত থাকিয়াও একটি অপরগুলিকে অভিভূত করিতে চেষ্টা করে। যখন রজঃ ও তমঃকে অভিভূত করিয়া সত্ত্ব প্রবর্ত্তিত হয়, তখন জ্ঞানের বিশেষ প্রকাশ হয়।—

সর্ব্বদ্বারেষু দেহেঽস্মিন্ প্রকাশ উপজায়তে।
জ্ঞানং যদা তদা বিদ্যাদ্ বিবৃদ্ধং সত্ত্বমিত্যুত॥

সেইরূপ যখন সত্ত্ব ও তমোগুণকে অভিভূত করিয়া রজোগুণের বৃদ্ধি হয়, তখন কর্ম্মে প্রবৃত্তি হয়।—

লোভঃ প্রবৃত্তিরারম্ভঃ কর্ম্মণামশমঃ স্পৃহা।
রজস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে ভরতর্ষভ॥

আর রজঃ ও সত্বকে অভিভূত করিয়া তমঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে,—অপ্রকাশ অপ্রবৃত্তি প্রমাদ ও মোহ উপস্থিত হয়। জ্ঞান ও কর্ম্মবৃত্তি নিশ্চেষ্ট হয়।—

অপ্রকাশোঽপ্রবৃত্তিশ্চ প্রমাদো মোহ এব চ।
তমস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে কুরুনন্দন॥

(গীতা, ১৪।১১—১৩)।

যাঁহাদের সাধারণতঃ রজঃ ও তমঃ অভিভূত ও সত্ব প্রকাশিত, তাঁহাদিগকে সাত্বিক প্রকৃতিযুক্ত লোক বলে। তাঁহারা জ্ঞানপ্রধান, তাঁহাদের রাজসিক কর্ম্মবৃত্তি বশীভূত, এবং তামসিক মোহ ও আলস্যাদি সংযত। যাঁহাদের রজোগুণ সবিশেষ অভিব্যক্ত, তাঁহারা প্রবৃত্তিবশে কর্ম্মে নিরত। সাত্বিক লোকের বুদ্ধি,—জ্ঞান, ধর্ম্ম, ঐশ্বর্য্য ও বৈরাগ্য ভাবের অনুকূল। সত্ব-প্রধান লোক ইহকালে সুখী হয় ও পরকালে স্বর্গলাভ করে।

যাহা হউক, এ সকল কথা আর এস্থলে বিশেষ বুঝিবার প্রয়োজন নাই। আমাদের লিঙ্গ-দেহ বা সূক্ষ্মশরীর এই ত্রিগুণের আশ্রয়, এবং ধর্ম্মাধর্ম্ম অনুসারে, তাহাতে কোন না কোন গুণের প্রাধান্য থাকে। কাহারও সূক্ষ্মদেহ সাত্বিক বা সত্বগুণপ্রধান, কাহারও বা রাজসিক এবং কাহারও বা তামসিক। এই সূক্ষ্মশরীর যে অষ্টাদশ তত্বযুক্ত, তাহার মধ্যে বুদ্ধি, অহঙ্কার ও মন ইহারা অন্তঃকরণ বা চিত্ত। আর দশ ইন্দ্রিয় বাহ্য করণ। এই চিত্তই প্রধানতঃ সাত্বিক বা সত্বপ্রধান, রাজসিক বা রজঃপ্রধান অথবা তামসিক বা তমঃপ্রধান হয়। তদনুসারে মানুষ সাত্বিক, রাজসিক বা তামসিক প্রকৃতিযুক্ত হয়। চিত্ত সত্বপ্রধান হইলে, তাহা সুখাত্মক ও জ্ঞান-প্রধান হয়। চিত্ত রজঃপ্রধান হইলে, তাহা দুঃখাত্মক এবং কর্ম্মপ্রধান হয়। আর চিত্ত তমঃপ্রধান হইলে তাহা মোহাত্মক হয়, তাহাতে জ্ঞান বা কর্ম্ম-বৃত্তির বড় বিকাশ হয় না। যাহার চিত্ত সাত্বিক, সে দৈবপ্রকৃতি-সম্পন্ন।

সে সাধনমার্গে অগ্রসর হইবার অধিকারী। গীতায় একথা পরে উল্লিখিত হইয়াছে।

এই সত্ত্বপ্রধান চিত্তের বৃত্তি স্বভাবতঃই সুখজনক, অক্লিষ্ট। তাহা দুঃখযুক্ত নহে। জ্ঞান প্রকাশ হেতু যে সুখ, তাহা অনাবিল। কিন্তু সে চিত্তে যখন রজোগুণের প্রাধান্য হয়, অথবা যাহারা প্রধানতঃ রজোগুণ-প্রধান, তাহাদের চিত্তবৃত্তি যখন বাসনাবশে বিক্ষিপ্ত হয়, তখন চিত্ত সুখ ও দুঃখ এই দ্বন্দ্বযুক্ত হয়, এবং সে চিত্ত প্রধানতঃ দুঃখযুক্ত থাকে। সেরূপ রাজসিক চিত্তবৃত্তি ক্লিষ্ট। এইরূপে আমাদের চিত্তবৃত্তিতে বৃত্তি ক্রিয়াকালে কিরূপে সুখ দুঃখ উৎপন্ন হয়, তাহা গীতায় উক্ত হইয়াছে। যথা—

মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ।
আগমাপায়িনোঽনিত্যাস্তাংতিতিক্ষস্ব ভারত। (২।১৪)।

মাত্রাস্পর্শজ সুখ দুঃখ।—গীতোক্ত এই মাত্রাস্পর্শজ সুখ দুঃখ কিরূপ, এই তত্ত্ব এস্থলে বুঝিতে হইবে। আমাদের পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ই বাহ্য বিষয় আহরণ করে। বাহ্য বিষয় প্রত্যক্ষ হইলে—চক্ষুঃ তাহার রূপ গ্রহণ করে, কর্ণ শব্দ গ্রহণ করে, রসনা রস গ্রহণ করে, নাসিকা গন্ধ গ্রহণ করে এবং ত্বক্ স্পর্শানুভব করে। ইন্দ্রিয়ের এই অনুভূতি নির্ব্বিশেষ (sensation মাত্র)। ইন্দ্রিয় সেই অনুভূত বিষয় আনিয়া মনকে অর্পণ করে। মন তাহা গ্রহণ করিয়া সেই অনুভূত বিষয় কি, তাহার অনুসন্ধান ও আলোচনা করে। তখন বুদ্ধি সেই অনুভূত বাহ্য বিষয় কি, তাহা পূর্ব্বানুভূত বিষয় সকল স্মরণ করিয়া, তাহাদের সহিত সাধর্ম্ম্য বৈধর্ম্ম্য বিচার পূর্ব্বক সে সম্বন্ধে নিশ্চয় জ্ঞান (perception) লাভ করে। এই রূপে আমাদের বিষয়জ্ঞান হয়। এইরূপে কোন বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞানের উৎপত্তি কালে চিত্ত সাত্ত্বিক হইলে, সেই বৃত্তি-জ্ঞানফলে বুদ্ধির প্রকাশ-ভাব ও সুখভাব হয়। চিত্ত রাজসিক হইলে, বুদ্ধিতে দুঃখভাব বা দুঃখ মিশ্রিত সুখভাবের উদয় হয়। সুতরাং বিষয়জ্ঞান হইবামাত্র, সেই বিষয়

সুখজনক কি দুঃখজনক, তাহার অনুভব হয়। এই জন্য বৃত্তিজ্ঞান ক্লিষ্ট বা অক্লিষ্ট। এই অনুভব হইতে আমাদের পূর্ব্ব সংস্কার অনুসারে যে বিষয়টি সুখজনক, তাহার সম্বন্ধে রাগ বা আকর্ষণ জন্মে ও তাহা গ্রহণ করিবার ইচ্ছা—বাসনা বা সংকল্প মনে উদিত হয়। আর যে বিষয়টি দুঃখজনক তাহার প্রতি দ্বেষ বা প্রত্যাখ্যান করিবার প্রবৃত্তি হয় ও তাহা ত্যাগ করিবার ইচ্ছা—বাসনা বা সংকল্প হয়। কাম বা বাসনাই বীজ। তাহা হইতেই—বিষয় জ্ঞান হইবা মাত্র, সে বিষয় ত্যাগ বা গ্রহণ করিবার ইচ্ছা হয়। ইচ্ছা প্রবল হইলে সুখজ বিষয় গ্রহণ করিতে, এবং দুঃখজ বিষয় ত্যাগ করিতে সংকল্প বা প্রবৃত্তি তীব্র হয়। এই সংকল্প বা প্রবত্তিই কর্ম্মের মূল—তাহার প্রারম্ভ। এই সংকল্প মনের ধর্ম্ম। এই সংকল্প দ্বারা পরিচালিত, হইয়া, আমাদের কর্ম্মেন্দ্রিয় প্রবর্ত্তিত হয়। তখন আমরা ত্যাগ-গ্রহণাত্মক কর্ম্মে রত হই। ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম। বুদ্ধিতে বিষয় গ্রহণ হইলে তাহার সম্বন্ধে সুখ বা দুঃখের অনুভব হয়। এবং সেই সুখ বা দুঃখের অনুভব হইতে, যে সুখজ বিষয় গ্রহণে প্রবৃত্তি ও দুঃখজ বিষয় ত্যাগের ইচ্ছা হয়, তাহা হইতে কর্ম্ম প্রবৃত্তির বিকাশ হয়, কর্ম্মেন্দ্রিয় কর্ম্মে পরিচালিত হয়। আমাদের চিত্তবৃত্তি চঞ্চল, বিশেষতঃ রজোগুণ প্রভাবে প্রায়ই বিক্ষিপ্ত। সেই বিক্ষেপ হেতু, এক বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞান উৎপন্ন হইতে না হইতে, চিত্ত বিষয়ান্তরে ধাবিত হয়। এজন্য এক বিষয় গ্রহণকালে যে সুখ বা দুঃখের অনুভূতি এবং সেই সঙ্গে যে কর্ম্মে প্রবৃত্তি উৎপন্ন হয়, তাহা পরে অন্য বিষয় গ্রহণকালে সেই বিষয় গ্রহণ জনিত সুখ দুঃখানুভূতির দ্বারা পূর্ব্বানুভূত সুখ-দুঃখ অভিভূত হয়, এবং পরবর্ত্তী বিষয় ত্যাগ বা গ্রহণ জন্য যে সংকল্প হয়, তাহা পূর্ব্বানুভূত বিষয় ত্যাগ বা গ্রহণ জন্য সংকল্পকে অভিভূত করে। যদি সাত্ত্বিক প্রকৃতি হেতু বা কোন কারণে কোন এক বিষয়ে কেহ অধিক ক্ষণ একাগ্র থাকিতে পারে, তবে সেই বিষয় সম্বন্ধে তাহার সুখ বা দুঃখানুভূতি

এবং তদনুসারে সেই বিষয় গ্রহণ বা ত্যাগের সংকল্প কতকটা স্থায়ী হইতে পারে। কোন বিশেষ সুখ বা দুঃখের অনুভূতি প্রবল হইলেও তাহার স্থায়ী ভাব হয়। অতএব ইন্দ্রিয় দ্বারা বাহ্য বিষয়-সম্বন্ধজ, অর্থাৎ মাত্রা-স্পর্শজ সুখ দুঃখ আগমাপায়ী ও অনিত্য। এই জন্য, যতক্ষণ প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেক-জ্ঞান সিদ্ধ না হয়, ততক্ষণ এইরূপ দুঃখ ক্ষণস্থায়ী বলিয়া তাহা সহ্য করিবার উপদেশ ভগবান্ দিয়াছেন।

সাত্ত্বিক বুদ্ধিতে সুখদুঃখ বোধ।—রজঃপ্রধান চিত্তে সুখ দুঃখের উৎপত্তি ও স্থিতির ব্যাপার এইরূপ। কিন্তু বুদ্ধি প্রধানতঃ সাত্ত্বিক। বুদ্ধি-বশে চিত্ত সাত্ত্বিক হইলে, তাহাতে সুখ-দুঃখানুভূতি কিরূপ হয়, তাহা বুঝিতে হইবে। বুদ্ধি যখন মন ও ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয় গ্রহণ করে, তখন তাহা সাত্ত্বিক ভাব যুক্ত হইলে, সেই বিষয়ের নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান চিত্তে প্রকাশিত হয় এবং সেই জ্ঞান লাভ করিয়াই চিত্ত প্রসন্ন ও সুখযুক্ত হয়। তখন সেই বিষয় সুখদ কি দুঃখদ, তাহা আর চিত্তে বড় উদয় হয় না। তখন সেই বিষয় ত্যাগ করিতে হইবে কি গ্রহণ করিতে হইবে, তখন সে কথাও মনে হয় না। জ্ঞান তখন রাজসিক সুখদুঃখানুভূতি বৃত্তিকে ও কর্ম্মবৃত্তিকে অভিভূত করে। জ্ঞানের যতই বিকাশ হইতে থাকে, যতই সত্ত্বের বৃদ্ধি হয়, ততই এই রজ-আত্মক সুখ দুঃখানুভূতি বৃত্তি এবং এই প্রবৃত্তিজ ক্লিষ্টবৃত্তি ক্ষীণ হয়। জ্ঞান বিকাশের সহিত রাজসিক প্রবৃত্তির দমন হয়, অজ্ঞান ও মোহাত্মক তমঃ দূর হয়। সে জ্ঞান স্বতঃই সুখস্বরূপ ও প্রকাশ-স্বরূপ।

চিত্তে জ্ঞানের বিকাশ কালে, আমি জানিতেছি এবং ইহা আমি জানি-তেছি,—এইরূপ অভিমান হয়। তখন জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয়—যুগপৎ চিত্ত-বৃত্তিতে প্রতিভাত হয়। কিন্তু যখন নির্ম্মলচিত্তে কোন বিষয়ের জ্ঞান হয়, তখন জ্ঞাতার নিজের কথা মনে থাকে না। জ্ঞাতা সেই বিষয় হইতে যে সুখ বা দুঃখ অনুভব করিতেছে, তাহা মনে থাকে না। সে বিষয়ের তত্ত্ব গ্রহণ কালে বা

তাহার সৌন্দর্য্য, মহত্ত্ব, বিরাটত্ব প্রভৃতি অনুভব কালে, তাহার সংস্পর্শের ফলে যে আশু কোন বিপদ হইতে পারে, এমন কি, তাহাও তখন মনে থাকে না। সেইরূপ বৃত্তিজ্ঞান বিকাশকালে, জ্ঞাতা আমার কিরূপ সুখ বা দুঃখ অনুভব হইতেছে—এই জ্ঞান. এবং সেই অনুভূত সুখ বা দুঃখ জনক বিষয় কিরূপে গ্রহণ বা ত্যাগ করিতে হইবে, এ সম্বন্ধে সংকল্পও উদয় হয় না। সেরূপ অনুভব ও সংকল্প হইলে, সেই জ্ঞেয় সম্বন্ধে জ্ঞান এবং সেই জ্ঞান হইতে যে আনন্দ লাভ হয়, তাহা অভিভূত হইয়া পড়ে। সে 'জ্ঞেয়'র তত্ত্ব ও সে তত্ত্বজ্ঞানজ আনন্দ কিছুই আর জ্ঞানে প্রকাশ পায় না। তখন জ্ঞানের প্রকাশ-স্বভাব অভিভূত হয়। কিন্তু সাধারণতঃ জ্ঞানস্বভাব ও আনন্দস্বভাব সাত্ত্বিক বুদ্ধিতে, এই রাগ-দ্বেষাত্মক সুখ-দুঃখানুভূতি বৃত্তি, ও সেই রাগ-দ্বেষ পরিচালিত কর্ম্মবৃত্তি ক্ষীণ হইয়া যায়। তাহার সেই নির্ম্মল জ্ঞান ও আনন্দ এইরূপে সুখ দুঃখানুভূতি ও কর্ম্ম প্রবৃত্তি দ্বারা অভিভূত বা মলিন হয় না।

এই সাত্ত্বিক বুদ্ধিতে অবস্থান করিতে পারিলে, আর এই মাত্রাস্পর্শজ, আগমাপায়ী অনিত্য সুখ দুখ (এবং তাহারই বিশেষ ভাব শীত গ্রীষ্ম বোধ) সহজে সহ্য করিতে পারা যায়, তাহাতে অভিভূত হইতে হয় না। ভগবান্ প্রথমে অর্জ্জুনকে এই উপদেশ দিয়াছেন। সুখ দুঃখ বোধ যে এইরূপ অনিত্য—এবং বাহ্য-বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয় ও মনের সম্বন্ধ হইলে সেই বিষয়-জ্ঞানের সহিত যে সুখদুঃখ বোধ অবশ্যম্ভাবী, এজন্য তাহাতে অভিভূত না হইয়া, তাহা সহ্য করাই বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য; এ কারণ 'তিতিক্ষা' গুণ অর্জ্জন করিয়া, সুখদুঃখ সহ্য করা শিক্ষা করিতে হইবে,—ভগবান্ প্রথমে অর্জ্জুনকে এইরূপ উপদেশ দিয়াছেন।

সাংখ্য-জ্ঞানে সুখদুঃখ বোধ নিবৃত্তি।—কিন্তু এই তিতিক্ষা অভ্যাসই যথেষ্ট নহে। পুরুষ-প্রকৃতি-বিবেক-জ্ঞান হইলে জানা যায় যে এই সুখ-দুঃখ—ধর্ম্ম, ইহা প্রকৃতিজ দেহের ধর্ম্ম, ইহা বুদ্ধি অহঙ্কার মন—এই

অন্তঃকরণের ধর্ম্ম মাত্র। দেহে অন্তঃকরণের সহিত সম্বন্ধহেতুই পুরুষে এই অন্তঃকরণ-ধর্ম্ম প্রতিবিম্বিত হয়। সেই অভ্যাস হেতু পুরুষ আপনাকে অন্তঃকরণ-ধর্ম্ম-যুক্ত মনে করিয়া, অন্তঃকরণে যখন সুখানুভব হয়, তখন আপনাকে সুখী এবং অন্তঃকরণে যখন দুঃখানুভব হয়, তখন আপনাকে দুঃখী মনে করে। বাস্তবিক ইহা অজ্ঞান মাত্র। পুরুষ যখন আপনাকে এই অন্তঃকরণ হইতে পৃথক্, সূক্ষ্ম ও স্থূল দেহ হইতে আপনাকে সম্পূর্ণ ভিন্ন বলিয়া জানিতে ও অনুভব করিতে পারে, তখন আর পুরুষের এই সুখ দুঃখ বোধ থাকে না, তখন আর এই সুখজ বিষয় গ্রহণ ও দুঃখজ বিষয় ত্যাগ করিবার প্রবৃত্তিও থাকে না। তখন কোন কামনা থাকে না, কোন বাসনা থাকে না, লাভালাভ জ্ঞান থাকে না, এবং সুখজ বিষয় গ্রহণ ও দুঃখজ বিষয় ত্যাগের সংকল্প দ্বারা পরিচালিত কর্ম্মবৃত্তিও থাকে না। তখন প্রকৃতিজ সুখ দুঃখানুভূতি ও কর্ম্মবৃত্তির সহিত আর তাহার আত্মাধ্যাস থাকে না। এই সাংখ্যজ্ঞানে অবস্থান যত দৃঢ় হয়, ততই সুখ দুঃখ বোধ ক্ষীণ হয়, কামনা দূর হয়, কোন বিষয়ে আর স্পৃহা থাকে না। তখন অহঙ্কার মমতা দূর হয়, সকল ইন্দ্রিয় নিয়মিত ও বশীভূত হয়, চিত্ত সংযত হয়, সুখদুঃখ, শুভাশুভ, লাভালাভ সকলই তুল্য জ্ঞান হয়। সাংখ্যজ্ঞানী আর সুখানুযায়ী রাগ বা দুঃখানুযায়ী দ্বেষের বশীভূত থাকে না। তাহার কাম ক্রোধ বশীভূত হয়, সে আত্মতৃপ্ত আত্মরত ও পরমাত্মায় সমাহিত হয়। যাহার চিত্ত এইরূপ বশীভূত, সেই এই সাংখ্যজ্ঞানে অবস্থিত—সেই স্থিতপ্রজ্ঞ। এই সাংখ্যজ্ঞানের এই পরিণাম—এই স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ, এই অধ্যায় শেষে বিবৃত হইয়াছে।

স্থিতপ্রজ্ঞ নিষ্কামকর্ম্মের প্রকৃত অধিকারী।—এইরূপ সাংখ্যজ্ঞানে প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হইলে যখন স্থিতপ্রজ্ঞ হওয়া যায়, তখন নিষ্কাম কর্ম্মের প্রকৃত অধিকার হয়। তাহা এই অধ্যায়ে ইঙ্গিত করা হইয়াছে। বলিয়াছি ত, জ্ঞানে যে বিষয় গ্রহণ করা যায়, সেই বিষয় সম্বন্ধে মলিনচিত্তে

রাগ বা দ্বেষ উৎপন্ন হয়। যে বিষয় সুখজ সে সম্বন্ধে অনুরাগ হয়, তাহা গ্রহণ করিবার ইচ্ছা হয়। যাহার জ্ঞান অপেক্ষাকৃত নির্ম্মল, সে আপাত-সুখকর, কিন্তু পরিণামে দুঃখকর বস্তু পরিত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত হয়, এবং যাহা আপাততঃ দুঃখকর, কিন্তু পরিণামে সুখকর, তাহা গ্রহণ করিতে প্রবৃত্ত হয়। জ্ঞানে যে বিষয় গ্রহণ করা যায়, তাহা সুখ দুঃখ উভয়াত্মক হইতে পারে, তাহা আপাত-সুখকর এবং পরিণামে দুঃখকর, অথবা আপাত-দুঃখকর ও পরিণামে সুখকর হইতে পারে। এই সুখ দুঃখ বিচার করিয়া ও তুলনা করিয়া, যাহা অধিক সুখকর, তাহা গ্রহণ করিতে এবং যাহা অধিক দুঃখকর, তাহা ত্যাগ করিতে প্রবৃত্তি হয়। আমরা ক্ষণিক সুখের পরিবর্ত্তে অধিকতর স্থায়ী সুখ কামনা করি। এই বর্ত্তমান সুখ দুঃখ অনুযায়ী রাগ দ্বেষ চালিত বা কামনা চালিত হইয়া সাধারণতঃ আমরা ত্যাগ গ্রহণাত্মক কর্ম্মে প্রবৃত্ত হই বটে, কিন্তু বুদ্ধি সত্ত্ব প্রভাবে কিছু স্থির হইলে, আমরা বিচার করিয়া, যাহা অপেক্ষাকৃত স্থায়ী সুখদ, তাহাকে উপাদেয়, ও যাহার পরিণাম দুঃখ তাহা হেয়, এই ধারণা করিয়া তদনুসারে কর্ম্মে রত হই। যাহার বুদ্ধি যত স্থির, অবিক্ষিপ্ত—সে সুখকামনার বিষয় ত্যাগ বা গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে, আগন্তুক সুখদুঃখ বোধ দ্বারা পরিচালিত না হইয়া, তাহার পরিণাম চিন্তা করিয়া, কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে পারে। কেহ উপস্থিত সুখের আশায় কর্ম্ম করে, কেহ ভবিষ্যৎ সুখের আশায় কর্ম্ম করে, কেহ সমগ্র জীবনের সুখ দুঃখের কথা ভাবিয়া কর্ম্ম করে, কেহ বা এ জীবন নশ্বর ক্ষণস্থায়ী বুঝিয়া পরকালে বিশ্বাস করিয়া, পরকালে সুখের আশায় কর্ম্ম করে ও ইহকালের সুখ দুঃখ উপেক্ষা করে। আমরা স্বার্থ চিন্তা করিয়া, নিজ 'প্রেয়' চিন্তা করিয়া ও এইরূপে নিজের সুখ দুঃখ চিন্তা করিয়া ও রাগদ্বেষ-বশে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হই।

কিন্তু যাহার সাংখ্যজ্ঞান লাভ হইয়াছে, যাহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সে আর নিজের সুখ দুঃখ অনুভব করিয়া রাগদ্বেষ-বশে কর্ম্ম

করিতে প্রবৃত্ত হয় না। তাহার ইচ্ছা সংযত, কামনা বাসনা সংকল্প— সকলই সংযত। সে স্বার্থ-চালিত হইয়া কামনার বশে আর কর্ম্ম করে না। সে আত্মসংস্থ হইয়া আত্মাতেই ভূমানন্দ-রসাস্বাদ করে। স্থিতপ্রজ্ঞ অবস্থায় তাহার নিজের কোন প্রয়োজন থাকে না। এইরূপে যখন প্রবৃত্তির নিগড় ভগ্ন হইয়া যায়, ইচ্ছা সংযত হয়, Denial of the Will সিদ্ধ হয়, তখনই কেবল জ্ঞান-পরিচালিত হইয়া নিষ্কাম কর্ম্ম করা সম্ভব হয়। তখন সে কর্ত্তব্য স্থির করিয়া অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম করিতে পারে। তখন তাহার নিজের প্রয়োজন না থাকিলেও এবং আপনাকে অকর্ত্তা জানিয়াও নিজ বশীভূত প্রকৃতিকে পরিচালিত করিয়া, কেবল অপরের প্রয়োজন-সাধনজন্য পরার্থ কর্ম্ম করিতে পারে। তখন সে সমাজের জন্য, লোক-সংগ্রহার্থ বা লোকহিতার্থ কর্ম্ম করিবার জন্য, এবং ঈশ্বরার্থ কর্ম্ম করিবার জন্য প্রকৃত অধিকারী হয়। যে প্রবৃত্তি-চালিত পুরুষ, সে নিজের সুখ দুঃখ লাভালাভ লইয়া ব্যস্ত। সে রাগ, দ্বেষ, কাম ও ক্রোধের বশীভূত, ও তাহাদের-দ্বারা পরিচালিত। সে কি কখন নিষ্কাম ভাবে পরার্থ কর্ম্ম করিতে পারে? সে কি ঈশ্বরার্থ—লোক-সংগ্রহার্থ কর্ম্ম করিবার উপযুক্ত হইতে পারে? সে কিরূপে আত্মপর ভেদ না করিয়া সমত্ব বুদ্ধিযুক্ত হইয়া সর্ব্বত্র সেই এক আত্মাকে দর্শন করিয়া, ব্যক্তি-নির্ব্বিশেষে লোকহিতার্থ নিষ্কাম কর্ম্ম করিতে পারিবে? যে প্রকৃত স্থিতপ্রজ্ঞ, তাহারই পক্ষে প্রকৃত নিষ্কাম কর্ম্ম সম্ভব। যাহার চিত্ত শুদ্ধ কামনাহীন, কেবল তাহারই পক্ষে প্রকৃত নিষ্কাম কর্ম্ম সম্ভব। সেই নিষ্কাম কর্ম্মে বা কর্ম্মযোগে সিদ্ধি লাভ করিতে পারে।

কে নিষ্কাম কর্ম্মারম্ভের অধিকারী হয়।—তবে যাহারা স্থিত-প্রজ্ঞ হয় নাই, সুখ দুঃখ তুল্য বোধ করিতে শিখে নাই, কামনা ত্যাগ করিতে পারে নাই, তাহাদের পক্ষে কি নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠান অসম্ভব? যাহাদের প্রকৃতি রাজসিক বা তামসিক, তাহাদের পক্ষে নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠান

একেবারে অসম্ভব বটে। কিন্তু যাহাদের প্রকৃতি কতকটা সাত্ত্বিক, তাহাদের পক্ষে নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠানারম্ভ একেবারে অসম্ভব নহে। তাহাদের প্রবৃত্তি অনেকটা সংযত, কামনা বা বাসনা অনেকটা নিয়মিত। তাহারা প্রেয় অন্বেষণ করে বটে, কিন্তু যাহা আপাত-রমণীয় বা সুখকর, তাহাতে তাহারা আকৃষ্ট হয় না, বা যাহা আপাত দুঃখকর কিন্তু পরিণাম সুখকর, তাহাও দ্বেষবশে ত্যাগ করে না। তাহারা ভবিষ্যৎ ভাবিয়া ইহ-পরকালে ভাবী সুখ লক্ষ্য করিয়া কর্ম্ম করে। সুতরাং তাহাদের চিত্ত উপস্থিত রাগদ্বেষ চালিত নহে। এই জন্য সাত্ত্বিক প্রকৃতিযুক্ত লোক নিষ্কাম কর্ম্ম বা কর্ত্তব্য কর্ম্ম আরম্ভ করিবার অধিকারী। তাহারা গীতার উপদেশ অনুসারে নিষ্কাম কর্ম্ম অনুষ্ঠানে অর্থাৎ বুদ্ধিযুক্ত হইয়া কর্ম্মযোগ অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতে পারে। কিন্তু সেই নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠান কালেও প্রথমে তাহাদের চিত্তে নানা কামনা আসিয়া, স্বার্থ আসিয়া উপস্থিত হয়। ভাবী সুখ-দুঃখ, ধর্ম্মাধর্ম্ম, পাপপুণ্য গণনা করিয়া, তাহারাও কর্ত্তব্য কর্ম্ম হইতে বিচলিত হয়। অর্জ্জুনের সেইরূপ কর্ত্তব্য কর্ম্ম হইতে প্রচ্যুতি হইয়াছিল। এইরূপ লোক বিষয়-সংস্পর্শ জনিত দুঃখ শোক বা মোহ দ্বারা অভিভূত হইলে আর কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিবার উপযুক্ত থাকে না। কিন্তু (I ought)— 'আমার এই কর্ত্তব্য'—এই বাণী যাহার অন্তরে স্পষ্ট প্রকাশিত হয়, সে সেই বাণী বা ঈশ্বরের আদেশ বা শাস্ত্রের বিধান অনুসরণ করিয়া কর্ত্তব্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, সে আর স্বার্থের কথা বড় ভাবে না, নিজের সুখ দুঃখের কথা ভাবে না, ইহপরকালের কথাও ভাবে না। এমন কি, সে কর্ত্তব্য কর্ম্ম পালন করিতে গিয়া মরণকেও গ্রাহ্য করে না। কিন্তু যদি চিত্তে স্বাভাবিক বাসনাবশে স্বার্থ ভাবনা আসিয়া পড়ে, তবে সে বাণী ক্ষীণ হইয়া যায়, সে আর কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিবার তত উপযুক্ত থাকে না। তথাপি ইহাদের পক্ষেও নিষ্কাম কর্ম্মাচরণের চেষ্টা বিফল হয় না। ভগবান্‌ বলিয়াছেন,—ইহার স্বল্প মাত্র আচরণেও মহাভয় হইতে ত্রাণ

পাওয়া হয়। নিষ্কাম কর্ম্ম করিবার চেষ্টা ও অভ্যাস করিতে করিতে, চিত্ত ক্রমে নির্ম্মল হইয়া আসে। নিষ্কাম কর্ম্ম প্রথমে ভালরূপে আচরিত হয় না সত্য, এবং প্রথমে তাহা কামনা, বাসনা বা স্বার্থ চিন্তা হেতু সু-অনুষ্ঠিত হয় না সত্য, কিন্তু পরিণামে পুনঃ পুনঃ অভ্যাসের ফলে চিত্তমলা দূর হইয়া যায়। তাহার জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হয়, সে তখন নিষ্কাম কর্ম্ম ভালরূপে অনুষ্ঠান করিবার যোগ্য হয়।

কর্ম্মযোগ নিম্নাধিকারীর জন্য নহে।—অনেকে অনুমান করেন যে, চিত্ত-মলা দূর হইয়া বুদ্ধি নির্ম্মল হইলে চিত্তে জ্ঞান-সূর্য্য আপনিই প্রকাশিত হয়। চিত্তমলা দূর করাই একমাত্র কর্ম্মযোগের উদ্দেশ্য। চিত্তমলা দূর হইয়া বুদ্ধি জ্ঞান-স্বরূপ হইলে, আর কর্ম্মযোগের কোন প্রয়োজন থাকে না। অতএব নিষ্কাম কর্ম্মাচরণ নিম্নাধিকারীর জন্য, এবং তাহার চিত্ত-শুদ্ধির জন্য। এ কথা আংশিক সত্য। কর্ম্মযোগেই পরিণামে আত্মদর্শন হয় (গীতা, ১৩।২৪)। আত্মদর্শন হইলে আত্মাতে স্থিত হইয়া স্থিত প্রজ্ঞ হওয়া যায় বটে, কিন্তু স্থিত-প্রজ্ঞত্ব হেতু যে ব্রাহ্মী স্থিতি, তাহাই সাধনার শেষ নহে। ব্রাহ্মী স্থিতি লাভ করিয়া, সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা হইয়া, সর্ব্বভূতে সেই এক অবিভক্তের বিভক্তের ন্যায় ভাব দর্শন করিয়া, যিনি সর্ব্বভূত-স্থিত আপনাকে ও ব্রহ্মকে দর্শন করিয়া, সর্ব্বভূতহিত অন্য স্বপ্রকৃতিকে নিয়মিত করিয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করেন, তাঁহার কর্ম্মই প্রকৃত আদর্শ নিষ্কাম কর্ম্ম। এ কথা পরে দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ব্যাখ্যায় বিবৃত হইয়াছে। নিষ্কাম কর্ম্মাচরণ চেষ্টার ফলে পরিণামে স্থিতপ্রজ্ঞ হওয়া যায়। স্থিতপ্রজ্ঞ হইলে তবে প্রকৃত নিষ্কাম কর্ম্মের অর্থাৎ লোক-সংগ্রহার্থ কর্ম্মের এবং ঈশ্বরার্থ কর্ম্মের পূর্ণ অধিকারী হওয়া যায়। এ তত্ত্ব পরে গীতায় বিবৃত হইয়াছে।

অনেকে মনে করিতে পারেন যে, যখন প্রজ্ঞা স্থির হয়, ব্রহ্মে স্থিতি হয়, তখন আর কোন কর্ম্ম থাকে না। তাহা ঠিক নহে। যতক্ষণ দেহ

থাকে, ততক্ষণ কর্ম্ম থাকে। দেহ ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতিজ। প্রকৃতির রজোগুণ হইতে কর্ম্ম হয়। এজন্য কর্ম্মচেষ্টা কখনও দূর হয় না। যতক্ষণ প্রকৃতজ্ঞানে অবস্থিতি না হয়, ততক্ষণ প্রকৃতির বশে কর্ম্ম করিতে হয়। প্রকৃতি সাত্ত্বিক হইলে শুভ কর্ম্মে পুণ্য কর্ম্মে শাস্ত্রোদ্ভাসিত বিহিত কর্ম্মে প্রবৃত্তি হয়। তখন কামনা বা বাসনা শুদ্ধ হয়, স্বর্গ কামনায় ইহ-পরকালে স্থায়ী সুখ কামনায়, আপাত-সুখকর বিষয়ের কামনা দমন করিয়া পুণ্যকর্ম্মে প্রবৃত্তি ও রতি হয়। রাজসিক ও তামসিক প্রকৃতি হইলে উপস্থিত কামনা চালিত হইয়া সদসৎ কর্ম্মে মতি হয়। জ্ঞানে এই প্রবৃত্তিকে নিয়মিত করিতে হয়। আমি প্রকৃতি হইতে ভিন্ন, এ জ্ঞান হইলে আর প্রকৃতিস্থ ত্রিগুণের বশীভূত থাকিতে হয় না। তখন প্রকৃতিকে বশীভূত করিয়া প্রকৃতির "প্রভু" হইয়া, প্রকৃতির স্বাভাবিক কর্ম্মপ্রবৃত্তিকে জ্ঞানবলে পরিচালিত করিতে হয়। প্রকৃতির বশ না হইয়া প্রকৃতির 'প্রভু' হইতে হয়। নিজে অকর্ত্তা হইয়াও প্রকৃতির কর্ম্মকে সেনাপতির সৈন্য নিয়মনের ন্যায় নিয়মিত করিতে হয়।

স্থিতপ্রজ্ঞের লোকহিতার্থ কর্ম্ম।—যাহা হউক, এস্থলে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, যে জ্ঞানস্বরূপে অবস্থিত, যে আপনাকে ব্রহ্মের সহিত বা ঈশ্বরের সহিত অভিন্ন জানিয়া ব্রহ্মে স্থিত হইয়াছে, সে এই জগৎ-তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া, ব্রহ্ম-প্রবর্ত্তিত জগতের কর্ম্মচক্রের স্বরূপ জানিতে পারে। সে সমাজের হিতার্থ কর্ম্ম কি, তাহা জানিতে পারে, এবং ঈশ্বরের জগৎ রক্ষার্থ ও ধর্ম্ম রক্ষার্থ কর্ম্ম কি, তাহা বুঝিতে পারে। তখন সে জ্ঞানবলে আপনার বশীভূত প্রকৃতির কর্ম্মশক্তিকে নিয়মিত করিয়া স্থিতপ্রজ্ঞ হইয়া নিজে স্থির, অচল, অটল অকর্ত্তা থাকিয়াও নিজের সর্ব্বরূপ স্বার্থ বা কামনা সম্পূর্ণ ত্যাগ করিয়াও এই লোকহিতার্থ কর্ম্মে, বা ঈশ্বরার্থ কর্ম্মে স্বীয় বশীভূত প্রকৃতি দ্বারা ঈশ্বরের ন্যায় রত হইতে পারে। জগৎ রক্ষার্থ কর্ম্মের প্রয়োজন, এবং স্বয়ং ঈশ্বরই সেই কর্ম্মের প্রবর্ত্তক জানিয়া, এবং

নিজ বশীভূত প্রকৃতিকে সেই কর্ম্মের সহায় হইতে সক্ষম জানিয়া সে কথন নিষ্কর্ম্মা হইয়া বসিয়া থাকে না। আত্মবশে আত্মতৃপ্ত নিরাশ্রয় থাকিয়াও সে জগচ্চক্র প্রবর্ত্তনার্থ স্বপ্রকৃতিকে অনুষ্ঠেয় কর্ম্মে রত করে। সিদ্ধ মহাত্মগণ এইরূপে কর্ম্ম করেন। নিবৃত্তিমার্গস্থ মহর্ষিগণও এইরূপ কর্ম্মে ভগবানের সহায় হন। অবশ্য যাঁহারা কর্ম্মযোগ প্রথম আরম্ভ করেন, তাঁহাদের পক্ষে এরূপভাবে কর্ম্ম করিবার সম্ভাবনা নাই। সাধনায় সিদ্ধ না হইলে, 'সমত্বতে' স্থিত না হইলে, এরূপে কর্ম্ম করা যায় না। কর্ম্মযোগ আরম্ভ করিবার জন্য প্রথমে কর্ত্তব্য বুদ্ধিতে, লোকহিতার্থ কর্ম্মাচরণ ও ঈশ্বরের কর্ম্মের নিমিত্তমাত্র হইয়া কর্ম্মাচরণ অভ্যাস করিয়া, ক্রমে নিষ্কাম হইতে শিক্ষা করিতে হয়। সে সাধনা অভ্যাস করিতে করিতে, ক্রমে ক্রমে সেই অভ্যাস-ফলে সর্ব্ব কাম-মলা দূর হইলে, তবে উক্ত প্রকারে কর্ম্মানুষ্ঠান করা যায় এবং প্রকৃত কর্ম্মযোগে সিদ্ধি হয়। অতএব যিনি প্রকৃত স্থিতপ্রজ্ঞ, তিনিই প্রকৃত নিষ্কাম কর্ম্ম উপযুক্ত রূপে অনুষ্ঠান করিতে সমর্থ এবং প্রয়োজন হইলে তিনি সে কর্ম্মের অনুষ্ঠানও করেন।

গীতোক্ত যোগের অধিকারী কে।—এই গীতোক্ত কর্ম্মযোগাদি অনুষ্ঠানের অধিকারী কে? গীতায় তাহা স্পষ্ট উক্ত হয় নাই। এস্থলে সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে যে, যিনি আত্মজ্ঞান-লাভ-পূর্ব্বক সুখ দুঃখে অভিভূত না হন, তিনিই এই গীতোক্ত সাধনার অধিকারী। অতএব বলা যাইতে পারে যে, সাংখ্যদর্শনের যেখানে পরিসমাপ্তি—গীতার সেখানে আরম্ভ। সাংখ্যদর্শনে দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তিই পরম পুরুষার্থ। গীতায় সাধনার প্রথমেই সুখ দুঃখ সহ্য করিবার,—সুখে স্পৃহাহীন ও দুঃখে অনুদ্বিগ্নচিত্ত হইবার—উপদেশ আছে। যে দুঃখে অভিভূত, সেই দুঃখ-নিবৃত্তিকে পরম-পুরুষার্থ মনে করে। যে সুখ-দুঃখ কিছুই গ্রাহ্য করে না, তাহার পক্ষে সে দুঃখ নিবৃত্তির উপদেশ বৃথা। সুখ-দুঃখ গ্রাহ্য না করিয়া, তাহা সহ্য করিতে শিক্ষা করিয়া, তবে গীতার উপদেশ

অনুসারে সাধনমার্গে প্রবেশ করিতে হয়। গীতোক্ত সাধনার ফল কেবল দুঃখ-নিবৃত্তি নহে,—অত্যন্ত নিরবচ্ছিন্ন সুখপ্রাপ্তি, ব্রহ্মসংস্পর্শরূপ অত্যন্ত সুখভোগ, এবং পরিণামে ভগবানের পরমধাম লাভ। এই মুক্তি লাভ জন্য কর্ম্মমার্গে হউক, জ্ঞানমার্গে হউক, কর্ম্মসন্ন্যাসমার্গে হউক, ধ্যানমার্গে হউক অথবা ভক্তিমার্গে হউক, প্রথমে আত্মজ্ঞান-লাভ-পূর্ব্বক নিষ্কাম হইয়া, সুখ দুঃখ বোধ এবং রাগ দ্বেষের অতীত হইয়া, কাম ক্রোধ জয় করিয়া—এক কথায় স্থিতপ্রজ্ঞ হইয়া—সে মার্গে প্রবেশাধিকার লাভ করিতে হইবে। গীতা মোক্ষশাস্ত্র। যাহা পরম নিঃশ্রেয়স, তাহা লাভ করিবার সাধনমার্গ গীতায় উপদিষ্ট হইয়াছে। অতএব যেখানে সাংখ্যজ্ঞানের শেষ, সেইখানে গীতোক্ত জ্ঞানের আরম্ভ। দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি সাংখ্যজ্ঞানের চরম ফল—পরম পুরুষার্থ। দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি হইলে, সাংখ্যজ্ঞানসাধন শেষ হয়। আর গীতা অনুসারে, সুখ দুঃখ সমজ্ঞান পূর্ব্বক তাহা উপেক্ষা করিয়া, কর্ম্ম, জ্ঞান বা ভক্তিমার্গে প্রকৃত মুমুক্ষুর সাধনার আরম্ভ হয়। পরমাত্মতত্ত্ব ঈশ্বরতত্ত্ব ব্রহ্মতত্ত্ব এবং প্রকৃতিপুরুষ বা ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞতত্ত্বের অর্থদর্শন-রূপ জ্ঞানের উপর এ সাধনা প্রতিষ্ঠিত। এ সাধনার সিদ্ধিতে পরিশেষে সংসার-নিবৃত্তি এবং পরব্রহ্মের সহিত একত্ব জ্ঞানে নির্ব্বাণ বা পরিচ্ছিন্ন ব্যক্তিত্ব ভাব হইতে মোক্ষপ্রাপ্তি। এ কথা পরে বিবৃত হইবে।

গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রথমে সাংখ্যজ্ঞান এবং সেই জ্ঞান-পরিপাকে সুখ দুঃখ সম্বন্ধে নির্ব্বিকার হইবার উপদেশ-পূর্ব্বক নিষ্কামভাবে কর্ম্মমার্গে সাধনার উল্লেখ করা হইয়াছে। পরে তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে এই কর্ম্ম-মার্গে সাধনা বিবৃত হইয়াছে।

তৃতীয় অধ্যায়।

কর্ম্মযোগ।

—:*:—

স্বধর্ম্মেণ যমারাধ্য ভক্ত্যা মুক্তিমিতা বুধাঃ।
তং কৃষ্ণং পরমানন্দং তোষয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মভিঃ॥
উপেয়া কর্ম্মনিষ্ঠাত্র প্রধানেনোপসংহৃতা।
উপেয়া জ্ঞাননিষ্ঠাতু তদ্‌গুণত্বেন কীর্ত্তিতা॥"

অর্জ্জুন উবাচ।

জ্যায়সী চেৎ কর্ম্মণস্তে মতা বুদ্ধি র্জনার্দ্দন।
তৎ কিং কর্ম্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব॥ ১

অর্জ্জুন—
কর্ম্ম হ'তে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ—যদি জনার্দ্দন!
এই মত তব, তবে কেন হে কেশব!
নিযুক্ত করিছ মোরে কর্ম্মে ভয়ঙ্কর? ১

(১) কর্ম্ম হ'তে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ—শঙ্করাচার্য্য বলেন,—"প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি বিষয়ভূত যোগবুদ্ধি ও সাংখ্যবুদ্ধি—এই দুইরূপ বুদ্ধি ভগবান নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সাংখ্যবুদ্ধির আশ্রয়ে কামনা ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস কর্ত্তব্য বলিয়াছেন, এবং তাহাতেই শ্রেয়োলাভ হয়—ব্রহ্মে স্থিতি হয়, ইহা দেখাইয়া দিয়াছেন। অন্যদিকে অর্জ্জুন কর্ম্মাধিকারী বলিয়া, কর্ত্তব্য বোধে আসক্তি ত্যাগ করিয়া

তাঁহাকে কর্ম্ম করিবার উপদেশ দিয়াছেন,—অথচ বলেন নাই যে তাহাতে অর্জ্জুনের শ্রেয়োলাভ হইবে। এই জন্য মোক্ষার্থী অর্জ্জুনের বুদ্ধি সন্দেহযুক্ত হইয়াছে।”

পূর্ব্বে অর্জ্জুন বলিয়াছেন,—

"যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে
শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্।” (২।৭)

শ্রেয়ঃ যাহা, অর্জ্জুন তাহারই জিজ্ঞাসু। ভগবান্ শ্রেয়ঃ প্রাপ্তির সাক্ষাৎ সাধন সাংখ্যবুদ্ধি-নিষ্ঠা অর্জ্জুনকে শ্রবণ করাইয়া, আবার বহু দৃষ্ট অনর্থে পূর্ণ শ্রেয়ঃ প্রাপ্তির অনিশ্চিত সাধন কর্ম্মমার্গে নিযুক্ত হইতে বলিতেছেন। অর্জ্জুন এজন্য অতি ব্যাকুল হইয়া এই প্রশ্ন করিতেছেন।

কোন কোন ব্যাখ্যাকার গীতাশাস্ত্রের সম্বন্ধ নিরূপণ করিতে গিয়া বলেন যে, গীতা মোক্ষশাস্ত্র। সকল আশ্রমীরই জন্য ইহাতে মোক্ষ উপদিষ্ট হইয়াছে। ইহাতে দেখান হইয়াছে যে, জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয়ই সামঞ্জস্য করিয়া সাধনা করা সকল সাধকেরই কর্ত্তব্য। কেবল যাবজ্জীবন জ্ঞান সাধনা করিলেই মোক্ষ হয় না। সুতরাং শ্রুতি ও স্মৃতি-বিহিত কর্ম্ম একেবারে কাহাকেও পরিত্যাগ করিতে নাই। অনেকযুক্তি ও তর্কের দ্বারা আজীবন-সন্ন্যাসী শঙ্করাচার্য্য সেই জ্ঞান ও কর্ম্ম-সমুচ্চয়-বাদ খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বলেন,—“যে সংসারী, কেবল তাহারই প্রথমে কৃচ্ছ-সাধ্য কর্ম্মযোগের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি করিতে হয়,—সে একেবারে জ্ঞান সাধন করিতে পারে না। কিন্তু যে ঊর্দ্ধরেতা সন্ন্যাসী, তাহার কর্ম্মমার্গে সাধনার প্রয়োজন নাই। কর্ম্ম দুইরূপ—শ্রৌতকর্ম্ম ও স্মার্ত্ত কর্ম্ম। ইহার মধ্যে কোনরূপ কর্ম্মের সহিত জ্ঞানের সমুচ্চয় হইতে পারে না। অর্থাৎ যে সাংখ্যজ্ঞানী, তাঁহার পক্ষে ইহার মধ্যে কোনরূপ কর্ম্ম সাধনার প্রয়োজন নাই। জ্ঞানী—গৃহস্থই হউন বা সন্ন্যাসীই হউন, তাঁহার পক্ষে কোনরূপ কর্ম্ম করিবার প্রয়োজন নাই।” শঙ্করাচার্য্য শ্রুতি স্মৃতি

বচন উদ্ধৃত করিয়া আপন মত সমর্থন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তন্মধ্যে দুই একটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"ন কর্ম্মণা ন প্রজয়া ধনেন ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ।"

(মহানারায়ণ উপঃ ১০।৫)।

"পরমাত্মনি যো রক্তো যো রক্তোঽপরমাত্মনি।
সর্ব্বৈষণাবিনির্ম্মুক্তঃ স ভৈক্ষ্যং ভোক্তুমর্হতি॥"
"কর্ম্মণা বধ্যতে জন্তুর্ব্বিদ্যয়া চ বিমুচ্যতে।
তস্মাৎ কর্ম্ম ন কুর্ব্বন্তি যতয়ঃ পারদর্শিনঃ॥" —শুকানুশাসন।
"ত্যজ ধর্ম্মমধর্ম্মঞ্চ উভে সত্যানৃতে ত্যজ।

* * * *

প্রব্রজন্ত্যকৃতোদ্বাহাঃ পরং বৈরাগ্যমাশ্রিতাঃ।"—বৃহস্পতি-ধর্ম্মশাস্ত্র।

এতদনুসারে শঙ্করাচার্য্য এই শ্লোকের এইরূপ অর্থ করেন,—"যদি কর্ম্ম অপেক্ষা বুদ্ধি অর্থাৎ জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ, ইহাই তোমার অভিপ্রায়, তবে আমাকে ক্রূর হিংসা লক্ষণ কর্ম্মে 'কর্ম্ম কর' এই বলিয়া কেন নিযুক্ত করিতেছ? ইহাতে যেন জ্ঞান হইতে কর্ম্মশ্রেষ্ঠ এইরূপ বোধ হইতেছে।" অর্জ্জুনের এই প্রশ্ন হইতেই বুঝা যায় যে, এ স্থলে জ্ঞান ও কর্ম্মের সমুচ্চয় করা হয় নাই। সমুচ্চয় হইলে, একের অপেক্ষা, অন্যের শ্রেষ্ঠত্ব উক্ত হইত না। কর্ম্মমার্গ হইতে জ্ঞানমার্গ শ্রেষ্ঠ;—ইহাই অর্জ্জুন বুঝিয়াছিলেন।

গিরি শঙ্করাচার্য্যের এই মত সমর্থন করিয়াছেন। মধুসূদনও এই কথা বলেন। তিনি বলেন—"সাধনান্তর আছে। প্রথম নিষ্কাম কর্ম্ম-নিষ্ঠা—ফল চিত্তশুদ্ধি; তাহার পর শমদমাদি সাধন পূর্ব্বক সর্ব্বকর্ম্ম-সন্ন্যাস, তাহার পর ভগবদ্ভক্তি নিষ্ঠা; তাহার পর তত্ত্বজ্ঞান-নিষ্ঠা—তাহার ফল জীবন্মুক্তি, পরমবৈরাগ্য-প্রাপ্তি ও বিদেহ-মুক্তি। শ্রুতিতে আছে, আত্ম-জ্ঞান পরিণামে লাভ করিলেই মুক্তি হয়।—

'তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।'—(শ্বেতাশ্বতর ৩৮।)

কিন্তু আত্মজ্ঞান লাভের জন্য প্রথমে কর্ম্মাদি সাধনার প্রয়োজন। এই জন্য কর্ম্মাধিকারীকে জ্ঞাননিষ্ঠার উপদেশ দেওয়া উচিত নহে এবং জ্ঞানাধিকারী হইবার পর কর্ম্মনিষ্ঠারও আর আবশ্যক নাই। সুতরাং একরূপ নিষ্ঠা অপেক্ষা অন্য নিষ্ঠা ভাল বা অনায়াসসাধ্য, এরূপ কথা সঙ্গত হইতে পারে না। বিভিন্ন অধিকারীর পক্ষে বিভিন্ন ব্যবস্থা।"

রামানুজ বলেন,—"মুমুক্ষুগণের পরমপ্রাপ্য বেদান্ত-প্রতিপাদিত পরব্রহ্ম পুরুষোত্তম। তাঁহাকে পাইবার উপায় জ্ঞান, উপাসনা ও ধ্যানাদি। ইহারা একান্ত ও অত্যন্ত ভক্তিযোগের অঙ্গীভূত। আত্মাকে (জীবাত্মা) দর্শনের উপায়—আত্মার নিত্যত্ব অসঙ্গত্ব জ্ঞানপূর্ব্বক কর্ম্ম-নিষ্পাদ্য জ্ঞানযোগ। বেদান্তে প্রজাপতির (ব্রহ্মার) বাক্যে দহর বিদ্যাতে আত্মস্বরূপ উক্ত হইয়াছে। সে আত্মা প্রত্যগাত্মা। শ্রুতিতে যে যে স্থলে আত্মতত্ত্বের উপদেশ আছে, তাহা প্রত্যগাত্মা সম্বন্ধেই বুঝিতে হইবে। তিনিই পরমাত্মস্বরূপে জ্ঞেয় ও উপাস্য। সেই পরমাত্ম-জ্ঞান ও উপাসনা ফলে বিষ্ণুর পরম পদ লাভ হয় বলিয়া তাহাই পরাবিদ্যা। অতএব গীতায় এই তৃতীয় অধ্যায় হইতে ষষ্ঠ অধ্যায় পর্য্যন্ত চারি অধ্যায়ে বিষ্ণুর পরমপদ প্রাপ্তির জন্য যে প্রত্যগাত্মাকে দর্শনের আবশ্যক, তাহারই প্রধান উপায় সকল প্রপঞ্চিত হইয়াছে।"

রামানুজ আরও বলেন,—"জ্ঞাননিষ্ঠা লাভ করিতে হইলে, আত্মাবলোকন বা আত্মপ্রত্যক্ষ করিতে হয়। আত্মসাক্ষাৎকার হইলে, নিয়ত আত্মাতে অবস্থান করিতে হয় বা ব্রহ্মে স্থিতি করিতে হয়। কর্ম্মনিষ্ঠা তাহার নিষ্পাদক মাত্র। এই জ্ঞাননিষ্ঠা লাভ করিতে হইলে, সকল ইন্দ্রিয় এবং মনকে সমুদায় বিষয় হইতে প্রত্যাহার করিতে হয়,—ইন্দ্রিয় ব্যাপারের উপরতি আবশ্যক হয়। সুতরাং সে অবস্থায় সকাম হউক, নিষ্কাম হউক

কোন কার্য্যই থাকে না। অতএব পরাবিদ্যা বা আত্মজ্ঞান শ্রেষ্ঠ হইলে কর্ম্মযোগ শ্রেষ্ঠ হইতে পারে না। এই অভিপ্রায়ে অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে, যখন আত্মাবলোকন সর্ব্বেন্দ্রিয়-ব্যাপারোপরতি-নিষ্পাদ্য, যখন সকল কর্ম্ম-নিবৃত্তিপূর্ব্বক আত্ম-জ্ঞাননিষ্ঠা লাভ হয়, তখন আমাকে সেই জ্ঞাননিষ্ঠায় নিয়োজিত করাই তোমার কর্ত্তব্য। তবে কেন আমাকে সর্ব্বেন্দ্রিয়-ব্যাপার-রূপ আত্মাবলোকন বিরোধী ঘোর কর্ম্মে নিয়োজিত করিতেছ?"

স্বামী বলেন,—"পূর্ব্বে মোক্ষসাধন সাংখ্য বা দেহাত্ম-বিবেক বুদ্ধি উক্ত হইয়াছে, তৎপরে কর্ম্মযোগ-বুদ্ধি উক্ত হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে কোন্ সাধন প্রধান, তাহা স্পষ্ট উক্ত হয় নাই। পরে সমাধিতে অচলবুদ্ধিযুক্ত স্থিত-প্রজ্ঞের ব্রাহ্মী স্থিতি হয়, এই বলিয়া দ্বিতীয় অধ্যায়ের উপসংহার করায় বুদ্ধি ও কর্ম্মের মধ্যে বুদ্ধির শ্রেষ্ঠত্বই ভগবানের অভিপ্রেত। এই মনে করিয়াই অর্জ্জুন এই প্রশ্ন করিয়াছেন।"

বলদেব বলেন,—"ভগবান্ অজ্ঞানকর্দ্দমনিমগ্ন জগৎকে আত্মজ্ঞান ও উপাসনার উপদেশ দ্বারা সমুদ্ধার করিবার জন্য, তাঁহার অঙ্গভূত জীবাত্ম-যাথার্থ্যবুদ্ধির উপদেশ দিয়াছেন। এই তত্ত্ব এই তৃতীয় হইতে চারি অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। অতএব কর্ম্মবুদ্ধি-নিষ্পাদ্য জীবাত্মবুদ্ধিই শ্রেষ্ঠ। এই জন্য অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে, কর্ম্ম নিষ্কাম হইলেও তাহা দ্বারা সাধ্য জীবাত্মবুদ্ধি সিদ্ধির জন্য কেন ভগবান্ তাঁহাকে ঘোর কর্ম্মে নিযুক্ত করিতেছেন। আত্মানুভবের হেতুভূত যে সাংখ্যবুদ্ধি, তাহা নিখিল ইন্দ্রিয় ব্যাপার হইতে বিরতি দ্বারা সাধ্য। তাহার জন্য তাহার সজাতীয় শম দমাদির প্রয়োজন, তাহার বিজাতীয় সর্ব্বেন্দ্রিয়-ব্যাপার যে কর্ম্ম, তাহা সাধ্য বা সেই জ্ঞানের উপায় হইতে পারে না।"

এইরূপে শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি ব্যাখ্যাকারগণ এই শ্লোকে উক্ত 'কর্ম্ম' অর্থে শ্রৌত ও স্মার্ত্ত সকল প্রকার কর্ম্মই বুঝিয়াছেন। কর্ম্ম লৌকিক

ও বৈদিক ভেদে দ্বিবিধ। আর বৈদিক কর্ম্ম—শ্রৌত ও স্মার্ত্ত কর্ম্মভেদে দ্বিবিধ। বেদোক্ত যজ্ঞাদি, যাহা বেদের সংহিতায় 'ব্রাহ্মণ' বিভাগে ও শ্রৌতসূত্রে বিবৃত হইয়াছে, তাহা শ্রৌতকর্ম্ম। আর বেদাঙ্গ যে গৃহ্যসূত্র, ও তদবলম্বনে মানব-ধর্ম্ম-শাস্ত্র প্রভৃতি যে স্মৃতি শাস্ত্র সকল, তাহাতে বিহিত যে সমুদায় কর্ম্ম, তাহা 'স্মার্ত্ত' কর্ম্ম। শ্রৌত কর্ম্মের মধ্যে বর্ণ ও আশ্রম বিভাগ অনুসারে কর্ম্ম বিভাগ নির্দ্দিষ্ট নাই। স্মার্ত্ত কর্ম্ম মধ্যেই মানুষের সাধারণ কর্ত্তব্যকর্ম্ম, বর্ণ ও আশ্রম বিভাগ অনুসারে বিশেষ কর্ম্ম বিস্তারিত হইয়াছে। ক্ষত্রিয় বর্ণের আচরণীয় যে যুদ্ধ, তাহা স্মৃতিতেই বিহিত। তাহা স্মার্ত্তকর্ম্ম। ভগবান্ অর্জ্জুনকে ধর্ম্মযুদ্ধ করিতে উপদেশ দিতেছেন। ইহা স্মার্ত্তকর্ম্ম, গৃহস্থাশ্রমস্থ ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম।

অর্জ্জুন এস্থলে "ঘোর কর্ম্ম" বলিয়া এই যুদ্ধ কর্ম্মই উল্লেখ করিয়াছেন, এবং সাধারণ ভাবে কর্ম্ম অর্থে এইরূপ কর্ম্মই বুঝিয়াছেন। এই যুদ্ধ তাঁহার বর্ণোচিত ধর্ম্ম, তাঁহার ক্ষত্রিয়-স্বভাবানুযায়ী কর্ম্ম বলিয়া তাঁহার স্বধর্ম্ম। তিনি এস্থলে এ প্রশ্নের দ্বারা শ্রৌত ও স্মার্ত্ত সকল প্রকার কর্ম্মের কথা ইঙ্গিত করেন নাই। তিনি কেবল নিজের স্বধর্ম্ম সম্বন্ধেই প্রশ্ন করিয়াছিলেন। আর তখন দুঃখ-শোক-মোহযুক্ত অর্জ্জুন, সেই স্বধর্ম্ম যে নিষ্কামভাবে বুদ্ধিযোগে আচরিত হইতে পারে, তাহাও বুঝেন নাই। সে কর্ম্মকে সকাম কর্ম্ম মনে করিতেছিলেন বোধ হয়। পূর্ব্বে ৩১শ হইতে ৩৭শ শ্লোকে ভগবান্ অর্জ্জুনকে এই যুদ্ধরূপ স্বধর্ম্ম আচরণে লাভ ও স্বর্গাদি ফল উল্লেখ করিয়া, অর্জ্জুনকে যুদ্ধকর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করিতেছিলেন। এজন্য অর্জ্জুন এই স্বধর্ম্ম যুদ্ধকে সকাম কর্ম্মই বুঝিয়াছিলেন পরে যে কামনা আসক্তি ও ফলাভিসন্ধি ত্যাগপূর্ব্বক বুদ্ধিযোগে যুক্ত হইয়া কর্ম্মযোগ সাধনার উপদেশ আছে, যুদ্ধ যে তাহার অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে, ইহা তখন অর্জ্জুন বুঝেন নাই।

অতএব এস্থলে তদনুরূপ অর্থ করিলেও বেশ সঙ্গত হয়। পূর্ব্বে

দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৩৯শ শ্লোকে বলা হইয়াছে—"এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণু।" সুতরাং বুদ্ধি অর্থে এই তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে সাংখ্যবুদ্ধি ও যোগবুদ্ধি উভয়ই বুঝাইতেছে। গীতায় বুদ্ধিযোগ অর্থে কর্ম্মযোগ ও সাংখ্য বা জ্ঞানযোগ উভয়ই বুঝিতে হইবে। আর দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৪৯শ শ্লোকে "দূরেণ হ্যবরং কর্ম্ম বুদ্ধিযোগাদ্ ধনঞ্জয়" ইহা বলা হইয়াছে। সে স্থলে কর্ম্ম সকাম কি নিষ্কাম, তাহা কিছুই বলা হয় নাই সত্য, কিন্তু সে স্থানে কর্ম্ম অর্থে যে সকামকর্ম্ম, তাহা সকল ব্যাখ্যাকারই বলিয়াছেন। অর্জ্জুনও সেই স্থানে কর্ম্মের অর্থ ঠিক বুঝিতে পারেন নাই, অথবা এই কর্ম্ম সকাম কর্ম্ম এবং যুদ্ধও এই সকাম কর্ম্ম, এইরূপ বুঝিয়াছিলেন বোধ হয়। এই জন্য তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"যদি কর্ম্ম অপেক্ষা জ্ঞান বা সাংখ্যবুদ্ধি ও যোগ-বুদ্ধি উভয়ই শ্রেষ্ঠ, তবে "কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে" একথা বলিয়া তুমি কেন আমাকে ঘোর যুদ্ধ কর্ম্মে নিযুক্ত করিতেছ?" এখনও এই যুদ্ধ কর্ম্মে অর্জ্জুনের বিরাগ দূর হয় নাই। তাই তিনি এখনও যুদ্ধকে ঘোর কর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন। এই যুদ্ধের ফলে আত্মীয়দের হত্যা হইবে ও অর্জ্জুনকে তাহাতে দুঃখ পাইতে হইবে, অর্জ্জুনের এই ধারণা এখনও রহিয়াছিল। তাহার উপর দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৩১শ হইতে ৩৭শ শ্লোকে যুদ্ধের পরিণামে অর্জ্জুনের লাভ হইবে, ভগবান্ এরূপ কথাও বলিয়াছেন। সুতরাং যুদ্ধ, সকাম কর্ম্ম অথবা অশুভ কর্ম্ম বলিয়া অর্জ্জুনের ধারণা হইয়াছিল। প্রথমে নিষ্কাম হইয়া—সুখ দুঃখানুভূতির অতীত হইয়া—রাগদ্বেষের অতীত হইয়া,—কাম ক্রোধ জয় করিয়া, নির্ম্মল জ্ঞানে অবস্থিত হইয়া যে কর্ম্মযোগ সাধনা করিতে হয়, যুদ্ধ কিরূপে তাহার অন্তর্গত হইতে পারে, তাহা অর্জ্জুন প্রথমে বুঝেন নাই। অতএব বুদ্ধিযোগে সাংখ্যজ্ঞান-নিষ্ঠা বা কর্ম্মযোগনিষ্ঠা যাহাই অবলম্বিত হউক, তাহা "অবর" কর্ম্ম হইতে শ্রেষ্ঠ, এবং যুদ্ধ যে অবর কর্ম্ম ও বুদ্ধিযোগে ইহা আচরিত হইতে পারে না, এইরূপ বুঝিয়াই অর্জ্জুন ভগবান্‌কে এই

প্রশ্ন করিলেন যে, যুদ্ধরূপ ঘোর কর্ম্ম যখন সাংখ্যবুদ্ধির বা কর্ম্মযোগ বুদ্ধির অপেক্ষা নিকৃষ্ট, তখন কেন তুমি আমায় এ কর্ম্মে নিযুক্ত করিতেছ?

অর্জ্জুনের এই ভ্রম দূর করিবার জন্যই ভগবান্‌ তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে বিস্তারিতরূপে কর্ম্মযোগ বুঝাইয়াছেন। স্বধর্ম্ম সকামভাবে ও নিষ্কাম-ভাবে অনুষ্ঠিত হইতে পারে। সকামভাবে অনুষ্ঠিত হইলে তাহা হেয়—অবর কর্ম্ম। কিন্তু নিষ্কামভাবে আচরিত হইলে—কেবল কর্ত্তব্য-বুদ্ধিতে—বুদ্ধিযোগে আচরিত হইলে, তাহা মোক্ষের সাধন কর্ম্মযোগের অন্তর্গত হয়। ভগবান্‌ এই তৃতীয় অধ্যায়ে দেখাইয়াছেন যে, কর্ম্ম যোগে বুদ্ধিযুক্ত হইয়াও এ ঘোর যুদ্ধও করা যাইতে পারে। আর নিষ্কাম ভাবে কর্ত্তব্যবোধে স্বধর্ম্ম যুদ্ধ না করিলেও অর্জ্জুন আত্মজ্ঞান লাভের উপায়ভূত কর্ম্মযোগ-বুদ্ধি লাভ করিতে পারিবেন না।

অতএব অর্জ্জুনের এই প্রশ্ন, উল্লিখিত "দূরেণ হ্যবরং কর্ম্ম বুদ্ধি-যোগাদ্‌ ধনঞ্জয়"—এই শ্লোক হইতে বুঝিতে হইবে। সুতরাং এ স্থলে জ্ঞান ও কর্ম্ম সমুচ্চয়বাদ বা পরস্পর ভেদবাদ এ সকল সম্বন্ধে কোন তর্কই উপস্থিত করিবার কোন প্রয়োজন নাই এবং কর্ম্মযোগ অপেক্ষা যে জ্ঞান-যোগ মোক্ষার্থীর পক্ষে বিহিত, এবং জ্ঞানযোগীর পক্ষে সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসই প্রশস্ত, এ সকল বিচার এস্থলে অবশ্য অপ্রাসঙ্গিক বলিতে হয়। সমুচ্চয়বাদ ও অসমুচ্চয়বাদ সম্বন্ধে বিরোধ থাকিতে পারে। কিন্তু গীতায় পরে এই উভয় বাদের সামঞ্জস্য হইয়াছে, এবং এক অর্থে সমুচ্চয়বাদই স্থাপিত হইয়াছে। শ্রৌত ও স্মার্ত্ত সকামকর্ম্মের সহিত জ্ঞানের সমুচ্চয় নাই সত্য, তাহা জ্ঞানের বিরোধী বটে। কিন্তু যাহা নিষ্কাম কর্ম্ম, যাহা গীতোক্ত কর্ম্মযোগ, সেই কর্ম্মযোগে অনুষ্ঠিত কর্ম্ম—স্মার্ত্ত কর্ম্ম হউক, বা শ্রৌত কর্ম্ম হউক বা লৌকিক কর্ম্ম হউক অথবা যে কোনরূপ লোকহিতার্থ কর্ম্ম হউক, তাহার সহিত জ্ঞানের বিরোধ নাই। তাহা জ্ঞানের পরিপক অবস্থায়ও আচরণীয়। ইহা দ্বিতীয় অধ্যায়ের ব্যাখ্যা-শেষে বিবৃত হইয়াছে।

ভগবান্ বলিয়াছেন,—

"সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্‌বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ।
একমপ্যাস্থিতঃ সম্যক্ উভয়োর্বিন্দতে ফলম্॥
যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্‌যোগৈরপি গম্যতে।
একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি॥ (গীতা, ৫।৪,৫)।

গীতায় অন্যত্র আছে,—

ধ্যানেনাত্মনি পশ্যন্তি কেচিদাত্মানমাত্মনা।
অন্যে সাংখ্যেন যোগেন কর্ম্মযোগেন চাপরে॥ (গীতা, ১৩।২৩)।

অতএব সাংখ্য জ্ঞানযোগ ও নিষ্কাম কর্ম্মযোগ উভয়ের ফলই এক। তবে কর্ম্মযোগ সাধন ব্যতীত কর্ম্ম-সন্ন্যাস বা সাংখ্যজ্ঞানে অবস্থান বিশেষ কষ্ট কর। এজন্য সাংখ্যজ্ঞানীর পক্ষেও কর্ম্মযোগ অবশ্য আচরণীয় (গীতা, ৫।৬), ইহাই ভগবানের উপদেশ। এইরূপে গীতায় জ্ঞান ও কর্ম্মের সমুচ্চয় হইয়াছে। "আত্মজ্ঞান" হইতে পরমাত্মজ্ঞান লাভ হয়, কর্ম্মযোগের দ্বারা সেই জ্ঞানে স্থিতি হয়। যিনি পরমাত্ম-জ্ঞানী সর্ব্বভূতে আত্মদর্শন করেন, 'বাসুদেব সমুদায়' এই জ্ঞানে অবস্থিত হইয়াছেন, তিনি নিবৃত্তি-মার্গে নিষ্কামভাবে লোকহিতার্থ কর্ম্ম করেন, ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে ঈশ্বরার্থ কর্ম্ম করেন। অতএব গীতায় জ্ঞান ও কর্ম্মের বিরোধ নাই, বা একটি উচ্চাধিকারীর জন্য, ও অপরটি নিম্নাধিকারীর জন্য,—এ কথা নাই। অথচ সকল ব্যাখ্যাকারগণই কর্ম্মকে নিকৃষ্ট বলিয়া বুঝাইয়াছেন।

শঙ্কর মতে—জ্ঞান, রামানুজ মতে—ধ্যান-লক্ষণ-ভক্তি এবং শাণ্ডিল্যাদির মতে—পরানুরক্তিরূপা ভক্তিই অজ্ঞান দূরপূর্ব্বক মোক্ষলাভের উপায়। শঙ্কর বলেন,—"নিষ্ক্রিয় আত্মা বা ব্রহ্মের জ্ঞান হইলে, সমুদায় কর্ম্মেরই ক্ষয় হইয়া যায়, নৈষ্কর্ম্ম্য সিদ্ধি হয়।" কিন্তু রামানুজ বলেন,—"কর্ম্ম করিয়াও নৈষ্কর্ম্ম্য-সিদ্ধি হয়, জ্ঞানযোগের ফলস্বরূপ ধ্যাননিষ্ঠা-সিদ্ধি হয়।" শ্রীধরও বলেন,—"কর্ম্মানুষ্ঠানে যদি কর্তৃত্বাভিনিবেশ না থাকে, তবে নৈষ্কর্ম্ম্য-সিদ্ধি হয় বটে,

তবে যে আত্মাতে অবস্থান করে, সে সর্ব্বকর্ম্ম সমর্পণ করিয়া সন্ন্যাসী হয়।" বলদেব বলেন,—"সকল কর্ম্ম ত্যাগ করিলে নৈষ্কর্ম্য সিদ্ধি লাভ হয়।"

এইরূপে প্রায় সকল ব্যাখ্যাকারগণই কর্ম্মযোগ ও জ্ঞানযোগ মধ্যে জ্ঞানযোগের প্রাধান্য বুঝাইয়াছেন। পরে গীতায় (৬।৩ শ্লোকে) যে যোগারোহণ জন্য কর্ম্মই কারণ, এবং যোগারূঢ় হইলে 'শম'ই কারণ উক্ত হইয়াছে। ইহা হইতেই বোধ হয় ব্যাখ্যাকারগণ বলেন যে, কর্ম্মযোগ—জ্ঞানযোগ সাধনার প্রথম সোপান হইতে পারে, কিন্তু জ্ঞানযোগে আরূঢ় হইলে আর কর্ম্মযোগের প্রয়োজন নাই। শঙ্কর আরও বলেন যে, জ্ঞানের জন্য কখনই কর্ম্মের প্রয়োজন নাই। কর্ম্মযোগ কেবল চিত্ত-শুদ্ধির জন্য, জ্ঞানসাধনের জন্য নহে। জ্ঞান নিত্যসিদ্ধ। কিন্তু গীতায় কোথাও এই মত প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। বরং এই মত খণ্ডন করিয়া, সাধারণ ভাবে "কর্ম্মসন্ন্যাসাৎ কর্ম্মযোগোবিশিষ্যতে" (৫।২)—এই তত্ত্বই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। গীতায় এ কথা পরে বুঝা যাইবে। এবং উক্ত ৬।৩ শ্লোকের অর্থও যে অন্যরূপ, তাহা পরে বিবৃত হইবে।

অতএব এই শ্লোকে কর্ম্ম অর্থে 'অবর কর্ম্ম' (২।৪৯), আর 'বুদ্ধি' অর্থে 'বুদ্ধি যোগ' (২।৪৯)। এই বুদ্ধিযোগ দুই রূপ,—সাংখ্যে বুদ্ধি ও যোগে বুদ্ধি (২।৩৯)। এই বুদ্ধিযোগেই সুকৃত ও দুষ্কৃত, উভয়ই ত্যাগ করা যায়, এবং ইহা দ্বারাই এই সুকৃত দুষ্কৃত ত্যাগ-পূর্ব্বক কর্ম্ম করিবার কৌশল লাভ হয় (২।৫০)। অতএব এস্থলে বুদ্ধি অর্থে—সাংখ্যবুদ্ধি ও নিষ্কাম কর্ম্মবুদ্ধি। এই কর্ম্মযোগ-বুদ্ধি দ্বারা আচরিত কর্ম্মই উক্ত বুদ্ধিযোগ বিনা আচরিত কর্ম্ম হইতে শ্রেষ্ঠ। এস্থলে এই ঘোর যুদ্ধকর্ম্ম যে বুদ্ধিযোগ যুক্ত হইয়া স্বধর্ম্ম পালনার্থ আচরণীয়, তাহা অর্জ্জুন এখনও বুঝিতে পারেন নাই। তিনি এই স্বধর্ম্ম যুদ্ধকে 'অবর' কর্ম্ম মনে করিতেছিলেন। ইহাই সিদ্ধান্ত।

কর্ম্ম—বুদ্ধিযোগ বিরহিত কর্ম্ম।

বুদ্ধি—সাংখ্যবুদ্ধি ও যোগবুদ্ধি। সাংখ্যদর্শন অনুসারে সাত্ত্বিক নির্ম্মল বুদ্ধি। তাহা অধ্যবসায়াত্মিকা, তাহা ধর্ম্ম জ্ঞান ঐশ্বর্য্য ও বৈরাগ্যাত্মক।—

"অধ্যবসায়ো বুদ্ধির্ধর্ম্মো জ্ঞানং বিরাগ ঐশ্বর্য্যম্।

সাত্ত্বিকমেতদ্রূপং ... ...॥" (কারিকা, ২৩)। অতএব এই অধ্যবসায়াত্মক সাত্ত্বিক নির্ম্মল বুদ্ধি ধর্ম্মরূপ ও জ্ঞানরূপ। শ্রুতি-স্মৃত্যুক্ত কর্ম্মপ্রবৃত্তিই ধর্ম্ম। (চোদনা-লক্ষণোঽর্থো ধর্ম্মঃ—ইতি পূর্ব্ব মীমাংসা, ১।২) যাহা হইতে অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স সিদ্ধি হয়, তাহা ধর্ম্ম (বৈশেষিক দর্শন,—১।২)। অতএব এই বুদ্ধিকে ধর্ম্মরূপ বলাতে, নির্ম্মল সাত্ত্বিক বুদ্ধির স্বরূপ যে এই নিষ্কাম কর্ম্ম প্রবৃত্তি, তাহা ও প্রকৃত নিবৃত্তি-মূলক, ইহা বুঝা যায়। আর এই নির্ম্মল বুদ্ধির রূপ যে জ্ঞান —তাহা শুদ্ধ নিবৃত্তি মূলক। জ্ঞান হইতে বৈরাগ্য; ও ধর্ম্ম হইতে ঐশ্বর্য্য,—ইহারাও এই সাত্ত্বিক অধ্যবসায়যুক্ত বুদ্ধির রূপ। অতএব নির্ম্মল সাত্ত্বিক অধ্যবসায়াত্মক বুদ্ধির স্বরূপ যে জ্ঞান ও ধর্ম্ম—বা নিষ্কামভাবে নিবৃত্তি-মার্গে কর্ম্ম, তাহার সমুচ্চয় আছে। ইহা সাংখ্যদর্শনেরও সিদ্ধান্ত।

কর্ম্মে—এই যুদ্ধরূপ কর্ম্মে।

ভয়ঙ্কর—মূলে আছে 'ঘোর'। সর্ব্বেন্দ্রিয় ব্যাপাররূপ আত্মজ্ঞান-বিরোধী (রামানুজ, বলদেব), হিংসাত্মক (স্বামী ও শঙ্কর)।

ব্যামিশ্রেণেব বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সীব মে।
তদেকং বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োঽহমাপ্নুয়াম্ ॥২

করিতেছ মুগ্ধপ্রায় বিমিশ্র বচনে
বুদ্ধি মম; কহ তবে নিশ্চয় করিয়া
এক কথা—যাহে মম হবে শ্রেয়ো লাভ ॥ ২

(২) বিমিশ্র বচনে—কথন বা কর্ম্ম প্রশংসা কথন বা জ্ঞান প্রশংসা এইরূপ সংশয়-জনক বাক্যে (স্বামী)। ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম্ম যুদ্ধ, ধর্ম্মযুদ্ধ উপস্থিত হইলে তাহা কর্ত্তব্য, অথচ কেবল জ্ঞান হইতেই মুক্তি হয়, এইরূপ সন্দেহ-জনক কথায়,(শঙ্কর)। বলদেব বলেন,—সাংখ্য বুদ্ধি ও যোগ বুদ্ধি সাধ্যসাধক রূপে অবিরোধী হইলেও তাহা এস্থলে বিমিশ্রিত হইয়াছে। মধুসূদন বলেন,—জ্ঞান ও কর্ম্ম যোগ উভয়ই একাধিকারীর কর্ত্তব্য কি ভিন্নাধিকারীর কর্ত্তব্য, এবং ভিন্নাধিকারীর কর্ত্তব্য হইলে, অর্জ্জুন কিসের অধিকারী, তাহা বুঝিতে না পারিয়াই তিনি সন্দেহ যুক্ত হইয়াছিলেন। রামানুজ বলেন,—"আত্মাব-লোকন সাধনভূত জ্ঞাননিষ্ঠা সকল ইন্দ্রিয় ও মনের শব্দাদি বিষয় ব্যাপার হইতে উপরতিদ্বারা নিষ্পাদ্য। কর্ম্ম এই বিষয়-ব্যাপার-সংশ্লিষ্ট। অতএব তাহা নিবৃত্তিমূলক জ্ঞাননিষ্ঠার অন্তরায়। তবে আমাকে কেন কর্ম্ম করিতে বলিতেছ?"

পূর্ব্ব শ্লোক সম্বন্ধে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা হইতে বলা যায় যে, এ স্থলে বিমিশ্র বচন অর্থে জ্ঞানযোগ ও কর্ম্মযোগের বা সাংখ্যবুদ্ধি ও যোগ বুদ্ধির মিশ্রণ নহে। ইহার মধ্যে কোন্‌টি অর্জ্জুনের শ্রেয়ঃ, সে সম্বন্ধে তাহার জিজ্ঞাসাও হয় নাই। যুদ্ধরূপ অবর কর্ম্মকে হেয় বলিয়া আবার কেন তাহাই আমার কর্ত্তব্য—এই উপদেশ দিতেছ? ইহাই এ প্রশ্নের অভিপ্রায়।

ভগবান্ দ্বিতীয় অধ্যায়ে সাংখ্যবুদ্ধির কথা বলিয়াছেন, পরে সুখভোগ ও স্বর্গকামনা করিয়া স্বধর্ম্মাচরণের পরিবর্ত্তে নিষ্কামভাবে স্বধর্ম্মানুষ্ঠান বিষয়ে যোগবুদ্ধির কথা বলিয়াছেন, ও শেষে সমাধিতে নিশ্চল বুদ্ধির কথা বলিয়াছেন। কর্ম্মযোগে অনাময়পদ লাভ হয় ভগবান বলিয়াছেন, আবার সাংখ্যবুদ্ধিতে স্থিতপ্রজ্ঞের সমাধিতে অচলা বুদ্ধির ফলেও ব্রহ্ম-নির্ব্বাণ লাভ হয় বলিয়াছেন। ইহাও অর্জ্জুনের নিকট ব্যামিশ্র বচন। অর্জ্জুনের পক্ষে সাংখ্যবুদ্ধি কি যোগ বুদ্ধি অবলম্বনীয় অথবা স্বধর্ম্ম "আচরণ

জন্য এই ঘোর যুদ্ধ কর্ম্ম অবলম্বনীয়, ইহা অর্জ্জুন বুঝিতে পারেন নাই। এইজন্য অর্জ্জুনের সংশয় উপস্থিত হইয়াছে।

· করিতেছ মুগ্ধ যেন - তোমার বাক্য বিস্পষ্ট হইলেও মন্দ বুদ্ধি আমার কাছে তাহা অস্পষ্ট বোধ হইতেছে, যেন তুমি আমার মোহ উৎপাদন করিতেছ। অথচ তোমার তাহা অভিপ্রেত নহে (শঙ্কর)।

শ্রেয়ো লাভ—সংসারে দুই পথ আছে, 'শ্রেয়ঃ' ও 'প্রেয়ঃ'। প্রেয়ঃ—সুখ, শ্রেয়ঃ—পরমার্থ। শ্রেয়োমার্গেই পরিণামে মুক্তি হয়।

শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ সম্বন্ধে কঠোপনিষদে যম ও নচিকেতার প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য। তাহাতে আছে,—

"অন্যচ্ছ্রেয়োঽন্যদুতৈব প্রেয়স্তে উভে নানার্থে পুরুষং সিনীতঃ।
তয়োঃ শ্রেয় আদদানস্য সাধু ভবতি হীয়তেঽর্থাদ্ য উ প্রেয়ো বৃণীতে॥
শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেতস্তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ।
শ্রেয়োহি ধীরোঽভিপ্রেয়সো বৃণীতে প্রেয়ো মন্দো যোগক্ষেমাদ্ বৃণীতে॥
(কঠ উপঃ ২।১-২)

অতএব শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ পরস্পর ভিন্ন। যে শ্রেয়কে গ্রহণ করে, তাহার মঙ্গল হয়। জ্ঞানীই শ্রেয়কে গ্রহণ করে, আর অল্পবুদ্ধি লোক যোগক্ষেম অভিলাষে প্রেয়কে গ্রহণ করে। যাহাতে ইহপরকালে সুখলাভ হয়, তাহা প্রেয়ঃ। মুমুক্ষুর তাহা ত্যাজ্য। প্রেয়ঃ পথ—অবিদ্যার পথ, আর শ্রেয়ঃ পথ—বিদ্যার পথ।

অর্জ্জুন পূর্ব্ব হইতেই শোক ও মোহযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি 'শ্রেয়ঃ' প্রার্থী ছিলেন, অথচ শ্রেয়ঃ কি তাহাও বুঝিতে পারিতেছিলেন না। যুদ্ধ যে শ্রেয়ঃ নহে, তখন তাহাই অর্জ্জুনের ধারণা হইয়াছিল। ভগবানের উক্ত সাংখ্যজ্ঞান ও সমাধিতে অচলা বুদ্ধির উপদেশে অর্জ্জুনের নিজের মতই যেন সমর্থিত হইতেছিল। নিষ্কামভাবে স্বধর্ম্মাচরণ যে শ্রেয়ঃ—এবং সে জন্য যুদ্ধরূপ ঘোর কর্ম্ম যে তখন অর্জ্জুনের শ্রেয়ঃ, ইহা ভগবান্

বুঝাইলেও অর্জ্জুন বুঝিতেছিলেন না। অর্জ্জুন শ্রেয়ঃ সম্বন্ধে সংশয়যুক্ত হইয়া এই প্রশ্ন করিয়াছিলেন।

গীতার উপদেশ অর্জ্জুনের প্রতি উপলক্ষিত হইলেও, উহা কর্ত্তব্য-বিষয়ে সংশয়যুক্ত সকল লোকের পক্ষেই প্রযোজ্য। দ্বিতীয় অধ্যায় পাঠ করিয়া অর্জ্জুনের ন্যায় অধিকাংশ লোকেরই সংশয় নিবৃত্ত হয় না। অনেক ব্যাখ্যাকারই গীতার মর্ম্ম না বুঝিয়া জ্ঞানমার্গ ও কর্ম্মমার্গ সম্বন্ধে বিরুদ্ধ মত প্রচার করিয়াছেন, পূর্ব্বে তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে। অতঃপর ভগবান্ শ্রেয়ঃ কি—তাহা যেরূপ বুঝাইয়াছেন, তাহা বিশেষ করিয়া বুঝিতে হইবে। আপাততঃ অর্জ্জুনের এই প্রশ্নের উত্তরে জ্ঞানযোগ ও কর্ম্মযোগ উভয়ই যে তুল্যরূপে নিঃশ্রেয়স সিদ্ধির উপায় এবং নিষ্কাম-ভাবে আচরিত স্বধর্ম্ম যুদ্ধও যে এই কর্ম্মযোগের অন্তর্গত, ইহাই ভগবান্ উপদেশ দিতেছেন।

শ্রীভগবানুবাচ।

লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ।
জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্ম্মযোগেন যোগিনাম্ ॥ ৩

শ্রীভগবান—

কহিয়াছি পূর্ব্বে আমি শুন পুণ্যবান্
আছে হেথা দুই নিষ্ঠা,—সাংখ্যজ্ঞানীদের
জ্ঞানযোগে, কর্ম্মযোগে আর যোগীদের ॥ ৩

(৩) নিষ্ঠা—স্থিতি, অনুষ্ঠেয় তাৎপর্য্য (শঙ্কর)। মোক্ষপরতা (স্বামী)। সাধ্যসাধন-ভেদে নিষ্ঠা দুই প্রকার হইলেও উহা একাত্মক ; এই জন্য এক-বচনে ইহা মূলে ব্যবহৃত হইয়াছে (বলদেব)।

নিষ্ঠা ও যোগ—প্রায় একই অর্থে গীতায় ব্যবহৃত। নিষ্ঠা অর্থে স্থিতি, অনুষ্ঠেয়, তাৎপর্য্য (হনু)। যোগ অর্থে আত্মাতে বা ঈশ্বরে যুক্ত-ভাব। বুদ্ধিকে স্থির, অবিচলিত ও আত্মাতে যুক্ত বা প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখাই নিষ্ঠা। আত্মাবলোকন-নিরত বুদ্ধিই আত্মনিষ্ঠ। তাহাই সাংখ্য জ্ঞানীদের জ্ঞানযোগ। আর ইন্দ্রিয় ও মনের সংযম পূর্ব্বক কর্ত্তব্য কর্ম্মে বুদ্ধিকে নিয়মিত করিয়া আত্মাতে স্থির ও অবিচলিত ভাবে রাখাই কর্ম্মনিষ্ঠা। তাহাই কর্ম্মযোগে যোগীদের নিষ্ঠা। গীতায় এ অধ্যায়ে কর্ম্মযোগনিষ্ঠা বিশেষভাবে উপদিষ্ট হইয়াছে।

দুই—বিষয় ব্যাকুল-বুদ্ধিযুক্ত মুগ্ধ লোকের কর্ম্ম-যোগে অধিকার; আর মোহ-উত্তীর্ণ কামনাত্যাগী অব্যাকুল-বুদ্ধিযুক্ত লোকের জ্ঞানযোগে অধিকার। এই দুই অধিকার হইতে দুই নিষ্ঠা (রামানুজ)। এই অর্থ সঙ্গত নহে। বিষয় ব্যাকুল মুগ্ধ লোকের কোন নিষ্ঠাই সম্ভব নহে। মোহ-উত্তীর্ণ কামনাত্যাগী অব্যাকুল-বুদ্ধিযুক্ত লোকের পক্ষেই এই দুই রূপ নিষ্ঠার কোন একরূপ নিষ্ঠা সম্ভব। এইরূপ বুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তি কোন এক নিষ্ঠায় স্থিত হইলে, উভয় নিষ্ঠার ফল প্রাপ্ত হন, ইহাই গীতায় উক্ত হইয়াছে।

পূর্ব্বে—এই গীতার প্রথমে, অথবা সৃষ্টির পূর্ব্বে (স্বামী, বলদেব ও মধুসূদন)। কিংবা বেদে,—"পুরা বেদাত্মনা ময়া প্রোক্তা"। সৃষ্টির আদিতে সকল প্রজা সৃষ্টি করিয়া তাহাদের অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স প্রাপ্তির কারণ আমি সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর প্রবৃত্তিমার্গে ও নিবৃত্তিমার্গে এই দুই রূপ নিষ্ঠা বেদে প্রকাশ করিয়াছি (শঙ্কর)। গীতার চতুর্থ অধ্যায়ের ১-৩ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

জ্ঞানযোগ ও কর্ম্মযোগ—দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৩৯ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। আত্মবিষয়-বিবেকী সাংখ্যজ্ঞানীদের, ব্রহ্মচর্য্য হইতে সন্ন্যাসাশ্রমে পরমহংস, পরিব্রাজক প্রভৃতি হইয়া, জ্ঞানভূমিতে আরোহণ পূর্ব্বক শুদ্ধান্তঃ-

করণ হইলে, জ্ঞানমার্গ অবলম্বনীয় হয়। এবং সেই জ্ঞানমার্গ লাভ জন্য,—তাহার উপযুক্ত হইবার জন্য—চিত্তশুদ্ধি করিতে হয়, ও সেই জন্য শ্রুতি-স্মৃতি-নির্দ্দিষ্ট নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম এবং লৌকিক কর্ম্ম নিষ্কামভাবে সম্পাদন করিতে হয়। ইহাই কর্ম্মযোগ, (শঙ্কর)। রামানুজ বলেন,—মোক্ষাভিলাষীই জ্ঞানযোগের অধিকারী। ফলাভিসন্ধি ত্যাগ-পূর্ব্বক পরম পুরুষের আরাধনা রূপ কর্ম্মনিষ্ঠায় মনের মলা দূর হয়, ইন্দ্রিয়ের ব্যাকুলতা দূর হয় ও জ্ঞাননিষ্ঠায় অধিকার হয়। স্বকর্ম্ম দ্বারা ভগবদর্চ্চনার কথা পরে উক্ত হইয়াছে। অতএব এই কর্ম্মনিষ্ঠা ব্যতীত আত্মনিষ্ঠা দুঃসাধ্য।

যাহা হউক, আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে, গীতায় এই দুই নিষ্ঠারই সমান প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। কেননা উভয় নিষ্ঠার ফলেই আত্মজ্ঞান লাভ হয়, ইহা পরে উক্ত হইয়াছে। (১৩ অধ্যায় ২৪ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। সুতরাং কর্ম্মমার্গ কেবল জ্ঞানমার্গের পূর্ব্ব সোপান, এরূপ বলা যায় না। জ্ঞানযোগ ব্যতীত কর্ম্মযোগে সিদ্ধি হয় না, ও কর্ম্মযোগ ব্যতীত জ্ঞান-যোগে স্থিতি হয় না,—ইহাও বলা যায় না। যেমন স্বধর্ম্মাচরণ দ্বারা চিত্ত নির্ম্মল হইলে নৈষ্কর্ম্ম্য-সিদ্ধি হয়, এবং তাহার পরিণামে ধ্যানযোগ আশ্রয় করিয়া ভগবদ্ভক্তিলাভ পূর্ব্বক পরমেশ্বর তত্ত্ব-জ্ঞান হেতু মোক্ষ হয়,—সেইরূপ ভগবান্‌কে আশ্রয় করিয়া সর্ব্ব অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম সদা আচরণ করিয়াও ভগবৎ-প্রসাদে অব্যয় পদ লাভ রূপ মোক্ষ হইতে পারে। ইহা গীতায় পরে উক্ত হইয়াছে (১৮ অধ্যায়, ৪৭-৫৭ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। অতএব নিষ্কাম কর্ম্মাচরণ করিতে করিতে চিত্ত নির্ম্মল হইলে, বুদ্ধি স্থির হয়। বুদ্ধি স্থির হইলে জ্ঞানযোগ সাধ্য হয়। আর জ্ঞান-যোগে আত্মতত্ত্ব-জ্ঞান এবং পুরুষ-প্রকৃতি-বিবেক-জ্ঞান সিদ্ধ হইলে সেই সিদ্ধ অবস্থায় নিষ্কাম কর্ম্মের প্রকৃত অধিকারী হওয়া যায়, লোক সংগ্রহার্থ বা ঈশ্বরার্থ কর্ম্ম—ঈশ্বরে অর্পণ বুদ্ধিকে উপযুক্তরূপে অনুষ্ঠান করা সম্ভব হয়। ঋষিগণ, সিদ্ধগণ ও স্বয়ং ভগবান্ এইরূপে জগতের হিতার্থ কর্ম্ম করেন।

এইরূপে কর্ম্মযোগ দ্বারাও পরম শ্রেয়ঃ লাভ হয়। একথা এস্থলে আর বিশদ করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই।

ন কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।
ন চ সংন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি ॥ ৪

কর্ম্ম অনুষ্ঠান সুধু করি পরিত্যাগ,
না পারে পুরুষে কভু হ'তে কর্ম্মহীন ;
সুধু সন্ন্যাসেতে নাহি হয় সিদ্ধিলাভ ॥ ৪

(৪) কর্ম্ম অনুষ্ঠান পরিত্যাগ—আরব্ধ শাস্ত্রীয় কর্ম্ম পরিত্যাগ (রামানুজ)। যজ্ঞাদি ক্রিয়ার অনুষ্ঠানত্যাগ (শঙ্কর)। অর্জ্জুন যুদ্ধের অনুষ্ঠান করিয়া তাহা পরিত্যাগ করিতে চাহিতেছেন বলিয়া এইরূপ বলা হইয়াছে (শঙ্কর)।

এ শ্লোকে 'কর্ম্মণাম্' আছে। অর্থাৎ সকল প্রকার কর্ম্ম। কর্ম্মের আরম্ভ বা অনুষ্ঠানে প্রবৃত্তি পরিত্যাগের দ্বারা কখন কর্ম্ম ত্যাগ হয় না। কর্ম্মের মূল কাম, বাসনা, সংস্কার। দুঃখ সুখ বোধ হেতু ত্যাগ-গ্রহণাত্মক কর্ম্মের ইচ্ছা হয়। ইচ্ছা হইতে সংকল্প হয়। সংকল্প দ্বারা কর্ম্ম প্রবৃত্তি হয়। তাহা দ্বারা কর্ম্মেন্দ্রিয় চালিত হইয়া কর্ম্মারম্ভ হয়। কর্ম্মমূল—কাম সঙ্কল্প ইচ্ছা দ্বেষ প্রভৃতি ত্যাগ না হইলে, কেবল আরম্ভ ত্যাগে প্রকৃত কর্ম্ম ত্যাগ হয় না—নৈষ্কর্ম্ম্য সিদ্ধিও হয় না। সে মিথ্যাচারী, তাহার মনে বিষয় স্পৃহা থাকে—রাগ থাকে।

কর্ম্মহীন—(মূলে আছে 'নৈষ্কর্ম্ম্য') নৈষ্কর্ম্ম্যভাব বা কর্ম্মশূন্যতা, কিংবা জ্ঞানযোগে নিষ্ঠা বা নিষ্ক্রিয়ভাবে আত্মস্বরূপে অবস্থান (শঙ্কর)। সমস্ত ইন্দ্রিয় ব্যাপার রূপ কর্ম্মে বিরতি বা জ্ঞাননিষ্ঠা (বলদেব, রামানুজ)।

নৈষ্কর্ম্য, অর্থাৎ নৈষ্কর্ম্য-লক্ষণ অকর্ত্তাত্মজ্ঞান লক্ষণ সিদ্ধি। জ্ঞানাধিকারীর জ্ঞানের দ্বারাই সিদ্ধি হয়, কেবল কর্ম্মারম্ভ ত্যাগে সিদ্ধি হয় না। (হনু)।

স্বধু সন্ন্যাসেতে—কর্ত্তব্যকর্ম্ম সন্ন্যাসে বা কেবল কর্ম্ম পরিত্যাগ মাত্রে বা জ্ঞান লাভ হইবার পূর্ব্বে কর্ম্মত্যাগ করিলে সিদ্ধি হয় না (শঙ্কর)। চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত জ্ঞান-শূন্য সন্ন্যাসে মোক্ষ হয় না। (স্বামী)।

ব্যাখ্যাকারগণের মতে এই শ্লোকের অভিপ্রায় এই যে, কর্ম্ম ও জ্ঞান পরস্পরে বিরোধী হইলেও, অর্থাৎ উভয়ের একত্র অনুষ্ঠান একই অধিকারীর পক্ষে অসম্ভব হইলেও. ইহার একটিকে ত্যাগ করিয়া অন্যটির আশ্রয় গ্রহণ করিলে কোন ফল হয় না। অর্থাৎ কর্ম্মাচরণ কেবল চিত্তশুদ্ধির জন্য জ্ঞানমার্গে আরোহণ করিবার জন্য হইলেও—গৌণ করে মোক্ষের কারণ হয়। এই জন্য সাধনার প্রথমাবস্থায় কর্ম্মমার্গ ত্যাগ করিতে নাই। যাহা হউক, গীতায় পরে উক্ত হইয়াছে যে যোগ বা কর্ম্মযোগ ব্যতীত সন্ন্যাস লাভ হয় না। যোগিগণ আত্মশুদ্ধির জন্য আসক্তিশূন্য হইয়া যজ্ঞ দান তপ প্রভৃতি নিত্য কার্য্য কর্ম্ম করেন। কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারাই যে পরিণামে নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি হয়—কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া ক্রমে অসক্ত-বুদ্ধি জিতাত্মা ও স্পৃহাহীন হইলে তবে কর্ম্মসন্ন্যাস অর্থাৎ সর্ব্বকর্ম্ম-ফল-সন্ন্যাস দ্বারা নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি হয়,—তাহা গীতায় পরে (১৮।৪৭-৪৯ শ্লোকে) উক্ত হইয়াছে। কিন্তু কর্ম্মযোগে সিদ্ধি লাভ করিয়া পরিণামে জ্ঞান-নিষ্ঠায় আরোহণ করিতে পারিলে, কর্ম্মযোগের আর প্রয়োজন হয় না,—এ কথাও সর্ব্বথা সত্য নহে। চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত জ্ঞানমার্গে আরোহণ করা যায় না। কর্ম্মনিষ্ঠাই এই চিত্তশুদ্ধির একমাত্র কারণ, এই কর্ম্ম হইতেই পরিণামে জ্ঞানলাভ হয় বটে,—কিন্তু জ্ঞাননিষ্ঠা লাভ হইলে তাহার পরে কেবল কর্ম্ম-সন্ন্যাস দ্বারা সিদ্ধি হয় না। কেননা যোগস্থ হইয়া কর্ম্ম না করিলে. আবার চিত্ত-বিক্ষেপ উপস্থিত হইয়া সন্ন্যাস হইতে প্রচ্যুতি হইতে পারে। যাঁহাদের এ প্রচ্যুতিরও সম্ভব নাই, তাঁহারা সাধনার জন্য

কর্ম্মযোগ অবলম্বন না করিলেও, সিদ্ধ হইয়া, তাঁহারা কর্ম্ম করেন, তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। এ উভয় নিষ্ঠার মধ্যে একটি ত্যাগ করিলে আর একটিতে মোক্ষ হয় না। সে যাহা হউক, এ সম্বন্ধে শঙ্করাচার্য্য ও রামানুজ যাহা বলিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।—

শঙ্কর এই শ্লোক সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—"অর্জ্জুন যুদ্ধ করিব না বলিয়াছিলেন বলিয়া, ভগবান্ এই উপদেশ দিতেছেন। অথবা জ্ঞান ও কর্ম্ম পরস্পর বিরোধী,—এককালে এক পুরুষের দ্বারা উভয়ই আচরণীয় নহে; অতএব জ্ঞান ও কর্ম্ম পরস্পর অপেক্ষা না করিয়া মোক্ষের কারণ হইতে পারে,—এই প্রকার সম্ভাবনা নিবারণ জন্য ভগবান্ বলিয়াছেন যে, কর্ম্মনিষ্ঠা জ্ঞান প্রভৃতির হেতু বলিয়া, পরতন্ত্র-ভাবে তাহা মোক্ষের কারণ হয়। কিন্তু জ্ঞাননিষ্ঠা কর্ম্মনিষ্ঠা হইতে উদিত হইয়া, স্বতন্ত্র ভাবে মোক্ষের কারণ হয়। কর্ম্ম এস্থলে যজ্ঞাদি কর্ম্ম। ইহা চিত্তশুদ্ধিকর, অর্থাৎ দুরদৃষ্ট-নাশকারী বলিয়া, তাহার ফলে জ্ঞাননিষ্ঠার উদয় হয়। এইরূপে জ্ঞাননিষ্ঠা ও কর্ম্মনিষ্ঠা-পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত। এই জন্য জ্ঞানপ্রাপ্তির অনুকূল কর্ম্মানুষ্ঠান না করিলে, নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি হয় না। আর কেবল কর্ম্মের অনুষ্ঠানেও নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি হয় না। নৈষ্কর্ম্ম্য অর্থে জ্ঞানযোগ। জ্ঞানযোগের প্রতি কর্ম্মারম্ভই হেতু।"

শঙ্কর আরও বলেন,—"যজ্ঞাদি বিহিত ক্রিয়া এই জন্মে বা পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে অনুষ্ঠিত হইয়া দুরদৃষ্ট ক্ষয় দ্বারা চিত্তশুদ্ধির কারণ হয় এবং চিত্ত-শুদ্ধির দ্বারা জ্ঞাননিষ্ঠা প্রাপ্তির কারণ হয়। স্মৃতিতে আছে,—

> জ্ঞানমুৎপদ্যতে পুংসাং ক্ষয়াৎ পাপস্য কর্ম্মণঃ।
> যথা দর্পতলপ্রখ্যে পশ্যত্যাত্মানমাত্মনি ॥"

অতএব নৈষ্কর্ম্ম্য-সিদ্ধি কেবল কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারাই লব্ধ হয়। কর্ম্মের অনারম্ভে নৈষ্কর্ম্ম্য-সিদ্ধি হইতে পারে না। কর্ম্মযোগই জ্ঞানযোগ-লাভের উপায়। এজন্য শ্রুতিতে আছে,—"তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা

: বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসাঽনাশকেন (বৃহদারণ্যক, ৪।৪।২২)।
ইহা হইতে বুঝা যায় যে, কর্ম্মযোগই জ্ঞানযোগের উপায়।

গীতায় এই জন্য উক্ত হইয়াছে।—

"যোগিনঃ কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে।" (৫।১১)

"যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্।" (১৮।৩)

রামানুজ বলেন, "মুমুক্ষুর পক্ষে সহসা জ্ঞানযোগ দুষ্কর। সর্ব্বেন্দ্রিয়-ব্যাপারাখ্য কর্ম্মের উপরতি পূর্ব্বক যে জ্ঞাননিষ্ঠা, তাহা আরব্ধ শাস্ত্রীয় কর্ম্মত্যাগ করিলে সম্ভব হয় না। বিশেষতঃ নিষ্কামভাবে পরমপুরুষের আরাধনা-বিষয়ক কর্ম্মের ফলে অনাদিকাল-প্রবর্ত্তিত ও সঞ্চিত পাপরাশি নষ্ট না হইলে, আত্মনিষ্ঠা দুঃসম্পাদ্য হয়।"

নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ ॥ ৫

নাহি হেন কেহ, যেই কর্ম্ম নাহি করি
রহে ক্ষণেকের তরে ; করে কর্ম্ম সব
প্রকৃতি-জনিত গুণে অবশ হইয়া ॥ ৫

(৫) নাহি কেহ—ক্ষণেকের তরে—পুরুষ অকর্ত্তা (গীতা, ১৩।৩১)। পুরুষ প্রকৃতিস্থ হইয়া প্রকৃতিজ গুণ ভোগ করে (১৩।২১), এবং প্রকৃতিজ অহঙ্কার বশে আপনাকে কর্ত্তা মনে করে (৩।২৭)। এই জন্য অকর্ত্তা পুরুষে প্রকৃতি-কৃত কর্ম্মের অধ্যাস হয়। প্রকৃতি পরিণামী, নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল, নিয়ত ক্রিয়াশীল। এজন্য উক্ত অধ্যাস হেতু পুরুষ আপনাকে সর্ব্বদা কর্ম্মকারী কর্ত্তা মনে না করিয়া থাকিতে পারে না। এ তত্ত্ব পরে ত্রয়োদশ অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে।

প্রকৃতি-জনিত গুণে—প্রকৃতি হইতে জাত সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের দ্বারা মুগ্ধ হইয়া (শঙ্কর)। অথবা প্রকৃতিজ বা নিজ স্বভাবানুরূপ রাগ দ্বেষাদি গুণে বশীভূত হইয়া (স্বামী)। প্রাক্তন কর্ম্মানুগুণানুসারে প্রবৃদ্ধ গুণবশে (রামানুজ)। এই অধ্যায়ের শেষে এই কথা বুঝান আছে। (পরে ১৩।২১ শ্লোক ও ১৩।৫-১৮ শ্লোক, ও তাহার ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।)

কি কারণে জ্ঞানলাভের পূর্ব্বে কর্ম্ম-সন্ন্যাসের দ্বারা সিদ্ধি হয় না, অর্থাৎ আত্মনিশ্চয় হইলেও আত্মাতে অবস্থিতি করিবার পূর্ব্বে প্রকৃতির অধীন মানব প্রকৃতিজ গুণের দ্বারা বিচলিত হয় বলিয়া তাহাতে সিদ্ধি হয় না,—ইহাই এ শ্লোকে দেখান হইয়াছে (শঙ্কর, মধু)।

স্বামী বলেন,—জ্ঞানী বা অজ্ঞানী, কেহই কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারে না। কেননা সকলেই নিজ নিজ স্বভাববশে পরিচালিত হইয়া কর্ম্ম করে। এই জন্য একেবারে কর্ম্মত্যাগ সম্ভব নহে, কেবল কর্ম্মে আসক্তি ত্যাগই সম্ভব। এই অর্থই অধিক সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়।

বলদেব-বলেন,—অবিশুদ্ধচিত্ত লোকে বৈদিক কর্ম্ম সন্ন্যাস করিলেও কি কারণে লৌকিক কর্ম্মে রত হয়, তাহা এখানে দেখান হইয়াছে।

হনুমান বলেন,—যোগানুষ্ঠান পূর্ব্বক সত্ত্বশুদ্ধি-জনিত আত্মবিজ্ঞান হইতেই সিদ্ধি হয়, পূর্ব্ব শ্লোকে ইহার ইঙ্গিত করা হইয়াছে। কেবল কর্ম্মানুষ্ঠান ত্যাগ করিলে বা কর্ম্মসন্ন্যাস করিতে গেলে, কেন সিদ্ধি হয় না, তাহাই এ শ্লোকে বুঝান হইয়াছে।

প্রকৃতিজ রজোগুণ চঞ্চল, তাহাই সকলকে কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করে। কিরূপে ইহা কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করে, তাহা দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষে ব্যাখ্যায় বিবৃত হইয়াছে। মানুষের সত্ত্বগুণ যতই প্রবল হউক, রজঃ ও তমোগুণ একেবারে নষ্ট হয় না। তাহারা অভিভূত থাকে মাত্র। অবসর পাইলেই তাহারা ক্রিয়াশীল হয়, তখন রজোগুণ কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করে। প্রকৃতিকে সম্পূর্ণ বশীভূত করিতে না পারিলে, গুণাতীত না হইলে, আর প্রকৃতিকে

নিয়মিত করা যায় না। তাহার পূর্ব্বে জ্ঞানযোগ বা কর্ম্মযোগ কিছুতেই সিদ্ধি হয় না। শঙ্কর বলেন যে, এই কথা 'অজ্ঞ' ব্যক্তি সম্বন্ধে প্রযোজ্য, জ্ঞানীর সম্বন্ধে নহে। কিন্তু জ্ঞানী হইলেই ত্রিগুণাতীত হওয়া যায় না। জ্ঞান সাত্ত্বিক বুদ্ধির রূপমাত্র, তাহা বলিয়াছি। অতএব একথা জ্ঞানীর সম্বন্ধেও প্রযোজ্য।

চণ্ডীতে আছে—

'জ্ঞানিনামপি চেতাংসি দেবী ভগবতী হি সা।
বলাদাকৃষ্য মোহায় মহামায়া প্রযচ্ছতি॥'

অতএব জ্ঞানযোগে সাধনা আরম্ভ করিবার পূর্ব্বেও—যত দিন প্রকৃতির বন্ধন হইতে মুক্ত হওয়া না যায়, প্রকৃতিতে আত্মাধ্যাস যত দিন দূর না হয়, তত দিন সর্ব্ব কর্ম্মসন্ন্যাস চেষ্টা বৃথা।

কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে॥ ৬

কর্ম্মেন্দ্রিয়গণে যেই সংযত করিয়া,
ইন্দ্রিয়-বিষয় সব ভাবে মনে মনে,
মূঢ়মতি—মিথ্যাচারী কহে হেন জনে॥ ৬

(৬) কর্ম্মেন্দ্রিয়গণে—সংযত করিয়া—অনাত্মজ্ঞ ব্যক্তির বিহিত কর্ম্ম আরম্ভ না করিলে কি ফল হয়, তাহা এ স্থলে উক্ত হইয়াছে (শঙ্কর)। বাক্ পাণি পাদ পায়ু ও উপস্থ ইহারা কর্ম্মেন্দ্রিয়। এই সকল কর্ম্মেন্দ্রিয় মনের দ্বারা প্রবর্ত্তিত। মন বুদ্ধি দ্বারা চালিত। ইহা সাধারণ নিয়ম। ক্রিয়া-শক্তি অন্তঃকরণে নিহিত। প্রবল বাসনা-বশে যখন এই শক্তি কার্য্যোন্মুখী হয়, তখন বুদ্ধিতে ইচ্ছা সংকল্পাদিরূপে তাহার বিকাশ হয়, এবং

তাহা দ্বারা মনে কর্ম্মপ্রবৃত্তি হয়। এই কর্ম্ম-শক্তি তখন কার্য্যোন্মুখ হইয়া কর্ম্মনাড়ী দ্বারা বাহ্য কর্ম্মেন্দ্রিয়ে পরিচালিত হয়। তখন কর্ম্মেন্দ্রিয় কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত হয়। কিন্তু যদি মনে এই শক্তি ক্রিয়াশীল হইলেও, মন তাহাকে ঊর্দ্ধস্রোতঃ বৃত্তি দ্বারা সংযত করে, তাহাকে আর কর্ম্মনাড়ী দ্বারা কর্ম্মেন্দ্রিয়ে পরিচালিত হইতে না দেয়, অথবা পরিচালিত হইলেও নিরোধ-শক্তির সাহায্যে তাহাকে সংযত করে, তবে কর্ম্মেন্দ্রিয়গণ সংযত হয়,—আর কর্ম্ম করে না। কিন্তু উক্ত অন্তঃকরণে সেই কর্ম্ম-শক্তির স্ফূর্ত্তি অনুভূত হয়। জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা যে বিষয় গ্রহণ হইয়াছে, তাহা রাগদ্বেষ দ্বারা হেয় কি উপাদেয় স্থির করিয়া, তাহা ত্যাগ বা গ্রহণের ইচ্ছা বা কামনা মনে অনুভূত হয়।

ভাবে মনে মনে—যাহারা বিমূঢ়াত্মা যাহাদের রাগদ্বেষ-দূষিত-চিত্ত, তাহারা ঔৎসুক্যবশতঃ কর্ম্মেন্দ্রিয়-নিগ্রহ করিলেও, অর্থাৎ বহিরিন্দ্রিয় দ্বারা কর্ম্ম না করিলেও মনে মনে অনুরাগ-বিরাগ-বশে শব্দাদি ইন্দ্রিয়-বিষয় স্মরণ করে (মধু)। নিষ্কাম কর্ম্ম দ্বারা চিত্তশুদ্ধির পূর্ব্বে কর্ম্মত্যাগ করিয়া মনে মনে ঈশ্বর ধ্যান করিতে গেলেও তাহার পরিবর্ত্তে বিষয় চিন্তা মনে উদিত হয় (বলদেব)। পাপধ্বংসের পূর্ব্বে,—মনোজয় হইবার পূর্ব্বে —আত্মজ্ঞানে প্রবৃত্ত হইলেই বিষয়-প্রবণতা-বশতঃ মন আত্মা হইতে বিমুখ হইয়া বিষয় চিন্তা করে (রামানুজ), ভগবদ্‌-ধ্যান-চ্ছলে ইন্দ্রিয়ের বিষয় স্মরণ করে (স্বামী)। অনাত্মজ্ঞ ব্যক্তির বিহিত কর্ম্ম ত্যাগ করা ভাল নহে, ইহাই এস্থলে বলা হইতেছে (শঙ্কর)। গীতার ২।৫৯ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

এই শ্লোকের অর্থ এই যে, যাহারা কেবল বাহ্য ইন্দ্রিয়দের প্রত্যাহার করিয়া বিষয় গ্রহণ করা ত্যাগ করে—অথচ মনকে সংযত না করিতে পারায় মনে মনে বিষয় চিন্তা করে, তাহাদের ধ্যানযোগ জ্ঞানযোগ বা কর্ম্মসন্ন্যাসযোগ কিছুই হয় না। কর্ম্মযোগানুষ্ঠানের অভ্যাস দ্বারাই মনোজয় হয়। আর ভগবৎপরায়ণ হইয়া যিনি 'যুক্ত' ব্যক্তি হন—ঈশ্বরার্থ

কর্ম্মে নিরত হন, তিনিই মনকে জয় করিয়া কর্ম্মযোগ জ্ঞানযোগ প্রভৃতির অধিকারী হন।

মিথ্যাচারী—নিজ সংকল্পের অন্যথা আচরণকারী (রামানুজ)। পাপাচারী (শঙ্কর), বা কপটাচারী (স্বামী)। ইন্দ্রিয় সংযম ক্রিয়া বৃথা হওয়ায় সে দাম্ভিক হয়। (বলদেব)।

যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেঽর্জ্জুন।
কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্ম্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে ॥ ৭

কিন্তু চিত্তবলে করি ইন্দ্রিয় সংযত
আসক্তি ত্যজিয়া যেই, কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা
হয় কর্ম্ম-যোগে রত—শ্রেষ্ঠ সেই জন॥ ৭

(৭) চিত্তবলে—(মূলে আছে মনসা)। মনের দ্বারা (শঙ্কর)। বিবেক যুক্ত হইয়া (মধু)।

ইন্দ্রিয়—জ্ঞানেন্দ্রিয়। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়। কিংবা ইন্দ্রিয় অর্থে কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয় উভয়ই হইতে পারে।

সংযত—ঈশ্বরপরায়ণ করিয়া (স্বামী)। বিষয়াসক্তি-নিবৃত্ত করিয়া (মধু)। আত্মাবলোকন প্রবৃত্তির দ্বারা নিয়মিত করিয়া (রামানুজ)।

আসক্তি ত্যজিয়া—অনাসক্ত হইয়া, অসঙ্গ-পূর্ব্বক (রামানুজ), ফলাভিলাষ ত্যাগ করিয়া (স্বামী)।

কর্ম্মেন্দ্রিয়—বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ এই পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয়।

শ্রেষ্ঠ—উক্ত মিথ্যাচারী ও ইতরলোক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ (শঙ্কর, মধু)। তাহার জ্ঞান সম্ভাবনা বলিয়া পূর্ব্বোক্ত মিথ্যাচারী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ (বলদেব)।

চিত্তশুদ্ধির দ্বারা জ্ঞানলাভ হয় বলিয়া শ্রেষ্ঠ (স্বামী)। রামানুজ ভিন্ন অর্থ করেন। তিনি বলেন,—তাহাদের প্রমাদের সম্ভাবনা না থাকায় তাহারা জ্ঞাননিষ্ঠাবান্ পুরুষ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ হয়।

নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং কর্ম্ম জ্যায়োহ্যকর্ম্মণঃ।
শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকর্ম্মণঃ॥ ৮

করিও নিয়ত কর্ম্ম ; কর্ম্ম ত্যাগ হ'তে,
কর্ম্ম হয় শ্রেয়তর। কর্ম্ম ত্যাগ করি,
নির্ব্বাহ জীবন-যাত্রা হবে না তোমার॥ ৮

(৮) করিও নিয়ত কর্ম্ম—নিত্য কর্ম্ম করিও অর্থাৎ শ্রুতি স্মৃতি-বিহিত নিত্য কর্ম্ম করিও (স্বামী, মধু, শঙ্কর)। চিত্তশুদ্ধি জন্য নিষ্কাম ভাবে স্ববিহিত আবশ্যক কর্ম্ম করিও (বলদেব)। স্বীয় স্বীয় বর্ণ ও আশ্রম বিহিত কর্ম্ম করিও।

রামানুজ ভিন্ন অর্থ করেন। তিনি বলেন,—তুমি প্রকৃতির সহিত সংসৃষ্ট থাকায় নিত্যকাল ব্যাপিয়া, অনাদি বাসনার দ্বারা চালিত হইয়া, যে কর্ম্ম করিবে, তাহাই তোমার সর্ব্বাপেক্ষা সুকর হইবে। এই শ্লোকের শেষ ছত্রের সহিত মিলাইয়া দেখিলে, এই অর্থও একরূপ সঙ্গত হয়। কারণ মূল শ্লোকে 'নিয়তং'—তৎপরস্থিত 'কুরু' এই ক্রিয়ার বিশেষণ বোধ হয়। 'নিয়ত'এর সহিত 'কর্ম্ম' অন্বয় করিলে, তাহা কিছু দুরান্বয় হইয়া পড়ে। কিন্তু এস্থলে সর্ব্বদা কর্ম্ম কর এ অর্থ অপেক্ষা, নিয়ত অর্থাৎ আশ্রমাদি-বিহিত কর্ম্ম কর, এই অর্থই অধিকতর সঙ্গত।

কর্ম্মত্যাগ হ'তে কর্ম্ম শ্রেষ্ঠ—চতুর্থ শ্লোকোক্ত কর্ম্মের অনারম্ভ অপেক্ষা কর্ম্ম শ্রেষ্ঠ (শঙ্কর, বলদেব)। সর্ব্ব কর্ম্ম ত্যাগ অপেক্ষা কর্ম্ম করা

ভাল (স্বামী)। রামানুজ বলেন,—জ্ঞাননিষ্ঠা অপেক্ষাও কর্ম্ম-নিষ্ঠা শ্রেষ্ঠ। কেননা পূর্ব্বে অভ্যাস না হওয়ায় জ্ঞান-নিষ্ঠায় স্বাভাবিক কর্ম্মপ্রবৃত্তিকে সহজে নিবৃত্ত করা যায় না। আরও কর্ম্মযোগে আত্মার স্বরূপ উপলব্ধি করিলে, আত্মার অকর্তৃত্ব অনুমিত হয়। এই জন্য আত্মজ্ঞানও কর্ম্ম যোগের অন্তর্গত, এবং সেই হেতু কর্ম্মযোগ শ্রেষ্ঠ। জ্ঞাননিষ্ঠায় অধিকারীরও কর্ম্মযোগ আচরণীয়। কেন না, জ্ঞাননিষ্ঠেরও কর্ম্মত্যাগ করিলে শরীর রক্ষা হয় না। এই যুক্তি রামানুজের। তিনি আরও বলেন যে, যে পর্য্যন্ত শরীর ধারণ করিতে হয়, ও সাধনার সমাপ্তি না হয়, সে পর্য্যন্ত ন্যায়ার্জ্জিত ধনের দ্বারা মহাযজ্ঞ ও নিত্য-নৈমিত্তিকাদি কর্ম্ম অবশ্য সম্পন্ন করিয়া, যজ্ঞাবশিষ্ট আহারের দ্বারা শরীর ধারণ করিবে। কেন না আহার শুদ্ধ হইলে সত্ত্বশুদ্ধি হয়। সত্ত্বশুদ্ধিতে স্মৃতি স্থির হয়। এই জন্য প্রকৃতিসংসৃষ্ট কর্ম্মযোগই সুকর।

জীবন-যাত্রা—শরীর-স্থিতি (শঙ্কর)। শরীর-রক্ষার জন্য জ্ঞান-মার্গাবলম্বীকেও ভিক্ষাভ্রমণাদি ক্রিয়া করিতে হয়। ক্ষত্রিয়ের ত কর্ম্ম ব্যতীত জীবন ধারণের অন্য উপায় নাই (বলদেব)। ক্ষত্রিয়োচিত কর্ম্ম ব্যতীত অর্জ্জুনের শরীরযাত্রা উপযুক্ত রূপে নির্ব্বাহ হইবে না (মধুসূদন)। দেহাদি চেষ্টা দ্বারা শরীর-রক্ষা হয়, নতুবা মৃত্যু হয় (গিরি)।

যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোহন্যত্র লোকোহয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর ॥ ৯

যজ্ঞ হেতু কর্ম্ম বিনা হয় অন্য কর্ম্ম
এই লোকে, হে কৌন্তেয়, বন্ধন-কারণ ;
যজ্ঞ তরে কর্ম্ম কর আসক্তি ত্যজিয়া ॥ ৯

(৯) যজ্ঞহেতু—"যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ"—এই শ্রুতি অবলম্বন করিয়া শঙ্কর, স্বামী, মধুসূদন, গিরি, বলদেব ইঁহারা 'যজ্ঞ' অর্থে বিষ্ণু বা পরমেশ্বর স্থির করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, যজ্ঞহেতু অর্থ—ঈশ্বর বা বিষ্ণুর আরাধনার্থ—তাঁহার তোষণার্থ। কিন্তু রামানুজ 'যজ্ঞ' সাধারণ অর্থে বুঝিয়াছেন। অর্থাৎ এ শ্লোকে ও পরের কয় শ্লোকে যজ্ঞ একই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে,—এই কথা বলিয়াছেন। এ অর্থই বেশ সঙ্গত। পরে যজ্ঞের অর্থ আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিব। যাহা হউক এ কথা বলা যাইতে পারে যে, যজ্ঞ শব্দ এ স্থলে বিশেষ অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। এস্থলে কর্ম্মকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। এক—যজ্ঞার্থে কর্ম্ম, তাহা বন্ধন কারণ নহে। আর এক—যজ্ঞার্থ কর্ম্ম হইতে অন্য কর্ম্ম, যাহা বন্ধন-কারণ। সাধারণ অর্থে যাহা যজ্ঞ, বর্ণোচিত ও আশ্রমোচিত সমুদায় কর্ম্ম তাহার অন্তর্ভূত নহে। ক্ষত্রিয় বর্ণোচিত যুদ্ধ যজ্ঞের অন্তর্গত নহে। যজ্ঞের সাধারণ অর্থ ধরিলে এ সকল যুদ্ধাদি কর্ম্ম ও দান তপঃ প্রভৃতি কর্ম্ম বন্ধনের কারণ কর্ম্মের অন্তর্গত হইয়া পড়ে। এজন্য এ সকল কর্ম্ম যাহাতে যজ্ঞার্থ কর্ম্মের অন্তর্গত হয়, সকল কর্ত্তব্য কর্ম্মই যাহাতে বন্ধন কারণ না হয়, তাহার জন্য শঙ্কর প্রভৃতি যজ্ঞার্থ কর্ম্মকে ঈশ্বরার্থ কর্ম্ম বলিয়া বুঝিয়াছেন। পরে ১২।১০ শ্লোকে এই ঈশ্বরার্থ কর্ম্ম উক্ত হইয়াছে, তাহা দ্রষ্টব্য।

কিন্তু ভগবান্ পরে গীতায় যে যে স্থলে ঈশ্বরার্থ কর্ম্ম উল্লেখ করিয়াছেন, সেই সেই স্থলে "মদর্থ" কর্ম্ম বলিয়াছেন। সুতরাং এইরূপ অস্পষ্ট ভাবে এস্থলে ঈশ্বরার্থ কর্ম্মকে যজ্ঞার্থ কর্ম্ম বলিবার কোন প্রয়োজন ছিল না। এই শ্লোকের অব্যবহিত পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, কর্ম্ম না করিলে শরীর যাত্রাও নির্ব্বাহ করা যায় না। কি কৌশলে সেই শরীর যাত্রাদি নির্ব্বাহার্থ কর্ম্ম করিলে, তাহা বন্ধন কারণ হয় না, তাহাই এ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে, এবং পরের কয় শ্লোকে তাহা বিবৃত হইয়াছে। যজ্ঞ

ব্যতীত অন্য কোনরূপ কর্ম্মদ্বারা যদি শরীরযাত্রাদি নির্ব্বাহ করা যায়, তবে সে কর্ম্ম বন্ধনের কারণ হয়। লোকে নিজের ও নিজ পরিবারের আহারাদি সংগ্রহ জন্য অর্থাদি উপার্জ্জন করে, ও নানারূপ কর্ম্ম করে। এই কর্ম্মের উদ্দেশ্য যদি কেবল নিজেদের দেহযাত্রা নির্ব্বাহ ও নিজের ভোগ মাত্র হয়, তবে সে সব কর্ম্ম বন্ধনের কারণ। কিন্তু যদি তাহা যজ্ঞার্থ হয়, তবে বন্ধনের কারণ হয় না। পরে ইহা বিশেষ ভাবে উক্ত হইয়াছে যে, যাহারা যজ্ঞের অবশিষ্ট ভোজী, তাহারা পাপ হইতে মুক্ত হয়. আর যে আত্মকারণে পাক করে, সে পাপ আহার করে (৩।১৩),—দেবতারাই ইষ্ট ভোগ দাতা, তাঁহারা অন্নদাতা, সে অন্ন যে যজ্ঞদ্বারা দেব প্রভৃতিকে না দিয়া নিজে ভোগ করে সে চোর (৩।১২)। অতএব এ শ্লোকের অর্থ এই যে, আহার সংগ্রহ ও ইষ্টভোগাদি সংগ্রহ জন্য যে কর্ম্ম করা হয়, তাহা যদি যজ্ঞের উদ্দেশ্যে না করিয়া নিজের উদ্দেশ্যে করা হয়, তবে তাহা বন্ধন-কারণ হয়। এই তত্ত্বই পরে ১০ম হইতে ১৬শ শ্লোক পর্য্যন্ত বিবৃত হইয়াছে। কর্ত্তব্যবোধে নিজ প্রয়োজন বুদ্ধি ত্যাগপূর্ব্বক, অসক্ত বা নির্লিপ্ত ভাবে ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগপূর্ব্বক, যজ্ঞের প্রয়োজক জানিয়া কেবল সেই যজ্ঞের জন্য অর্থোপার্জ্জনাদি কর্ম্ম করিলে সে, কর্ম্ম বন্ধনের কারণ হয় না, ইহাই এস্থলে উপদিষ্ট হইয়াছে। ঈশ্বরার্থ-কর্ম্মতত্ত্ব পরে দ্বাদশ অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। প্রথম ছয় অধ্যায়ে তাহার উল্লেখের আবশ্যক হয় নাই। এজন্য বলিয়াছি যে, রামানুজ এস্থলে যজ্ঞের যে সাধারণ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাই অধিক সঙ্গত।

বন্ধন কারণ—রামানুজ বলেন যে, আত্মপ্রয়োজন জন্য আসক্তি বশে যে কর্ম্ম করা হয়, তাহা হইতে কর্ম্মবন্ধন হয়। অহঙ্কার মমতা ও সর্ব্বেন্দ্রিয়-ব্যাকুলতা-জনিত কর্ম্মে বাসনাবীজ থাকায় তাহাতে বন্ধন হয়। অর্থাৎ. সেই বাসনা বা কামবীজ হেতু সংসারে পুনঃ পুনঃ প্রত্যাবর্ত্তন

করিতে হয়। ঋগ্বেদে ১৮।১০।১১ মন্ত্রে আছে, "কামস্তদগ্রসমবর্ত্ত-তাধিমনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ।"

আসক্তি ত্যজিয়া—সুখাভিলাষ ত্যাগ করিয়া, এবং ন্যায়োপার্জ্জিত দ্রব্যসিদ্ধ যজ্ঞাদির দ্বারা বিষ্ণুকে আরাধনা পূর্ব্বক, তাহার অবশিষ্ট দ্বারা দেহ যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া (বলদেব)। আত্ম প্রয়োজন সাধনের অভিপ্রায় ত্যাগ করিয়া (রামানুজ)। কর্ম্মফলে অভিলাষ ত্যাগ করিয়া (শঙ্কর)। আসক্তি ত্যাগ করিয়া পরম পুরুষকে যজ্ঞাদি কর্ম্মের দ্বারা আরাধনা করিলে, অর্থাৎ যজ্ঞ হেতু কর্ম্ম করিলে, অনাদিকাল প্রবৃত্ত কর্ম্মবাসনা দূর হইয়া যায়, ইন্দ্রিয় ব্যাকুলতা নষ্ট হয়, আত্মাবলোকন সিদ্ধ হয় (মধু)।

যজ্ঞ তরে কর্ম্ম কর,—অর্থাৎ যজ্ঞের জন্য কর্ম্মানুষ্ঠান কর। পূর্ব্বশ্লোকে উল্লিখিত হইয়াছে যে, শরীরযাত্রা নির্ব্বাহ জন্য কর্ম্ম করিতে হয়, আহার সংগ্রহ করিতে হয়। সে জন্য গৃহীর অর্থার্জ্জনাদি ও সন্ন্যাসীর ভিক্ষাদির প্রয়োজন হয়, অথবা অন্যের উপর নির্ভর করিতে হয়। কিন্তু নিজের জন্য আহার সংগ্রহের চেষ্টা করিতে হইলে, কামনা বশে মন সেই দিকে আকৃষ্ট হয়; সুতরাং কর্ম্মে আসক্তি হয়। তাহার ফল—কর্ম্ম-বন্ধন। এখন কথা হইতেছে, এমন কোন উপায় আছে কিনা, যাহাতে আহার-সংগ্রহও চলিবে, এবং সে নিমিত্ত কৃতকর্ম্মে আসক্তিও হইবে না। ইহার উপায়—যজ্ঞ। তাহাতে আহার-সংগ্রহার্থ কর্ম্ম নিজের জন্য করিতেছি, মনে এরূপ ধারণার পরিবর্ত্তে যজ্ঞার্থ কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতেছি—এইরূপ ধারণা হইবে।

আমাদের যেন সর্ব্বদা এ ধারণা থাকে যে, আমরা এই জগতের সহিত নানা ভাবে সম্বদ্ধ। আমরা সকলের নিকট ঋণী। দেবগণ, পিতৃগণ, ঋষিগণ, মনুষ্যগণ, এবং ভূতগণ,—যাহারই সহিত আমাদের সম্বন্ধ আছে, সকলের নিকট আমরা ঋণী। সেই ঋণ শোধ করা আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য। (১) আমাদের দেবগণের কাছে যে ঋণ, তাহা গীতায় এস্থলে উক্ত

হইয়াছে। আমাদের উৎপত্তি বৃদ্ধি ও উন্নতি প্রভৃতির জন্য আমরা দেবগণের নিকট ঋণী। সেই দেবঋণ শোধ করিবার উপায় দেবযজ্ঞ। তাহা বেদে কর্ম্মকাণ্ডে বিবৃত হইয়াছে। বেদোক্ত দেবযজ্ঞ সাধারণতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা—সপ্ত পাকযজ্ঞ বা সপ্ত অগ্নিযজ্ঞ, সপ্ত হবির্যজ্ঞ ও সপ্ত সোমযজ্ঞ। তাহার কথা এস্থলে উল্লেখের প্রয়োজন নাই। (২) ঋষিগণ শাস্ত্রের প্রবর্ত্তক ও রক্ষক। তাঁহাদের নিকট পরম্পরা ক্রমে আমরা জ্ঞান ও ধর্ম্ম লাভ করি। সেই জ্ঞান অর্জ্জন পূর্ব্বক সমাজে প্রচারের দ্বারা এবং ধর্ম্মের আচরণ ও প্রতিষ্ঠা করিয়া কেবল আমরা ঋষিঋণ শোধ করিতে পারি। (৩) পিতৃযজ্ঞ ও পিতৃতর্পণ করিয়া, পুত্রোৎপাদন করিয়া এবং সন্তানদের উপযুক্ত লালন পালন ও শিক্ষা দ্বারা ও উপযুক্ত বংশ রক্ষা দ্বারা আমরা পিতৃঋণ শোধ করি। (৪) মানুষের নিকট, সমাজের নিকট আমরা নানাভাবে ঋণী। সমাজের সহায়তা বিনা আমরা মানুষ হইতাম না—পশু হইয়া যাইতাম। অতএব সমাজকে যথাসাধ্য সাহায্য করা—ক্ষুধিতকে অন্ন দিয়া, আর্ত্তের আর্ত্তি দূর করিয়া, অর্থের দ্বারা, শরীরের দ্বারা, যেরূপে পারি, সমাজের সাহায্য করা আমাদের নিতান্ত কর্ত্তব্য। * (৫) ভূতগণের নিকটও আমরা ঋণী। আমরা শরীর-রক্ষার্থ যে আহার করি, তাহা ভূতগণ হইতেই গ্রহণ করি। প্রতিদিন অন্ন পানীয়ের ও নিঃশ্বাসের সহিত, এবং মার্জ্জনী পেষণী চুল্লী প্রভৃতির দ্বারা আমরা কত জীব হত্যা করি, তাহার সংখ্যা নাই। যে মৎস্য-মাংসাশী তাহার আহারের ত কথাই নাই। যে নিরামিষভোজী সেও জীব আহার করে। যে চাউল, যব বা গোধূম আমরা আহার করি, তাহার প্রত্যেকটি এক একটি জীববীজ। এইরূপে আমাদের সংশ্লিষ্ট জগৎ হইতে নানা রূপে আমরা গ্রহণ করি বলিয়া

---

* মৎপ্রণীত সমাজ ও তাহার আদর্শ, পুস্তকের প্রথম খণ্ড চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

সকলের নিকট ঋণী। এই জন্য প্রতিদিন সামান্য পিপীলিকাটি পর্য্যন্ত সকল ভূতের আহার দিয়া ভূতযজ্ঞ দ্বারা ভূতগণের ঋণ শোধ করিতে চেষ্টা করা আমাদের প্রত্যেকের কর্ত্তব্য। এইরূপে আমাদের সকলের দেবঋণ, পিতৃঋণ, ঋষিঋণ, মনুষ্যঋণ ও ভূতঋণ শোধ করিতে চেষ্টা করা একান্ত কর্ত্তব্য।

পঞ্চ মহাযজ্ঞের দ্বারা সে মহাঋণ কতকটা শোধ হইতে পারে। এই ঋণ শোধ জন্য কর্ত্তব্য ভাবিয়া কর্ম্ম করা এবং তাহার জন্য অর্থাদি সংগ্রহ করা কোন অবস্থায় ত্যাগ করিতে নাই। গীতায় আছে (৮।৩) ভূতভাবোদ্ভবকর বিসর্গ বা ত্যাগই প্রকৃত কর্ম্ম। সেই কর্ম্ম হইতেই যজ্ঞের উৎপত্তি। ইহা ত্যাগাত্মক। ইহার ইংরাজী প্রতিশব্দ Sacrifice।

এই জন্য আমাদের পঞ্চ মহাযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান অবশ্য কর্ত্তব্য। আমরা এই যজ্ঞার্থ কর্ম্ম করিতে বাধ্য,—বাধ্য না থাকিলেও ইহা আমাদের একান্ত ও অবশ্য কর্ত্তব্য। এই যজ্ঞাদির জন্য যে দ্রব্যাদি সংগ্রহ অথবা যে কোন কর্ম্ম অনুষ্ঠেয়, তাহা আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য। এইরূপ কর্ত্তব্য বোধে যজ্ঞার্থ কর্ম্মের অনুষ্ঠানে কর্ম্ম-বন্ধন হয় না। আমাদের উদরপূরণ জন্য, গৃহ শয্যাদি সংগ্রহ জন্য, আমাদের নিজ সুখ ও ভোগের উপকরণ অথবা আমাদের স্ত্রী পুত্রাদির সুখ ও ভোগের উপকরণ সংগ্রহ জন্য অর্থাদি অর্জ্জন প্রভৃতি কর্ম্ম প্রয়োজন মনে করিয়া যে কর্ম্ম করে, তাহারই কর্ম্মে বন্ধন হয়।

অতএব যজ্ঞার্থ কর্ম্ম করিতেছি, বা ঈশ্বরার্থ কর্ম্ম করিতেছি, অথবা পশুপক্ষী মনুষ্য প্রভৃতি সর্ব্বজীবের পোষণ ও বর্দ্ধন জন্য, ও প্রকৃতির যে শক্তির ব্যয়ে জীব-জগৎ বর্দ্ধিত হয়, সে শক্তির বর্দ্ধন জন্য যে যজ্ঞাদি কর্ত্তব্য, তাহার জন্যই দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিতেছি,—কেবল এইরূপ ধারণা করিয়াই কর্ম্ম করিতে হইবে। তাহা হইলে নিজের জন্য কর্ম্ম করিতেছি, এরূপ মনে হইবে না। সুতরাং কর্ম্মে স্বার্থ বা নিজ কামনা থাকিবে না।

তাহাতে আমরা ক্রমে স্বার্থ ভুলিয়া যাইব, নিজের সুখ ভোগের কামনা সংযত করিতে পারিব। তাহাতে ধর্ম্মের মূলসূত্র 'Denial of the Will' শিক্ষা হইবে,—কর্ম্মে বন্ধন হইবে না। এই তত্ত্বই এ শ্লোকে ও পরের আটটি শ্লোকে বুঝান হইয়াছে, এবং যজ্ঞ কেন কর্ত্তব্য, তাহাও দেখান হইয়াছে।

সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।
অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোঽস্ত্বিষ্টকামধুক্‌ ॥ ১০

যজ্ঞ সহ প্রজাপতি প্রজা সৃষ্টি করি
কয়েছিলা পূর্ব্বে—"হও বর্দ্ধিত ইহাতে,
হ'ক ইহা তোমাদের ইষ্ট কামদাতা॥" ১০

(১০) **যজ্ঞসহ**—ব্রহ্মা সৃষ্টির প্রথমে যজ্ঞের সহিত তিন বর্ণ (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য) সৃষ্টি করিয়াছিলেন (শঙ্কর, মধুসূদন, স্বামী,—মনু ১।১১ দ্রষ্টব্য)। দেবতাদের যাহা আদিরূপ সেই প্রজা সৃষ্টি করিয়াছিলেন (বলদেব)। বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে, ব্রহ্ম সৃষ্টি কালে অগ্নি, ইন্দ্র, বরুণাদি, বসু রুদ্রাদি, ও পৃথ্বী—এই সকল দেবতাদের যথাক্রমে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র জাতিরূপে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। বেদে আছে (ঋক্‌ ৮।১০।৯০)—

"ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীৎ বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।
উরূ তদস্য যদ্‌বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত।"

অতএব সৃষ্টির প্রথমে চারি বর্ণ দেবগণের সৃষ্টি হইয়াছিল। এ তত্ত্ব পরে (৪।১৩) শ্লোকের ব্যাখ্যায় বিবৃত হইবে।

যাহা হউক, এ স্থলে এই দেব সৃষ্টির কথা উক্ত হয় নাই। দেব মনুষ্যাদি সর্ব্ব প্রজার সৃষ্টি উক্ত হইয়াছে। সমুদায় ভূত-সর্গই শ্রুতি

অনুসারে চতুর্ব্বর্ণে বিভক্ত বটে, কিন্তু তাহা এ স্থলে উল্লেখেরও প্রয়োজন নাই। (৮।৪১-৪৪ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)। এই শ্লোকের আরও এক অর্থ হইতে পারে। প্রজাপতিই ভূতসৃষ্টির জন্য প্রথমে যজ্ঞ করিয়াছিলেন, এবং সেই যজ্ঞ হইতেই সমুদায় ভূত-সৃষ্টি হইয়াছিল। শ্রুতি হইতে পাওয়া যায় যে, পরম পুরুষ এই সৃষ্টি করিবার জন্য প্রথমে আপনাকেই যজ্ঞে আহুতি দেন। তিনি আপনাকে নানারূপে পরিচ্ছিন্ন করিয়া যজ্ঞে আহুতি দিলে, সেই মহাত্যাগরূপ যজ্ঞ হইতেই ভূতগণের সৃষ্টি হয়। ঋগ্বেদে পুরুষসূক্তে ইহা বিবৃত হইয়াছে। সে তত্ত্ব এ স্থলে বুঝিবার প্রয়োজন নাই। সেই যজ্ঞে পুরুষের দেহে বিভিন্ন প্রজার সৃষ্টি হইলে, সেই যজ্ঞ দ্বারাই প্রজাদের বৃদ্ধি ও উন্নতি হইবে, ইহাই প্রজাপতির নিয়ম হইয়াছিল।

প্রজাপতি—ঈশ্বর, বিষ্ণু (বলদেব)। প্রজাস্রষ্টা (শঙ্কর, মধু)।

প্রজাপতি,—পুরাণমতে ব্রহ্মা ও ব্রহ্মার মানস পুত্র মরীচি বশিষ্ঠ প্রভৃতি। প্রজাপতি,—শ্রুতি অনুসারে হিরণ্যগর্ভ।

প্রজাসৃষ্টি করি—এই প্রজা সৃষ্টির বিবরণ বিভিন্ন পুরাণে পাওয়া যায়। বিশেষতঃ শ্রীভাগবতে, বিষ্ণুপুরাণে, মার্কণ্ডেয় পুরাণে, এবং মনু-সংহিতায় ইহা বিবৃত আছে। শ্রুতিতে এই প্রজাসৃষ্টি-তত্ত্ব অতি সংক্ষেপে উক্ত হইয়াছে। ব্রহ্ম ঈক্ষণ করিলেন বা কামনা করিলেন—আমি বহু হইব। এই বহু হইবার সংকল্প ব্রহ্ম নাম ও রূপ দ্বারা ব্যাকৃত করিলেন, ও তাহা নামরূপ দ্বারা ব্যাকৃত করিয়া সৃষ্টি করিলেন, এবং সৃষ্টি করিয়া আত্মারূপে তাহাতে অনু-প্রবিষ্ট হইলেন। এই নামরূপ উপাধি দ্বারা পরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মই এই সকল ভূত বা প্রজারূপে উদ্ভূত হইয়াছিলেন।

শ্রুতিতে আছে—

"বহ্বীঃ প্রজাঃ পুরুষাৎ সম্প্রসূতাঃ। (মুণ্ডক, ২।১।৫)

অনেন জীবেন আত্মনা অনুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণীতি।'

(ছান্দোগ্য, ৬।৩।২)।

এ তত্ত্ব পরে ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে বিবৃত হইবে।

কয়েছিলা—নামরূপ বিভাগশূন্য, নিজ প্রকৃতির শক্তিতে বিলীন পুরুষদিগের প্রয়োজন অনুসারে সৃষ্টিকালে সেই প্রয়োজনের সম্পাদক নামরূপ বিভাগ করিয়া, যজ্ঞ এবং তাহার নিরূপক বেদ প্রকাশ করিয়াছিলেন (বলদেব)। অথবা অনাদিকাল প্রবৃত্ত অচিৎ অর্থাৎ জড় বিষয়ের সংসর্গে অবশ ও নামরূপ বিভাগ হেতু বহু পুরুষকে লয় কালে আপনাতে লীন করিয়া বা বিলীন রাখিয়া, পরে সৃষ্টিকালে পুনর্ব্বার নামরূপ বিভাগযুক্ত করিয়া প্রজাসৃষ্টি করিয়াছিলেন (রামানুজ)। বলদেব ও রামানুজ উক্তরূপ অর্থ করিয়া দ্বৈতাদ্বৈতবাদ সমর্থন করিয়াছেন বোধ হয়।

ব্রহ্মা বা হিরণ্যগর্ভ হইতে বেদের উৎপত্তি। বেদকে ব্রহ্মার মুখ বলে। চারি বেদ হইতে ব্রহ্মা চতুর্ম্মুখ। অতএব এ স্থলে অর্থ এই যে, ব্রহ্মা বেদমুখে কহিয়াছিলেন।

বৃদ্ধি হও—আপনার বৃদ্ধি কর (বলদেব, রামানুজ)। উত্তরোত্তর উন্নত হও (মধুসূদন)।

ইহাতে—এই যজ্ঞ দ্বারা: অথবা আশ্রমোচিত ধর্ম্মের দ্বারা (মধু)।

ইষ্টকামদাতা—অভিপ্রেত-ফল-দাতা (শঙ্কর)। কাম্যফলদাতা (মধু)। মোক্ষরূপ ইষ্ট ও তাহার অনুযায়ী কামনার ফলদাতা (রামানুজ)। চিত্তশুদ্ধি হইলে আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া ও দেহযাত্রা যজ্ঞ দ্বারা সম্পাদন করিয়া বাঞ্ছিত মোক্ষ ফল লাভ হইবে (বলদেব)।

মূল অনুযায়ী অর্থ এই যে, এই যজ্ঞ তোমাদের ইষ্ট ও কাম উভয়ই দোহন করিবে। অর্থাৎ ইহা হইতে প্রেয়ঃ ও শেষে শ্রেয়ঃ লাভ করিবে। বৈশেষিক দর্শন অনুসারে বেদোক্ত যজ্ঞাদি যাহাকে ধর্ম্ম বলে, তাহা হইতে অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স উভয়ই লাভ হইবে। (১।২ সূত্র)।

এস্থলে কর্ম্মযোগ মার্গে আরোহণ জন্য প্রথমে যজ্ঞ করা আবশ্যক বলিয়া

ভগবান্ প্রথমে ইষ্টফল-দাতা যজ্ঞাদি কাম্য কর্ম্মেরও প্রশংসা করিয়াছেন বোধ হয়। কারণ, বিনাজ্ঞানে কর্ম্মত্যাগ অপেক্ষা কাম্যকর্ম্মও অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ (স্বামী)। অথবা যজ্ঞাদি নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য ইহাই এস্থলে বুঝান হইয়াছে (গিরি)। শেষ অর্থই অধিক সঙ্গত।

কেন না, এই যজ্ঞাদি সকাম ভাবে আচরণ করিলে তাহা হেয়। পূর্ব্বে (২।৪২-৪৪) শ্লোকে, তাহা নিন্দিত হইয়াছে। অতএব ভগবান্ কর্ম্মযোগ বুঝাইতে গিয়া সকামভাবে যে যজ্ঞ করিতে হইবে, এরূপ উপদেশ দিতে পারেন না। যজ্ঞ কি জন্য কর্ত্তব্য, এবং কিরূপে নিষ্কাম ভাবে তাহা অনুষ্ঠেয় হইয়া কর্ম্মযোগের অন্তর্ভূত হইতে পারে, তাহাই এ স্থলে উপদিষ্ট হইয়াছে এবং নিষ্কাম ভাবে কর্ত্তব্য বুদ্ধিতে এই যজ্ঞাদি আচরণ করিলে, জ্ঞান লাভ পূর্ব্বক যজ্ঞে সর্ব্বত্র ব্রহ্মদর্শন হয়, তাহা পরে উপদিষ্ট হইয়াছে। এইরূপ ভাবে যজ্ঞাদি বিহিত কর্ম্ম কখন ত্যাজ্য নহে, তাহা সর্ব্বদা কর্ত্তব্য, ইহাও পরে উক্ত হইয়াছে (১৮।৫ শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ ॥১১

যজ্ঞ দ্বারা দেবগণে করহ ভাবনা
তাঁহারাও তোমাদের করুন ভাবনা,
পরস্পর ভাবনায় কর শ্রেয়ো লাভ ॥ ১১

(১১) ভাবনা—(মূলে আছে ভাবয়ত) আপ্যায়িত করা (শঙ্কর), বা যজ্ঞের হবি দ্বারা বর্দ্ধিত করা। (স্বামী, মধু)। যজ্ঞের দ্বারা দেবতাদের উপাসনা করা (রামানুজ)।

ভাবনার সাধারণ অর্থ—চিন্তা করা। ভূ ধাতু হইতে ভাবনা। ভূ

ধাতুর অর্থ—হওয়া। তাহা হইতে ভাবনার অর্থ—বৃদ্ধি হওয়া, অথবা ভাব-বিকারযুক্ত হওয়া। এস্থলে বর্দ্ধিত কর অর্থই সঙ্গত। দেবগণ জড়শক্তির নিয়ন্তা, তাহাদের অন্তর্যামী, তদ্‌ভাবাপন্ন আত্মা। সেই দেবশক্তি হইতেই বৃষ্টি প্রভৃতি দ্বারা অন্নের উৎপত্তি হয়। সেই অন্ন হইতে জীবের উদ্ভব ও বৃদ্ধি হয়। এই বৃষ্টি প্রভৃতি ক্রিয়া হেতু সেই দেবশক্তির ক্ষয় হয়। যজ্ঞ দ্বারা আমাদের সেই শক্তিকে বর্দ্ধিত করিতে হয়। ভাবনা অর্থে উপাসনা দ্বারা আপ্যায়িত করা বুঝিলে, দেবগণ কিরূপে আমাদের ভাবনা করেন, তাহা ভাল বুঝা যায় না।

ভাবনায়—বৃষ্টি দ্বারা অন্ন উৎপন্ন করিয়া দেবগণ জীবদিগকে বর্দ্ধন করিবেন (মধু)। (বিষ্ণু পুরাণ ১।৬ দ্রষ্টব্য)।

শ্রেয়ঃ—মোক্ষ (বলদেব), স্বর্গ (মধু)। মোক্ষ-লক্ষণ-যুক্ত জ্ঞান পাইবে, অথবা স্বর্গলাভ হইবে (শঙ্কর)। বলদেব আরও বলিয়াছেন যে, যজ্ঞ দ্বারা আহার শুদ্ধি হয়, (১৪শ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য); আহার-শুদ্ধিই জ্ঞান নিষ্ঠার প্রধান অঙ্গ। কারণ শ্রুতিতে আছে, "তত্রাহারশুদ্ধৌ সত্ত্ব-শুদ্ধিঃ, সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ, স্মৃতিলব্ধে সর্ব্বগ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষঃ।" (ছান্দোগ্য উপনিষদ্ ৭।২৬।২)। শ্রুতিতে আছে জীবের শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ উভয়েরই প্রয়োজন। ইহার মধ্যে প্রেয়ঃ আপাততঃ উপাদেয়। আর শ্রেয়ঃ নিত্য পরম পুরুষার্থ। (পূর্ব্বে ৩।৩ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।) বলদেবের এই অর্থ বেশ সঙ্গত। শঙ্করের মতে, ভাবনা অর্থে আপ্যায়িত করা। আমরা যদি দেবোদ্দেশে যজ্ঞ করি, তবে দেবগণ তুষ্ট হইয়া আমাদিগকে আপ্যায়িত করিবেন। তাঁহাদের দ্বারা আমাদের অভীষ্ট যে শ্রেয়ঃ, তাহাও লাভ হইবে। কিন্তু কেবল কর্ম্মের দ্বারা যে নিঃশ্রেয়সরূপ পরম শ্রেয়ঃ, তাহা লাভ হয় না। দেবগণ আমাদের মোক্ষোপায় যে জ্ঞান তাহা দিতে পারেন না।

ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ।
তৈর্দত্তানপ্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙ্‌ক্তে স্তেন এব সঃ ॥ ১২

—

'যজ্ঞে পুষ্ট দেবগণ দিবেন সবারে
ইষ্ট ভোগ ; ভুঞ্জে যেই দেবে নাহি দিয়া
দেবদত্ত সে সকল—তস্কর সে জন ॥' ১২

(১২) যজ্ঞে পুষ্ট—(যজ্ঞভাবিতাঃ)—যজ্ঞ দ্বারা বর্দ্ধিত অথবা উপচিত শক্তিযুক্ত। শঙ্করের মতে—যজ্ঞের দ্বারা আপ্যায়িত। যজ্ঞে যে ঋক্ মন্ত্রাদি উচ্চারিত হয়, সেই মন্ত্রশক্তিদ্বারা বর্দ্ধিত—এ অর্থও হইতে পারে। শাস্ত্রে আছে দেবগণ যজ্ঞভাগভুক্ (মনু, ৮।১৪৬)

দেবগণ—দেবতাগণ ঈশ্বরেরই শরীর ভূত অংশ, এজন্য ঈশ্বরই সর্ব্ব-যজ্ঞের ফলদাতা (রামানুজ)। দেবগণ পরোক্ষভাবে ফলদাতা (পরে ৪।১১ শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

এই দেবগণ বৈদিক যজ্ঞভাক্ দেবতা। ইঁহাদের সম্বন্ধে যাস্ক নিরুক্তে বলিয়াছেন,—'মহাভাগ্যাৎ দেবতায়াঃ এক আত্মা বহুধা স্তূয়তে।' শ্রুতি-তেই আছে—'একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি।' (ঋগ্বেদ ২।৩।২২।৬)। ব্রহ্ম—'বহুস্যাং প্রজায়েয়' এইরূপ ঈক্ষণ করিয়া প্রথমে হিরণ্যগর্ভরূপ হন, এবং তাহা হইতে ক্রমে দেবতারূপ হন। দেবগণ ব্রহ্মের অধিদৈবতারূপ। এই জন্য জ্ঞানিগণ, যজ্ঞ দেবতাতে ব্রহ্মদর্শন করেন (গীতা ৪।২৪ এবং ৯।১৬ দ্রষ্টব্য)। এই দেবগণ মধ্যে ইন্দ্র, অগ্নি, সোম, অশ্বিদ্বয়, মরুৎগণ, মিত্রা-বরুণ আদিত্যগণ ও বিশ্বদেবগণই প্রধান।

ইষ্টভোগ—স্ত্রী, পুত্র, পশু প্রভৃতি (শঙ্কর)। হিরণ্য পশু স্বর্গাদি (মধু)। অন্ন পানাদি বাহ্য সম্পদ (গিরি, রামানুজ)। ইষ্ট বা

অভীষ্ট অর্থে যদি কেবল কাম্য বিষয় হয়, তবে যজ্ঞ সকাম হইয়া পড়ে। ইহার অর্থ এই যে নিষ্কাম ভাবে এইরূপ কর্ত্তব্য বুদ্ধিতে যজ্ঞ করিলে দেবগণ ভাবিত হইয়া আমাদের অযাচিত প্রয়োজনীয় যাহা, তাহা দান করেন। তাঁহারা পূর্ব্বোক্ত ভাবে আমাদের কর্ম্মফল দাতা।

এস্থলে কর্ম্মত্যাগের দোষ দেখান হইয়াছে (স্বামী)। যজ্ঞে পারত্রিকের ফল ভিন্ন এ জন্মেও ফল পাওয়া যায়, তাহা এস্থলে দেখান হইয়াছে (মধুসূদন)। এই শ্লোকে বুঝান হইয়াছে যে, নিজের কামভোগের জন্য যে কেবল যজ্ঞ করিতে হয়, তাহা নহে, যজ্ঞকার্য্য একান্ত কর্ত্তব্য। কেন কর্ত্তব্য তাহা পরে বিস্তারিত বুঝান হইয়াছে। দুঃখের বিষয়, এখন এদেশের যজ্ঞযুগ একরূপ চলিয়া গিয়াছে। সুতরাং যজ্ঞতত্ত্ব এক্ষণে বুঝিবার প্রয়োজন নাই। যাহা হউক যজ্ঞতত্ত্ব পরে সংক্ষেপে বিবৃত হইবে।

দেবে নাহি দিয়া—যজ্ঞে দেবোদ্দেশে আহুতি না দিয়া (মধু)। পঞ্চ যজ্ঞাদির দ্বারা দেবগণকে তুষ্ট না করিয়া (বলদেব, স্বামী)।

দেবদত্ত যে সকল—দেবশক্তি হইতে জগতে বৃষ্টি প্রভৃতি দ্বারা উৎপন্ন অন্ন। দেবতা হইতে প্রাপ্ত অন্নাদি ভোগ্যবস্তু।

ভুঙ্ক্তে—নিজ দেহ ও ইন্দ্রিয় তৃপ্তি করে (মধু, শঙ্কর)।

তস্কর—দেবস্বাপহারী (শঙ্কর)। অন্যের নিকট প্রাপ্ত বস্তু অন্যের প্রয়োজনে না দিয়া তাহাকে যে নিজস্ব করিয়া লয় (রামানুজ)। এইরূপে দেব ও জীবমধ্যে পরস্পর বিনিময় চলে। মানুষ যজ্ঞ দ্বারা দেবগণকে বর্দ্ধন করেন—দেবতাগণকে তুষ্ট করেন। আর দেবতারা উক্ত ক্রমে সেই যজ্ঞ দ্বারা সংবর্দ্ধিত হইয়া অন্নাদি উৎপাদন করিয়া, জীবের উদ্ভব ও বর্দ্ধন করেন। যাহারা এই দেবদত্ত অন্নাদি, কোন বিনিময় না দিয়া কেবল নিজের জন্য গ্রহণ করে, তাহারা তস্কর। তাহারা দেবশক্তির অপহরণ বা অপচয়কারী। শ্রীভাগবতে আছে—

"যাবদ্ভ্রিয়েত জঠরং তাবৎ স্বত্বং হি দেহিনাম্।
অধিকং যোঽভিমন্যেত সস্তেনো দণ্ডমর্হতি॥

যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ।
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ॥ ১৩

যজ্ঞ-অবশিষ্ট ভোজী সাধু যেই জন
হয় সর্ব্বপাপ মুক্ত; কিন্তু যেই পাপী
নিজ হেতু করে পাক—পাপাহারী সেই॥ ১৩

(১৩) যজ্ঞ-অবশিষ্ট ভোজী—দেবযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, মনুষ্যযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ ও ব্রহ্মযজ্ঞ এই পাঁচ যজ্ঞ। (গিরি, দেবযজ্ঞ ত্যাগ করিয়া চারি যজ্ঞের উল্লেখ করিয়াছেন।) দেবতা, পিতৃলোক, মনুষ্য ও অন্য ভূতগণের বর্দ্ধন জন্য ও-ব্রহ্মের তৃপ্তির জন্য যে কার্য্য করা হয়, তাহাই যজ্ঞ। এই কয় যজ্ঞ করিয়া যে ব্যক্তি যজ্ঞাবশিষ্ট ভোজন করে, সেই অমৃত ভোজন করে (শঙ্কর)। শঙ্কর ঋষিযজ্ঞের কথা উল্লেখ করেন নাই। এক অর্থে তাহাই ব্রহ্মযজ্ঞ। রামানুজ বলেন, ইন্দ্রাদি স্বরূপে আত্মভাবে অবস্থিত পরম পুরুষের আরাধনার্থ দ্রব্যত্যাগরূপ যজ্ঞ করিয়া, ও যজ্ঞে অবস্থিত পরমপুরুষের আরাধনা করিয়া, সেই যজ্ঞাবশিষ্ট অন্ন ভোজন করিয়া যে শরীরযাত্রা নির্ব্বাহ করে, তাহারা যজ্ঞাবশিষ্টভোজী। তাহারা বৈশ্বদেবাদি যজ্ঞাবশিষ্ট ভোজী (মধু)।

সাধু—(সন্তঃ)—মূলে যে সন্তঃ শব্দ আছে, অনেকের মতে তাহার অর্থ সাধু, শিষ্ট। বর্ত্তমানকালে 'সন্ত' সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত আছে। কিন্তু 'সন্তঃ' শব্দ বিশেষণ হইতে পারে, অর্থ—যিনি হন। তদনুসারে এ শ্লোকের অর্থ—যাঁহারা যজ্ঞাবশিষ্টভোজী হন, তাঁহারা সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হন।

সর্ব্বপাপমুক্ত—শঙ্কর স্বামী ও মধু বলেন,—এস্থলে স্মৃত্যুক্ত পঞ্চসূনার (পঞ্চপাপের) কথা উল্লিখিত হইয়াছে। যথা—

"কণ্ডনী পেষণী চুল্লী উদকুম্ভী চ মার্জ্জনী।
পঞ্চসূনা গৃহস্থস্য তাভিঃ স্বর্গং ন গচ্ছতি॥"

স্মৃতিমতে, অজ্ঞানকৃত এই পঞ্চ পাপ, উক্ত পঞ্চযজ্ঞের দ্বারা নষ্ট হয়। অজ্ঞান পূর্ব্বক ঢেঁকি, যাঁতা, উমুন, জলের কলসী ও ঝাঁটার দ্বারা লোকে সর্ব্বদা যে জীবহিংসা করে, উক্ত পঞ্চ যজ্ঞের দ্বারা সেই পাপের মোচন হয়। আমাদের শাস্ত্র মতে সামান্য অজ্ঞানকৃত প্রাণিহিংসাও কতদূর পাপজনক, তাহা ইহা হইতে বেশ বুঝা যায়। শাস্ত্রে আছে—

"পঞ্চসূনা কৃতং পাপং পঞ্চযজ্ঞৈ র্ব্যপোহতি"।

বলদেব ও রামানুজ বলেন,—অনাদি কাল হইতে উপচিত হইয়াছে যে পাপ ও যাহা আত্মতত্ত্বাবলোকন-বিরোধী তাহাই এস্থলে উক্ত হইয়াছে।

এই যে পঞ্চ পাপের কথা উক্ত হইয়াছে—ইহা ক্ষুদ্র, চক্ষুর একরূপ অগোচর প্রাণিহিংসা জনিত পাপ। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে আমরা আহারাদি দ্বারাও বহু জীবহিংসা করিয়া থাকি। ভূতযজ্ঞের দ্বারা এই পাপ দূর করিতে হয়, অর্থাৎ এই জীবঋণ শোধ দিতে হয়। অন্য মহাযজ্ঞের অন্ত প্রয়োজন, তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। সুতরাং এস্থলে রামানুজ ও বলদেবের অর্থ অধিক সঙ্গত।

নিজহেতু করে পাক—নিজের আহারার্থ পাক করে। যজ্ঞপুরুষের অঙ্গস্বরূপ দেবতাদের অর্চ্চনার জন্য যজ্ঞার্থ পাক না করিয়া আত্মপোষণের জন্য পাক করে (রামানুজ, বলদেব)।

পাপাহারী—সেরূপ অশুদ্ধ আহারের পরিণাম পাপ, এই জন্য সে পাপাহারী (রামানুজ)। কেন না তাহার উক্ত পঞ্চসূনা বিদ্যমান থাকে। যজ্ঞদ্বারা তাহা নষ্ট হয় না। শ্রুতিতে আছে, "ইদমেবাস্য তৎসাধারণমন্নং

যদিদমস্তুতে স য এতদুপাস্তে ন স পাপ্মানো ব্যাবর্ত্ততে মিশ্রং হ্যেতৎ।” অন্যত্র আছে “মোঘমন্নং বিন্দতে অপ্রচেতাঃ সত্যং ব্রবীমি বধইৎস তস্য নার্য্যমণং পুষ্যতি নোসখায়ং কেবলাঘোভবতি কেবলাৎ ইতি।’ (মধুসূদন ধৃত শ্রুতিবচন)।

অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি পর্জ্জন্যাদন্নসম্ভবঃ।
যজ্ঞাদ্ভবতি পর্জ্জন্যো যজ্ঞঃ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ ॥ ১৪

অন্ন হতে সমুদ্ভূত হয় ভূতগণ,
জন্মে অন্ন বৃষ্টি হতে, বৃষ্টির উদ্ভব
যজ্ঞহতে, কর্ম্মহতে যজ্ঞের সম্ভব ; ১৪

(১৪) অন্ন হতে সমুদ্ভূত—ভুক্ত অন্ন পরিপাক হইয়া রক্তাদি সার পদার্থ প্রস্তুত হয়। ইহারই সার হইতে পরে পুরুষের রেতঃ ও স্ত্রীলোকের শোণিত উৎপন্ন হয়। এই শুক্র ও শোণিতযোগেই জীবদেহের উৎপত্তি ও বৃদ্ধি হয়। সুতরাং অন্ন হইতেই আমাদের মাতা-পিতৃজ শরীর বা স্থূল দেহের সৃষ্টি ও বৃদ্ধি হয় (শঙ্কর)। “শুক্র-শোণিত-জীব সংযোগে তু খলু কুক্ষিগতে গর্ভসংজ্ঞো ভবতি।” (চরক)। এই মত আধুনিক জীব-বিজ্ঞান সম্মত।

প্রশ্নোপনিষদে (১২ শ্লোকে) আছে—“অন্নং বৈ প্রজাপতিস্ততো হ বৈ তদ্ রেতস্তস্মাদিমাঃ প্রজাঃ প্রজায়ন্ত ইতি।”

তৈত্তিরীয় উপনিষদে (৩।২।১ আছে—“অন্নং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। * * অন্নাৎ ভূতানি জায়ন্তে অন্নাৎ জাতানি জীবন্তি, অন্নং প্রয়ন্তি।” বৃহদারণ্যক উপনিষদে (৫।১২।১) আছে—“অন্নেহি ইমানি সর্ব্বাণি

ভূতানি বিষ্ঠানি।” মুণ্ডক উপনিষদে (১।১।৮) আছে—“তপসা চীয়তে ব্রহ্ম ততোঽন্নমভিজায়তে। অন্নাৎ প্রাণো মনঃ সত্যং লোকাঃ কর্ম্মসু চানৃতম্॥” ঋগ্বেদ অনুসারে ‘রয়ি’ ই অন্ন। এই রয়িই চন্দ্র। রয়ি হইতে সমুদায় মূর্ত্তির (স্থূলজড়ের) উৎপত্তি হয়। (প্রশ্ন, ১।৫) বৃহদারণ্যক উপনিষদে (৬।২।১৬) আছে—আহুতি চন্দ্রকে প্রাপ্ত হইলে রয়ি বা অন্ন উৎপন্ন হয়। অতএব অন্নই ভূতগণের স্থূলশরীর উৎপত্তির কারণ।

সাংখ্যকারিকায় আছে,—

“সূক্ষ্মা মাতা পিতৃজাঃ সহ প্রভূতৈস্ত্রিধা বিশেষাঃ স্যুঃ।
সূক্ষ্মা তেষাং নিয়তা মাতা-পিতৃজা নিবর্ত্তন্তে॥” (৩৯)।

বৃষ্টি হ’তে—(মূলে আছে ‘পর্জ্জন্য’)—অর্থাৎ বৃষ্টি ও বজ্রাকুলিত মেঘ। কিন্তু এস্থলে অর্থ বৃষ্টি (স্বামী ও শঙ্কর)। মধু ও গিরি বলেন,—এই সত্য প্রত্যক্ষ সিদ্ধ।

বৃষ্টির উদ্ভব যজ্ঞ হেতু—মনু স্মৃতিতে আছে—

“অগ্নৌ প্রাস্তাহুতিঃ সম্যগাদিত্যমুপতিষ্ঠতে।
আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টি র্বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজাঃ॥”

অর্থাৎ অগ্নিতে যে আহুতি প্রদান করা যায়, তাহা আদিত্যের অভিমুখে উপস্থিত হয়। তাহা হইতে আদিত্য প্রভাবে বৃষ্টি হয়, বৃষ্টি হইতে বসুমতী ফলবতী হইলে অন্ন উৎপন্ন হয় ও তাহা হইতে প্রজা সৃষ্টি হয়। মৈত্রায়ণী শ্রুতিতে (৬।৩৭) আছে—

“আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টিঃ বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজা।”

ছান্দোগ্য উপনিষদে (৭।৪।২) আছে যে ব্রহ্ম—“বর্ষস্য সংকৢপ্ত্যৈ অন্নং সংকল্পতে অন্নস্য সংকৢপ্ত্যৈ প্রাণাঃ।” ইহা ব্যতীত ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যকে পঞ্চাগ্নিবিদ্যায় উক্ত হইয়াছে যে দেবগণই যজ্ঞদ্বারা প্রজাসৃষ্টি করেন। তাঁহারা এই লোকরূপ অগ্নিতে শ্রদ্ধা আহুতি দেন, তাহা হইতে

সোম উৎপন্ন হয়। তাঁহারা পর্জ্জন্যরূপ অগ্নিতে এই সোম আহুতি দেন, তাহা হইতে বর্ষণ হয়। দেবতারা পরে পৃথিবীরূপ অগ্নিতে এই বৃষ্টি আহুতি দেন, তাহা হইতে অন্নের উৎপত্তি হয়। তাঁহারা পুরুষরূপ অগ্নিতে এই অন্ন আহুতি দেন, তাহা হইতে রেতঃ উৎপত্তি হয়। পরে স্ত্রীরূপ অগ্নিতে সেই রেতঃ আহুতি দেন, তাহা হইতে জীবগণের উৎপত্তি হয়। এ তত্ত্ব পরে চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে চতুর্থ শ্লোকের ব্যাখ্যাশেষে বিবৃত হইবে। আমরা এইরূপে জানিতে পারি যে দেবগণ যে যজ্ঞরূপ কর্ম্ম করেন, তাহা হইতেই জীবগণের উৎপত্তি হয়।

যাহাহউক ঋগ্বেদে বৃষ্টির উৎপত্তিতত্ত্ব যেরূপ বিবৃত হইয়াছে তাহা এস্থলে উল্লেখ করা কর্ত্তব্য। আদিত্য দেবতা রশ্মির দ্বারা জলীয় বাষ্প আকর্ষণ করেন। সেই বাষ্প অন্তরীক্ষে বায়ুস্তরে অবস্থান করে। তাহা হইতে বৃষ্টি হয়। কিরূপে এই বৃষ্টি হয়, তাহা বুঝিতে হইবে। ঋগ্বেদানুসারে ইন্দ্র বৃষ্টিদাতা দেবতা। মেঘের—বিশেষতঃ ঘনকৃষ্ণ মেঘের ঋগ্বেদীয় নাম বৃত্র বা অহি। মরুদ্‌গণের সহায়ে ইন্দ্র বজ্র প্রহার দ্বারা এই মেঘরূপ বৃত্রাসুরকে বধ করিলে, তবে মেঘ বৃষ্টিরূপে পরিণত হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ৩২ সূক্ত উল্লেখ করা যাইতে পারে। অতএব ঋগ্বেদ অনুসারেও তড়িৎই বৃষ্টি উৎপাদনের সহকারী কারণ। সূর্য্য-রশ্মিযোগে যে জল বাষ্প হইয়া উর্দ্ধে বায়ুস্তরে বায়ুর সহিত অবস্থিত থাকে, তাহাকে ঘনীভূত করিয়া আবার বায়বীয় অবস্থা হইতে জলীয় অবস্থায় ক্ষুদ্রজলকণা রূপে পরিণত করিয়া এবং তাহাদিগের সংযোগ দ্বারা মেঘ উৎপাদনের এবং মেঘকে বৃষ্টিরূপে পরিণত করিবার প্রধান কারণ,—এই তাড়িত। বৃষ্ট-দেবতা ইন্দ্র এই তাড়িতের সহায়ে জলীয় বাষ্পকে মেঘরূপে পরিণত করেন, এবং সেই মেঘকে ভিন্ন করিয়া বৃষ্টি উৎপাদন করেন।

এই বৃষ্টি উৎপাদন কর্ম্মে আমরা যদি দেবতার সহায় হই, অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি প্রভৃতি নিবারণ হইতে পারে। আধুনিক বিজ্ঞান, তাহার যে

উপায়ই আবিষ্কার করুক, আমাদের দেশে প্রাচীন ঋষিরা যজ্ঞরূপ উপায়ে তাহা সম্পাদন করিতেন, যজ্ঞদ্বারা তাঁহারা দেবতাদের এই কর্ম্মের সহায় হইতেন।

মানুষ যজ্ঞ দ্বারা কিরূপে এই বৃষ্টি উৎপাদন কর্ম্মে দেবতাদের সহায় হইতেন, তাহা এস্থলে বিবৃত হইয়াছে। মানুষ যজ্ঞ করিয়াই দেবতাদের সেই ভূতোদ্ভবকর কর্ম্মের সহায় হন। তাঁহারা যজ্ঞে যে আহুতি দেন তাহা হইতেও অন্ন উৎপন্ন হয়, অর্থাৎ তাহা এই দেবতাদের দ্বারা অন্ন উৎপত্তির সহায় হয়। কিরূপে সহায় হয়, তাহাই এই শ্লোকে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

এস্থলে উক্ত হইয়াছে যে, দেবতার উদ্দেশে অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞে যে আহুতি প্রদান করা যায়, তাহাই এক অপূর্ব্বাখ্য সূক্ষ্ম শক্তি বা ধর্ম যুক্ত হইয়া বাষ্পাদিরূপে রশ্মি-পথে সূর্য্যাভিমুখে আরোহণ করিতে থাকে পরে সেই শক্তির সহায়ে বৃষ্টি হয়, এবং তাহা হইতেই ব্রীহিযবাদি অন্ন জন্মে, এবং পূর্ব্বোল্লিখিত রূপে তাহা হইতেই ভূত-সৃষ্টি ও বৃদ্ধি হয় (গিরি)। সুতরাং যজ্ঞদত্ত হবিই পরে অন্নরূপে পরিণত হয় ও জীবদেহ বর্দ্ধন করে।

এই কথা আরও বিশদ করিয়া বুঝিতে হইলে, আধুনিক বিজ্ঞান-সম্মত দুই একটি তত্ত্বের আলোচনা করিতে হয়। সূর্য্যের উত্তাপে জল যখন বাষ্পরূপে পরিণত হইয়া ঊর্দ্ধে উত্থিত হয়, তখন তাহার সহিত কতকটা সেই তাপ অন্তর্হিত হয়। বিজ্ঞানের ভাষায় তাহাকে Latent heat বলে। সেই বাষ্প পুনর্ব্বার বৃষ্টিরূপে পরিণত হইতে হইলে, তাহার সেই অন্তর্ভূত তাপ বাহির হইয়া যাওয়ার প্রয়োজন হয়। ঊর্দ্ধে স্থিত শীতল বায়ু-স্তরের সংযোগে, অথবা ঊর্দ্ধগমন-ক্রিয়া সম্পাদন হেতু সেই জলীয় বাষ্পের তাপ সম্পূর্ণরূপে দূর হইতে পারে না—ইহা বিজ্ঞানবিদ্গণ এক্ষণে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তাঁহারা এখন অনুমান করেন

যে, তড়িতের ক্রিয়া-বিশেষের দ্বারা সেই কার্য্য সম্পন্ন হয়। এই জন্য বাষ্প যখন প্রথমে মেঘরূপে পরিণত হয়, তখন তাহার সহিত বিদ্যুৎ-স্ফুরণ হয়। সম্ভবতঃ এই বাষ্পের অন্তর্ভূত উত্তাপ কোনরূপে তড়িৎ-শক্তিতে পরিণত হয়। এবং সেই তড়িৎ এবং পৃথিবী হইতে আকৃষ্ট তাহার বিরোধী তড়িৎ পরস্পর আকর্ষণ-নিয়মানুসারে একীভূত হইয়া, বিদ্যুৎ স্ফুরিত হয়, এবং তখন বাষ্পের সেই অন্তর্ভূত উত্তাপ হ্রাসপ্রাপ্ত হওয়ায়, বাষ্প বৃষ্টিরূপে পরিণত হয়। সূর্য্য হইতে বিস্ফুরিত তেজ—তড়িৎ চুম্বক-শক্তি-রূপে কতকটা পরিবর্ত্তিত হইয়া, বাষ্পের তাপকে তড়িৎ রূপে পরিণত করে। এই জন্য সূর্য্যের তড়িতের হ্রাস-বৃদ্ধির সহিত অতিবৃষ্টির ও অনাবৃষ্টির সম্পর্ক আছে,—বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ ইহা সিদ্ধান্ত করেন। অতএব বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতকে সিদ্ধান্ত করিতে হইবে যে, কোন উপায়ে উর্দ্ধস্থিত বাষ্পে এই তড়িৎ-শক্তির সংযোগ-বিয়োগ ক্রিয়া দ্বারা অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টি নিবারণ করা যাইতে পারে। সম্প্রতি আকাশাভিমুখে ডাইনামাইট নিক্ষেপ করিয়া, তাহার সহসা বিশ্লেষণ জনিত শব্দের কম্পন হইতে বৃষ্টি উৎপাদনের চেষ্টা হইয়াছিল। কিন্তু তাহা কার্য্যকরী হয় নাই।

এস্থলে বৃষ্টি উৎপাদনের সেই প্রাচীন উপায় উল্লিখিত হইয়াছে। অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞে, অগ্নিতে যে হবিঃ ক্ষেপণ করা হয়, তাহার অপূর্ব্ব ধর্ম্ম বা কোন বিশেষ শক্তির সহিত ধূম ও বাষ্পাকারে সূর্য্যরশ্মি-পথে উর্দ্ধে উঠিয়া জলীয় বাষ্পের সহিত মিলিত হয়, ও তাহাকে বৃষ্টিতে পরিণত করে (শঙ্কর ও মধুসূদন)। বিজ্ঞান সাহায্যে আমরা এ কথা বুঝিতে পারি। আমরা বলিতে পারি যে এই অগ্নিতে আহুত দ্রব্যের বাষ্প উর্দ্ধে জলীয় বাষ্পের সহিত মিলিত হয়। সেই হব্যের বাষ্পকণাকে কেন্দ্র (nucleus) করিয়া তাহারই বিশেষ শক্তি সাহায্যে জলীয়বাষ্পকে জলকণারূপে পরিণত করিবার সহায় হয়, এবং এই জলকণার সংযোগে মেঘের উৎপত্তির সহায় হয়। আরও বলা যাইতে পারে যে বহু বৃহৎ যজ্ঞাগ্নিকুণ্ডে যে বহু পরিমাণে

হব্যাদি নিক্ষিপ্ত হয়, তাহাও হয়তঃ বাষ্প হইয়া উপরে উঠিবার সময় বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদন করে। সেই জন্য তাহাই জলীয়বাষ্পকে বৃষ্টিতে পরিণত করিবার সহায় হয়।

ইহা ব্যতীত আরও এক কথা আছে। যজ্ঞে আহুতিরূপে নিক্ষিপ্ত এই হবিঃ বাষ্পরূপে জলীয় বাষ্পের সহিত ঊর্দ্ধে সংমিলিত হইয়া সেই হবিঃ সম্ভূত বাষ্প বৃষ্টির সহিত ভূমিতে পড়িয়া ভূমির উর্ব্বরতা-শক্তির বৃদ্ধি সাধন করে। শুধু তাহাই নহে। শাস্ত্রে কথিত আছে যে, এই হবিঃসম্ভূত বাষ্প মধ্যে জীবদেহ সংগঠনকারী অণু অধিক পরিমাণে বর্ত্তমান থাকে। সে গুলি আধুনিক বিজ্ঞানাবিষ্কৃত Protoplasm germ-cell বা bacillus কিনা, তাহা পরীক্ষা করিলে জানা যাইতে পারে। যদি তাহা হয়, তবে এই হবিঃ শুধু ভূমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করে না। সেই ভূমিতে যে শস্য হয়, তাহাতে এই হবিঃ হইতেই জীবদেহ গঠনকারী অণুর পরিমাণ বৃদ্ধি হয়। এবং সেই শস্যে জীবদেহের বীজ থাকে। এইরূপ জীবদেহ গঠনোপ-যোগী অণুবিশিষ্ট শস্যই প্রকৃতপক্ষে আমাদের দেহের উপযোগী। অহার অভাবে আমাদের দেহ নিস্তেজ হইয়া পড়ে, উপযুক্ত সন্তানোৎপাদক রেতঃ ক্ষীণ হয় ও জীব-বীজের অপুষ্টিকর হয়। এ তত্ত্ব যদি সত্য হয়, তবে যজ্ঞ যে আমাদের কত উপকারী, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যাইবে। যজ্ঞ দ্বারা ভূমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধির ভার, এবং আমাদের দেহের প্রকৃত উপযোগী শস্য যাহাতে উৎপন্ন হয়,—এইরূপ কঠিন কার্য্যের ভার পূর্ব্বকালে নিরক্ষর কৃষকের হস্তে রাখার পরিবর্ত্তে সকল গৃহস্থের উপরই ন্যস্ত ছিল, এবং এই জন্য যজ্ঞ সকল গৃহস্থেরই কর্ত্তব্য ছিল। তখন প্রাচীন আর্য্য জনপদ সকল গৃহস্থের সম্পাদিত যজ্ঞ-ধূমে পূর্ণ থাকিত। সেদিন চলিয়া গিয়াছে।

এ সম্বন্ধে আরও এক কথা বলিতে হইবে। আর্য্যসমাজ প্রতিষ্ঠাতা দয়ানন্দ সরস্বতী, যজ্ঞের অন্যরূপ উপযোগিতা বুঝাইয়াছেন। আমরা

মিলিত হইয়া যে জনপদে বাস করি, আমাদের মল-মূত্র শ্বাস প্রশ্বাসাদি দ্বারা সেই জনপদের ভূমি, জল ও বায়ু দূষিত হয়। যজ্ঞই সেই জনপদের দূষিত ভূমি, জল ও বায়ুকে বিশুদ্ধ করিবার প্রধান উপায় ছিল। যজ্ঞে আহুত হবিঃ বাষ্পাকারে পরিণত হইয়া, দূষিত বায়ুকে বিশুদ্ধ করিত। দূষিত বায়ুই আমাদের অধিকাংশ সংক্রামক রোগের কারণ। বায়ু শোধিত হইলে আর সে সকল সংক্রামক রোগ হইতে পারে না। এইরূপে যজ্ঞ দ্বারা ভূমি ও জল শোধিত হইত। এই জন্য আর্য্য ঋষিগণের মতে যজ্ঞানুষ্ঠান সেই জনপদস্থ প্রত্যেক গৃহস্থেরই কর্ত্তব্য ছিল। ইহা সেই জনপদের স্বাস্থ্যরক্ষার প্রধান উপায় ছিল। ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট উপায় বোধ হয় এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। দয়ানন্দ সরস্বতী কৃত ঋগ্বেদ ভাষ্যভূমিকায় (৪৬ পৃঃ) আছে—"স চ অগ্নিহোত্রম্ আরভ্য অশ্বমেধপর্য্যন্তেষু যজ্ঞেষু সুগন্ধিমিষ্টপুষ্ট-রোগনাশক-গুণৈর্যুক্তস্য সম্যক্ সংস্কারেণ শোধিতস্য দ্রব্যস্য বায়ুবৃষ্টিজলশুদ্ধিকরণার্থম্ অগ্নৌ হোমঃ ক্রিয়তে। স তদ্দ্বারা সর্ব্বজগৎ সুখকার্য্যেব ভবতি। ... যজ্ঞঃ পরোপকারায় ভবতি।"

এই তত্ত্ব হইতে পূর্ব্বোক্ত ১১।১২।১৩ শ্লোকের অর্থও কতকটা বুঝা যাইবে। কেন না, যজ্ঞের দ্বারা কিরূপে আমরা সংবর্দ্ধিত হইতে পারি, তাহার এক কারণ ইহা হইতে জানা যাইবে। আর এই যজ্ঞ হইতে বৃষ্টিকারিণী শক্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বরুণ বা পর্জ্জন্যদেব, ও বিদ্যুৎ-শক্তির আধার আকাশ দেবতা ইন্দ্র কিরূপে সংবর্দ্ধিত হন, অর্থাৎ যজ্ঞ হইতে তাঁহাদের শক্তি কিরূপে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তাহাও বুঝা যাইবে।

আরও এক কথা উল্লেখ করা কর্ত্তব্য। সুকৃতি-শক্তি বলে মৃত্যুর পর জীব সূক্ষ্মশরীর লইয়া বিদ্যুৎপথে সূর্য্যলোকাভিমুখে গমন করে। আর যাহাদের ততদূর সুকৃতি-শক্তি নাই, তাহারা তত ঊর্দ্ধে, বায়ু ও অন্তরিক্ষ অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে না। ইহারা, এবং যাহারা

স্বর্গে গিয়া ভোগক্ষয়ে পরে পুনর্জ্জন্মগ্রহণ করে, তাহারা আকাশ-বায়ু-ক্রমে হবিঃবাষ্পের সহিত বৃষ্টিমুখে ভূমিতে পতিত হয়, ও শস্যের অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া জীবদেহে প্রবেশ করে ও পরে সময় উপস্থিত হইলে, শুক্র ও শোণিতের যোগে নিজ কর্ম্মানুগুণ স্থূল-শরীর গ্রহণ করে। শাস্ত্রের এই পুনর্জ্জন্মতত্ত্ব পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। মনু সংহিতায় আছে,—

"যদাণুমাত্রিকো ভূত্বা বীজং স্থাস্নু চরিষ্ণু চ।
সমাবিশতি সংসৃষ্ট স্তদা মূর্ত্তিং বিমুঞ্চতি॥" ১৷৫৬

অতএব যজ্ঞ দ্বারা উপযুক্ত অন্ন সৃষ্ট হইয়া সেই অন্ন আমরা ভোজন করিলে যে রেতঃ উৎপন্ন হয়, তাহা হইতেই আমাদের উপযুক্ত সন্তান উৎপন্ন হয়। এইরূপে পরোক্ষ ভাবে যজ্ঞই জীবোৎপত্তির সহায়।

সে যাহা হউক, জীবদেহোৎপাদক পোষক শস্য উৎপাদন করিতে যে প্রকৃতির কতকটা শক্তির ব্যয় হয়—ইন্দ্র বরুণাদির শক্তির যে কতকটা ক্ষয় হয়, তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। কেন না, বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত তত্ত্ব হইতে সকলে বুঝিতে পারিবেন যে, উপযুক্ত-পরিমাণ শক্তির ব্যয় ব্যতীত শস্য উৎপাদন-রূপ কার্য্য সম্ভবে না। পরে সেই শক্তির যদি পূরণ না হয়—তবে ইন্দ্র ও বরুণ-শক্তির ক্রমে হ্রাস হইতে পারে। যজ্ঞ দ্বারা সেই শক্তির পূরণ করিতে হয়,—অনাবৃষ্টি বা অল্পবৃষ্টির মূল কারণ নিবারণ করিতে হয়। এইজন্যই বলা হইয়াছে যে, যে মানব এই শক্তি দ্বারা পুষ্ট হইয়া—পরে এই শক্তিকে নিজে পুষ্ট না করে—সে পাপী ও পাপাহারী এবং চোর।

কর্ম্ম হতে যজ্ঞের উদ্ভব—এই যজ্ঞধর্ম্মাখ্য সূক্ষ্ম অপূর্ব্ব শক্তির উৎপাদনের কারণ কর্ম্ম, অর্থাৎ তাহা ঋত্বিক্‌ যজমানাদি-ব্যাপার-রূপ কর্ম্ম বিশেষের দ্বারা সাধ্য হয়, (মধু. শঙ্কর, গিরি)। এই কর্ম্ম কাহাকে বলে,

তাহা পরে গীতায় (৮।৩ শ্লোকে) উক্ত হইয়াছে। যথা "ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্ম্মসজ্ঞিতঃ।" কর্ম্ম প্রধানতঃ দুইরূপ—এক ত্যাগ, আর এক গ্রহণ। এস্থলে এই গ্রহণাত্মক কর্ম্মের কথা উক্ত হয় নাই। এ কর্ম্ম ত্যাগাত্মক। মানুষের কর্ম্ম কেবল ত্যাগাত্মক হইতে পারে না। মানুষ উপাদেয় বিষয় গ্রহণ করে, তাহা ত্যাগ করিতে চাহে না। মানুষ জন্ম জন্ম ধরিয়া গ্রহণই করিতে থাকে, অথবা উপাদেয় গ্রহণ ও হেয় ত্যাগ করিতে থাকে। এইরূপে মানুষের জন্ম জন্ম ক্রম বিকাশ হয়। মানুষ যখন এইরূপে ক্রমোন্নত হয়, তখন তাহার ত্যাগ-প্রবৃত্তির বিকাশ হইতে আরম্ভ হয়, তখন সে সঞ্চিত উপাদেয় বস্তু ত্যাগ করিতে অর্থাৎ পরার্থ ত্যাগ করিতে এবং হেয় বস্তুও পরার্থ গ্রহণ করিতে পারে। ইহাকেই সাধারণ ভাবে ত্যাগ' বলা যায়। যাহা প্রকৃত কর্ম্ম নামের যোগ্য, তাহা এই ত্যাগাত্মক; অর্থাৎ ইহা পরার্থে উপাদেয় বিষয়-ত্যাগাত্মক, ও পরার্থ হেয়-বিষয়-(দুঃখ-দারিদ্র্যাদি) গ্রহণাত্মক। ইহাই কর্ম্ম। এই কর্ম্ম দ্বারা সর্ব্বভূত উপকৃত হয়, তাহাদের ভূতভাবের বৃদ্ধি হয়। ভগবান্ গীতায় কেবল এই কর্ম্মেরই উপদেশ দিয়াছেন।

ভগবান্ সদা পূর্ণ, তাঁহার প্রাপ্তব্যও কিছু নাই, রক্ষিতব্যও কিছুই নাই। সুতরাং তাঁহার কর্ত্তব্যও কিছু নাই। তথাপি ভগবান্ কর্ম্ম করেন; ইহা পরে (২২ শ্লোকে) উক্ত হইয়াছে। ভগবানের সে কর্ম্ম এই ত্যাগাত্মক। তিনি আপনার স্বভাব—নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়, শান্ত, প্রপঞ্চাতীত ভাব, ত্যাগ করিয়া এই জগৎ রক্ষাদি-রূপ কর্ম্মে নিরত। ভগবানের এই ত্যাগাত্মক ভূতভাবোদ্ভবকর কর্ম্ম হইতে প্রথম যজ্ঞের উৎপত্তি হয়, তাহা পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। সেই যজ্ঞের নাম পুরুষ-যজ্ঞ। তাহাই ঋগ্বেদে প্রসিদ্ধ পুরুষ-সূক্তে উক্ত হইয়াছে। ভগবান্ এই সৃষ্টি জন্য প্রথম আপনাকে বলি দিয়া যজ্ঞ করেন, তিনিই দেবতারূপে সে যজ্ঞ করেন। এই মহাত্যাগ (sacrifice)। ইহাতেই আকাশাদিক্রমে সমুদায় সৃষ্টি হয় ও জীবগণের

উৎপত্তি হয়। অতএব আদিতে পরম পুরুষের সেই মহাত্যাগাত্মক কর্ম্ম হইতেই যজ্ঞের উৎপত্তি।

সাধারণ ভাবে এই শ্লোকের অর্থ এই যে, ত্যাগাত্মক কর্ম্ম হইতেই যজ্ঞের উৎপত্তি। যতরূপ ত্যাগাত্মক কর্ম্ম হইতে পারে, তাহার মধ্যে যজ্ঞরূপ ত্যাগাত্মক কর্ম্মই শ্রেষ্ঠ, সেই ত্যাগাত্মক কর্ম্মের চরম বিকাশ। যজ্ঞ সমুদায় ত্যাগাত্মক কর্ম্মের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কেন, তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে।

কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবম্।
তস্মাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্ ॥১৫

ব্রহ্ম হ'তে হয় জে'ন কর্ম্মের উদ্ভব,
ব্রহ্ম সমুদ্ভব হন্ অক্ষর হইতে,
সর্ব্বগত ব্রহ্ম তাই নিত্য যজ্ঞে স্থিত॥ ১৫

মুণ্ডকোপনিষদের প্রথম মুণ্ডকের প্রথম খণ্ডের অষ্টম শ্লোক এইরূপ—
"তপসা চীয়তে ব্রহ্ম ততোঽন্নমভিজায়তে।
অন্নাৎ প্রাণো মনঃ সত্যং লোকাঃ কর্ম্মসু চামৃতম্॥"

(১৫) ব্রহ্ম—বেদ (শঙ্কর, স্বামী, গিরি, মধু, বলদেব)। ঋগ্বেদের পুরুষসূক্তে আছে "তস্মাৎ যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুত ঋচঃ সামানি জজ্ঞিরে" অর্থাৎ উক্ত পুরুষযজ্ঞ হইতে বেদের উৎপত্তি। ঐতরেয় আরণ্যকে আছে,—"তদিতি বা এতস্য মহতো ভূতস্য নাম ভবতি যোঽসৌ তদেবং নাম বেদব্রহ্ম ভবতি ব্রহ্ম ভবতি।" অর্থাৎ ব্রহ্মপ্রতিপাদক বেদ ব্রহ্ম নামে অভিহিত। রামানুজ বলেন, "এখানে ব্রহ্ম অর্থে প্রকৃতি বা পরিণামরূপ শরীর। কারণ গীতার ১৪শ অধ্যায়ের ৩য় শ্লোকে আছে—"মমযোনি র্মহদ্ব্রহ্ম তস্মিন্

গর্ভং দধাম্যহম্।" কোন কোন টীকাকার বলেন, ব্রহ্ম এখানে ব্রহ্মা। সে অর্থ নিতান্তই অসঙ্গত। কেহ কেহ অর্থ করেন,—'ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবম্' বলিতে ব্রহ্মা ও অক্ষর একই সময়ে উদ্ভূত, ইহাই বুঝায়। এ অর্থও একান্ত অসঙ্গত। গীতায় 'ব্রহ্ম' ও পরংব্রহ্ম উভয়ই উল্লিখিত হইয়াছে। 'অক্ষরং ব্রহ্ম পরমং' (৮।৩)। এই স্থলে অর্জ্জুন প্রশ্ন করিয়াছিলেন, 'ব্রহ্ম' কি? তাহার উত্তরেই এই কথা উক্ত হইয়াছে। সে স্থলে ব্রহ্ম ও 'ব্রহ্ম পরমং' একই। এস্থলে উক্ত হইয়াছে, ব্রহ্ম অক্ষর হইতেই উৎপন্ন, অর্থাৎ 'অক্ষরং ব্রহ্ম পরমং' হইতে উৎপন্ন। সুতরাং এই ব্রহ্ম পৃথক্। পরে ত্রয়োদশ অধ্যায়ে যে ব্রহ্মতত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে, সেই 'ব্রহ্ম'ও এস্থলে উক্ত ব্রহ্ম ভিন্নার্থে ব্যবহৃত।

কিন্তু এস্থলে ব্রহ্ম যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহাই ব্রহ্মশব্দের মূল অর্থ। ঋগ্বেদে অনেক সূক্তে, ঋষিরা 'ব্রহ্ম' রচনা করিতেছেন, এরূপ মন্ত্র আছে। সায়ন সে স্থলে ব্রহ্ম অর্থে স্তোত্র বুঝিয়াছেন; (ঋগ্বেদ ৭।২০।১ ইত্যাদি দ্রষ্টব্য) সে স্থলে ব্রহ্ম অর্থে বেদমন্ত্র। কোথাও প্রার্থনা আছে— 'আমাদের ব্রহ্ম ও যজ্ঞ বর্দ্ধন কর' (ঋগ্বেদ, ১।১০।৪) সেখানে ব্রহ্ম অর্থে অন্ন। কোথাও উক্ত হইয়াছে "ব্রহ্ম দেবানাং পদবী" (ঋগ্বেদ, ৭।৪।৭)। কোন স্থলে (আশ্বলায়ন শ্রৌত সূত্রে ১।১৯) ব্রহ্ম অর্থে কুশের গুচ্ছ। এইরূপে বেদসংহিতায় ও ব্রাহ্মণে 'ব্রহ্ম' শব্দ নানা অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

বৃ ধাতু হইতে ব্রহ্ম। ইহার এক অর্থ বর্দ্ধন করা ও আর এক অর্থ প্রকাশ হওয়া—ব্যাপ্ত হওয়া। এই বৃ ধাতু হইতে বৃহস্পতি শব্দ হইয়াছে। শ্রুতিতে আছে—এই বৃহস্পতি বাচস্পতি। এজন্য ব্রহ্মের এক অর্থ যাহা বাক্যরূপে স্ফুটিত হয়। বাক্যরূপেই ব্রহ্মের প্রকাশ। (বাইবেলেও 'In the beginning was the Word' ইহা উক্ত হইয়াছে)। শ্রুতিতে আছে, ব্রহ্ম ঈক্ষণ বা কল্পনা করিলেন,—আমি বহু হইব। এবং নাম ও রূপ দ্বারা তাহা ব্যাকৃত করিলেন। 'নাম'—বাক্য

বা শব্দ দ্বারাই কল্পনা করা যায়। (পরে ৮।১৩ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)। এই জন্য অক্ষর পরব্রহ্ম প্রথমে 'শব্দ ব্রহ্মরূপে প্রথম প্রকাশিত হন, এবং সেই শব্দের বা বাক্যের বর্দ্ধন দ্বারা বর্দ্ধিত হন, এবং তাহাতেই এ জগতের বিকাশ হয়। এই শব্দ-ব্রহ্মই—বেদ। ইহা নিঃশ্বাসের ন্যায় সহজভাবে হিরণ্যগর্ভের মুখ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে, ইহা শ্রুতির উক্তি। ঋষিগণ সেই বেদার্থ দর্শন করিয়া তাহা যেভাবে যিনি গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাই আমাদের উপকারের জন্য প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাই আমাদের বেদ।

অতএব এস্থলে ব্রহ্ম অর্থে শব্দব্রহ্ম বা বেদ।

কর্ম্মের উদ্ভব—অর্থাৎ বেদই কর্ম্মের প্রমাণ (মধু)। অথবা বেদ হইতেই কর্ম্মের প্রবৃত্তি (বলদেব, স্বামী)। প্রকৃতি-পরিণামরূপ শরীর হইতেই কর্ম্মের উদ্ভব হয় (রামানুজ)। রামানুজের অর্থ এস্থলে সঙ্গত নহে।

অক্ষর হইতে—পরমাত্মার নিশ্বাস হইতে যেন পুরুষের নিশ্বাসের ন্যায় বুদ্ধি প্রয়োগ বা চেষ্টা বিনা বেদ উদ্ভূত হইয়াছে। (মধু, শঙ্কর, গিরি)। শ্রুতিতে আছে "অস্য মহতো ভূতস্য নিশ্বসিতমেতৎ ঋগ্বেদঃ যজুর্ব্বেদঃ সামবেদঃ।" (মুণ্ডক, ১।১।৫ ; বৃহদারণ্যক, ২।৪।১০) রামানুজ বলেন—অক্ষর বা জীবাত্মা হইতে উদ্ভূত। এ অর্থ সঙ্গত নহে।

কারণ, গীতার ৮ম অধ্যায়ের ৩,১১,২১শ্লোকে,১২শ অধ্যায়ের ৩য় শ্লোকে এবং ১৫শ অধ্যায়ের ১৬শ শ্লোকে এই 'অক্ষর' শব্দের অর্থ পাওয়া যায়। সেই সব শ্লোক হইতে জানা যায় যে, এই সৃষ্টিতে পুরুষ তিনরূপ—ক্ষর অক্ষর ও উত্তম। তন্মধ্যে ক্ষর পুরুষ—জীব, কেন না তাহা ব্রহ্মে লয় হইতে পারে। অক্ষর পুরুষ 'কূটস্থ'। অর্থাৎ নির্গুণ ব্রহ্ম বা পরমাত্মাই অক্ষর। তিনি অক্ষয় পুরুষরূপে সর্ব্বজীবদেহে জীবের সহিত অবস্থিত। ঋগ্বেদের ১ম মণ্ডলের ১৬৪ সূক্তের ২১শ ঋকে আছে—

"দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে"

অর্থাৎ দুই পরস্পর যুক্ত সখ্যভাবাপন্ন পক্ষী এক বৃক্ষে বাস করেন। এই কূটস্থ অক্ষর পুরুষ সর্ব্বজীবে অবিভক্তভাবে অধিষ্ঠান করেন বলিয়া, তিনি সর্ব্বগত। ইহা ব্যতীত অব্যক্ত পরব্রহ্ম যিনি, তাঁহাকেও 'অক্ষর' বলা হইয়াছে। এই শ্লোকে 'ব্রহ্ম' অর্থে বেদ বুঝাইলে 'অক্ষর' অর্থে—জীবাত্মা হইতে পারে না—কেন না বেদ অপৌরুষেয়। অক্ষর অর্থে তাহা হইলে পরব্রহ্ম। (গীতা, ৮।৩) রামানুজের অর্থ ধরিলে 'ব্রহ্ম' অর্থে মহদ্‌যোনি বা তাহা হইতে জাত ভূতশরীর বুঝিতে হইবে ও 'অক্ষর' অর্থে জীবাত্ম- হইবে। কিন্তু এ অর্থ সঙ্গত নহে। (১৩।১২ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)।

সর্ব্বগত—সর্ব্বপ্রকাশক (মধু, শঙ্কর)। মন্ত্রার্থবাদের দ্বারা সর্ব্বভূতের প্রয়োজনীয় আখ্যানাদিতে অবস্থিত (স্বামী)। সকল শরীর অধিকার করিয়া বাসকারী (রামানুজ)।

ব্রহ্ম অর্থে যদি বেদ হয়, তবে তিনি কিরূপে সর্ব্বগত হন ? ইহার একমাত্র গ্রাহ্য উত্তর এই যে, অক্ষরব্রহ্ম হইতে যে শব্দব্রহ্মের উৎপত্তি, তাহাতেই সমুদায় জগৎ প্রতিষ্ঠিত। সেই বেদানুসারেই এই জগতের উৎপত্তি ও স্থিতি। ব্রহ্ম এজন্য যেরূপ কল্পনা করেন, বেদরূপ বাক্য দ্বারা তাহা সত্তাযুক্ত হইয়া প্রকাশিত হয়। প্রসিদ্ধ জর্ম্মাণ দার্শনিক হেগেলের কথায় Thought is Being। স্পাইনোজা বলিয়াছেন, ব্রহ্মের দুই ভাব (modes)—Thought এবং Extension। এই Thought (Ideas) বা কল্পনা বাক্য (words) দ্বারা ব্যক্ত। সেই বাক্য-সমষ্টিই বেদ। এইজন্য বেদ বা শব্দব্রহ্মকে সর্ব্বগত বলা হয়।

নিত্যযজ্ঞে স্থিত—যজ্ঞ হইতে যে অতীন্দ্রিয় অপূর্ব্ব ধর্ম্ম বা শক্তি জন্মে, তাহাতে অবস্থান করেন (মধু)। যজ্ঞ বিধি-প্রধান বলিয়া তাহাতে বাস করেন (শঙ্কর)। নিজসৃষ্ট প্রজার জীবনোপায় বলিয়া অতি প্রিয় যজ্ঞে অধিষ্ঠিত থাকেন (বলদেব)। তিনিই যজ্ঞের মূল (রামানুজ)। সর্ব্ব-

ব্যাপী অক্ষর পুরুষ সর্ব্বদা যজ্ঞের উপায়ভূত হইয়া তাহাতে অধিষ্ঠিত থাকেন (স্বামী)।

মূলে আছে—'নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্'। এই শব্দব্রহ্ম সর্ব্বযজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত থাকেন। কেবল যে মানুষের যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত থাকেন, তাহা নহে। ব্রহ্মের একটি রূপ অধিযজ্ঞ। প্রতি দেহে তিনি অধিযজ্ঞ রূপে থাকেন (৮।৪)। যে প্রাণকর্ম্ম দ্বারা এই দেহ রক্ষিত হয়, তাহাকে প্রাণাগ্নিহোত্র বলে। ইহা ব্যতীত এই সৃষ্টিকল্পে যে প্রথম যজ্ঞ পুরুষসূক্তে উক্ত হইয়াছে, তাহার উল্লেখ করিয়াছি। দেবগণের যে যজ্ঞ দ্বারা এই জগৎ বিধৃত, ও জীবের উদ্ভব হয়, তাহাও উল্লিখিত হইয়াছে। এই সর্ব্বযজ্ঞই বেদবিহিত এবং সেই বেদ দ্বারাই অক্ষর সর্ব্বগত ব্রহ্ম সর্ব্বযজ্ঞে অধিষ্ঠিত থাকেন।

এই শ্লোকের একরূপ সহজ অর্থও হইতে পারে; যথা,—অক্ষর পরব্রহ্মের এক চতুর্থ পাদ (পুরুষসূক্ত দ্রষ্টব্য) মাত্র মায়াযুক্ত সগুণ ব্রহ্মরূপে জগতে প্রকাশিত। এই মায়ার গুণত্রয় হইতে কর্ম্মের উৎপত্তি। ব্রহ্মই এই কর্ম্মের আধার ও যজ্ঞরূপ কর্ম্মের অধিষ্ঠাতা।

এবং প্রবর্ত্তিতং চক্রং নানুবর্ত্তয়তীহ যঃ।
অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি ॥১৬

এইরূপে প্রবর্ত্তিত চক্র যে হেথায়
নহে অনুবর্ত্তী, পার্থ—সেই পাপ-প্রাণ,
ইন্দ্রিয়-নিরত—বৃথা জীবন তাহার ॥ ১৬

(১৬) প্রবর্ত্তিত চক্র—বেদ-যজ্ঞ পূর্ব্বক ঈশ্বর-প্রবর্ত্তিত জগৎ-চক্র (শঙ্কর)। জীবের পুরুষার্থ সিদ্ধির জন্য প্রবর্ত্তিত কর্ম্মাদি চক্র (স্বামী)।

ব্রহ্ম হইতে বেদের আবির্ভাব, তাহা হইতে কর্ম্মে চোদনা ও বৈদিক কর্ম্ম অনুষ্ঠানে ধর্ম্মোৎপত্তি, তাহা হইতে পর্জ্জন্য, তাহা হইতে অন্ন, তাহা হইতে ভূতগণ, এবং পুনর্ব্বার ভূতগণ হইতে কর্ম্মপ্রবৃত্তি—এই পরমেশ্বর-প্রবর্ত্তিত চক্র (মধুসূদন, বলদেব)। রামানুজ বলেন, "ভূতশরীর (ব্রহ্ম) হইতে কর্ম্ম, কর্ম্ম হইতে যজ্ঞ, যজ্ঞ হইতে পর্জ্জন্য, পর্জ্জন্য হইতে অন্ন, অন্ন হইতে ভূতশরীর, পুনর্ব্বার ভূতশরীর হইতে কর্ম্ম ইত্যাদি—এইরূপ কার্য্য-কারণ-ভাবে জগতে কর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তিত হয়।

অক্ষর পরব্রহ্ম হইতে প্রতি সৃষ্টিতে যে ভূতগণের আদি উৎপত্তি, তাহার তত্ত্ব পরে, (১৪।৩ শ্লোকে) উক্ত হইয়াছে। তাহার পর সৃষ্টি অবস্থায় পুনঃ পুনঃ এই ভূতগণের স্থূল শরীর গ্রহণপূর্ব্বক উৎপত্তি, ও স্থূল শরীর নাশহেতু বিনাশ হইতেছে। জীবগণ এক দেহ ত্যাগ করিয়া দেহান্তর গ্রহণ করিতেছে। ইহার তত্ত্বও পরে (১৪।৪ শ্লোকে) বিবৃত হইয়াছে। সৃষ্টির পরে প্রলয় ও প্রলয়ের পর সৃষ্টি—ইহাই মূল জগৎ-চক্র। তাহার পর সৃষ্টিকালে পুনঃপুনঃ জীবগণের জন্ম—দ্বিতীয় জগৎ-চক্র। তাহাই এস্থলে উক্ত হইয়াছে। কর্ম্ম দ্বারা এই জগৎ-চক্র প্রবর্ত্তিত হয়। ভগবান্ স্বয়ং সে জগৎ-চক্র প্রবর্ত্তিত করেন। বৌদ্ধদের মতে ইহা ধর্ম্মচক্র-প্রবর্ত্তন। মানুষ কর্ম্ম দ্বারা সেই জগৎ-চক্র প্রবর্ত্তনের সহায়। ভগবান্ নিজে সর্ব্বহৃদয়ে স্থিত হইয়া মায়া দ্বারা সকলকে স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত করেন। যে মায়ামুক্ত সে স্বয়ং একার্য্য নিরত।

নহে অনুবর্ত্তী—কর্ম্মযোগাধিকারী বা জ্ঞানযোগাধিকারী যে কেহ (রামানুজ)। যাহারা ইহলোকে কেবল কর্ম্মাধিকারী, তাহারা (শঙ্কর)। ইন্দ্রিয়নিরত বিশেষণ যখন এই শ্লোকে উল্লিখিত হইয়াছে, তখন এই শ্লোক কেবল কর্ম্মাধিকারীকেই উপলক্ষিত করিয়াছে (মধুসূদন)। শ্রুতিতে আছে—এই জীবাত্মা সকল ভূতেরই লোক, অর্থাৎ সকলের জন্যই কার্য্য করিবে। সে যে হোম করে, তাহাতে দেবলোকের কার্য্য

হয়; যে উপদেশ দেয়, তাহাতে ঋষিদের কার্য্য হয়; যে পুত্রোৎপাদন করে, তাহা দ্বারা পিতৃলোক তৃপ্ত হয়। সে মনুষ্যদের বাস ও অন্ন দিয়া তাহাদের তৃপ্তি করে, তৃণ ও উদক দিয়া পশুদের তৃপ্তি করে ও শ্বাপদ বয়স পিপীলিকাদের আহার দিয়া তৃপ্ত করে। এইজন্য রামানুজের অর্থই অধিক সঙ্গত। পূর্ব্বে ১৩শ শ্লোকের টীকায় যে পঞ্চ যজ্ঞের কথা উল্লিখিত আছে, তাহা যে চিরদিনই গৃহস্থর কর্ত্তব্য, এ কথা সকলেই স্বীকার করিবেন। তবে অন্য বেদোক্ত সকাম যজ্ঞ সম্বন্ধে মতান্তর হইতে পারে। কিন্তু সে সকল যজ্ঞও নিষ্কামভাবে কর্ত্তব্য বোধে করা যাইতে পারে ও করা কর্ত্তব্য। তাহার কারণ পূর্ব্বোক্ত কয় শ্লোকে বুঝান হইয়াছে।

শ্রুতি (শ্রৌত সূত্র দ্রষ্টব্য) অনুসারে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য সকল বর্ণের লোকের জন্য চারি আশ্রম বিহিত। প্রত্যেককেই ব্রহ্মচর্য্য, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস আশ্রমের মধ্য দিয়া জীবন অতিবাহিত করিতে হয়। যাঁহারা শ্রুতি অনুসারে আপনার জীবনকে নিয়মিত করিতে চাহিতেন, তাঁহারা ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম হইতে একেবারে সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করিতেন না। শাস্ত্রানুসারে তাহা অবিহিত। বৈদিক যুগে কেহই গৃহস্থাশ্রমের কর্ত্তব্য যজ্ঞাদি কর্ম্ম ত্যাগ করিতে পারিতেন না। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাদুর্ভাবে প্রথম ভিক্ষুর আশ্রম স্থাপিত হয় এবং বৌদ্ধধর্ম্মানুসারে গৃহস্থাশ্রমী না হইয়াও, ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম হইতে সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করা বিহিত হইয়াছিল। শঙ্করাচার্য্য হয়তঃ তদনুসারে দশনামী সন্ন্যাসি-সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত করেন এবং ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম হইতে একেবারে সন্ন্যাসাশ্রমে প্রবেশ করিবার ব্যবস্থা করেন। ইহারাই গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ না করায়, যজ্ঞাদি কর্ম্মত্যাগী। আজীবন সন্ন্যাসী শঙ্করাচার্য্য সেইজন্য বার বার প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, যে মুমুক্ষু, তাহার যজ্ঞাদি গৃহস্থাশ্রমোচিত কর্ম্মে প্রয়োজন নাই। উচ্চাধিকারীর পক্ষে কেবল জ্ঞানসাধনই কর্ত্তব্য। যে নিম্নাধিকারী, সেই কেবল চিত্তশুদ্ধির জন্য গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া যজ্ঞাদি

গৃহস্থাশ্রম-বিহিত ও বর্ণোচিত কর্ম্ম করিবে। বলা বাহুল্য, শঙ্করাচার্য্য শ্রুতির দুই একটি বচন দ্বারা এই মত প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিলেও ইহা শ্রুতিবিরুদ্ধ। কর্ম্ম যে একান্ত কর্ত্তব্য, তাহা গীতায় বিশেষভাবে উপদিষ্ট হইয়াছে। যিনি জ্ঞানী, যিনি সর্ব্বরূপ আসক্তি-বিহীন, যিনি মুক্ত, তাঁহাকেও কর্ম্ম করিতে হইবে। সে কর্ম্মে বন্ধন নাই, মুক্ত পুরুষের কর্ম্ম দ্বারা বন্ধন হয় না।

"গতসঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ।
যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে ॥ (গীতা, ৪।২৩)।

অতএব মুক্ত হউন, জ্ঞানী হউন, সর্ব্বাসক্তিশূন্য সন্ন্যাসী হউন, তাঁহাকে এই লোকহিতার্থ যজ্ঞাদি কর্ম্ম করিতেই হইবে; নতুবা তাঁহার জীবন বৃথা। তাঁহার পূর্ব্বোক্ত পঞ্চঋণ শোধ হয় না, পাপ ও সম্পূর্ণ দূর হয় না। সুতরাং শঙ্কর যে সন্ন্যাসীর কর্ম্মত্যাগ উপদেশ দিয়াছেন, তাহা শাস্ত্রবিহিত নহে।

কেহ কেহ বলেন যে, জ্ঞানোৎপত্তিদ্বারা উক্ত পঞ্চঋণ আপনিই শোধ হইয়া যায়। ইহা সঙ্গত নহে। তবে সন্ন্যাস ও বানপ্রস্থাশ্রম-বিহিত জ্ঞান-বিতরণরূপ কর্ম্ম ও ধর্ম্মরক্ষারূপ কর্ম্ম দ্বারা সে ঋণ শোধ হইতে পারে। কিন্তু গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া প্রথমে পঞ্চ মহাযজ্ঞাদি দ্বারা সে ঋণ শোধই প্রকৃষ্ট উপায়। কেহ বলেন, ভগবদ্ ভক্তি দ্বারা সে ঋণ শোধ হইয়া যায়। শ্রীভাগবতে আছে—

"দেবর্ষিভূতাপ্ত নৃণাং পিতৃণাং
ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্।
সর্ব্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং
গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্ত্তম্ * ॥ (শ্রীভাগবত ১১।৫।৩৭)।

---

* কর্ত্তং কৃত্যং পরিহৃত্য; যদ্বা কর্ত্তং ভেদং পরিহৃত্য। স্বামী।

ইহার ব্যাখ্যা গীতাতেই আছে :—

"স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ। (গীতা, ১৮।৪৬)।

অতএব কর্ম্ম দ্বারা ভগবানের অর্চ্চনা করিলে, ভগবৎকার্য্য দ্বারা ভগবানের শরণ লইলে, তবে এই ঋণ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। অতএব এই শ্লোকে যাহা উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা সর্ব্বাবস্থায় সকলের সম্বন্ধে প্রযোজ্য, তাহাতে কোনরূপ বাধা নাই।

বৃথা জীবন তাহার—শঙ্কর বলেন যে, যাহারা অজ্ঞ, জ্ঞানাধিকারী নহে, তাহাদের কর্ম্মই কর্ত্তব্য। যজ্ঞাদি কর্ম্ম না করিলে, তাহারা ইন্দ্রিয়-বিষয়ে ক্রীড়াশীল হয় ও তাহাদের জীবন পাপময় হয়। আত্মনিষ্ঠা-যোগ্যতা প্রাপ্তির পূর্ব্বে, অনাত্মজ্ঞের কর্ম্মানুষ্ঠান কর্ত্তব্য। পূর্ব্বে চতুর্থ শ্লোক হইতে এ পর্য্যন্ত অনাত্মবিদের কর্ম্মানুষ্ঠান যে কর্ত্তব্য, তাহার বহু কারণ উক্ত হইয়াছে, এবং কর্ম্মানুষ্ঠান না করিলে যে দোষ, তাহা সংকীর্ত্তিত হইয়াছে। এ সিদ্ধান্ত যে সঙ্গত নহে, তাহা আমরা বিশেষ ভাবে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। ভগবান্ আর ব্যামিশ্রবচনে অর্জ্জুনের বুদ্ধিকে মোহযুক্ত করেন নাই। তিনি সাংখ্যের জ্ঞানযোগ ও যোগীর কর্ম্মযোগ এই দ্বিবিধ নিষ্ঠার মধ্যে, এস্থলে সামান্যভাবে যোগীর কর্ম্মযোগ বিবৃত করিয়াছেন মাত্র। পর শ্লোক হইতে জ্ঞাননিষ্ঠ সাংখ্যজ্ঞানীদেরও যে কর্ম্মযোগানুষ্ঠান প্রয়োজনীয়, তাহা বিশেষভাবে বিবৃত হইয়াছে।

যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাৎ আত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে॥ ১৭

কিন্তু যে মানব হয় আত্মাতে নিরত,
আত্মাতেই রহে তৃপ্ত, সন্তুষ্ট আত্মাতে,
কার্য্য তার কিছু আর না থাকে তখন॥ ১৭

(১৭) আত্মাতেই রহে তৃপ্ত—আত্মজ্ঞাননিষ্ঠ বিষয়াসক্তিহীন হইয়া কেবল আত্মাতেই নিরত থাকে (শঙ্কর)।

যে ব্যক্তি জ্ঞানযোগ কর্ম্মযোগ উভয়-সাধন-নিরপেক্ষ, তিনিই আত্মাভিমুখ আত্মা দ্বারাই তৃপ্ত বা সন্তুষ্ট—অন্য কিছুতে অর্থাৎ নৃত্য-গীত-বাদ্যে অর্থাৎ ধারণ-পোষণ-ভোগ-ব্যাপারে তিনি তৃপ্ত হন না (রামানুজ)।

কার্য্য তার থাকে না—তিনি কর্ম্মাধিকারী নহেন বলিয়া তাঁহার বৈদিকাদি কোনরূপই কার্য্য নাই (মধু)। তাঁহার কোন কর্ত্তব্য নাই (স্বামী)। করণীয় কিছুই নাই (শঙ্কর)। শ্রুতিতে আছে "আত্মক্রীড় আত্মরতিঃ ক্রিয়াবানেষ ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ।" (ছান্দোগ্য, ৭।২৫।২)। রামানুজ বলেন "যিনি জ্ঞানযোগ বা কর্ম্মযোগ সাধন-নিরপেক্ষ, তিনিই আত্মরত ও আত্মতৃপ্ত। তিনি আত্মদর্শনহেতু মুক্ত হইয়াছেন, সুতরাং চিত্তশুদ্ধি জন্য তাঁহার মহাযজ্ঞাদি বর্ণ ও আশ্রমোচিত কর্ম্ম করিবার প্রয়োজন নাই।"

শঙ্কর বলেন যে, ভগবান যে জগৎ-চক্র-প্রবর্ত্তনের কথা বলিয়াছেন, তাহা সকলেরই অনুবর্ত্তনীয় অথবা কেবল জ্ঞানযোগে অনধিকারী কর্ম্মযোগীরই অনুষ্ঠেয়, অর্জ্জুনের এরূপ প্রশ্ন হইতে পারে। সেই প্রশ্নের অপেক্ষায় ভগবান্ এই কথা বলিয়াছেন।

পূর্ব্বের ও পরবর্ত্তী কয় শ্লোকের সহিত ১৮শ অধ্যায়ের ৫ম শ্লোক ও ১৭শ অধ্যায়ের ২৪।২৫শে শ্লোক মিলাইয়া দেখিলে এই অর্থ বোধ হয় যে, আত্মজ্ঞানীদের বা ব্রহ্মবাদীদের 'নিজের' জন্য কোন কার্য্য করিতে হয় না। কেন না, তাঁহাদের কিছুতে আসক্তি নাই, স্বর্গাদিভোগের বাসনা নাই, ইন্দ্রিয় বিষয়ে রতি নাই, তাঁহারা ইষ্টকাম চাহেন না, তাঁহার নির্যোগক্ষেম আত্মবান্। তাঁহাদের নিজের কার্য্য নাই—জীবন যাত্রা-নির্ব্বাহার্থও তাঁহাদের কোন কার্য্য নাই। ভগবান্ তাঁহাদের যোগক্ষেম বহন করেন। কিন্তু অন্যের জন্য—তাঁহারা কার্য্য করেন। লোক-সংগ্রহার্থ কার্য্য তাঁহাদেরও কর্ত্তব্য।

এইরূপ অর্থ না করিলে পূর্ব্বাপর সঙ্গতি থাকে না। পরে ১৮শ অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকে ভগবান্ বলিয়াছেন যে, এই কর্ম্ম সম্বন্ধে দুইরূপ মত প্রচলিত আছে। কোন কোন মনস্বী ব্যক্তি বলেন—কর্ম্ম ত্যাজ্য; কেহ বলেন—যজ্ঞ দান তপঃ কর্ম্ম কথনই ত্যাজ্য নহে। ভগবান্ দ্বিতীয় মত অনুমোদন করিয়া বলিয়াছেন,—

যজ্ঞদানতপঃকর্ম্ম ন ত্যাজ্যং কার্য্যমেব তৎ।
যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্॥
এতান্যপি তু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানি চ।
কর্ত্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুত্তমম্॥ (গীতা ১৮।৫)।

ভগবান্ আরও বলিয়াছেন, যে সন্ন্যাস অর্থে কাম্য কর্ম্মের ন্যাস বা ত্যাগ মাত্র, কর্ত্তব্য কর্ম্ম ত্যাগ নহে। সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগই প্রকৃত ত্যাগ, (১৮।২)। ভগবান্ নিজের দৃষ্টান্ত দিয়া পরে (২২শ শ্লোকে) বুঝাইয়াছেন যে, তাঁহার আপ্তব্য কিছু নাই, তথাপি তিনি জগৎ রক্ষার্থ, ধর্ম্ম রক্ষার্থ কর্ম্ম করেন। অতএব এ শ্লোকের অর্থ এই—"যে পাপজীবন, ইন্দ্রিয়ারাম, তাহারই চিত্তশুদ্ধি জন্য, পাপক্ষয় জন্য এই যজ্ঞাদি বিহিত কার্য্য কর্ত্তব্য, না করিলে তাহার জীবন বৃথা হয়। কিন্তু যে আত্মরত, আত্মতৃপ্ত, আত্মসন্তুষ্ট, সেই সাংখ্যযোগীর নিজের জন্য অর্থাৎ পাপক্ষালন ও চিত্তশুদ্ধির জন্য কোন কার্য্য নাই। কোন কার্য্য দ্বারা আর তাঁহাকে পাপমুক্ত হইতে হয় না, কেন না তাঁহার চিত্ত শুদ্ধ হইয়াছে। পাপ দূর করিয়া চিত্ত নির্ম্মল না হইলে, তাহাতে তাঁহার আত্মদর্শন হইত না। সুতরাং চিত্তশুদ্ধির জন্য যে কর্ত্তব্যকর্ম্মে প্রয়োজন, তাহা তাহার নাই। যোগক্ষেম জন্যও তাঁহার কোন কর্ম্মের প্রয়োজন নাই। এই কথা পর শ্লোকে বিশদ করিয়া বলা হইয়াছে।

নৈব তস্য কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন।
ন চাস্য সর্ব্বভূতেষু কশ্চিদর্থব্যপাশ্রয়ঃ॥ ১৮

কর্ম্মে কিম্বা কর্ম্মত্যাগে—নাহি হেথা তার
থাকে কোন অর্থ আর; সর্ব্বভূতমাঝে,
কিছুতে আশ্রয় তার নাহি প্রয়োজন। ১৮

(১৮) কর্ম্মে কিম্বা কর্ম্মত্যাগে—আত্মদর্শন লাভ করিলে পরে আত্মদর্শন-সাধনভূত কোন কর্ম্ম করিলে লাভ নাই—কোনরূপ কর্ম্ম না করিলেও ক্ষতি নাই (রামানুজ)। কর্ম্ম করিলে তাঁহার পুণ্য নাই, কর্ম্ম না করিলেও পাপ নাই (স্বামী, শঙ্কর)। অভ্যুদয়ের জন্য, মোক্ষের জন্য, বা পাপ দূর করিবার জন্য তাঁহাদের কোন কর্ম্মের প্রয়োজন নাই (মধু)।

মূলে আছে,—'কৃতেন', 'অকৃতেন'। কৃত=পুণ্য, ও অকৃত= পাপ,—এরূপ অর্থও করা যায়। শ্রুতিতে আছে—

বায়ুরনিলমমৃতমথেদং ভস্মান্তং শরীরম্।
ওঁ ক্রতো স্মর কৃতং স্মর ক্রতো স্মর কৃতং স্মর, (ঈশ উপ ১৭)।

এ স্থলে কৃত অর্থ—এতাবৎ কাল অনুষ্ঠিত কর্ম্ম। গীতায়ও এই শ্লোকে কৃত অর্থে অনুষ্ঠিত কর্ম্ম, ও অকৃত অর্থে অননুষ্ঠিত কর্ম্ম। এই কর্ম্মদ্বারা যে পুণ্যরূপ অপূর্ব্ব বা অদৃষ্টশক্তি সংস্কাররূপে উৎপন্ন হয়, তাহার ফলে স্বর্গাদি লোক লাভ হয়। যিনি জ্ঞানী, তিনি স্বর্গাদিকামনাশূন্য। এজন্য কর্ম্ম করিয়া যে ফল হয়, তাহাতে তাঁহার প্রয়োজন নাই এবং কর্ম্মত্যাগও তাঁহার কোনও প্রয়োজন নাই। কর্ম্মদ্বারা আত্মজ্ঞানে স্থিতি হইতে প্রচ্যুতি হইতে পারে, এই আশঙ্কায় তাঁহাদের কর্ম্মত্যাগেরও প্রয়োজন নাই।

কিছুতে আশ্রয়—নিজ কর্ম্মের জন্য প্রকৃতির পরিণাম আকাশাদি কোন ভূতের অবলম্বন তাঁহার প্রয়োজন হয় না (রামানুজ)। ব্রহ্মাদি স্থাবর পর্য্যন্ত কোন ভূতবিশেষের আশ্রয় করিয়া কোন ক্রিয়া তাঁহাকে সাধন করিতে হয় না (শঙ্কর)। তখন দেবকৃত বিঘ্ন-সম্ভাবনা

না থাকায়, তাহা নিবারণ জন্য, কোন কর্ম্ম দ্বারা দেবতার সেবা করিতে হয় না। মোক্ষে কোনরূপ বিঘ্ন না থাকায়, সে অবস্থায় আশ্রয়ণীয় কিছুই থাকে না (মধুসূদন)। শ্রুতিতে আছে "তস্য হ ন দেবাশ্চ নাভূত্যা ঈশতে আত্মা হ্যেষাং সম্ভবতি।" (বৃহদারণ্যক, ১।৪।১০)। সুতরাং দেবতারাও ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞের ব্রহ্ম ভাবনায় প্রতিবন্ধক হইতে পারেন না (স্বামী)। বিঘ্নোৎপাদন নিবারণ জন্য দেবমানব কাহাকেও কর্ম্মের দ্বারা তাহার সেবা করিতে হয় না। জ্ঞানোদয়ের পূর্ব্বেই দেবতারা বিঘ্নোৎপাদনকারী। আত্মরত হইতে পারিলে আর তাঁহাদের প্রভাব থাকে না (বলদেব)।

মধুসূদন এইস্থলে বশিষ্ঠের বাক্য উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, মোক্ষ সাধনের সাতটি স্তর আছে। তাহার প্রথম তিনটি স্তর জাগ্রৎ অবস্থার, চতুর্থ স্তর স্বপ্নাবস্থার ও শেষ তিনটি স্তর সুষুপ্তি অবস্থার। জাগ্রৎ অবস্থার স্তর যথা—(১) শুভ বা মোক্ষ' ইচ্ছা, অর্থাৎ নিত্য ও অনিত্য বস্তু বিবেকপূর্ব্বক মোক্ষফল প্রাপ্তির ইচ্ছা। (২) বিচরণ—অর্থাৎ গুরুর নিকট গিয়া বেদান্তবাক্য বিচার, শ্রবণ ও মনন করা। (৩) তনুমানস—অর্থাৎ নিদিধ্যাসনের অভ্যাস দ্বারা মনকে একাগ্র করিয়া সূক্ষ্ম বস্তু গ্রহণযোগ্য করা। স্বপ্ন অবস্থার স্তরকে সত্তাপত্তি বলে।—ইহা বেদান্তবাক্য হইতে নির্ব্বিকল্প ব্রহ্মাত্মৈক্য সাক্ষাৎকার অবস্থা। তখন এই সমস্ত জগৎ মিথ্যা—এই জ্ঞানের স্ফুরণ হয়, তখন অদ্বৈতবুদ্ধি স্থির হয়, দ্বৈতবুদ্ধি প্রশমিত হয়, এবং সমস্ত জগৎ স্বপ্নবৎ প্রতীয়মান হয়। এই চতুর্থ স্তরে আরোহণ করিলে যোগী ব্রহ্মবিৎ হন। শেষ সুষুপ্তি অবস্থা, জীবন্মুক্তি অবস্থা। সবিকল্প সমাধির অভ্যাস দ্বারা মন-নিরোধ হইলে, ইহাতে নির্ব্বিকল্প সমাধির অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায়। অবান্তর ভেদে তাহার তিন স্তর। যথা,—(১) অসংসক্তি,—এ অবস্থায় সুষুপ্ত হইতে কখন কখন ব্যুত্থান হয়। (২) পদার্থ-ভাবনী—এ অবস্থায় যোগী অনেক চেষ্টার ফলে আর ব্যুত্থিত হন না, অভ্যাস পরিপাকের দ্বারা স্থায়িরূপে সুষুপ্ত হন;

পরমাত্মার সহিত একীভূত হন, অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে চিরনিদ্রিত হন (২।৬৯ দ্রষ্টব্য)। (৭) তুরীয় অবস্থা—এই অবস্থায় ব্রহ্মে তন্ময় হয়, আদৌ ভেদদর্শন থাকে না, স্বতঃ পরতঃ কখন ব্যুত্থান হয় না, পূর্ণানন্দ ভোগ হয়। তখন নিজ প্রযত্নে আর দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে প্রবৃত্তি থাকে না, বিদেহ মুক্তি হয়।

মধুসূদন বশিষ্ঠের বচন প্রমাণরূপে উদ্ধৃত করিয়া এস্থলে মোক্ষ-সাধনের যে সাতটি স্তর দেখাইয়াছেন, সিদ্ধগণের অবস্থা তাহা হইতে ভিন্ন। সিদ্ধের, অর্থাৎ যে আত্মাতে অবস্থান লাভ করিয়াছে তাহার, আর কোনরূপ কর্ম্মসাধন জ্ঞানসাধন বা ধ্যানসাধনের প্রয়োজন হয় না, ইহাই এস্থলে উক্ত হইয়াছে। যিনি মুমুক্ষু, তাঁহারই সাধনার প্রয়োজন। যিনি মুক্ত, তাঁহার নিজের মুক্তিরূপ পরমপুরুষার্থ লাভ জন্য আর কোন সাধনার প্রয়োজন নাই। তিনি মুক্ত হইয়াও কিন্তু 'পর'-প্রয়োজনার্থ কর্ম্ম করিতে পারেন। এই জগৎ তখন তাঁহার আত্মভূত হয়। সেই জগতের কর্ম্মচক্র-প্রবর্ত্তন জন্য ঈশ্বরের সহিত একত্বধারণাপূর্ব্বক ঐশী-শক্তি সহায়ে কর্ম্ম করিতে পারেন। [illegible] শ্লোকে বুঝান হইয়াছে।

অতএব মধুসূদন [illegible] উক্ত সাতটি স্তরের উল্লেখ করিয়া যে বলিয়াছেন—[illegible] তিন স্তরের কর্ম্মাধিকার থাকে না, শেষ চারি [illegible] ইহা সঙ্গত নহে। এ অর্থ ধরিলে পরের শ্লোকে 'তস্মাৎ [illegible]' যে বলা [illegible] তাহার অর্থ [illegible] হয়। [illegible] উপদেশ [illegible] যে, [illegible] করিবেন না, [illegible] কর্ম্ম করিবেন। [illegible] রাজর্ষিগণ [illegible] ব্যাসাদি [illegible]

জন্য জ্ঞানপ্রচাররূপ কর্ম্ম করিতেন। পরবর্ত্তী কয় শ্লোকে তত্ত্বজ্ঞানীর লোকসংগ্রহ জন্য কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য কেন, তাহা স্পষ্টীকৃত হইয়াছে।

আসক্তি ত্যজিয়া তবে—কেবল তত্ত্বজ্ঞই এরূপ আসক্তি ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করিতে পারেন। নতুবা যাহার দেহাভিমান আছে, সে কখন অনাসক্ত হইয়া কর্ম্ম করিতে পারে না। যে আপনার স্বার্থকে একেবারে ভুলিতে না পারে, সে অনাসক্ত হইয়া পরার্থ কার্য্য করিতে পারে না। ইহা দ্বিতীয় অধ্যায়ের ব্যাখ্যা-শেষে বিবৃত হইয়াছে।

তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর।
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পূরুষম্॥ ১৯

আসক্তি ত্যজিয়া তবে কর আচরণ
সতত কর্ত্তব্য কর্ম্ম;—অনাসক্ত হ'য়ে
কর্ম্ম করি করে লোকে শ্রেষ্ঠ পদ লাভ॥ ১৯

(১৯) সতত কর্ত্তব্য কর্ম্ম—(মূলে আছে "সততং কার্য্যং কর্ম্ম") —অবশ্য-কর্ত্তব্য বলিয়া বিহিত নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম (স্বামী)। নিত্যকর্ম্ম (শঙ্কর)। শ্রুত্যুক্ত যজ্ঞ, দান, তপঃ কর্ম্ম (মধু)। কর্ত্তব্য বলিয়া বিহিত কর্ম্ম (বলদেব)। বর্ণ ও আশ্রমোচিত কর্ম্ম। যেহেতু আত্মদর্শন সাধনায় হইলেও, যাঁহারা সে সাধনপ্রবৃত্ত জ্ঞানযোগী, তাঁহাদেরও দেহযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য কর্ম্মের অপেক্ষা আছে। অতএব আত্মদর্শনার্থীর পক্ষেও কর্ম্মযোগ শ্রেয়ঃ। সেই কারণ অসঙ্গপূর্ব্বক আত্মপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত সতত কর্ত্তব্য আচরণ কর, আত্মার অকর্ত্তৃত্ব অনুসন্ধানপূর্ব্বক কর্ম্মানুষ্ঠান [illegible] পরমার্থ লাভ হয় (রামানুজ)। ঈশোপনিষদে (১ম ও ২য় মন্ত্রে) [illegible]

ঈশা বাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্॥ ১
কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ।
এবং ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি ন কর্ম্ম লিপ্যতে নরে॥ ২

সমুদয় প্রামাণ্য উপনিষদ্ মধ্যে কেবল উক্ত মন্ত্রে এই নিষ্কাম কর্ম্মের ইঙ্গিত আছে। সর্ব্বব্যাপী ঈশ্বরে ত্যাগবুদ্ধি পূর্ব্বক কর্ম্মাচরণ করিলে, আর কর্ম্মে লিপ্ত হইতে হয় না। এই ত্যাগ সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগবুদ্ধিরূপ সন্ন্যাস। গীতায় এ স্থলে উপদিষ্ট হইয়াছে যে এই ত্যাগ-বুদ্ধি-পূর্ব্বক সর্ব্বরূপ কর্ম্মফলে অনাসক্ত হইয়া কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হইবে। ইহাতে কর্ম্মবন্ধন হইবে না, কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইবার আর অন্য উপায় নাই। কর্ম্মবন্ধন মুক্ত হইলেই পরমপদ লাভ হয়।—

"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিঃ ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥ (মুণ্ডক, ২।২।৯)।

কর্ম্ম করি—ঈশ্বরার্থ কর্ম্ম করিয়া (শঙ্কর, মধু)। কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠান করিয়া (রামানুজ)।

শ্রেষ্ঠ পদ—আত্মশুদ্ধি ও জ্ঞানপ্রাপ্তির দ্বারা মোক্ষপদ লাভ করে (মধু, শঙ্কর)। আত্মাকে প্রাপ্ত হয় (রামানুজ)। মূলে আছে 'পরম',—তাহা বিষ্ণুর পরম পদ। 'তদ্‌বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ।' (ঋগ্বেদ, ১।২২।২০)। তাহা ভগবানের পরম ধাম (গীতা ৮,২১)। অতএব এই কর্ম্মযোগ দ্বারাই যে পরমার্থ-সিদ্ধি হয়। ইহাই গীতার উপদেশ।

কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ।
লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কর্ত্তুমর্হসি॥

করেছে সুসিদ্ধি লাভ জনকাদি সবে
কর্ম্মেতে কেবল ; লোকসংগ্রহের প্রতি
লক্ষ্য রাখি কর্ম্ম পুনঃ কর্ত্তব্য তোমার ॥ ২০

(২০) করেছে সুসিদ্ধি লাভ—কর্ম্মের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি লাভ করিয়া ও জ্ঞানপ্রাপ্ত হইয়া ক্রমে ক্রমে সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন বা মোক্ষলাভ করিয়াছেন (শঙ্কর)। সংসিদ্ধি = সম্যক্‌জ্ঞান। জ্ঞাননিষ্ঠা (স্বামী)। যেহেতু জ্ঞানযোগাধিকারীর পক্ষেও আত্মদর্শন জন্য কর্ম্মযোগ শ্রেয়ঃ, সেইজন্য জনকাদি রাজর্ষি যাঁহারা জ্ঞানীর অগ্রগণ্য ছিলেন, তাঁহারা কর্ম্মযোগেই সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। যিনি আত্মাকে লাভ করিতে চাহেন, সেই মুমুক্ষুগণের প্রথমে জ্ঞানযোগে অধিকার না থাকায় কর্ম্মযোগই যে কর্ত্তব্য, ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। এ স্থলে ভগবান্ বলিতেছেন যে, যিনি জ্ঞান যোগে অধিকারী, তাঁহার পক্ষেও জ্ঞানযোগ অপেক্ষা কর্ম্মযোগ শ্রেষ্ঠ। অতএব সর্ব্বথা কর্ম্মযোগই কার্য্য বা অনুষ্ঠেয় (রামানুজ)। আমরা পূর্ব্ব হইতে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে,রামানুজের এই অর্থই সঙ্গত।

জনকাদি—জনক, অশ্বপতি, অজাতশত্রু প্রভৃতি (শঙ্কর)। বৃহদারণ্যক, ও ছান্দোগ্য উপনিষদ্ হইতে পাওয়া যায় যে, কর্ম্মযোগিশ্রেষ্ঠ রাজর্ষি জনকাদিই তখন প্রধানতঃ ব্রহ্মবিদ্যার অধিকারী ছিলেন। ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের নিকট জ্ঞানোপদেশ লইতে আসিতেন, এবং এই কর্ম্মযোগী রাজর্ষিদিগের নিকটই তাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞানে উপদেশ লাভ করিতেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদের জনক-যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদ, শ্বেতকেতু-পাঞ্চাল-সংবাদ, ছান্দোগ্য উপনিষদে জনশ্রুতি-রৈক্য-সংবাদ, কৈকয়-উদ্দালকাদি সংবাদ প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

অনেকের মতে 'জনক' কোন এক রাজার নাম নহে। ইহা সাধারণ কোন রাজবংশের নাম। কিন্তু এস্থলে প্রসিদ্ধ রাজা জনকেরই উল্লেখ

হইয়াছে। ত্রেতাযুগে যাজ্ঞবল্ক্যাদির সাহায্যে তিনিই বৈদিক যজ্ঞের প্রচার করেন। পুরাণ অনুসারে তিনি ব্যাসদেবের সমসাময়িক। কেন না, ব্যাস, তাঁহার পুত্র শুকদেবকে ব্রহ্মবিদ্যা লাভের জন্য রাজর্ষি জনকের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন।

কর্ম্মেতে কেবল—ক্ষত্রিয় রাজর্ষিগণ কর্ম্ম দ্বারা সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। শঙ্কর বলেন, জনকাদি ক্ষত্রিয়দিগের প্রথমে আত্মদর্শন হয় নাই, পরে কর্ম্ম দ্বারা তাঁহারা সত্ত্বশুদ্ধি লাভ করিয়া ক্রমে সিদ্ধ হইয়াছিলেন। রামানুজ বলেন, জনকাদি জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ হইয়াও কর্ম্ম করিতেন। অতএব জ্ঞানযোগাধিকারীর পক্ষেও জ্ঞানযোগ অপেক্ষা কর্ম্মযোগ শ্রেষ্ঠ। মধুসূদন বলেন, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের সন্ন্যাসাশ্রম বিহিত নহে। এইজন্য জনকাদি—গৃহীর বিহিত কর্ম্মমার্গাবলম্বন করিয়াছিলেন এবং তাহাতেই সিদ্ধ হইয়াছিলেন। মধুসূদন আরও বলেন যে, স্মৃতিতে আছে "সর্ব্বে রাজাশ্রিতা ধর্ম্মা রাজা ধর্ম্মস্য ধারকঃ।" অর্থাৎ ক্ষত্রিয় (রাজা) বর্ণাশ্রমধর্ম্ম প্রবর্ত্তন জন্য অবশ্য কর্ম্ম করিবেন। মধুসূদনের অর্থ হইতে বুঝা যায় যে, ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়া কর্ম্মত্যাগ করিতে পারেন। কিন্তু যিনি রাজা বা যিনি ক্ষত্রিয় হইয়া প্রজার ধর্ম্ম রক্ষা করিতে নিযুক্ত, তিনি জ্ঞানযোগীই হউন, আর কর্ম্মযোগীই হউন, কদাপি প্রজারক্ষা কর্ম্মত্যাগ করিবেন না। আর এই কর্ত্তব্য পালন করিলেও তাঁহাদের সিদ্ধিলাভের কোন প্রতিবন্ধক হয় না। এইজন্যই পরে বলা হইয়াছে যে লোকসংগ্রহ জন্য কর্ম্ম করিবে।

যাহা হউক, ক্ষত্রিয় বৈশ্য প্রভৃতি বর্ণের যদি কর্ম্মযোগই বিহিত, তবে ব্রাহ্মণের পক্ষে তাহা কেন অবিহিত হইবে, বুঝা যায় না। ব্রাহ্মণই যজ্ঞাদি ধর্ম্মের রক্ষক। তাঁহাদিগকে গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া প্রথমে বেদোক্ত যজ্ঞাদি আচরণ করিতে হয়। ক্ষত্রিয় রাজা বা ধনী বৈশ্যগণ যে যজ্ঞাদি আচরণ করিতেন, তাহাতে ব্রাহ্মণেরাই হোতা প্রভৃতির কার্য্য করিতেন।

ব্রাহ্মণ উপযুক্ত সময়ে গৃহাশ্রম ত্যাগ করিয়া বানপ্রস্থ বা সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিলেও, তাঁহাদের সে আশ্রমের উপযোগী ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার জন্য কর্ম্ম করিতে হইত। তাঁহারাই সমাজের জ্ঞানোপদেষ্টা হইতেন। সুতরাং এস্থলে কেবল রামানুজের অর্থই সঙ্গত।

লোক সাধারণ রক্ষা—(মূলে আছে "লোকসংগ্রহম্") অর্থাৎ লোকের উন্মাদ প্রবৃত্তি নিবারণ (শঙ্কর)। লোককে স্বধর্ম্মে প্রবর্ত্তন (স্বামী)। লোকশিক্ষার্থ। অর্থাৎ আমি কর্ম্ম করিলে জন সকল আমার দৃষ্টান্তে কর্ম্ম করিবে, অন্যথা আমার কর্ম্ম ত্যাগের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া তাহারাও নিত্যকর্ম্ম ও বিহিত কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া পতিত হইবে, ইহা দেখিয়া (স্বামী)। লোকের নিজ নিজ ধর্ম্মে অপ্রবৃত্তি নিবারণই লোকসংগ্রহ,—ব্যাখ্যাকারগণ এই অর্থ করেন। কেহ বলেন, ক্ষত্রিয়-বর্ণোচিত কর্ম্ম পূর্ব্বজন্মে করিয়া, তাহার সংস্কারবশে এ জন্মে ক্ষত্রিয়শরীর গ্রহণ করিয়া বিদ্বান্ হইলেও, জনকাদির ন্যায় প্রারব্ধকর্ম্মবশে অর্জ্জুনকে লোকসংগ্রহের জন্য কর্ম্ম করিতেই হইবে, এবং অর্জ্জুনের তাহাই কর্ত্তব্য। এ অর্থ কিছু সংকীর্ণ। লোকসংগ্রহ, শব্দের অর্থ কি? সংগ্রহ অর্থ সম্যক গ্রহণ, সম্মিলন, একত্রীকরণ। লোক সকল সম্মিলিত হইয়া, পরস্পর পরস্পরাপেক্ষী হইয়া যে সমাজ বদ্ধ থাকে, তাহাকেই লোকসংগ্রহ বলে। লোকসংগ্রহ শব্দের অর্থ—লোকসমাজ। অতএব লোক সংগ্রহার্থ যে কর্ম্ম তাহা সমাজরক্ষার্থ কর্ম্ম। মানুষের সম্মিলিত কর্ম্ম দ্বারাই সমাজের স্থিতি রক্ষা ও উন্নতি হয়। সেই লোকসংগ্রহ বা সমাজের কথা ভাবিয়াও কর্ম্ম করা প্রয়োজন। ভগবান্ এস্থলে ইহাই উপদেশ দিয়াছেন। লোকসমাজ রক্ষার জন্য সকলেরই কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য। ক্ষত্রিয় যেমন লোকের ধর্ম্মরক্ষা করিবেন, লোককে শাসনে রাখিবেন, শত্রু হইতে রক্ষা করিবেন, তেমনি ব্রাহ্মণেরও কর্ত্তব্য লোককে ধর্ম্ম শিক্ষা দিবেন, লোকমধ্যে জ্ঞান, যতদূর সম্ভব, বিস্তার করিবেন। এই জন্য ব্রাহ্মণ ধর্ম্মযাজক ও অধ্যাপকরূপে

ও শিক্ষক হইয়া ও সদ্‌গ্রন্থাদি লিখিয়া লোককে শিক্ষা দিতেন। শ্রীকৃষ্ণের এই মহাবাক্য অনুসরণ করিয়াই তাঁহার সময় বেদব্যাস লোকসংগ্রহার্থ বোধ হয় বেদসংগ্রহ করেন, পুরাণেতিহাস রচনা করেন এবং বেদান্তদর্শন প্রণয়ন করেন। নতুবা সে কার্য্যে ব্যাসের নিজের কোন স্বার্থ সে কালে থাকিতে পারে না। শ্রীভগবান্‌ স্বয়ং পরে ২২শ শ্লোকে বলিয়াছেন, তাঁহার কোন কর্ম্মই নাই, তথাপি তিনিও লোকসংগ্রহ জন্য কর্ম্ম করিয়া থাকেন। আর শঙ্করাচার্য্য মুখে যে উপদেশই এখন দিন্‌, কিন্তু তিনিও নিজে লোকসংগ্রহ জন্য, ভারতের এক সীমা হইতে সীমান্তর ভ্রমণ করিয়া বৌদ্ধমত খণ্ডনপূর্ব্বক অদ্বৈতবাদ সংস্থাপন করেন, ও সমুদয় বেদান্ত গ্রন্থের ভাষ্য লিখিয়া যান। সুতরাং ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, শ্রীভগবানের এই উক্তি একদেশদর্শী নহে। আত্মদর্শী হউন, আর কর্ম্মযোগী হউন, ব্রাহ্মণ হউন, আর ক্ষত্রিয় হউন, যোগী হউন, আর সন্ন্যাসী হউন—সকল শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরই লোকসংগ্রহ জন্য কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য। এ শ্লোকের ইহাই অর্থ। *

---

* লোক সংগ্রহের জন্য অর্থাৎ সমাজের রক্ষা ও উন্নতির জন্য যে আমাদের সাধারণ-সকলের কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য, তাহা 'সমাজ ও তাহার আদর্শ' নামক গ্রন্থে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি। তাহা হইতে কিয়দংশ এস্থলে উদ্ধৃত হইল।—

"সমাজ ছাড়িয়া, সমাজের সহায়তা বিনা কেহ কখন মানুষ হইতে পারে নাই। তুমি গর্ব্ব করিতেছ, মনে করিতেছ,— তুমি নিজ শক্তিবলে, নিজ প্রভাবে আজ বড় হইয়াছ—বুঝি সমাজের শীর্ষস্থানীয় হইয়াছ। তাই তুমি সমাজকে উপেক্ষা করিতেছ। * * * * তাই তুমি যথেচ্ছাচার করিতেছ, যাহাতে আপনার সুখ ও সুবিধা বৃদ্ধি হয়, সেইরূপ আচরণ করিতেছ। সমাজের প্রতি একবার লক্ষ্য করিতেছ না। তোমার কাজে সমাজের উন্নতি কি অবনতি হইতেছে, তাহা একবার দেখিতেছ না। সমাজের, আর দশজন লোক তোমার অনুকরণ করিয়া, সমাজকে অধঃপাতে দিতেছে, সে দিকে ফিরিয়া চাহিতেছ না। মূর্খ তুমি, জান না—সমাজ তোমার পিতামাতা, অথবা পিতা-মাতা হইতেও অধিক। এই সমাজ ভগবানেরই রূপ। সমাজাত্মা—হিরণ্যগর্ভ বা পরম পুরুষ, আর সমাজশক্তি—স্বয়ং ভগবতী, পরমা প্রকৃতি। তুমি ভগবানের সেই সমাজ-রূপ বিরাট শরীরের অতি ক্ষুদ্র অণু মাত্র। তুমি পণ্ডিত হইয়াছ, বিদ্বান হইয়াছ—তুমি অর্থোপার্জ্জন করিয়া বড়লোক হইয়াছ,—তুমি জান না কি যে, তুমি সেই সমাজ-

যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে ॥ ২১

শ্রেষ্ঠ লোক যেই রূপ করে আচরণ
সাধারণে করে তাহা; যাহা সপ্রমাণ
করে তারা—লোকে তার হয় অনুগামী ॥২১

(২১) এই শ্লোকে ও পরবর্ত্তী কয় শ্লোকে লোক-সংগ্রহ জন্য কর্ম্ম করা কেন কর্ত্তব্য, তাহা বুঝান হইয়াছে (শঙ্কর)।

বৃক্ষেরই ফল। তুমি সমাজের শিশু। সমাজ পিতামাতা হইয়া তোমাকে যেরূপ গড়িয়াছে, তুমি তেমনই হইয়াছ। সমাজ তোমায় মানুষ করিয়াছে, তাই তুমি মানুষ হইয়াছ। না হইলে, তুমি পশুর অধিক কিছুই নহ। * * * *। সমাজ হইতে তুমি তোমার মনুষ্যত্ব লাভ করিয়াছ—তুমি বড়লোক হইয়াছ, জ্ঞানী হইয়াছ—উত্তম। যাহার জন্য তুমি বড়লোক, শক্তি থাকে, তুমি তাহার সেবা কর। মনে রাখিও যে, যে বহুর আশ্রয়, তাহারই জীবন সার্থক। (দক্ষ সংহিতা, ৩৩)।

কিন্তু তুমি যদি সমাজের উন্নতি ও রক্ষার জন্য কর্ম্ম না কর, যদি নিজ স্বার্থ বা সুবিধার জন্য সমাজকে উপেক্ষা কর, যদি ভ্রান্ত কর্ত্তব্য বুদ্ধিতেও সমাজের ক্ষতি কর, বা সমাজকে ত্যাগ কর, তবে তুমি নিতান্ত পাপী। তুমি যে হও, ভগবানের যন্ত্র ব্যতীত আর কিছুই নহ। তোমার নিজত্ব যাহাই থাকুক, তুমি ভগবানের কার্য্য করিতে, তাঁহার কার্য্যের নিমিত্ত বা উপলক্ষ মাত্র হইতে সংসারে আসিয়াছ। ভগবানের কার্য্যের উপযোগী হইবার জন্য স্বয়ং প্রকৃতি তোমাকে সমাজ সহায়ে গড়িয়া লইয়াছেন। জগন্নাথের রথের ন্যায়, ভগবানের এই সমাজ-রথ—এই সমগ্র-সংসার-রথ, তুমি আমি সকলে মিলিয়া, জ্ঞাতসারে হউক, অজ্ঞাতসারে হউক, ভগবানের যন্ত্রস্বরূপে টানিয়া লইয়া চলিয়াছি। তাই সংসার-রথের চক্র নিয়ত ঘুরিয়া ঘুরিয়া কালবশে অগ্রসর হইতেছে। যে সে রথের মহাডোর ধরিয়া না টানিতে চাহে,—যে এক পার্শ্বে সরিয়া গিয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতে চাহে,—সে একদিন না একদিন সেই মহারথের মহা গতিতে নিষ্পেষিত হইয়া যাইবে।"

(সমাজ ও তাহার আদর্শ, ১১-১২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

মানুষের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে বর্ত্তমানকালে দুইখানি অতি উপাদেয় গ্রন্থের কথা এস্থলে উল্লেখ করা কর্ত্তব্য। একখানি ইটালীয় কর্ম্মবীর জোসেফ্ ম্যাট্‌সিনির "On the Duties of man"। আর একখানি জার্ম্মানির 'শ্রেষ্ঠ দার্শনিক' ফিক্তের

শ্রেষ্ঠ—রাজাদি প্রধান লোক (শঙ্কর, মধু)। কৃৎস্ন-শাস্ত্রজ্ঞ ও শাস্ত্রানুসারে কর্ম্মানুষ্ঠাতা (রামানুজ)।

সাধারণে করে তাই—(মূলে আছে ইতরো জনঃ) অর্থাৎ প্রাকৃত জন (স্বামী) তাহাই করে। তাহাদের স্বাতন্ত্র্য নাই বলিয়া তাহাই অনুকরণ করে (মধু)। ইতরজন অর্থাৎ অন্য জন (শঙ্কর)।

'On the Nature of the Scholar," । এই শেষোক্ত গ্রন্থের সপ্তম অধ্যায় হইতে সমাজ রক্ষা ও উন্নতির জন্য জ্ঞানীর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে—অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের কর্ম্ম সম্বন্ধে নিম্নলিখিত অংশ এস্থলে উদ্ধৃত হইল।—

"The true-minded Scholar looks upon his vocation—to become a partaker of the Divine thought of the Universe—as the purpose of God in him; and therefore both his person and calling become to him, before all other things, honorable and holy; and this holiness shows itself in all his outward manifestations."

"......the life of him in whom learned culture has fulfilled its ends... is itself the life of the Divine Idea in the world, changing and reconstructing it from its very foundation...this life may manifest itself in two forms:—either in actual external Being and Action, or only in Idea; which two distinct modes of manifestation together constitute the peculiar vocation of the Scholar. The first class comprehends all those who, by their own strength, and according to their own Idea, assume the *guidance* of human affairs, leading them to ever new perfection in constant harmony with each succeeding age; who originally, as the highest free leaders of men, direct their social relations and the relation of the whole to passive nature;—not those only who stand in the higher places of the earth, as kings, or the immediate councillers of kings, but all without exception who possess the right and calling, either by themselves or in concert with others, to think, judge, and resolve independently concerning the original disposal of these affairs. The second class embraces the *Scholars* properly and preeminently so called, whose vocation it is to maintain among men the *knowledge* of the Divine Idea, to elevate it unceasingly to greater clearness, and precision, and thus to transmit it from generation to generation, evergrowing brighter in the freshness and glory of renewed youth. The first class act directly upon the world,—they are the immediate point of contact between God and reality;—the

সপ্রমাণ করে—লৌকিক বৈদিক যাহা প্রমাণ করে (শঙ্কর); কর্ম্ম-শাস্ত্র ও তন্নিবৃত্তি শাস্ত্র যেরূপ প্রামাণ্য বলিয়া নির্ণয় করে (স্বামী)। বলদেব বলেন, এই জন্য তেজস্বীশ্রেষ্ঠ লোকের কোনরূপ স্বৈরাচরণ করা কর্ত্তব্য নহে। রামানুজ বলেন, এইজন্য তাহাদের স্ববর্ণ ও আশ্রমোচিত কর্ম্ম সকল সর্ব্বদা অনুষ্ঠেয়। অন্যথা জ্ঞানযোগীরও লোকনাশনজনিত পাপ হইবে।

---

last are the mediators between the pure spirituality of thought in the God-head, and the material energy and influence which that thought acquires through the instrumentality of the first class; they are the trainers of the first class,—the enduring pledge to the human race that the first class shall never fail from among men. No one can belong to the first class without having already belonged to the second,—without always continuing to belong to it.

"The second class of Scholars is again separated into sub-divisions, according to the manner in which they communicate to others their conceptions of the Idea. Either their immediate object is, by direct and free personal communication of their ideal conceptions, to cultivate in future Scholars a capacity for the reception of the Idea, so that they may afterwards lay hold of it and comprehend it for themselves:—and then they are educators of Scholars, *Teachers* in the higher or lower schools;—or, they propound their conceptions of the Idea, in a complete and finished form to those who have already cultivated the capacity to comprehend it. This is at present done by books—and they are thus—*Authors.*"

Ficte's 'Popular works'—p p. 199-200.

ফিক্তে যে 'Divine Idea' উপরে উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার অর্থ তিনি এইরূপে বুঝাইয়াছেন।

"The whole material world in all its adaptations and ends, and in particular the life of men in this world, are by no means in themselves and in truth, that which they seem to be to the uncultivated, and the natural sense of man; but there is something higher, which lies concealed behind all natural appearance. This concealed foundation of all appearances, may, in its greatest universality, be aptly named the *Divine Idea.*"

Ditto. p. 138.

অনুগামী—অনুবর্ত্তন করে, অর্থাৎ প্রমাণ বলিয়া মানিয়া লয় (শঙ্কর)। অনুসরণ করে (স্বামী)। সাধারণ লোকের ব্যবহার প্রধানদের অনুযায়ী হয়। অতএব তোমার ও রাজাদের ধর্ম্মাদি সংরক্ষণার্থ এই যুদ্ধ কর্ত্তব্য (মধু)।

ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত্ত এব চ কর্ম্মণি॥ ২২

নাহি এ ত্রিলোকে কিছু কর্ত্তব্য আমার,
অপ্রাপ্ত বা প্রাপ্য কিছু নাহি মম আর,—
তথাপি হে পার্থ! আমি করমে নিরত॥২২

(২২) নাহি এ ত্রিলোকে...আর—এই জগতে লোকসংগ্রহ জন্য কর্ম্ম যে কর্ত্তব্য, এ সম্বন্ধে যদি তোমার সন্দেহ থাকে, তবে আমার দৃষ্টান্ত দিতেছি দেখ। লোকত্রয়ে আমার কোন কর্ত্তব্য নাই, কারণ এমন কোন বস্তু নাই, যাহা আমার অপ্রাপ্ত, এবং এইজন্য প্রাপ্তব্য (শঙ্কর)। আপ্তকাম, সর্ব্বজ্ঞ, সত্যসংকল্প সর্ব্বেশ্বরের দেব-মনুষ্যাদি লোকে কোন কর্ত্তব্য কর্ম্ম নাই। তাঁহার অপ্রাপ্ত ও কর্ম্ম দ্বারা প্রাপ্তব্য কিছুই নাই, অতএব তিনি যে কর্ম্ম করেন, সে কেবল লোকসংগ্রহার্থ (রামানুজ)।

এস্থলে কোন ব্যাখ্যাকারই এই শ্লোকের তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেন নাই। ভগবৎ-তত্ত্ব পরে সপ্তম হইতে দ্বাদশ অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। ভগবান পূর্ণ। তিনি স্বরূপতঃ অকর্ত্তা। তিনি নির্গুণ নিষ্ক্রিয় পরমাত্মা। তবে তিনি কিরূপে কর্ম্ম করেন, কিরূপে কর্ত্তা হন? পরে ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ইহা ব্যাখ্যাত হইয়াছে। পরব্রহ্মের যাহা সগুণভাব—

তিনিই পরমেশ্বর। পরব্রহ্মের পরাখ্য মায়াশক্তিযোগেই পরমেশ্বরত্ব। এই মায়ার রূপ যে প্রকৃতি, তাহা হইতে সমুদায় কর্ম্ম হয়। সেই প্রকৃতি ভগবানেরই। তিনি সেই প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হইয়া প্রকৃতির কর্ম্মকে নিজ জ্ঞান দ্বারা নিয়মিত করেন। ভগবান্ স্বপ্রকৃতির নিয়ন্তৃরূপে কর্ত্তা। তিনি জীবহৃদয়ে অন্তর্য্যামিরূপে অবস্থান করেন, জীবের মঙ্গলের জন্য তাহার প্রকৃতিকে নিয়মিত করেন। পরে ভগবান্ বলিয়াছেন—

"প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া।" (৪।৬)

এই আত্মমায়া দ্বারা প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান হেতু ভগবান্ প্রকৃতির কর্ম্মে নিয়ন্তৃ স্বরূপে স্বপ্রকৃতির সহিত আত্মভূত হইয়া কর্ত্তা হন। এ তত্ত্ব এস্থলে বিবৃত করিবার প্রয়োজন নাই।

করমে নিরত—অর্থাৎ এই লোকরক্ষার জন্য বা লোকসংগ্রহের জন্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত (শঙ্কর, গিরি, রামানুজ)। শ্রীভগবানের কর্ম্মে নিরত থাকিবার কারণ এই শ্লোকে ও পরবর্ত্তী দুই শ্লোকে উল্লিখিত হইয়াছে (বলদেব)।

ভগবান্ মহাভারতে উদ্যোগপর্ব্বে (২৮।৭-১৬ শ্লোকে) এই কর্ম্মের প্রয়োজন বুঝাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, যে সকল জ্ঞান, কর্ম্ম সাধন করে, তাহা সফল, অন্য জ্ঞান নিষ্ফল। * * * ইত্যাদি। এ সমুদায় এস্থলে উদ্ধৃত করা নিষ্প্রয়োজন।

যদি হ্যহং ন বর্ত্তেয়ং জাতু কর্ম্মণ্যতন্দ্রিতঃ।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥ ২৩

যদি আমি কভু পার্থ, অতন্দ্রিত হ'য়ে
কর্ম্মে নাহি রত হই—তা হ'লে নিশ্চয়
লোক সব মম পথে হবে অনুগামী॥২৩

(২৩) অতন্দ্রিত হ'য়ে—অনলস হইয়া (শঙ্কর, স্বামী, মধু)। ইহার দুইরূপ অর্থ হইতে পারে। যথা (১) আমি যে অতন্দ্রিত হইয়া সর্ব্বদা কর্ম্ম করি, সেই কর্ম্ম যদি না করি। অথবা (২) আমি যে নিয়ত কর্ম্ম করি, সেই কর্ম্ম যদি অতন্দ্রিত হইয়া না করি।

কর্ম্ম যে অতন্দ্রিত ভাবে করিতে হয়, ইহা বুঝা যায়। জ্ঞানের নিদ্রা বা স্বপ্ন অবস্থায় কর্ম্ম হয় না—জাগ্রত অবস্থায়ই কেবল কর্ম্ম হয়। ভগবান্ বলিয়াছেন,"ইহলোকে কর্ম্মে বায়ু চলিতেছে, অহোরাত্র হইতেছে, অতন্দ্রিত ভাবে সূর্য্য নিয়ত উদিত হইতেছে। মাস অর্দ্ধমাস বা নক্ষত্রগণেতে চন্দ্র অতন্দ্রিত ভাবে গতায়াত করিতেছে। অগ্নি অতন্দ্রিত ভাবে প্রজ্বলিত হইয়া প্রজাগণের ক্রিয়া সাধন করিতেছে। পৃথিবী অতন্দ্রিত ভাবে সবলে এই গুরুভার বহন করিতেছে। অতন্দ্রিত ভাবে নদী জল বহন করিতেছে। ... ... ইন্দ্র বর্ষণ করিতেছে ... ইত্যাদি (মহাভারত, উদ্যোগপর্ব্ব, ২৮।১০-১৪)।

দ্বিতীয় অর্থ এই যে, অনেকের স্বভাবই কর্ম্ম—অনেকেই নিয়ত কর্ম্মশীল। দৃষ্টান্ত—প্রাণ। প্রাণক্রিয়া বন্ধ করিতে হইলে অতন্দ্রিত ভাবে আমাদের চেষ্টার আবশ্যক। যে লোকের কর্ম্মপ্রবৃত্তি প্রবল, সে বিশেষ চেষ্টা না করিয়া তাহার দমন করিতে পারে না,—কর্ম্ম করাই তাহার স্বভাব, সে অলস থাকিতে পারে না। ভগবান্ও সেইরূপ ঐশী শক্তি হেতু জগৎ রক্ষা ও পালনাদি জন্য নিয়ত কর্ম্মশীল। শক্তিমান্ ভগবানের প্রকৃতিকে নিয়মিত করিয়া, কর্ম্ম করাই স্বভাব। এজন্য ভগবান্ যদি কর্ম্ম না করা সঙ্কল্প করেন, তবে সে জন্য অনলস হইয়া তাঁহাকে চেষ্টা করিতে হইবে।

(২৩) কর্ম্মে নাহি রত হই—ব্রহ্মই জগতের স্রষ্টা, পাতা ও সংহারকর্ত্তা। এই সৃষ্টি প্রভৃতি কার্য্যবিভাগমধ্যে পুরাণ অনুসারে পালন-কার্য্য প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত পরমপুরুষ ঈশ্বর বা বিষ্ণু কর্ত্তৃক সংসাধিত হয়।

বিষ্ণু এই জগতের রজঃ ও তমঃ শক্তি ক্ষয় করিয়া ও সত্বশক্তি বৃদ্ধিপূর্ব্বক ইহার রক্ষা করেন। সত্বশক্তি বৃদ্ধির দ্বারা ধর্ম্ম রক্ষা হয়। ইহা ব্যতীত ঈশ্বর যে প্রয়োজন মত অবতীর্ণ হইয়া থাকেন ও কর্ম্ম করেন, তাহা ৪র্থ অধ্যায়ে ৭ম, ৮ম শ্লোকে উল্লিখিত হইয়াছে। তাঁহার সাধুরক্ষা ও দুষ্কৃতির বিনাশ এবং ধর্ম্মের সংস্থাপন কর্ম্ম সে স্থলে উল্লিখিত হইয়াছে। তাহা ব্যতীত লোকসংগ্রহ জন্যও তিনি অবতীর্ণ হইয়া কর্ম্ম করিয়া সাধারণকে লোক-সংগ্রহ জন্য কর্ম্ম করিতে শিক্ষা দেন। এক কথায়—ধর্ম্ম ও জ্ঞানবিকাশ জন্য যে কর্ম্মের প্রয়োজন, তাহা মনুষ্য নিজ শক্তিতে করিতে পারে না। তাহার জন্যই প্রধানতঃ ভগবানের অবতার।

রামানুজ অর্থ করেন যে, ভগবান্ জগতের উপকারের জন্য মনুষ্য-জাতিতে বসুদেব-গৃহে অবতীর্ণ হইয়া তৎকুলোচিত কর্ম্মে সর্ব্বদা প্রবর্ত্তিত ছিলেন, সর্ব্বপ্রকারে ধর্ম্মের অনুবর্ত্তন করিয়াছিলেন কিন্তু ভগবান্ যে কেবল মানুষাদিরূপে অবতীর্ণ হইয়া কর্ম্ম করেন, তাহা নহে। ভগবান্ নিয়ত জগৎ রক্ষার্থ কর্ম্ম করেন। রামানুজ বলিয়াছেন, 'সত্য-সংকল্প সর্ব্বেশ্বর স্বসংকল্প-কৃত জগতের উদয় বিভব লয় লীলা করেন। এই মহালীলার জন্য তিনি জগৎ সৃষ্টি করিয়া কর্ম্ম করেন, ও সূর্য্যচন্দ্রাদি সকলকে সর্ব্বদা কর্ম্মে নিয়মিত করেন। যাহা হউক, এই জগৎ—কর্ম্মমূল, কর্ম্মাত্মক। আমরা জানি যে, কর্ম্মদ্বারা শক্তির ক্ষয় হয়, তাহা আর কার্য্যকরী থাকে না। (বিজ্ঞানের কথায় তাহা Lower potential এ পরিণত হয়, এবং Dissipated হয়।) এই শক্তির ব্যয় ও ক্ষয় যদি নিয়ত চলিতে থাকে, তবে এ বিশ্বের একদিন না একদিন শেষ প্রলয় অবশ্যম্ভাবী। অথচ জগৎ নিত্য—সৃষ্টি-লয়-প্রবাহ অনাদি অনন্তকালব্যাপী, ইহা জ্ঞানের সিদ্ধান্ত। এজন্য এই শক্তিকে অনন্ত অক্ষয় এবং শক্তিমানের সহিত এক—ইহা সিদ্ধান্ত করিতে হয়। এই শক্তি হইতে কার্য্য হয়। শক্তি অক্ষয় বলিয়া সে কার্য্যের বিরাম হয় না। এই শক্তি দ্বারা ভগবান্ নিত্য কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত।

তিনি এ বিশ্বকর্ত্তা। তিনি কর্ম্ম না করিলে ও শক্তি সংবরণ করিলে, অথবা জ্ঞান ও সংকল্প দ্বারা সদা শক্তিকে নিয়মিত না করিলে, এ বিশ্ব থাকে না।

লোক সব অনুগামী—অর্থাৎ লোক তাহা হইলে কর্ম্ম করিবে না—স্বকর্ত্তব্য অনুষ্ঠান করিবে না। সুতরাং কর্ম্মের দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভ করিতে না পারিয়া নিরয়গামী হইবে (রামানুজ)। সাধারণ লোকে অবতীর্ণ আমাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়াই জানে। অর্থাৎ তাহারা আমার স্বরূপ জানে না। অতএব আমি বিহিত কর্ম্ম না করিলে, যাহারা কর্ম্মাধিকারী, তাহারাও আমার পথ অবলম্বন করিয়া কর্ম্ম করিবে না (মধু)। ভগবান অবশ্য বর্ণোচিত ও আশ্রমোচিত যজ্ঞাদি সকল কর্ম্ম লোকশিক্ষার্থ করিতেন, নিজে কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিয়া লোককে দৃষ্টান্ত দেখাইতেন, তিনি সকলের আদর্শ হইয়াছিলেন, একথা হরিবংশে উল্লিখিত আছে। কিন্তু এ অর্থ সঙ্কীর্ণ। কেন না, অর্জ্জুন তখন ভগবানের স্বরূপ না বুঝিলেও, ভগবান্ কেবল অবতারের কর্ম্মতত্ত্ব এস্থলে বলেন নাই। অবতীর্ণ ঈশ্বরকে কয়জন চিনিতে পারে? চিনিয়াই বা কয়জন তাঁহার অনুসরণ করে? ভগবান্ সর্ব্ব-হৃদয়ে অধিষ্ঠিত থাকিয়া সকলকে মায়া দ্বারা তাঁহার নির্দ্দিষ্ট পথে চালিত করেন। ভগবান্ কর্ম্ম না করিলে—জীবহৃদয়ে থাকিয়া তাহাদের পরিচালিত না করিলে, জীব নির্দ্দিষ্ট পথে কর্ম্ম করিতে পারিবে না,—তাঁহার অকর্ত্তৃভাব অবলম্বন করিবে। এস্থলে এই সাধারণ তত্ত্ব উক্ত হইয়াছে। মানুষ সর্ব্বরূপে তাঁহারই পথ অনুসরণ করে। তিনি বিনা স্বতন্ত্রভাবে কেহ জ্ঞাতা বা কর্ত্তা নাই। সকলে ভগবানের নির্দ্দিষ্ট পথ সর্ব্বরূপে অনুসরণ করিয়া থাকে। ভগবান্ নিজ মায়াশক্তি দ্বারা তাহাদের অজ্ঞাতে তাহাদিগকে সেই পথে পরিচালিত করেন। ভগবান যদি কর্ম্ম না করেন, বা কর্ম্মশক্তি সংবরণ করেন, তবে কি ফল হয়, তাহা পরশ্লোকে উক্ত হইয়াছে।

উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্য্যাং কর্ম্ম চেদহম্।
সঙ্করস্য চ কর্ত্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ ॥ ২৪

আমি না করিলে কর্ম্ম, এই লোক সব
হবে নষ্ট, হব আমি সঙ্করের হেতু ;—
আমিই তাদের হব নিধন-কারণ ॥ ২৪

(২৪) হবে নষ্ট—(মূলে আছে 'উৎসীদেয়ুঃ') অর্থাৎ উৎসন্ন যাইবে লোক-স্থিতি-কারণ কর্ম্মের অভাবে নষ্ট হইবে (শঙ্কর)। ধর্ম্মাভাবে নষ্ট হইবে (স্বামী)। কুলোচিত কর্ম্ম না করিয়া নষ্ট হইবে (রামানুজ)। ঈশ্বর পালনকার্য্য না করিলে, অথবা তাঁহার কর্ম্মপ্রবৃত্তি নিরুদ্ধ করিলে, সর্ব্বভূতের কর্ম্মপ্রবৃত্তি লোপ হইবে, ও স্থিতিহেতু অভাবে পৃথিব্যাদি ভূত সকলের বিনাশ সাধিত হইবে, অর্থাৎ জগতের বিকাশ অবস্থা আর থাকিবে না এবং বর্ণাশ্রমধর্ম্ম দ্বারা যে সকল লোককে ধারণ করা আছে, সে ধর্ম্ম লোপে তাহাদের বিনাশ হইবে (গিরি)। এই শেষ অর্থ অধিক সঙ্গত।

সঙ্করের হেতু ... নিধন কারণ—আমি কুলোচিত কর্ম্ম না করিলে সকল শিষ্টজনই আমার আচারই ধর্ম্ম, ইহা নিশ্চয় করিবে। তাহারা কর্ম্মাধিকারী হইয়াও কর্ম্ম ত্যাগ করিবে, সাধারণ লোক তাহাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিবে। সুতরাং ধর্ম্মাচরণ অভাবে ও শাস্ত্রীয় আচরণ পালন না করায় সকল শিষ্টজনের সঙ্করের (কর্ম্ম সাংকর্য্যের) কর্ত্তা আমি হইব। এবং এই প্রজাদের বিনাশ কারণ হইব (রামানুজ)। আমি পরমেশ্বর তাহা হইলে ধর্ম্মসাংকর্য্যের কর্ত্তা হইব এবং ক্রমে ধর্ম্মলোপ হওয়ায়, আমিই সকল প্রজা বিনাশের কারণ হইব। (মধু) কর্ম্মলোপ হেতু বর্ণসঙ্করের

সাংকর্য্য বা সংমিশ্রণ হইবে। কর্ম্ম-লোপই বিনাশের কারণ বলিয়া আমিই তাহাদের বিনাশের কারণ হইব (স্বামী)। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আমি যদি শাস্ত্রোক্ত কর্ম্ম না করি, তাহা হইলে এই লোক বিভ্রষ্টমর্য্যাদ হইবে, তাহাতে সঙ্করের উৎপত্তি হইবে। আর আমিই তাহার কর্ত্তা হইব। এইরূপে প্রজাপতি আমি এই সব প্রজাদের সাঙ্কর্য্য দোষে উপহনন অর্থাৎ মলিন করিব (বলদেব)।

যাহা হউক, ব্যাখ্যাকারগণের এ অর্থ হইতে এ তত্ত্ব পরিষ্কার বুঝা যায় না। আমরা দুই ভাবে এই তত্ত্ব বুঝিতে চেষ্টা করিব। প্রথম অর্থ এই যে, ভগবান্ আপনাকে বসুদেবপুত্ররূপে অর্জ্জুনের নিকট এই তত্ত্ব উপদেশ দিতেছেন এবং তিনি তৎকালীন সমাজের একজন শ্রেষ্ঠলোক মাত্র এই পরিচয় দিতেছেন। তিনি নিজে বর্ণোচিত ও আশ্রমোচিত কর্ম্ম না করিলে, সাধারণ লোকে তাঁহারই অনুসরণ করিয়া, বর্ণাদি ধর্ম্ম আচরণ করিবে না, সুতরাং সঙ্করের সৃষ্টি হইবে অর্থাৎ বর্ণধর্ম্ম-মিশ্রণ হইবে, এজন্য পরোক্ষভাবে ভগবান্ সঙ্করের কর্ত্তা হইবেন,—ইহাই উল্লেখ করিতেছেন।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, কামনা করিয়াই হউক, আর নিষ্কাম ভাবেই হউক, যে সকল লোক শাস্ত্রোক্ত কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহারা অনেক পরিমাণে নিজ প্রকৃতিকে দমন করিতে শিক্ষা করিয়াছে। সাধারণতঃ লোকে আসুর বা রাক্ষস-স্বভাবযুক্ত,—অর্থাৎ তামসিক ও রাজসিক-প্রকৃতি-সম্পন্ন। তাহারা ১৬শ অধ্যায়ের ২১শ শ্লোকোক্ত নরকের দ্বার-স্বরূপ—কাম, ক্রোধ ও লোভের বশবর্ত্তী। তাহারা সর্ব্বদা কামনা দ্বারা পরিচালিত হইয়া যথেচ্ছাচার অবলম্বন করিয়া থাকে। এ সকল লোকের চিত্ত অস্থির, বুদ্ধি অব্যবসায়াত্মক। তাহারা নিজে ভাবিয়া নিজ কর্ত্তব্য স্থির করিতে পারে না। তবে তাহারা শ্রেষ্ঠ লোকের অনুকরণ করিতে চেষ্টা করে। এবং যদি তাহারা দেখে যে, শ্রেষ্ঠ লোক সকলেই বর্ণ ও আশ্রমধর্ম্ম পালনে ও শাস্ত্রবিহিত ক্রিয়াতে সর্ব্বদা লিপ্ত আছে, তবে

তাহারাও উহাদের অনুকরণ করিয়া শাস্ত্রানুযায়ী কর্ম্ম করিতে রত হইবে। এইরূপে তাহাদের কামনা নির্দ্দিষ্ট পথে গিয়া তাহাদের উন্মার্গ প্রবৃত্তি দমন করিবে। তাহাতে ক্রমে ক্রমে তাহাদের সত্ত্বশক্তির কতক স্ফূর্ত্তি হইতে থাকিবে। কিন্তু যদি শ্রেষ্ঠলোক কর্ম্মমার্গ ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম-সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, যদি তাঁহারা শাস্ত্রীয় বিধানের অনুসরণ না করেন, তবে এই সকল সাধারণ লোকও শাস্ত্রীয় বিধানোক্ত কর্ম্ম ত্যাগ করিবে। তাহার ফলে তাহারা কামাচারী ও যথেচ্ছাচারী হইবে। (গীতার ১৬শ অধ্যায়ের ২৩শ শ্লোক দ্রষ্টব্য) তাহার ফলে বর্ণাদি ধর্ম্মের লোপ হইবে। অর্থাৎ এক বর্ণের কর্ত্তব্য কার্য্য অন্য বর্ণে প্রবৃত্তিবশে করিতে যাইবে। তাহা হইলে গুণবিভাগানুযায়ী বর্ণবিভাগ নষ্ট হইবে, সমাজ বিশৃঙ্খল হইবে। তাহাকেই এস্থলে সঙ্করোৎপত্তির কারণ বলা হইয়াছে। বর্ণভেদ ও তদনুসারে কর্ম্মভেদের বন্ধন শিথিল হইলে সমাজ যেরূপ উচ্ছৃঙ্খল হয় এবং তাহাতে বর্ণের যেরূপ মিশ্রণ হয়, তাহা আমাদের বর্ত্তমান সমাজের অবস্থা হইতে বেশ বুঝা যাইবে। (মানব ধর্ম্মশাস্ত্রের তৃতীয় অধ্যায়ের ১৭শ, ১৮শ, ও ১৯শ শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

যাহা হউক এই অর্থ বাহ্য। যাহা গূঢ় অর্থ, তাহাই আমাদের এস্থলে বুঝিতে হইবে। অর্জ্জুন বুঝুন আর নাই বুঝুন, ভগবান্ আপনি পরমেশ্বর স্বরূপে অবস্থিত ও যোগযুক্ত হইয়া অর্জ্জুনকে পরমেশ্বরের স্বরূপ উপদেশ দিতেছেন। তিনি এস্থলে তাঁহার সেই স্বরূপের কথাই বলিয়াছেন। পূর্ব্বের শ্লোক এতদনুসারে আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। এই শ্লোকও এই অর্থে গ্রহণ করিতে হইবে। পরমেশ্বর যদি কর্ম্ম না করেন, তবে তিনি কিরূপে সঙ্করের হেতু হইয়া এই প্রজাগণের বা জীবগণের উৎসন্নের কারণ হন, তাহা আমাদের বুঝিতে হইবে।

এই জগতের স্থিতি জন্য বর্ণ বিভাগ ও কর্ম্মবিভাগ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। প্রকৃতিজ গুণ যাহার যেরূপ,তাহার সেইরূপ গুণোচিত কর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট আছে।

ভগবান্ এতদনুসারে বর্ণবিভাগ করিয়া, প্রত্যেকের স্বাভাবিক কর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন (গীতায় ৪।১৩ ও ১৮।৪১-৪৪ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। সেই বিভাগ যতদিন নির্দ্দিষ্ট থাকে, ততদিন এ সমাজ রক্ষিত হয়।

ভগবান্ জীবহৃদয়ে অবস্থিত থাকিয়া তাহাদিগকে তাহাদের প্রকৃতিজ গুণবশে যন্ত্রারূঢ়ের ন্যায় মায়াদ্বারা পরিচালিত করিয়া তদনুযায়ী কর্ম্মে তাহাদিগকে নিযুক্ত করেন। এজন্য সকলেই তাঁহার বর্ত্ম অনুসরণ করে (৪।১১ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। ভগবান্ প্রতি জীবপ্রকৃতির নিয়ন্তা না হইলে জীব স্বভাবানুযায়ী বিহিত কর্ম্ম করিতে পারিত না। তাহারা স্বেচ্ছাচারী হইত। কেহ বর্ণোচিত ধর্ম্মাচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইত না। তাহা হইলে ধর্ম্মচক্র আর প্রবর্ত্তিত হইত না। ইহার প্রথম ফল—বর্ণ ও কর্ম্মের মিশ্রণ, পরস্পরের সহিত পরস্পরের সংঘর্ষ এবং তাহারই পরিণাম সমাজবন্ধন শিথিল হইয়া ক্রমে লোকের উচ্ছেদ। এই বর্ণ ও আশ্রমোচিত ধর্ম্মরক্ষার্থও ভগবান্‌কে অবতীর্ণ হইতে হয়, তাহা পরে (৪।৭-৯ শ্লোকে) উক্ত হইয়াছে।

সক্তাঃ কর্ম্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্ব্বন্তি ভারত।
কুর্য্যাদ্বিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহম্ ॥ ২৫

নির্ব্বোধ আসক্তিবশে কর্ম্ম করে যথা—
লোক সংগ্রহের তরে আসক্তি ত্যজিয়া,
কর্ম্ম করা, হে ভারত, বিজ্ঞের উচিত ॥২৫

(২৫) নির্ব্বোধ (অবিদ্বাংসঃ)—যাহারা বিদ্বান্ বা তত্ত্বজ্ঞানী নহে (শঙ্কর)। যাহারা আত্মজ্ঞানী নহে (রামানুজ)।

আসক্তিবশে (সক্তাঃ) - কর্ম্মফলাকাঙ্ক্ষায় (শঙ্কর)। কর্ম্মে অভিনিবিষ্ট হইয়া (স্বামী)। কর্তৃত্বাভিমানে (মধু)।

আসক্তি ত্যজিয়া—হে অর্জ্জুন তুমি যদি আমার ন্যায় কৃতার্থবুদ্ধি বা আত্মবিৎ হও, তথাপি তোমার নিজ কর্ত্তব্য না থাকিলেও পরের প্রতি অনুগ্রহ প্রযুক্ত তোমার কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য। ইহাই এস্থলে উক্ত হইয়াছে। যিনি বিদ্বান্, আত্মতত্ত্বজ্ঞ, তিনিও লোকশিক্ষার্থ ঠিক অজ্ঞানী কর্ম্মসঙ্গীর ন্যায় কর্ম্মানুষ্ঠান করিবেন—ইহাই তাঁহার কর্ত্তব্য (শঙ্কর)। যিনি জ্ঞান-যোগাধিকারী, তাঁহার অসক্ত বুদ্ধিতে বা অনাসক্ত ভাবে কর্ম্মযোগ অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য (রামানুজ)। আত্মবিদেরও লোকের প্রতি কৃপা করিয়া লোকসংগ্রহার্থ অনাসক্ত চিত্তে কর্ত্তব্যবোধে কর্ম্ম করা উচিত (স্বামী)। মধুসূদন বলেন, অর্জ্জুনের এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে,'তুমি ঈশ্বর, লোক-সংগ্রহার্থ কর্ম্ম করিলেও তোমার কখন কর্ত্তৃত্বাভিমান হইবে না ; সুতরাং তোমার কর্ম্ম করিলে ক্ষতি নাই। কিন্তু আমি জীব, এরূপ কর্ম্ম করিলেও কর্ত্তৃত্বাভিমান হওয়ায়, আমার জ্ঞান অভিভূত হইতে পারে।' এই আকাঙ্ক্ষার উত্তরে ভগবান্ বলিতেছেন যে, যিনি বিদ্বান্, তিনি লোক সংগ্রহের জন্য অসক্ত হইয়া কর্ম্ম ইচ্ছা করিবেন (মধু)। তিনি ফল-লিপ্সা-শূন্য হইয়া কর্ম্ম করিবেন, অর্থাৎ বেদোক্ত স্বকর্ম্ম করিবেন (বলদেব)।

কর্ম্ম করা বিজ্ঞের উচিত—জ্ঞানযোগাধিকারী ও কর্ম্ম-যোগাধিকারী উভয়েই কর্ম্ম করিবে। ইহাই এস্থলে উপদিষ্ট হইয়াছে। (রামানুজ, স্বামী, মধু)।

ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্।
যোজয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্ ॥২৬

কর্ম্মাসক্ত অজ্ঞানীর বুদ্ধি বিচলিত
বিজ্ঞে না করিবে ; নিজে যোগযুক্ত হ'য়ে
কর্ম্ম করি, কর্ম্মে তারে করিবে যোজিত ॥ ২৬

(২৬) **কর্ম্মাসক্ত অজ্ঞানীর**—অনাদি কর্ম্মবাসনা দ্বারা যাহারা কর্ম্মে নিযুক্ত, এবং যাহারা মোক্ষার্থ প্রথমে কর্ম্মযোগেরই অধিকারী।

বুদ্ধি বিচলিত—যাহারা কর্ম্মে আসক্ত ও অবিবেকী, তাহারা 'আমি কর্ত্তা' এইরূপ অভিমানবশে, 'ইহা কর্ত্তব্য' 'ইহা জ্ঞাতব্য' 'এইরূপ কর্ম্মের এইরূপ ফল' এই প্রকার বুদ্ধিযুক্ত। সাধনার দ্বারা তাহাদের চিত্ত-শুদ্ধি ও কর্ম্মবৃত্তি নিয়মিত ও সংযত হইবার পূর্ব্বে, তাহাদের জ্ঞানোপদেশ দিয়া বুদ্ধি বিচলিত করিতে নাই। কারণ চিত্তশুদ্ধি না হওয়ায়, তাহারা জ্ঞানোপদেশ হইতে কোন লাভ করিতে পারিবে না। কেন না তাহাদের হৃদয়ে জ্ঞাননিষ্ঠা সম্ভব হইবে না, অথচ বিহিত কর্ম্মে তাহাদের শ্রদ্ধাও দূর হইবে। সুতরাং তাহারা ইতোনষ্ট স্ততোভ্রষ্টঃ হইবে (মধু ও শঙ্কর)। কর্ম্মযোগ হইতে অন্যথা আত্মাবলোকন হয়, এইরূপ বুদ্ধিভেদ (রামানুজ)। বুদ্ধি বিচলিত হইলে কর্ম্মে আর তাহাদের শ্রদ্ধা থাকিবে না, অথচ জ্ঞানেরও উদয় হইবে না। সুতরাং তাহারা উভয়মার্গ-ভ্রষ্ট হইবে (বলদেব)। শাস্ত্রে আছে—

অজ্ঞস্যার্দ্ধপ্রবুদ্ধস্য সর্ব্বং ব্রহ্মেতি যো বদেৎ।
মহানিরয়জালেষু স তেন বিনিয়োজিতঃ॥"

নিজে যোগযুক্ত হ'য়ে—কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠান করিয়া, নিষ্কামভাবে বর্ণ ও আশ্রমাদি-বিহিত কর্ম্ম আচরণ করিয়া। এই প্রকার লোকসংগ্রহার্থ কর্ম্মে প্রবৃত্ত আমি বা অন্য কোন আত্মতত্ত্ববিৎ ব্যক্তির লোকসংগ্রহরূপ কার্য্য ব্যতিরেকে অন্য কোন কর্ত্তব্য নাই। এই কারণে আত্মবিদের পক্ষে এই উপদেশ দেওয়া হইতেছে (শঙ্কর)।

এস্থলে, জ্ঞানযোগীরা কেবল লোকসংগ্রহার্থ কর্ম্মযোগ করিবেন, অর্থাৎ নিজে অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম করিয়া সাধারণ লোককে দৃষ্টান্ত দ্বারা কর্ম্মে নিযুক্ত করিবেন, ইহাই অর্থ।

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে ॥ ২৭

প্রকৃতিজ গুণ দ্বারা হয় সর্ব্বরূপে
কর্ম্ম সব সম্পাদিত ; 'কর্ত্তা আমি' ইহা—
অহঙ্কারবশে ভাবে মূঢ়মতি জনে ॥ ২৭

(২৭) প্রকৃতিজ গুণ—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণের সাম্যাবস্থা প্রকৃতি (সাংখ্যদর্শন ১।৬১) বা প্রধান। সেই সাম্যাবস্থার পরিবর্ত্তনে গুণত্রয়ের যে বৈষম্য ও বিকার হয়, তাহার দ্বারা কার্য্যকারণরূপ কর্ম্মসূত্র উৎপন্ন হয়। কর্ম্ম,—লৌকিক ও শাস্ত্রীয় (শঙ্কর)। প্রকৃতির গুণ বা প্রকৃতির কার্য্য ইন্দ্রিয়ই সকল কর্ম্ম করে (স্বামী)।

সত্ত্বরজস্তমোগুণময়ী মিথ্যাজ্ঞানাত্মক পরমেশ্বরের শক্তি বা মায়াই প্রকৃতি (বলদেব ও মধুসূদন)। শাস্ত্রে আছে—

"মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ মায়িনন্তু মহেশ্বরম্ ॥"

সেই প্রকৃতির কার্য্য-কারণ-রূপ গুণবিকার হইতেই কর্ম্ম হয় (মধু)। লোকে নিজ প্রকৃতি বা গুণানুরূপ কর্ম্ম করে (রামানুজ)। ঈশ্বর-প্রবর্ত্তিত ও প্রকৃতির ত্রিগুণ হইতে জাত শরীর মন ও ইন্দ্রিয়ের দ্বারা এবং প্রাণ দ্বারা সর্ব্বকার্য্য সম্পাদিত হয় (বলদেব)।

সাংখ্যতত্ত্বসমাসে আছে—"পুরুষ কর্ত্তা হইলে সকল কর্ম্মই শুভ হইত। তিনরূপ বৃত্তি থাকিত না। ধর্ম্ম, সৌহিত্য, যম, নিয়ম, নির্ব্বৈরতা, সম্যক্-বিবেচনা, জ্ঞান ও ঐশ্বর্য্য প্রকাশক বৃত্তিই সাত্ত্বিকী। রাগ, ক্রোধ, লোভ, পরপরিবাদ, অতিরৌদ্রতা, অতুষ্টি, বিকৃতআকৃতিরূপ পরুষতাই রাজসিক বৃত্তি। উন্মাদ, মদ, বিষাদ, নাস্তিক্য, স্ত্রীপ্রসক্তিতা, নিদ্রা, আলস্য, নির্গুণতা ও অশৌচ ইহারাই তামসিক বৃত্তি। এই গুণত্রয় হইতেই জগতে

গুণের কর্তৃত্ব ও পুরুষের অকর্তৃত্ব সিদ্ধান্ত হয়।" পরে গুণত্রয়বিভাগ-যোগ নামক চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে এই ত্রিগুণ-তত্ত্ব বুঝান আছে। পুরুষ অকর্তা হইয়াও কিরূপে কর্তা হন, তাহা ত্রয়োদশ অধ্যায়ে, ২০—২১ শ্লোকের ব্যাখ্যায় বিবৃত হইবে।

অহঙ্কারবশে—(দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৭১শ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য)।

এই অহঙ্কার—কার্য্য-কারণ-সঙ্ঘাত আত্মপ্রত্যয় (মধু)। "অভিমানোহহঙ্কারঃ" (সাংখ্যদর্শন ২।১৬)। সংবিদ্‌বপু জীবাত্মা অনাদিকালপ্রবর্ত্তিত বিষয়ভোগবাসনাক্রান্ত হইয়া ভোগার্থ নিজ সন্নিহিত প্রকৃতিকে আশ্রয় করে, ও তাহার কার্য্যদ্বারা অহঙ্কারবশে বিমুগ্ধ ও আত্মজ্ঞানশূন্য হইয়া, শরীরাদিতে অহংভাবযুক্ত হয়, এবং শরীরাদির দ্বারা সিদ্ধ কর্ম্মকে নিজ-কৃত কর্ম্ম বলিয়া মনে করে (বলদেব)।

জীব, দেহ বা প্রকৃতি ও ঈশ্বর—কর্ম্মের এই তিন কারণ। জীব একা কর্ম্ম করে—এ ধারণা ভ্রান্ত। (গীতার ১৩শ অধ্যায়ের ২০শ শ্লোক, ১৮শ অধ্যায়ের ১৪শ—১৬শ শ্লোক দ্রষ্টব্য) সাংখ্যদর্শনে আছে "অহঙ্কারঃ কর্তা ন পুরুষঃ" (৬।৫৪), এবং "নির্গুণ আত্মনাত্মনোহসঙ্গত্বাদি শ্রুতেঃ" (৬।১০) সাংখ্যতত্ত্বসমাসে আছে, "ত্রিগুণ জন্য বিপরীত দর্শন হয় বলিয়া, অবোধ পুরুষ, আমি করিতেছি এইরূপ মনে করে। যে একগাছি সামান্য তৃণকেও নত করিতে অসমর্থ, সেই এ সমস্ত 'আমি করিতেছি, আমারই সব,' এইরূপ অবোধ অভিমানের দ্বারা উন্মত্ত হইয়া আপনাকে কর্তা মনে করে।"

পূর্ব্বে ২।৭১ শ্লোকের ব্যাখ্যায় এই অহঙ্কারের প্রকৃত স্বরূপ কি, তাহা উক্ত হইয়াছে। বুদ্ধিতত্ত্বে যখন জ্ঞানক্রিয়া হয় বা বৃত্তিজ্ঞান হয়, তখন অহং ও ত্বম্ বা ইদং এই দ্বৈত ভাব জ্ঞানে উদ্ভব হয়। এজন্য বুদ্ধিকে অহঙ্কারের কারণ বলা হইয়াছে। এই অহঙ্কারবশে, জীবের দেহ ও ইন্দ্রিয়াদিতে আত্মাধ্যাস হয়,—আমি এই বুদ্ধিস্বরূপ,

মনস্বরূপ, ইন্দ্রিয়স্বরূপ বা দেহস্বরূপ এই ধারণা হয়। তখন এই মন ও ইন্দ্রিয় দ্বারা যে কর্ম্ম হয়, সেই কর্ম্ম আমার—অজ্ঞানবশে বা আত্মার প্রকৃত স্বরূপ না জানায় 'আমি তাহার কর্ত্তা',—এইরূপ ধারণা হয়।

মূঢ়মতি—স্বরূপ-বিবেকে অসমর্থ অর্থাৎ অনাত্মবিষয়ে আত্মাভিমান-যুক্ত (মধু)। পূর্ব্বের দুই শ্লোকে যে কর্ম্মাসক্ত অজ্ঞানীর বা অবিদ্বানের কথা উক্ত হইয়াছে, তাহারা কেন কর্ম্মাসক্ত হয়, এবং কেন তাহাদের বিহিত কর্ম্মে নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য, ইহাই এই শ্লোকে বুঝান হইয়াছে।

তত্ত্ববিত্তু মহাবাহো গুণকর্ম্মবিভাগয়োঃ।
গুণা গুণেষু বর্ত্তন্ত ইতি মত্বা ন সজ্জতে॥ ২৮

কিন্তু পার্থ, গুণ আর কর্ম্মবিভাগের—
তত্ত্বদর্শী জন কর্ম্মে আসক্ত না হয়—
ভাবে তারা, গুণ হয় গুণে প্রবর্ত্তিত॥ ২৮

(২৮) গুণ আর কর্ম্মবিভাগের—(মূলে আছে—"গুণকর্ম্মবিভাগয়োঃ") অর্থাৎ গুণবিভাগ ও কর্ম্মবিভাগ—এ উভয়ের। ইন্দ্রিয় বা করণাত্মক গুণ—বিষয়াত্মক গুণেতে ব্যাপৃত রহিয়াছে। কিন্তু আত্মা নিষ্ক্রিয়, (শঙ্কর)। 'আমি গুণাত্মক নহি' এই স্থির করিয়া—গুণ হইতে আত্মার প্রভেদ, ও 'আত্মাতে কর্ম্ম নাই' এই স্থির করিয়া—কর্ম্ম হইতে আত্মার প্রভেদ করিয়া (স্বামী)। মধুসূদন বলেন, গুণ, কর্ম্ম ও বিভাগ এই তিনের। অর্থাৎ অহঙ্কারের আস্পদ বা অহংজ্ঞানের আধার শরীর ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণই গুণ; এবং মমতার আস্পদ সেই সকলের ব্যাপারভূত—কর্ম্ম, এবং এই সমস্ত বিকারযুক্ত জড় পদার্থ হইতে পৃথক্ বা বিভিন্ন স্বপ্রকাশ জ্ঞানস্বরূপ আত্মা, তাহাই এস্থলে বিভাগ; এই গুণ, কর্ম্ম ও বিভাগ বা আত্মা—

ইহাদের। গুণ বা ইন্দ্রিয় হইতে ও কর্ম্ম হইতে যে আত্মার বিভাগ বা ভেদ তাহার (বলদেব)। সত্ত্বাদি গুণবিভাগের ও গুণজ কর্ম্মবিভাগের (রামানুজ)।

ভগবান্ পরে (৪।১৩) শ্লোকে বলিয়াছেন যে, গুণ ও কর্ম্মবিভাগ অনুসারে তিনি চতুর্ব্বর্ণের সৃষ্টি করিয়াছেন। গুণ—প্রকৃতিজ তিন গুণ। তাহাদের তত্ত্ব পরে চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। এই প্রকৃতিজ গুণে বদ্ধ হেতু কেহ সাত্ত্বিক-প্রকৃতি-যুক্ত হন (তাঁহারা ব্রাহ্মণ)। কেহ সত্ত্বরজোগুণপ্রধান হন (তাঁহারা ক্ষত্রিয়)। কেহ রজস্তমোগুণ-প্রধান হন (তাঁহারা বৈশ্য)। আর কেহ বা কেবল তমোগুণপ্রধান হন, তাঁহারা তামসিক-প্রকৃতি-যুক্ত (ইঁহারা শূদ্র)। এই গুণবিভাগানুসারে বর্ণবিভাগ হয় এবং বর্ণবিভাগানুসারে স্বাভাবিক কর্ম্মবিভাগ হয় (গীতা ১৮।৪১—৪৪ শ্লোক দ্রষ্টব্য), তাহাই শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে। কোন্ গুণ প্রবল হইলে কিরূপ কর্ম্ম হয়, তাহা চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে।

অতএব রামানুজের ও শঙ্করাচার্য্যের অর্থই অধিক সঙ্গত। গুণের এবং কর্ম্মের বিভাগ অর্থাৎ উক্ত সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণের যে বিভাগ, এবং এই তিনরূপ গুণ হেতু যে কর্ম্মের বিভাগ নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহাই এস্থলে উল্লিখিত হইয়াছে। (গীতার ১৮শ অধ্যায়ের ৪১শ হইতে ৪৪শ শ্লোক দেখ)।

তত্ত্বদর্শী—এই গুণ ও কর্ম্ম-বিভাগের তত্ত্ব যাঁহারা জানেন, তাঁহারা প্রকৃতিজ গুণ দ্বারাই কর্ম্ম হয়, ইহা জানেন, এবং আত্মাকে অকর্ত্তা বলিয়াই জানেন। (১৩।২০ শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

আসক্ত না হয়—প্রকৃতির গুণ হইতে কর্ম্ম হয়, আত্মা নিষ্ক্রিয় অকর্ত্তা, এই তত্ত্ব জানিয়া কর্ম্মে আসক্ত হয় না। আত্মা পূর্ণ, আত্মার আপ্তব্য কিছুই নাই, ইহা জানিয়া আত্মার্থ কোন কর্ম্মে আসক্ত হয় না।

গুণ হয় গুণে প্রবর্ত্তিত—করণাত্মক (ইন্দ্রিয়াত্মক) গুণ, বিষয়াত্মক (ইন্দ্রিয়বিষয়াত্মক) গুণে প্রবর্ত্তিত হয় (শঙ্কর, স্বামী, মধু, বলদেব)। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণ নিজ বিষয়ে রত হয়। রামানুজ ভিন্ন অর্থ করেন ; তাঁহার মতে সত্ত্বাদি গুণ নিজ কার্য্যে প্রবর্ত্তিত হয় বা নিজ অনুরূপ কার্য্য করে।

আমাদের অন্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয় প্রকৃতির এই ত্রিগুণ হইতে জাত। ইন্দ্রিয়ের বিষয় রূপ-রসাদিও এই প্রকৃতির গুণ হইতে জাত। বিষয়—গ্রাহ্য ; চিত্ত তাহার গ্রাহক। বিষয়-গ্রহণ জন্য চিত্তদ্বারা নিয়মিত হইয়া ইন্দ্রিয়গণই বিষয়ে প্রবর্ত্তিত হয়। মনের দ্বারা প্রবর্ত্তিত হইয়া জ্ঞানেন্দ্রিয় বিষয় আহরণ করে। সেই আহরিত বিষয়ের মধ্যে মন যাহা সুখদ বা দুঃখদ বলিয়া স্থির করে, সেই বিষয় গ্রহণ বা ত্যাগ জন্য, মন কর্ম্মেন্দ্রিয়গণকে কর্ম্মে প্রেরণ করে।

সাংখ্যদর্শন মতে প্রকৃতির সত্ত্বাধিক্যে পুরুষের সান্নিধ্যে মহত্তত্ত্ব বা বুদ্ধিতত্ত্ব উৎপন্ন হয়। বুদ্ধি হইতে অহঙ্কার, এই অহঙ্কারের তামসিক বিকার হইতে পঞ্চতন্মাত্র ও পঞ্চতন্মাত্র হইতে স্থূলভূত বা বিষয় উৎপন্ন হয়। আর এই অহঙ্কারের রাজসিক বিকার হইতে মন প্রভৃতি একাদশ ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়। অতএব এক গুণাত্মক প্রকৃতি হইতেই আমাদের ইন্দ্রিয় এবং ইন্দ্রিয়ের বিষয় উভয়েরই উৎপত্তি হইয়াছে। পরে ১৩।২০ শ্লোক ও তাহার ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

প্রকৃতে গুর্ণসংমূঢ়াঃ সজ্জন্তে গুণকর্ম্মসু।
তানকৃৎস্নবিদো মন্দান্ কৃৎস্নবিন্ন বিচালয়েৎ ॥২৯

বিমোহিত যারা এই প্রকৃতির গুণে
আসক্ত গুণজ কর্ম্মে—বিজ্ঞে নাহি করে
হেন অজ্ঞ মন্দমতি জনে বিচলিত ॥ ২৯

(২৯) বিমোহিত প্রকৃতির গুণে—মায়াগুণে বিমোহিত (মধু)। প্রকৃতির গুণ দ্বারা বিমোহিত, অর্থাৎ দেহ-ইন্দ্রিয়াদিতে তাদাত্ম্য-অধ্যাস-রূপ অজ্ঞান হেতু বিমোহিত। পূর্ব্বের টীকা দ্রষ্টব্য।

প্রকৃতির গুণ কি, তাহার বৃত্তি কি, এবং মানুষে কিরূপে এই প্রকৃতির গুণ দ্বারা বিমোহিত হয়, তাহা পরে চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে ৫ম হইতে ১৮শ শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে।

আসক্ত গুণজ কর্ম্মে—দেহ-ইন্দ্রিয়-অন্তঃকরণ-কৃত গুণের কার্য্যে আপনাকে কর্ত্তা মনে করিয়া তাহাতে আসক্ত (মধু)। রামানুজ বলেন, ইহারাই প্রকৃত কর্ম্মাধিকারী; এবং ইহাদের কর্ম্ম দ্বারা চিত্তশুদ্ধি জন্মাইবার পূর্ব্বে আত্মজ্ঞান লাভের সম্ভাবনা নাই। ইহারা জ্ঞানযোগের অধিকারী নহে।

এই প্রকৃতিজ সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণের দ্বারা যে যে কর্ম্ম হয়, তাহাতে বাস্তবিক অকর্ত্তা পুরুষ কিরূপে আবদ্ধ হইয়া আপনাকে সেই সেই গুণজ কর্ম্মের কর্ত্তা মনে করে, তাহা পরে (উক্ত ১৪।৫—১৮ শ্লোকে) বিবৃত হইয়াছে।

বিজ্ঞ, অজ্ঞ—(মূলে আছে—কৃৎস্নবিৎ, অকৃৎস্নবিৎ) পূর্ণাত্মজ্ঞানী, অল্পজ্ঞানী (বলদেব)। মধুসূদন বলেন, বার্ত্তিককারদের ব্যাখ্যামতে কৃৎস্ন অর্থে আত্মপরতা ও অকৃৎস্ন অর্থে অনাত্মপরতা। কৃৎস্নবিৎ অর্থাৎ পরিপূর্ণ আত্মবিৎ। কৃৎস্ন বস্তুই যে ব্রহ্ম হইতে জাত, এবং ব্রহ্মই যে এ সমুদায়, যাঁহাদের এই জ্ঞান হইয়াছে, তাঁহারা কৃৎস্নবিৎ। যিনি অকৃৎস্নবিৎ তিনি নানাত্ব দর্শন করেন, সমুদায় দৃষ্টাদৃষ্ট বস্তু ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বলিয়া জানেন।

যাহা হউক, ইহা বলিতে পারা যায় যে, বিজ্ঞ অর্থে বিশেষ জ্ঞানী আত্মবিৎ। যে আপনাকে প্রকৃতি হইতে ভিন্ন বলিয়া জানে এবং আপনার অকর্ত্তৃত্বাদি স্বরূপজ্ঞ, সেই বিজ্ঞ। সে (পরে ১৩।৭—

১১ শ্লোকোক্ত) অমানিত্বাদি জ্ঞানযুক্ত। আর যে অজ্ঞ—অজ্ঞানী, সে উক্ত জ্ঞানযুক্ত নহে, অথবা ইহার অন্যথা যে অজ্ঞান, তাহা যুক্ত।

বিচলিত—অর্থাৎ এই সকল মন্দবুদ্ধি শ্রেষ্ঠ জনের আচারানুবর্ত্তী কর্ম্মাধিকারীর কথা ভাবিয়া বিজ্ঞ নিজে কর্ম্মযোগ হইতে প্রচলিত-মনা হইবেন না (রামানুজ)। বিশুদ্ধ সচ্চিদানন্দ-আত্মতত্ত্ব বুঝিতে অসমর্থ লোকদিগকে আত্মতত্ত্বের উপদেশ দিয়া কর্ম্ম হইতে বিচলিত করিবেন না (বলদেব)। তাহাদের কর্ম্মে শ্রদ্ধা নষ্ট করিবেন না (মধুসূদন)। বিচলিত—অর্থাৎ বুদ্ধিভেদ করা (শঙ্কর)।:

যাহারা অকৃৎস্নবিৎ বা যাহারা সম্যক্ জ্ঞানী নহে, তাহারা নিজ দেহে আত্মাধ্যাস করিয়া প্রকৃতির গুণজ কর্ম্মকে অহঙ্কারবশে আপনার কর্ম্ম মনে করিয়া কর্ত্তৃত্বাভিমানযুক্ত হয়। প্রকৃতির রজঃ ও তমোগুণজ কর্ম্ম প্রায়ই অবিহিত কর্ম্ম। সে কর্ম্মের ফলরূপে যাহারা রাজসিক ও তামসিক বা আসুরী প্রকৃতিযুক্ত, তাহারা প্রায়ই জগতের অহিতকর ও ক্ষয়কর উগ্র কর্ম্মকারী (১৬।৯)। তাহাদিগকে যদি আত্মতত্ত্বের উপদেশ দেওয়া যায়, আত্মার অকর্ত্তৃত্ব,—শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বরূপ উপদেশ দেওয়া যায়, তবে তাহারা এইরূপ পাপাচরণ করিতে নিরত থাকিবে, অথচ মনে করিবে যে, তাহাদের আত্মা প্রকৃতির অতীত—শুদ্ধ, প্রকৃতির গুণই কর্ম্ম করিতেছে, তাহারা তাহার দ্রষ্টা মাত্র। এই ধারণায় তাহাদের কৃত দুষ্কর্ম্মে আর দায়িত্ব বোধ থাকিবে না। তাহারা আপনাকে পাপাচারী মনে করিবে না। সুতরাং তাহারা আরও ঘোরতর পাপাচারী হইবে, এবং জগতের ক্ষয়ের কারণ হইবে। এজন্য সেরূপ লোককে জ্ঞানোপদেশ দেওয়া অনুচিত। তাহাদের বিহিত কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত রাখাই বিজ্ঞ লোকের কর্ত্তব্য। এমন অনেক অজ্ঞানী সন্ন্যাসীকে দেখা যায়, যিনি মুখে 'সোঽহং' বলেন, অথচ নানা দুষ্কর্ম্ম করিয়াও আপনাকে নিষ্পাপ ব্রহ্মস্বরূপ

মনে করেন। তাঁহাদের হয়ত এই 'সোঽহং' বুদ্ধি না হইলে তাঁহারা অতদূর দুরাচার হইতেন না।

এই সকল অজ্ঞানী লোক আত্মতত্ত্বের উপদেশ গ্রহণ করিবার উপযুক্ত নহে। যাহাদের চিত্ত কলুষিত, তাহারা আত্মতত্ত্ব বুঝিবার অধিকারী নহে। তাহারা সে উপদেশের বিকৃত অর্থ গ্রহণ করে, এবং তাহার ফলে ইতোনষ্টস্ততোভ্রষ্টঃ হয়।

ইহা ব্যতীত যাহারা স্বাভাবিক তামস প্রকৃতিযুক্ত, স্বভাবতঃ অলস, নিষ্কর্ম্মা,—তাহারা যদি কর্ম্ম-সন্ন্যাসের উপদেশ পায়, তবে তাহারা আরও অলস অকর্ম্মা হয়, সংসারের ভার মাত্র হইয়া পড়ে।

এইজন্য ভগবান্ উপদেশ দিয়াছেন যে, এই সকল লোক যাহাতে শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম সকামভাবেও অনুষ্ঠান করে, জ্ঞানী তাহারও উপদেশ দিবেন, এবং নিজে দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহাদের সেইরূপ কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করিবেন, তাহাদের আত্মতত্ত্ব উপদেশ দিবেন না; কর্ম্ম-সংন্যাসও উপদেশ দিবেন না।

ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা।
নিরাশীর্নির্ম্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ॥ ৩০

আমাতে করিয়া সর্ব্ব কর্ম্ম সমর্পণ
অধ্যাত্মবুদ্ধিতে, হ'য়ে নিরাশী নির্ম্মম,
যুদ্ধ কর—করি দূর চিত্তের সন্তাপ॥ ৩০

(৩০) অধ্যাত্মবুদ্ধিতে—(মূলে আছে "অধ্যাত্মচেতসা") বিবেক-বুদ্ধিতে (শঙ্কর)। ঈশ্বরই কর্ত্তা, আমি ভৃত্যবৎ কর্ম্ম করি—এই বুদ্ধিতে (শঙ্কর, মধু ও স্বামী)। আত্মবিষয়ক জ্ঞানে বা আত্মাতে চিত্ত সমাহিত করিয়া (বলদেব)।

আমাতে—সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বাত্মা সর্ব্বনিয়ন্তা বাসুদেব পরমেশ্বর আমাতে (শঙ্কর, মধু)। সর্ব্বাত্মভূত ভগবান্ পুরুষোত্তমে (রামানুজ)।

কর্ম্ম সমর্পণ—ঈশ্বরই সর্ব্বভূতে অধিষ্ঠিত হইয়া সকলকে কর্ম্মে নিযুক্ত করেন, সকলের স্ব স্ব প্রকৃতির নিয়ন্তা হন, ইহা নিশ্চয় করিয়া ঈশ্বরে সর্ব্বকর্ম্মের কর্তৃত্ব আরোপ কর। ঈশ্বরই সর্ব্বভূত-শরীরে অধিষ্ঠানপূর্ব্বক কর্ম্ম করান, তিনিই কর্ম্মের প্রবর্ত্তক—এই ধারণা করিয়া কর্ম্মে মমতা-রহিত হও (মধু)। আমি ভৃত্যবৎ ঈশ্বরের আদিষ্ট কর্ম্ম তাঁহার জন্য করিতেছি, এইরূপ মনে করিয়া কর্ম্মাচরণ কর।

এ সম্বন্ধে রামানুজ যাহা বলিয়াছেন, তাহা বিশেষ ভাবে বুঝিতে হইবে। তিনি বলেন,—জ্ঞানযোগাধিকারীর পক্ষেও জ্ঞানযোগ অপেক্ষা কর্ম্মযোগ শ্রেষ্ঠ, ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। এই হেতু ভগবান্ অর্জ্জুনকে উপদেশ দিতেছেন,—তুমি লোকসংগ্রহার্থ কর্ম্ম কর। প্রকৃতি বিবিক্ত আত্মার স্বভাব নিরূপণপূর্ব্বক গুণেই কর্তৃত্ব আরোপ করিয়া কর্ম্মানুষ্ঠান প্রকার পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। এই কর্ম্মের কর্তৃত্ব স্বরূপতঃ আত্মার নহে, কিন্তু ইহা গুণসম্বন্ধকৃত, এবং তাহা গুণকৃত ইহা বিবেক দ্বারা জানিতে হইবে, তাহাও উক্ত হইয়াছে। এক্ষণে উক্ত হইতেছে যে, জীবাত্মা সকল পরম পুরুষেরই শরীর। এজন্য ভগবান্ই জীবগণকে কর্ম্মে নিয়মিত করেন। ভগবানে এই কর্তৃত্ব আরোপপূর্ব্বক বিহিত কর্ম্ম কর্ত্তব্য। শ্রুতিতে এই উপদেশ আছে। যথা,—

"অন্তঃ প্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানাং। (মৈত্রায়ণী, ৩।৮)। "যঃ আত্মনি তিষ্ঠন্ আত্মনো অন্তরঃ বেদ যম্ আত্মা ন বেদ যস্যাত্মা শরীরং য আত্মান-মন্তরো যময়তি স ত আত্মা অন্তর্য্যামী অমৃত—"

(বৃহদারণ্যক, ৩।৭।৩)

অতএব পরম পুরুষের শরীরভূত জীবাত্মাগণের পরমপুরুষই প্রবর্ত্তয়িতা। গীতায়ও ইহা নানাস্থানে উক্ত হইয়াছে। যথা—

"সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ ...।" (১৫।১৫)

"ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।" (১৮।৬১)

অতএব আমার (পরমেশ্বরের) শরীর হেতু আমার দ্বারা কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত আত্মার স্বরূপ অনুসন্ধান পূর্ব্বক সর্ব্ব কর্ম্ম আমা দ্বারাই কৃত এই জ্ঞানে, আমাতে কর্ম্ম সংন্যস্ত করিবে। পরমেশ্বররূপী আমার আরাধনার্থই কেবল কর্ম্ম করিতেছ, এই জ্ঞানে কর্ম্মযোগ করিবে। ফলে আশা ও কর্ম্মে মমতাবিহীন হইয়া, আমাতে কর্ম্ম সমর্পণপূর্ব্বক অনুষ্ঠান করিবে।

এই ঈশ্বরে কর্ম্মার্পণের কথা পরে (৯।২৭ শ্লোকে) উক্ত হইয়াছে। যথা—

"যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ মদর্পণম্॥"

ঈশ্বরে কর্ম্ম সমর্পণ ও ঈশ্বরার্থ কর্ম্ম করা এই দুইই পৃথক্। ঈশ্বরার্থ কর্ম্মের কথা পরে (১২।১০ শ্লোকে) উক্ত হইয়াছে। ঈশ্বরে সর্ব্ব কর্ম্ম সমর্পণ ও ঈশ্বরে সর্ব্ব কর্ম্ম সংন্যস্ত করা একই কথা। ঈশ্বর-পরায়ণ হইয়া ঈশ্বরে সর্ব্ব কর্ম্ম সংন্যস্ত করার কথাও পরে (১২।৬ শ্লোকে) উক্ত হইয়াছে। কি উপায়ে ঈশ্বরে কর্ম্ম সমর্পণ বা কর্ম্ম সংন্যস্ত করা যায়, তাহা রামানুজ উক্তরূপে বুঝাইয়াছেন।

প্রসিদ্ধ দেবীসূক্তে উক্ত হইয়াছে যে—

"ময়া সোঽন্নমত্তি যো বিপশ্যতি
যঃ প্রাণিতি যঃ শৃণোত্যুক্তম্।
অমন্তবো মান্ত উপক্ষিয়ন্তি
শ্রুধি শ্রুত শ্রদ্ধিবন্তে বদামি॥"

(ঋগ্বেদ—দেবীসূক্ত, ১০।১২৫)

অতএব জীব যে কিছু কর্ম্ম করে, তাহা সেই ভগবানের পরাশক্তি পরমা প্রকৃতি দ্বারা কৃত হয়। আহার করিবার শক্তি, আহার-পরিপাক-

শক্তি, ভ্রমণশক্তি, শ্রবণশক্তি, দর্শনশক্তি, গ্রহণশক্তি প্রভৃতি সমুদায়ই সেই ভগবানের পরা প্রকৃতির। এই তত্ত্ব জানিলে, ভগবানে সেই কর্ম্ম-সমর্পণ-বুদ্ধি হয়। আমি কর্ত্তা নহি, কোন কর্ম্ম করি না, ভগবান্‌ তাঁহারই প্রকৃতি দ্বারা আমাকে কর্ম্ম করান, এই জ্ঞান হইলে ঈশ্বরে কর্ম্ম সমর্পণ হইতে পারে।

নিরাশী—আশা ত্যাগ করিয়া (শঙ্কর)। ফল-প্রার্থনা-হীন (গিরি)। ফলে নিরাশী (রামানুজ)। নিষ্কাম (স্বামী, মধু)। প্রভুর আজ্ঞায় কর্ম্ম করিতেছি, এই জ্ঞানে তৎকর্ম্মফলে ইচ্ছাশূন্য (বলদেব)।

নির্ম্মম—'মম' ভাব যাহার নির্গত হইয়াছে সেই নির্ম্মম (শঙ্কর)। পুত্র ভ্রাতা প্রভৃতির প্রতি নির্ম্মম (গিরি)। মমতা-রহিত (রামানুজ)। কর্ম্ম ঈশ্বরার্থ ও ঈশ্বরের ফল সাধন জন্য করিতেছি, এই জ্ঞানে কর্ম্মের প্রতি মমতাশূন্য (স্বামী, বলদেব)।

যুদ্ধ কর—যুদ্ধাদি কর্ম্ম কর। সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বাত্মা স্বকীয় আত্মা দ্বারাই কর্ত্তা, স্বকীয় করণ (ইন্দ্রিয়াদি) দ্বারা তাঁহারই আরাধনা একমাত্র প্রয়োজন; হেতু স্বয়ংই আমাদের কর্ম্ম করান, আমরা তাঁহার কর্ম্মের নিমিত্ত মাত্র (১১।৩৩ শ্লোক দ্রষ্টব্য), এই জ্ঞানে কর্ম্মে মমতা-রহিত হইয়া, কর্ম্মযোগ অনুষ্ঠান কর (রামানুজ)। বর্ণ ও আশ্রম-বিহিত কর্ম্ম কর। অর্জ্জুন ক্ষত্রিয়, এজন্য যুদ্ধ তাঁহার বর্ণাশ্রমবিহিত কর্ম্ম। এ কারণ এস্থলে অর্জ্জুনকে যুদ্ধের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে (বলদেব)।

এস্থলে যুদ্ধ উপস্থিত। অর্জ্জুন যুদ্ধ করিতে অনিচ্ছুক ছিলেন, যুদ্ধকে হেয় কর্ম্ম, অবর কর্ম্ম মনে করিতেছিলেন। এজন্য এই যুদ্ধ কি ভাবে কর্ম্মযোগের অন্তর্গত করা যায়, তাহারই উপদেশ দিতেছেন।

চিত্তের সন্তাপ—(মূলে আছে—জ্বর)—সন্তাপ, শোক (শঙ্কর, গিরি, স্বামী, মধু)। পরম পুরুষকে এই কর্ম্ম দ্বারা আরাধনা করিলে অনাদি-

কাল-প্রবর্ত্তিত কর্ম্মবন্ধন হইতে মোক্ষ লাভ করিব, ইহা স্মরণপূর্ব্বক শোক মোহ হইতে মুক্ত হইয়া যুদ্ধরূপ এই কর্ম্মযোগ অনুষ্ঠান কর (রামানুজ)। জ্বর=বন্ধুবধ-নিমিত্ত সন্তাপ (বলদেব)।

অতএব আশ্রমবিহিত কর্ম্ম যে মুমুক্ষুরও কর্ত্তব্য, ইহাই এস্থলে বাক্যার্থ (বলদেব)।

এই যুদ্ধকর্ম্ম অর্জ্জুনের স্বধর্ম্ম, তাঁহার ক্ষত্রিয়বর্ণোচিত কর্ম্ম, তাঁহার স্বাভাবিক প্রবৃত্তির অনুযায়ী কর্ম্ম। নিষ্কামভাবে ঈশ্বরার্চ্চনার্থ সেই কর্ম্ম আচরণ করিলে অর্জ্জুন সিদ্ধি লাভ করিবেন, ইহাই এস্থলে উপদিষ্ট হইয়াছে। গীতায় পরে (১৮।৪-৬ শ্লোকে) উক্ত হইয়াছে,—

"যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ॥"

য়ে মে মতমিদং নিত্যমনুতিষ্ঠন্তি মানবাঃ।
শ্রদ্ধাবন্তোঽনসূয়ন্তো মুচ্যন্তে তেঽপি কর্ম্মভিঃ॥৩১

যে করে এ মত মম নিত্য অনুষ্ঠান
হ'য়ে শ্রদ্ধাবান্ আর অসূয়া-রহিত,
সেই জন মুক্ত হয় সর্ব্ব কর্ম্ম হ'তে॥ ৩১

(৩১) এ মত মম—কর্ম্ম যে কর্ত্তব্য, এই আমার মত বা অভিপ্রায় (শঙ্কর)। ভগবান্ যে সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বনিয়ন্তা সকলের পতি, ইহাই উপনিষদের সাক্ষাৎ সারভূত অর্থ। শ্রুতিতে আছে,—

তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্।
পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাৎ বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যম্॥
(শ্বেতাশ্বতর, ৬।৭)

অতএব ভগবান্ যাহা এ স্থলে উপদেশ দিয়াছেন, তাহাই শাস্ত্রার্থ (রামানুজ)।

যে নিত্য অনুষ্ঠান করে—যে নিত্য অনুবর্ত্তন করে (শঙ্কর)। যে আত্মনিষ্ঠ শাস্ত্রাধিকারী মানব তাহা অনুষ্ঠান করে (রামানুজ)।

নিত্য শব্দের দুইরূপ অর্থ হইতে পারে। এক, ইহা 'অনুতিষ্ঠন্তি' ক্রিয়ার বিশেষণ—অর্থ সর্ব্বদা। আর এক, ইহা 'মত' শব্দের বিশেষণ—অর্থ নিত্য বেদ-বোধিত হেতু অনাদি পরম্পরাগত ও আবশ্যক (মধু)। অর্থাৎ শ্রুতি-বোধিত্বহেতু অনাদিপ্রাপ্ত (বলদেব)।

ভগবানের এই মত নিত্য। জগৎ রক্ষার্থ প্রবৃত্তিমার্গে এই কর্ম্মযোগ নিত্য আচরণীয়। তাঁহার এই নিত্য মত বেদরূপ মুখে তিনি পূর্ব্বেই প্রকাশ করিয়াছেন।

শ্রদ্ধাবান্, অসূয়া-রহিত—শ্রদ্ধার সহিত, এবং আমি পরম পুরুষ বাসুদেবে অসূয়া বা দ্বেষহীন হইয়া (শঙ্কর, গিরি)। শাস্ত্রার্থে শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া, অর্থাৎ ইহা শাস্ত্রার্থ নহে, এইরূপ বুদ্ধিতে শাস্ত্রে অসূয়াযুক্ত না হইয়া (রামানুজ)। আমার বাক্যে শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া এবং দুঃখাত্মক কর্ম্মে প্রবর্ত্তন সম্বন্ধে যে দোষ-দৃষ্টি—অসূয়া,—সেই অসূয়াবিহীন হইয়া (স্বামী)। শাস্ত্রাচার্য্যোপদিষ্ট বিষয় অনুভব না হইলেও তাহা যে সত্য, এই বিশ্বাস= শ্রদ্ধা, এবং গুণে দোষ-দৃষ্টি=অসূয়া। এই কর্ম্ম দুঃখাত্মক, ভগবান্ আমাকে সেই দুঃখাত্মক কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করিতেছেন, এই ধারণায় উপদেষ্টা ভগবানের প্রতি যে অসূয়া, সেই অসূয়া যাহার নাই (মধু)। দৃঢ় বিশ্বাসী ও দোষারোপ-শূন্য (বলদেব)।

মুক্ত হয় সর্ব্ব কর্ম্ম হ'তে—ধর্ম্মাধর্ম্মাখ্য কর্ম্ম হইতে মুক্ত হয় (শঙ্কর)। তাহারা ক্রমমুক্তিফল লাভ করে (গিরি)। সর্ব্ববন্ধহেতু অনাদি-কাল-প্রারব্ধ সর্ব্ব কর্ম্ম হইতে মুক্ত হয়, ক্রমে পাপ ক্ষীণ হওয়ায় মুক্ত হয়

(রামানুজ)। এইরূপে নিষ্কাম কর্ম্মাচরণ দ্বারা ক্রমে কর্ম্মবন্ধ হইতে মুক্ত হয় (স্বামী, বলদেব)। সত্ত্বশুদ্ধি ও জ্ঞান প্রাপ্তি দ্বারা মুক্ত হয় (মধু)।

যে ত্বেতদভ্যসূয়ন্তো নানুতিষ্ঠন্তি মে মতম্।
সর্ব্বজ্ঞানবিমূঢ়াংস্তান্ বিদ্ধি নষ্টানচেতসঃ ॥৩২

কিন্তু যে অসূয়া-বশে এ মত আমার
আচরণ নাহি করে, জানিও সে জন
সর্ব্ববিজ্ঞানমূঢ়, নষ্ট, বিবেক-বিহীন ॥ ৩২

(৩২) কিন্তু যে—কিন্তু যাহারা ইহার বিপরীত-স্বভাব,—আমার এই মতের প্রতি অসূয়াপূর্ব্বক তাহার অনুবর্ত্তন না করে (শঙ্কর)। যাহারা ভগবানের এই মতের দোষ উদ্ভাবনপূর্ব্বক তাহার অনুবর্ত্তী না হয় (গিরি)। এই সর্ব্ব আত্মবস্তু (জীবাত্মা) আমার অর্থাৎ ভগবানের শরীর, এজন্য কেবল আমাদ্বারাই আমার আরাধনা শেষভূত কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত,—এই উপ-নিষৎ-প্রতিপাদ্য ভগবানের অভিপ্রায় অশ্রদ্ধাপূর্ব্বক ও অসূয়াবশে অনুষ্ঠান না করে, অর্থাৎ এই মত অনুসন্ধানপূর্ব্বক সদা কর্ত্তব্য কর্ম্ম অনুষ্ঠান না করে (রামানুজ)। ভগবানের এই মত আচরণের গুণ পূর্ব্ব শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। এই শ্লোকে তাহার আচরণ না করিলে যে দোষ, তাহা উল্লিখিত হইতেছে। যাহারা নাস্তিক, যাহারা অশ্রদ্ধাপূর্ব্বক ও দোষ উদ্ভাবনপূর্ব্বক অনুসরণ না করে (মধু)। সর্ব্বসুহৃৎ সর্ব্বেশ্বরের এই শ্রুতিরহস্যভূত মত অশ্রদ্ধাপূর্ব্বক অনুষ্ঠান না করে, পরন্তু তাহার দোষ খ্যাপন করে (বলদেব)।

সর্ব্ববিজ্ঞানমূঢ়—সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানে বিবিধরূপে মূঢ় (শঙ্কর)। সগুণ নির্গুণ ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞান,—প্রমেয় প্রমাণ প্রয়োজন বিভাগ হেতু সেই

জ্ঞানের বিবিধত্ব (গিরি)। সর্ব্ব জ্ঞান সম্বন্ধে বিশেষরূপে মূঢ়, বিপরীত জ্ঞান হেতু সর্ব্বত্র মূঢ় (রামানুজ)। সর্ব্বকর্ম্মে এবং সগুণ নির্গুণ ব্রহ্ম বিষয়ে যে জ্ঞান (স্বামী, মধু), যাহা প্রমাণ প্রমেয় প্রয়োজন বিভাগ হেতু বিবিধ, সেই জ্ঞানের সর্ব্বপ্রকারে অযোগ্য (মধু)। সর্ব্ব কর্ম্মে এবং স্বাত্মজ্ঞান ও পরমাত্মজ্ঞান বিষয়ে বিমূঢ় (বলদেব)।

নষ্ট—নাশগত (শঙ্কর)। সর্ব্বপুরুষার্থভ্রষ্ট (মধু, বলদেব)।

বিবেকবিহীন—(মূলে আছে 'অচেতসঃ')—অবিবেকী (শঙ্কর)। কার্য্যাদি বস্তুর যাথাত্ম্য-নিশ্চয়ে অভাব হেতু অচেতাঃ (রামানুজ)। বিবেক-শূন্য (স্বামী)। দুষ্টচিত্ত (মধু)। চিত্তশূন্য (বলদেব)।

সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতে র্জ্ঞানবানপি।
প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি॥৩৩

জ্ঞানী যেই—সেও নিজ প্রকৃতির মত
করে চেষ্টা; চলে জীব প্রকৃতির বশে,—
অতএব কি করিবে নিগ্রহ তাহার? ৩৩

(৩৩) নিজ প্রকৃতির মত—পূর্ব্বজন্মকৃত ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞানেচ্ছাদিজনিত যে সংস্কার বর্ত্তমান জন্মে অভিব্যক্ত হয়, তাহাই লোকের নিজ প্রকৃতি বা স্বভাব (শঙ্কর, স্বামী, মধুসূদন, বলদেব)। প্রাচীন বাসনা (রামানুজ)।

চলে জীব প্রকৃতির বশে—সকল ভূতই স্বীয় প্রকৃতির অনুসরণ করে। জ্ঞানীও যখন স্বীয় স্বীয় প্রকৃতির অনুরূপ চেষ্টা করে, তখন মূর্খের ত কথাই নাই (শঙ্কর)। সর্ব্ব প্রাণিবর্গই প্রকৃতির বশবর্ত্তী। সর্ব্বভূতই অনিচ্ছাসত্বেও স্বপ্রকৃতিসদৃশ কর্ম্মচেষ্টা প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ অনুসরণ করে। সকল ভূতই প্রকৃতির অধীন। যখন জ্ঞানিগণই

স্বপ্রকৃতির অধীন, তখন অন্যের ত কথা'ই নাই। এইরূপ উক্তিকে কৈমুতিক ন্যায় বলে (গিরি)। নিজ নিজ প্রকৃতিবিশিষ্ট জন্তুগণ অনাদিকাল-প্রবৃত্ত বাসনা দ্বারা চালিত হয়, তাহারা সেই বাসনার অনুগামী (রামানুজ)। জ্ঞানী অজ্ঞানী সর্ব্বভূতই বা সমুদায় প্রাণীই প্রকৃতিকে অনুবর্ত্তন করে (স্বামী)। সর্ব্বপ্রাণী পুরুষার্থভ্রংশের হেতুভূত হইলেও স্বপ্রকৃতিকে অনুবর্ত্তন করে (মধু, বলদেব)।

কি করিবে নিগ্রহ তাহার—আমার বা অন্যের নিষেধরূপ নিগ্রহ তাহার কি করিবে (শঙ্কর)। ভগবান্ বা তত্তুল্য কাহারও শাসনে সে প্রকৃতির নিগ্রহ কিরূপে করিবে (গিরি)। সেই প্রাচীন বাসনানুযায়ী ভূতগণের শাস্ত্রকৃত নিগ্রহ কি করিবে (রামানুজ)। প্রকৃতি বলবতী বলিয়া কিরূপে ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করিবে (স্বামী)। সে সম্বন্ধে, অর্থাৎ প্রকৃতি অনুসারে মানুষ যে কর্ম্ম করে, তাহাতে আমার বা রাজার নিগ্রহ কি করিবে, অর্থাৎ উৎকট রাগহেতু ও সমুদয় দুর্ব্বাসনার প্রাবল্যহেতু শাসনের ভয় সত্ত্বেও সে পাপ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতে পারে না (মধু)। যে সৎপ্রসঙ্গশূন্য, তাহার নিগ্রহ বা শাস্ত্রজ্ঞের নিকট দণ্ডভয় কিছুই করিতে পারে না, তাহার দুর্ব্বাসনা এত প্রবল (বলদেব)।

এই শ্লোকের অভিপ্রায় আরও পরিষ্কাররূপে বুঝিতে হইবে। শঙ্কর বলেন, অর্জ্জুন প্রশ্ন করিতে পারিতেন যে, কি কারণে লোকে ভগবানের মত অনুবর্ত্তন করে না এবং তাহার প্রতিকূল হইয়া তাঁহার আজ্ঞা-লঙ্ঘন-দোষেও ভয় পায় না—ইহার উত্তরে এই কথা বলা হইয়াছে। গিরি বলেন যে, স্বধর্ম্মের অননুষ্ঠানে বা পরধর্ম্মানুষ্ঠানে ভগবানের প্রতিকূলতা করিবার কারণ কি, তাহাই এস্থলে উক্ত হইয়াছে। রাজানুশাসনের অতিক্রম যেমন ভয়ের কারণ, ভগবৎ-শাসনের অতিক্রমও সেইরূপ দোষও ভয়ের কারণ। সর্ব্বভূত প্রকৃতির বশবর্ত্তী,—প্রকৃতির অধীন, অনিচ্ছাসত্ত্বেও সেই প্রকৃতিবশে লোকে বাধ্য হইয়া কর্ম্ম করে। এই

প্রকৃতি—বর্ত্তমান জন্মে অভিব্যক্ত পূর্ব্বজন্মকৃত ধর্ম্মাধর্ম্মাদি-সংস্কার। জ্ঞানী অজ্ঞানী সকলেই সেই প্রকৃতির অধীন। এজন্য জ্ঞানী শাস্ত্র ও উপদেশ হইতে যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া জানিতে পারেন, তাহা তাঁহার প্রকৃতি-বিরোধী হইলে আর অনুষ্ঠান করিতে পারেন না। রামানুজ বলেন,—প্রকৃতির ত্রিগুণের দ্বারা সমুদায় কার্য্য হয়। সেই প্রকৃতি পরম পুরুষেরই আয়ত্ত। এজন্য কর্ম্মযোগ—কর্ম্মযোগীর ও জ্ঞানযোগীর পক্ষে সুকর, তাহা প্রমাদশূন্য ও আত্মজ্ঞানের অনুগত—হেতু-নিরপেক্ষ, আর জ্ঞানযোগ—দুষ্কর, প্রমাদযুক্ত, শরীরধারণাদি জন্য কর্ম্মসাপেক্ষ। এজন্য জ্ঞানযোগ অপেক্ষা কর্ম্মযোগই কর্ত্তব্য, ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। জ্ঞানযোগ দুষ্কর ও প্রমাদযুক্ত কেন, তাহাই এস্থলে উক্ত হইয়াছে। স্বামী বলেন—ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করিয়া নিষ্কাম হইয়া সকলের স্বধর্ম্মাচরণ মহাফলপ্রদ হইলেও, লোকে কেন তাহা আচরণ করে না, তাহাই এই শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। মধুসূদন বলেন, রাজার ন্যায় ভগবানের শাসন অতিক্রম করার দোষ দেখিয়াও, কেন তাহা অতিক্রম করিয়া লোকে সর্ব্ব পুরুষার্থ সাধনে প্রতিকূল হয়, ইহাই এস্থলে উক্ত হইয়াছে। বলদেবও এই কথা বলেন।

অতএব এই শ্লোক হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, সর্ব্বভূতই প্রকৃতির অধীন। মানুষের সম্বন্ধেও সেই কথা। জ্ঞানী অজ্ঞানী যে কেহ, সকলেই নিজ প্রকৃতির অধীন। তাহার স্থূল সূক্ষ্ম দেহ বা ক্ষেত্রই তাহার নিজ প্রকৃতি। প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকা। এই ত্রিগুণ জন্য আমাদের চিত্তও ত্রিগুণাত্মক। ইহার মধ্যে প্রত্যেকের কোন না কোন গুণের প্রাধান্য থাকে। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, যে সত্ত্বগুণপ্রধান, তাহাকে সাত্ত্বিক লোক বলে, তাহার কর্ম্মাদি সাত্ত্বিক। যে রাজসিক লোক, তাহার কর্ম্মাদি রাজসিক; আর যে তামসিক লোক, তাহার কর্ম্মাদি তমোগুণবৃত্তিজ। এ সকল তত্ত্ব গীতায় পরে (১৪।৫-১৮ শ্লোকে) বিবৃত হইয়াছে। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ অধ্যায়ে তাহা আরও বিশেষভাবে বিস্তারিত হইয়াছে।

মানুষ যতদিন এই প্রকৃতি বা প্রকৃতিজ গুণের বশীভূত থাকে, ততদিন সেই গুণানুসারেই কর্ম্মাদির চেষ্টা করে। তাহা সে অতিক্রম করিতে পারে না, অজ্ঞানবশে বাধ্য হইয়া সে সেইরূপ কর্ম্ম করে। এজন্য ভগবান্ পরে অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন,—

"যদহঙ্কারমাশ্রিত্য ন যোৎস্য ইতি মন্যসে।
মিথ্যৈষ ব্যবসায়স্তে প্রকৃতিস্ত্বাং নিয়োক্ষ্যতি॥
স্বভাবজেন কৌন্তেয় নিবদ্ধঃ স্বেন কর্ম্মণা।
কর্ত্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যস্যবশোহপি তৎ॥
ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেহর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥ (গীতা, ১৮।৫৯-৬১)।

এই প্রকৃতি ভগবানের। ইহা তাঁহার পরাশক্তির কার্য্যরূপ। এই জন্য এই বৈষ্ণবীশক্তি পরমাপ্রকৃতি দেবী ভগবতীরূপে চণ্ডীতে উক্ত হইয়াছেন। চণ্ডীতে আছে,—

"তথাপি মমতাবর্ত্তে মোহগর্ত্তে নিপাতিতাঃ।
মহামায়াপ্রভাবেণ সংসারস্থিতিকারিণঃ॥
তন্নাত্র বিস্ময়ঃ কার্য্যো যোগনিদ্রা জগৎপতেঃ।
মহামায়া হরেশ্চৈতৎ তয়া সংমোহ্যতে জগৎ॥
জ্ঞানিনামপি চেতাংসি দেবী ভগবতী হি সা।
বলাদাকৃষ্য মোহায় মহামায়া প্রযচ্ছতি॥ (চণ্ডী, ১।৪৮।৫০)।

এই মহামায়ার মায়া হেতু জ্ঞানীরও জ্ঞান অজ্ঞানাবরিত হয়। অজ্ঞের ত, কথাই নাই। শাস্ত্রের ও আচার্য্যের উপদেশ অদৃষ্টার্থক। পরকালে কি হইবে তাহা প্রত্যক্ষের বিষয় নহে। সুতরাং ইহারা পরকালের কথা ভাবিয়া ভগবানের বা শাস্ত্রের উপদেশ অনুসরণ করিতে পারে না। যাহা হউক, রাজার আদেশ বা বিধান এবং সমাজের শাসন দৃষ্টার্থক। চুরি ধরা পড়িলে জেল হয়, ইহা প্রত্যক্ষ। তথাপি অজ্ঞ লোক প্রকৃতিজ গুণ বা

রাগদ্বেষবশে এতদূর চালিত, যে দুষ্কর্ম্মের ফল পরিণাম দুঃখ, ইহা জানিয়াও রাজার বিধান লঙ্ঘন করে। তাহাদের প্রবৃত্তি-দমন সম্বন্ধে রাজার বিধানও বিশেষ ফলদায়ক হয় না। এই অজ্ঞানীদের ন্যায় জ্ঞানীও যদি প্রকৃতির বশীভূত থাকে, তবে তাহাদের পক্ষেও শাস্ত্রের উপদেশ ব্যর্থ হয়। শাস্ত্র ও আচার্য্যের উপদেশ শুনিয়া সে যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া জানিতে পারে, স্বপ্রকৃতিজ রাগদ্বেষবশে সে যখন পরিচালিত হয়, তখন সে কর্ত্তব্যের অনুষ্ঠান করিতে পারে না। এই রাগ দ্বেষ দ্বারা তাহার কর্ত্তব্য বুদ্ধি আবরিত হইয়া যায়। সে অবশ হইয়া স্বপ্রকৃতি দ্বারা চালিত হয়। রাগদ্বেষবশে লোকে কিরূপে কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত হয়, তাহা দ্বিতীয় অধ্যায়ের ব্যাখ্যার শেষে বিবৃত হইয়াছে। এইজন্য এই সকল লোকের সম্বন্ধে শাস্ত্রের উপদেশ বৃথা হয়। ভগবান্ স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া তাহাদের অনুকম্পার্থ ধর্ম্মোপদেশ দিতেছেন, ইহা জানিয়াও তাহারা স্বপ্রকৃতিবশে তৎ পালনে অসমর্থ হয়। এজন্য ভগবান্ এই প্রকৃতিকে বশীভূত করিবার উপদেশ দিতেছেন। প্রকৃতি অর্থাৎ ইন্দ্রিয় মন, অহঙ্কার যখন সম্পূর্ণ বশীভূত হয়, যখন জ্ঞান শুদ্ধ নির্ম্মল সাত্ত্বিক হয়, তখন ভগবানের মতানুযায়ী কার্য্য সম্ভব হয়। প্রথমে প্রকৃতিকে নির্ম্মল করিতে হয়। তামসিক প্রকৃতিকে রাজসিক করিতে হয় এবং রাজসিক প্রভৃতিকে সাত্ত্বিক করিতে হয়। কাম, ক্রোধ, লোভ, বাসনা, মমতা, অহন্তা সকলকে ক্রমে প্রকৃতির সাহায্যেই বলি দিতে হয়, তবে প্রকৃতি নির্ম্মল হয়—মুক্তিহেতু হয়। এ সকল তত্ত্ব গূঢ়ভাবে চণ্ডীতে উপদিষ্ট হইয়াছে। পরের কয় শ্লোকে এস্থলে তাহাই উক্ত হইয়াছে।

ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ।
তয়োর্ন বশমাগচ্ছেৎ তৌ হ্যস্য পরিপন্থিনৌ ॥ ৩৪

আছে প্রতি ইন্দ্রিয়ের আপন বিষয়ে
রাগ দ্বেষ ব্যবস্থিত ; তাহাদের বশ
নাহি হ'ও,—প্রতিকূল তাহারা ইহার ॥ ৩৪

(৩৪) প্রতি ইন্দ্রিয়ের আপন বিষয়ে—সর্ব্বইন্দ্রিয়ের শব্দাদিবিষয়ে। যে কোন বস্তু আমাদের প্রত্যক্ষ হয়, চক্ষু তাহার রূপ বর্ণ ও আকার গ্রহণ করে, কর্ণ তাহার শব্দ গ্রহণ করে, নাসিকা তাহার ঘ্রাণ গ্রহণ করে, জিহ্বা তাহার রস গ্রহণ করে এবং ত্বক্ তাহার স্পর্শ অনুভব করে। প্রকৃতি সাত্ত্বিক হইলে, সুদৃশ্য, সুশব্দ, সদ্গন্ধ, মধুর রস ও শীতল ও কোমল স্পর্শ গ্রহণে সুখানুভব করে। প্রকৃতি রাজসিক হইলে অসুভদৃশ্য, কর্কশ শব্দ তীব্র গন্ধ, কটু তিক্ত রস, কঠিন ও রুক্ষ স্পর্শ সুখকর বোধ হয়। প্রকৃতি তামসিক হইলে কুদৃশ্য, কুশব্দ মন্দ গন্ধ, কষায়াদি রস ও অপবিত্র স্পর্শ সুখজনক হয়। (১৪ অধ্যায়ে ১১—১৩ শ্লোক ও তাহার ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)। বৃহদারণ্যক উপনিষদে (১।৩ ব্রাহ্মণে) আছে যে, দেবগণ ও অসুরগণ উভয়ে আমাদের অন্তরে প্রবিষ্ট আছেন। দেবগণ আমাদিগকে কল্যাণ আঘ্রাণ করান, কল্যাণ দর্শন করান, কল্যাণ শ্রবণ করান, কল্যাণ সংকল্প করান ; আর অসুরগণ পাপ আঘ্রাণ করায়, পাপ দর্শন করায়, পাপ শ্রবণ করায়, পাপ সংকল্প করায়। (ছান্দোগ্য-উপনিষদ্ ১।২ ও দ্রষ্টব্য)।

রাগ দ্বেষ ব্যবস্থিত—ইষ্ট শব্দাদি বিষয়ে রাগ বা অনুরাগ ও অনিষ্ট বিষয়ে দ্বেষ। ইহা অবশ্যম্ভাবী (শঙ্কর)। বিষয়ের এইরূপ দুই ভাগ ব্যবস্থিত আছে, এই রাগ দ্বেষ দ্বারাই লোকে প্রকৃতির বশবর্ত্তী হয় (গিরি)।, শ্রোত্রাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের শব্দাদি বিষয়ে এবং বাগাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়ের বচনাদি বিষয়ে প্রাচীন বাসনাজনিত তত্তৎ অনুবুভূষারূপে বর্জ্জনীয় রাগ ব্যবস্থিত এবং তাহার অনুভবে প্রতিহত হইলে অবর্জ্জনীয় দ্বেষ ব্যবস্থিত আছে,

(রামানুজ)। অনুকূল বিষয়ে রাগ ও প্রতিকূল বিষয়ে দ্বেষ, ইহা অবশ্যম্ভাবী (স্বামী)। জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় এই সর্ব্ব ইন্দ্রিয়ের যে বিষয়, তাহা অনুকূল হইলে, শাস্ত্রনিষেধ সত্ত্বেও রাগ এবং শাস্ত্রবিহিত হইলেও প্রতিকূল বিষয়ে দ্বেষ বা বিরাগ ইহা আনুকূল্য-ব্যবস্থা দ্বারা স্থিত (মধু, বলদেব)।

এই তত্ত্ব পূর্ব্বে ২।৬৪ শ্লোকের ব্যাখ্যায় ও দ্বিতীয় অধ্যায়ের ব্যাখ্যা-শেষে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। আমরা দেখিয়াছি যে, স্বভাবতঃ আমাদের সুখকর বিষয়ে অনুরাগ ও দুঃখকর বিষয়ে বিরাগ হয়। জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা আমরা শব্দাদি যে কোন বিষয় আহরণ বা অনুভব (perceive) করি না কেন, এবং কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা আমরা যে কোন বিষয় ত্যাগ বা গ্রহণ করি না কেন,—তাহাতে আমাদের মন আকৃষ্ট হয়। মন আকৃষ্ট না হইলে, বিষয় গ্রহণ সম্ভব হয় না। এইজন্য মন আমাদের একাদশ ইন্দ্রিয়। অনাদিকালপ্রবৃত্ত প্রাচীন বাসনা আমাদের বৃত্তিকে যেরূপ সংগঠিত করিয়াছে, তদনুসারে অর্থাৎ আমাদের নিজ স্বভাবানুসারে সেই সকল বিষয়ে অনুরাগ বা বিরাগ উৎপন্ন হয়। এবং তদনুসারে যাহাতে অনুরক্ত হই, তাহা পাইতে চেষ্টা করি, ও যাহাতে বিরক্ত হই, তাহা ত্যাগ করিতে চেষ্টা করি। এই চেষ্টাফলে আমরা সাধারণতঃ কর্ম্ম করি।

তাহাদের বশ নাহি হ'ও—এই রাগদ্বেষের বশীভূত হইও না (শঙ্কর)। যেহেতু রাগদ্বেষ স্বধর্ম্ম ত্যাগ করাইয়া পরধর্ম্মের অনুবর্ত্তী করে, অথবা জ্ঞানযোগ-সাধকের ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ-চেষ্টা ব্যর্থ করে, এজন্য এই জ্ঞানযোগ আরম্ভ করিয়া রাগদ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া যেন বিনষ্ট হইও না (রামানুজ)। ভূতগণের এই রাগদ্বেষানুযায়ী প্রবৃত্তি হইলেও, তাহাদের বশবর্ত্তী হইও না (স্বামী)।

এস্থলে কথা হইতে পারে যে, যদি জ্ঞানী পর্য্যন্ত সকলেই স্বপ্রকৃতির

বশবর্ত্তী, সকলে স্বপ্রকৃতির অনুযায়ী কর্ম্ম করিতে প্রকৃতিবশে বাধ্য, তবে বিধিনিষেধ-শাস্ত্রের ফল কি? (গিরি)। ফল আছে, কেন না, আমাদের পুরুষকার আছে। পূর্ব্বে প্রকৃতির কার্য্য দেখাইয়া, এস্থলে পুরুষকারের স্বরূপ বুঝান হইতেছে (শঙ্কর)। প্রকৃতি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ে রাগ-দ্বেষ উৎপাদন করাইয়া পুরুষকে কার্য্যে প্রবৃত্ত করায়। পুরুষকার-বলে সেই রাগ-দ্বেষকে বশ করিতে হইবে। এই রাগ-দ্বেষের বশেই লোকে স্বধর্ম্ম ত্যাগ করে, পরধর্ম্ম অনুষ্ঠান করে (শঙ্কর), শাস্ত্রনিষিদ্ধ বিষয় আপাততঃ ইষ্টকর মনে করিয়া তাহাতে অনুরক্ত হয়, ও শাস্ত্রবিহিত বিষয় আপাততঃ কষ্টকর বা অনিষ্টকর ভাবিয়া তাহাতে বিরক্ত হয় (মধুসূদন)। কেবল শাস্ত্রীয় বিবেক-জ্ঞান প্রবল হইলে, পুরুষ স্বাভাবিক অনুরাগ-বিরাগ দমন করিয়া প্রকৃতির বিপরীত পথে—শাস্ত্রবিধি অনুসারে প্রবৃত্ত হইতে পারে (মধুসূদন)। বলদেব বলেন যে, যখন কেবল শাস্ত্রের নিষেধ দৃষ্টি করিয়া মনের স্বাভাবিক অনুকূল বিষয়ে লোকের বিরাগ জন্মাইতে পারে ও শাস্ত্রবিধি হেতু মনের প্রতিকূল বিষয়ে অনুরাগ জন্মাইতে পারে, তখন বিধিনিষেধ-শাস্ত্র ব্যর্থ নহে। ইহা আমাদের প্রবৃত্তি দমনের অনুকূল।

প্রকৃতিজ শরীর বা ক্ষেত্র ও আত্মা এই উভয়ের সংযোগে জীবাত্মা সংগঠিত। ইহার মধ্যে প্রকৃতি যখন আত্মাকে বশীভূত রাখে, তখন মানুষ বাসনার অধীন হইয়া প্রকৃতিবশে চালিত হয়। ইংরাজী কথায় তখন সে necessity বশে চালিত হয়। কিন্তু আত্মা যখন প্রকৃতিকে বশীভূত করিতে পারে, বাসনা দমন করিতে পারে, বা denial of the will শিক্ষা করে, তখন সে তাহার free will এর বলে আর necessity বা অনাদিকালপ্রবর্ত্তিত বাসনার অধীন থাকে না। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে, আত্মার ধর্ম্ম নিবৃত্তি, আর পশ্বাদি-জীব-ধর্ম্ম প্রবৃত্তি। এই তত্ত্বের দ্বারা আধুনিক দর্শনের free will ও necessity বাদের সামঞ্জস্য হইতে পারে।

যাহা হউক, শঙ্করাচার্য্য যে এ স্থলে পুরুষকারের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা আমাদের সংক্ষেপে বুঝিতে হইবে। যদি জ্ঞানবান্ বা বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিও নিজ প্রকৃতি দ্বারা চালিত হয়, তবে পুরুষকারের স্থান কোথায়? কিরূপে মানুষ রাগদ্বেষের অধীনতা হইতে মুক্ত হইবে? ভগবান্ এ স্থলে রাগদ্বেষের বশবর্ত্তী না হইবার উপদেশ দিয়াছেন, কিন্তু কিরূপে এই রাগ দ্বেষের অধীনতা-শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হওয়া যায়, তাহা এস্থলে বুঝান নাই। পরে অর্জ্জুনের প্রশ্নে তাহা বুঝাইয়াছেন,—পূর্ব্বাধ্যায়েও কিরূপে মন ও ইন্দ্রিয়গণকে নিগ্রহ করিতে হইবে, তাহার ইঙ্গিত করিয়াছেন। মানুষ এই ইন্দ্রিয় ও মনকে নিগৃহীত করিতে পারে বলিয়া, ও রাগ দ্বেষ কাম ক্রোধ লোভ প্রভৃতিকে দমন করিতে পারে বলিয়াও অবশ্য বলিতে হইবে যে, তাহার পুরুষকার আছে।

কিন্তু ভগবান্ বলিয়াছেন যে, জ্ঞান হইলে—অর্থাৎ প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেক-জ্ঞান হইলে পুরুষ আপনাকে অকর্ত্তা বলিয়া জানিতে পারে। যে ত্রিগুণাতীত হয়, সে গুণকে গুণে প্রবর্ত্তিত দেখিয়াও বিচলিত হয় না, আপনার অকর্ত্তা-স্বরূপে অবস্থান করে। (পরে চতুর্দ্দশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। অতএব পুরুষ অকর্ত্তা হইলে, তাহার পুরুষকার বা স্বরূপে কর্ত্তৃত্ব কোথায়? আমরা পরে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, পুরুষ আপনাকে প্রকৃতি হইতে ভিন্ন জানিলে প্রকৃতিজ গুণকৃত কর্ম্ম যে তাহার কর্ম্ম, এই-রূপ ভ্রান্ত কর্ত্তৃত্ববোধ তাহার থাকে না। এই প্রকৃতির বা নিজের চিত্তের সহিত তাহার আত্মাধ্যাস না থাকিলে, সে তখন স্বপ্রকৃতিকে নিয়মিত করিবার যোগ্য হয়। সে প্রকৃতিকে প্রকৃতির দ্বারাই নিয়মিত করে। প্রকৃতি ভগবানের পরাশক্তি। পুরুষ ভগবানের স্বরূপ বলিয়া, তাহার সংসৃষ্ট প্রকৃতিও মূলতঃ তাহার পরাশক্তি। এই শক্তি দুইরূপ—প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি-রূপ। ভগবান্ জগৎ সৃষ্টির পরে সর্ব্বভূতকে এই প্রবৃত্তিধর্ম্ম গ্রহণ

করান, এবং মুক্তির জন্য নিবৃত্তিধর্ম্ম গ্রহণ করান। এই প্রবৃত্তিকে ব্যুত্থানশক্তি বলে, আর নিবৃত্তিকে নিরোধশক্তি বলে। যাহার প্রকৃতি শুদ্ধ সাত্ত্বিক ও নির্ম্মল, তাহার এই নিরোধ শক্তির বিকাশ হয়। সেই সাত্ত্বিক প্রকৃতি জ্ঞানস্বভাব, সুখস্বভাব ও প্রকাশস্বভাব। তাহা প্রবল হইলে রাজসিক ও তামসিক প্রকৃতি পরাভূত হয়। রাগ দ্বেষ মোহ অজ্ঞান প্রভৃতি এই রাজসিক ও তামসিক প্রকৃতির কার্য্য। সাত্ত্বিক প্রকৃতি প্রবল হইলে রাগদ্বেষপ্রবৃত্তিকে নিরোধশক্তি দ্বারা নিরুদ্ধ করা যায়। অর্জ্জুন দৈবী প্রকৃতিসম্পন্ন। এজন্য ভগবান্ তাঁহাকে রাগদ্বেষ সংযত করিবার উপদেশ দিয়াছেন।

পুরুষের নিরোধশক্তি আছে বলিয়া সেই শক্তির বিকাশ হইলে তাহার পুরুষকারের বিকাশ হয় বলা যায়। চিত্ত শুদ্ধ, সাত্ত্বিক ও নির্ম্মল হইলে, তাহা পুরুষের প্রতিবিম্ব গ্রহণ করিয়া, এই নিরোধশক্তির বিকাশ করে। অতএব যতদিন প্রকৃতি শুদ্ধ নির্ম্মল না হয়, নিরোধশক্তির বিকাশ না হয়, ততদিন সে প্রকৃতির দাস থাকে, সে রাগদ্বেষবশে চালিত হয়। সে অবস্থায় প্রকৃতি স্বয়ং ক্রম আপূরিত হইয়া ক্রমশঃ তমঃ ও রজোগুণকে অভিভূত করিয়া সাত্ত্বিক হয়। প্রকৃতি সাত্ত্বিক হইলে রাগদ্বেষ ক্রমশঃ সম্পূর্ণ বশীভূত হয়। সত্ত্বগুণ বিকাশে রজঃ ও তমোগুণবৃত্তি অভিভূত হয়।

তাহার পূর্ব্বে প্রকৃতিকে ক্রমশঃ সাত্ত্বিক করিবার জন্য শাস্ত্র প্রকৃতিমার্গে নানারূপ কর্ম্মানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। মানুষ স্বর্গাদি-কামনাবশে রাগদ্বেষবশে প্রথম সেই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। তাহাতেই তাহার চিত্তমল ক্রমে দূর হইতে থাকে। ক্রমে চিত্ত নির্ম্মল ও সাত্ত্বিক হইলে, মানুষ নিষ্কামভাবে কর্ত্তব্যবোধে সে কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিতে পারে।

প্রকৃতি সাত্ত্বিক হইলে, পুরুষ আপনার নির্ম্মল চিত্তদর্পণে আপনার স্বরূপ দেখিতে পায়,—প্রকৃতি হইতে আপনার পার্থক্য ও প্রকৃতির কর্তৃত্বে আপনার অকর্তৃত্ব জানিতে পারে। তখন সে ত্রিগুণাতীত হইয়া

প্রকৃতিকে সম্পূর্ণ বশীভূত করিতে পারে। আর সে কখন রাগ দ্বেষের অধীন হয় না।

সাত্ত্বিক প্রকৃতিসম্পন্ন লোকের প্রতিই গীতায় উপদেশ সার্থক। ভগবান্ তাহাদিগকে পুরুষকার-বলে স্বপ্রকৃতিকে বশীভূত করিয়া সেই পুরুষকার-দ্বারা, পরম পুরুষার্থ লাভ জন্য কর্ম্মযোগ জ্ঞানযোগ ভক্তিযোগ সাধনার উপদেশ দিয়াছেন। তাহারা প্রথমে রাগদ্বেষ পুরুষকার দ্বারা সংযত করিতে চেষ্টা করিবে, রাগদ্বেষাদি মূলক ইন্দ্রিয় ও মনের প্রবৃত্তিকে দমন করিবে, নিষ্কাম নিরহঙ্কার আত্মরাম হইবে। তবে গীতোক্ত উপদেশে তাহাদের অধিকার হইবে। ভগবান্ অর্জ্জুনকে কর্ম্মযোগ সাধন জন্য পুনঃ পুনঃ রাগ দ্বেষ কাম ক্রোধাদি জয় করিবার উপদেশ দিয়াছেন।

এই রাগদ্বেষকে বশ করিবার প্রথম ও প্রধান উপায় শাস্ত্রবিহিত স্বধর্ম্মাচরণ। ইহাই পর শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে। (পরে ১৬।২৩ শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

প্রতিকূল তাহারা ইহার—এই রাগদ্বেষই পুরুষের শ্রেয়োমার্গে বিঘ্নকারী (শঙ্কর) রাগ দ্বেষ সকলের পক্ষেই দুর্জ্জয় শত্রু। তাহারা আত্মজ্ঞানাভ্যাসের বিরোধী (রামানুজ)। তাহারা মুমুক্ষুর প্রতিপক্ষ। বিষয় স্মরণাদি হইতে রাগদ্বেষ উৎপন্ন হইয়া পুরুষকে অতি গম্ভীর অনর্থে প্রবর্ত্তিত করে, শাস্ত্র সেই রাগদ্বেষের প্রতিবন্ধক পরমেশ্বর-ভজনাদিতে প্রবর্ত্তিত করে এবং তাহা দ্বারা বিষয়ের প্রতি রাগদ্বেষের নিবৃত্তি করায়। অতএব স্বাভাবিক পশু প্রকৃতি ত্যাগ করিয়া ধর্ম্মে প্রবর্ত্তিত হওয়াই কর্ত্তব্য (স্বামী)। শাস্ত্র-বেদনীয় অদৃষ্টার্থ বিষয়ে রাগ বা দ্বেষ ক্ষীণ, আর প্রত্যক্ষত-দৃষ্টার্থে রাগ দ্বেষ প্রবল। এজন্য লোকে ইষ্টকর শাস্ত্রোপদেশ ত্যাগ করিয়া পরিণামে অনিষ্টকর হইলেও, আপাতত ইষ্টকর লৌকিক বিষয়ে প্রবর্ত্তিত হয়। এইজন্য রাগদ্বেষজনিত প্রবৃত্তি অনিষ্টকর। বিবেক-বৈরাগ্য দ্বারা সেই রাগদ্বেষ দমন করিতে হয়। এই স্বাভাবিক দোষ হেতু রাগদ্বেষ

এই রাগদ্বেষাদি প্রবৃত্তিকে আসুরী প্রবৃত্তি বলে, তাহা বড় বলবান্। আর শাস্ত্রীয় কর্ম্মপ্রবৃত্তিকে দৈবী প্রকৃতি বলে,তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে এই দেবাসুর সংগ্রাম বা কুপ্রবৃত্তি ও সুপ্রবৃত্তি-সংগ্রাম নিয়ত চলিতেছে। ছান্দোগ্য উপনিষদে ও বৃহদারণ্যক উপনিষদে এই দেবাসুর-যুদ্ধের কথা বিবৃত আছে—

"দেবাসুরা হবৈ যত্র সংযত্তিরে" (১।২।১)।

ইহার ব্যাখ্যায় শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—

"দেবা দীব্যতে র্দ্যোতনার্থত্বাৎ শাস্ত্রোদ্ভাসিতা ইন্দ্রিয়বৃত্তয়ঃ। অসুরা স্তদ্বিপরীতাঃ। স্বে স্বে বাসুষু বিষ্বক্‌বিষয়াসু প্রাণনক্রিয়াসু রমণাৎ স্বাভাবিক্য স্তম আত্মিকা ইন্দ্রিয়বৃত্তয় এব। * * সংগ্রামং কৃতবন্তঃ, ... শাস্ত্রীয় প্রকাশ বৃত্ত্যভিভবায় প্রবৃত্তাঃ স্বাভাবিক্য স্তোরূপা ইন্দ্রিয়বৃত্তয়োঽসুরাঃ। তথা তদ্বিপরীতাঃ শাস্ত্রার্থবিষয়বিবেকজ্যোতি-রাত্মনো দেবাঃ স্বাভাবিক্য স্তমোরূপাসুরাভিভবনায় প্রবৃত্তা। ইত্যন্যো-ন্যাভিভবোদ্ভবরূপঃ সংগ্রাম ইব সর্ব্বপ্রাণিষু প্রতিদেহং দেবাসুরসংগ্রামো-ঽনাদিকালপ্রবৃত্তঃ।"

কিরূপে এই দেবাসুর-সংগ্রামে পরা প্রকৃতি মহা দেবীর সহায়ে আসুরী প্রকৃতির দমন হইয়া শাস্ত্রোদ্ভাসিত ইন্দ্রিয়াদি বৃত্তি বা দৈবী প্রকৃতির ক্রম বিকাশ হয়, সেই অতি গূঢ়তত্ত্ব চণ্ডীতে গুহ্যভাবে বিবৃত আছে। অতএব যখন মানুষ আসুরী প্রকৃতির অভিভব হেতু দৈবী প্রকৃতি লাভ করে, তখন সে স্বাভাবিক রাগদ্বেষের বশীভূত থাকে না। ভগবান্ তাহা-দের প্রতিই এই উপদেশ দিয়াছেন।

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ ॥ ৩৫

ভালরূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম্ম হ'তে
বিগুণ স্বধর্ম্ম ভাল ; স্বধর্ম্মে থাকিয়া
মরণ (ও) মঙ্গল—পরধর্ম্ম ভয়ানক ॥ ৩৫

(৩৫) স্বধর্ম্ম—বর্ণধর্ম্ম ও আশ্রমধর্ম্ম (মধুসূদন)। বেদবিহিত বর্ণ ধর্ম্ম (বলদেব) (গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৩১ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য)।

রামানুজ বলেন, স্বধর্ম্মভূত কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কেহ কেহ স্বধর্ম্ম অর্থে আত্মধর্ম্ম বুঝেন। ইহা অসঙ্গত।

বিগুণ—বিগত গুণ (শঙ্কর)। কিঞ্চিৎ অঙ্গহীন (স্বামী)। প্রমাদগর্ভ প্রকৃতিসংসৃষ্ট বলিয়া দুঃশক্য (রামানুজ)।

ভালরূপে অনুষ্ঠিত পর ধর্ম্ম—সদ্‌গুণের দ্বারা সম্পাদিত পরধর্ম্ম (শঙ্কর)। রাগ ও দ্বেষ প্রযুক্ত লোকে শাস্ত্রার্থেরও অন্যথা করে, এবং পর ধর্ম্মকে ধর্ম্ম বলিয়া অনুষ্ঠান করে (শঙ্কর)। অর্জ্জুন স্বীয় বর্ণ ধর্ম্ম যে যুদ্ধ, তাহা দুঃখ ও ক্লেশকর মনে করিতেছিলেন। এবং ভিক্ষাদি-লক্ষণ পরিব্রাজকের ধর্ম্ম সুকর, এজন্য তাহাই কর্ত্তব্য মনে করিতে-ছিলেন। এই জন্য একথা উক্ত হইয়াছে (গিরি)। কর্ম্মযোগ বিগুণ হইলেও,অর্থাৎ প্রকৃতি সংসৃষ্টহেতু প্রমাদ যুক্ত হইলেও এবং দুঃখে আচরণীয় হইলেও পরধর্ম্মভূত জ্ঞানযোগ অপেক্ষা শ্রেয় (রামানুজ)। যুদ্ধাদি স্বধর্ম্ম দুঃখকর ও ভালরূপে অনুষ্ঠান যোগ্য না হইলেও এবং অহিংসাদি পরধর্ম্ম সুকর হইলেও, স্বধর্ম্মই শ্রেয়। পরধর্ম্ম সর্ব্বাঙ্গ পূর্ণ করিয়া অনুষ্ঠিত হইলেও কিঞ্চিৎ অঙ্গহীন স্বধর্ম্মও তাহা অপেক্ষা শ্রেয় (স্বামী)।

মধুসূদন বলেন, স্বাভাবিক রাগ দ্বেষাদি পাশবিক প্রবৃত্তি দমন করিয়া শাস্ত্রীয় কর্ম্মই যদি কর্ত্তব্য হয়, তবে শাস্ত্রীয় কর্ম্ম মধ্যে যাহাসুকর, তাহাই আচরণ করিব না কেন,—কেন সুকর ভিক্ষাশনাদির পরিবর্ত্তে দুঃখকর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব,—অর্জ্জুনের এ প্রশ্ন হইতে পারে বলিয়া

এই কথা উক্ত হইয়াছে। যে বর্ণ ও যে আশ্রমের বিহিত যে ধর্ম্ম উক্ত হইয়াছে, তাহাই সে বর্ণাশ্রমীর স্বধর্ম্ম। সেই ধর্ম্ম বিগুণ হইলেও, সর্ব্বাঙ্গপূর্ণ পরধর্ম্ম আচরণ অপেক্ষা শ্রেয়। বেদে যে বর্ণের ও যে আশ্রমের যে ধর্ম্ম উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহাই সে বর্ণ ও সে আশ্রমীর স্বধর্ম্ম। বলদেবও এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি আরও বলেন যে, বেদাতিরিক্ত অন্য কোন প্রমাণ দ্বারা ধর্ম্ম কি, তাহা জানা যায় না। স্বধর্ম্ম সম্বন্ধে বেদই প্রমাণ। বল্লভ সম্প্রদায় অনুযায়ী অর্থ এই যে, স্বধর্ম্ম অর্থাৎ ভগবদ্ধর্ম্ম অঙ্গাদি-ভাবরহিত হইলেও, সুষ্ঠু প্রকারে অনুষ্ঠিত পরধর্ম্ম অর্থাৎ মোহক ধর্ম্ম অপেক্ষা উত্তম। ভগবদ্ধর্ম্ম অর্থাৎ ভগবদ্ভক্ত ধর্ম্ম।

যাহা হউক, এই স্বধর্ম্ম যে স্বীয় বর্ণাশ্রম বিহিত ধর্ম্ম, ও পরধর্ম্ম যে অপর বর্ণ ও আশ্রমের ধর্ম্ম, তাহা গীতা হইতেই জানা যায়। পূর্ব্বে (২।৩১ শ্লোকে) ভগবান্ অর্জ্জুনকে স্বধর্ম্ম বুঝাইতে গিয়া বলিয়াছেন—

"ধর্ম্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োঽন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে।"

মরণ (ও) মঙ্গল—এস্থলে যুদ্ধে মরণের আভাস আছে (স্বামী)। বলদেব বলেন, প্রত্যবায়ের অভাবে ও পরজন্মে ধর্ম্মাচরণ সম্ভব হইবে বলিয়া মঙ্গল। রামানুজ বলেন, এ জন্মে কর্ম্মের ফলে জ্ঞান-প্রাপ্তি না হইলেও, অন্য জন্মে অধিকতর ব্যাকুল হইয়া কর্ম্মযোগ করিতে পারিবে বলিয়া তাহা শ্রেয়। মধুসূদন বলেন, যুদ্ধে মরিলে ইহলোকে কীর্ত্তি ও পরলোকে স্বর্গ হইবে, এ জন্য মরণও মঙ্গল। স্বর্গপ্রাপ্তির কারণ বলিয়া শ্রেয় (স্বামী)। পরধর্ম্মে অবস্থিত হইয়া জীবন ধারণ করা অপেক্ষা শ্রেয় (শঙ্কর)। প্রত্যবায়ের অভাবে শ্রেয় ও পরজন্মে ধর্ম্মাচরণ সম্ভব হেতু ইষ্টসাধক (বলদেব)।

এস্থলে যখন শ্রেয় শব্দের উল্লেখ আছে, তখন 'মরণে স্বর্গলাভাদি ফল জন্য' শ্রেয়ত্ব উক্ত হয় নাই। কর্ম্মযোগে স্বধর্ম্ম আচরণে যে আত্ম-

জ্ঞান দ্বারা পরিণামে মুক্তি হয়, তাহাই উক্ত হইয়াছে। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে—

"স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ।" ২।৪০

ভয়ানক—নরকাদি লক্ষণ ভয়ের কারণ (শঙ্কর, স্বামী ও মধুসূদন)। অনিষ্টজনক (বলদেব)। অজ্ঞানীর জ্ঞানযোগ প্রমাদপূর্ণ বলিয়া ভয়ানক (রামানুজ)। রামানুজ এই শ্লোকের যে অর্থ করেন, তাহা বড় সঙ্গত নহে।

স্বধর্ম্ম শ্রেয় ও পরধর্ম্ম ভয়াবহ কেন? স্বধর্ম্ম অর্থে স্বীয় গুণানুযায়ী কর্ম্ম। ইহা পূর্ব্বে (২।৩১ শ্লোকের ব্যাখ্যায়) উক্ত হইয়াছে। আর পরধর্ম্ম তাহার বিপরীত। যে ক্ষত্রিয়, তাহার তেজ বীর্য্য বিক্রম ঈশ্বর-ভাব স্বাভাবিক। অতএব এই সকল গুণানুসারে, প্রজা পালন, প্রজা-শাসন, ও প্রজা রক্ষার্থ যুদ্ধাদি কর্ম্ম তাহার স্বাভাবিক। ক্ষত্রিয় স্বপ্রকৃতি-বশে এই কর্ম্মে স্বতঃই রত হয়। লোকে স্বীয় স্বভাবজ কর্ম্ম দ্বারা নিবদ্ধ থাকে (১৮।৬০)। এই জন্য ভগবান্ পরে বলিয়াছেন যে, এই স্বাভাবিক কর্ম্মই সহজ।

"সহজং কর্ম্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ।" (গীতা ১৮।৪৮)।

এইজন্যই ক্ষত্রিয়ের পক্ষে যে কর্ম্ম তাহার প্রকৃতির অনুযায়ী, যাহা তাহার স্বাভাবিক কর্ম্ম ও যে কর্ম্ম সেইজন্য সহজ, তাহাই শাস্ত্রানুসারে তাহার পক্ষে বিহিত হইয়াছে। (১৮।৪৩ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। অন্য বর্ণ সম্বন্ধেও সেই কথা।

এই স্বধর্ম্ম কর্ত্তব্যবোধে নিষ্কামভাবে তপঃ ও ঈশ্বরার্চ্চনা বুদ্ধিতে আচরণ করিলে, তাহাতে কর্ম্মবন্ধন হয় না।

পরধর্ম্ম স্বাভাবিক নহে, সহজ নহে, তাহা নিষ্কামভাবেও আচরণ করা যায় না। কামনা-চালিত না হইলে কেহ স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া পর-ধর্ম্ম গ্রহণ করে না। সুতরাং সে কর্ম্মে বন্ধন অনিবার্য্য। এজন্য ভগবান্

স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া পরধর্ম্ম গ্রহণ করা এত দোষাবহ ও ভয়াবহ বলিয়াছেন।

ইহা প্রত্যেক ব্যক্তির নিজের সম্বন্ধে কথা। ইহা ব্যতীত সমাজের কথা ভাবিয়া লোকসংগ্রহের কথা ভাবিয়া প্রত্যেকের স্বধর্ম্মাচরণ কর্ত্তব্য। আমি ব্রাহ্মণ হইয়া যদি ক্ষত্রিয়াদির কর্ম্ম গ্রহণ করি, তুমি ক্ষত্রিয় হইয়া যদি বৈশ্য বা শূদ্রের কর্ম্ম কর, তিনি শূদ্র হইয়া যদি ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম গ্রহণ করেন, অথবা বৈশ্য বা শূদ্রের মধ্যে যে কর্ম্মবিভাগ আছে, তাহাতেও যদি একের কর্ম্ম অন্যে করিতে যায়, কর্ম্মকারের কর্ম্ম যদি স্বর্ণকার বা সূত্রধর করিতে যায়, তবে সমাজে ঘোর বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। পরস্পরের মধ্যে ঘোর প্রতিযোগিতা আসে, পরস্পর বিদ্বেষভাব প্রবল হয়, উৎকট জীবনসংগ্রাম আরব্ধ হয়, সমাজ ধ্বংসের মুখে অগ্রসর হয়। ইহাকেই ভগবান্ পূর্ব্বে সঙ্করোৎপত্তির কারণ, ও প্রজার উৎসন্ন যাইবার হেতু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

অতএব পরধর্ম্ম গ্রহণ যেমন নিজের পক্ষে ভয়াবহ, তেমনি সমাজের পক্ষেও ঘোর অনিষ্টকর। একথা অন্য স্থলে আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। এখানে তাহা বিবৃত করা নিষ্প্রয়োজন।

অর্জ্জুন উবাচ।

অথ কেন প্রযুক্তোঽয়ং পাপং চরতি পূরুষঃ।
অনিচ্ছন্নপি বার্ষ্ণেয় বলাদিব নিয়োজিতঃ॥ ৩৬

অর্জ্জুন—

বল হে বার্ষ্ণেয়! নাহি ইচ্ছা, তবু যেন
কার প্রেরণায়—হ'য়ে আকৃষ্ট সবলে
নিয়োজিত হয় নর পাপ আচরণে? ৩৬

(৩৬) বার্ষ্ণেয়—বৃষ্ণিবংশোদ্ভূত শ্রীকৃষ্ণ। বৃষ্ণিবংশ যদুবংশেরই এক শাখা (স্বামী)।

নাহি ইচ্ছা তবু—স্বয়ং অনিচ্ছুক হইলেও (শঙ্কর)। জ্ঞানযোগ সাধনায় প্রবৃত্ত পুরুষ স্বয়ং বিষয়ানুভব করিতে ইচ্ছা না করিলেও (রামানুজ)। পাপাচরণে অনিচ্ছা করিলেও (স্বামী)। অসৎকর্ম্মে অনিচ্ছা ও নিবৃত্তি-লক্ষণ পরম-পুরুষার্থানুবন্ধী কর্ম্ম করিতে ইচ্ছা করিলেও (মধু)।

কার প্রেরণায়—(কেন প্রযুক্তঃ)—এই পাপকর্ম্মের প্রবর্ত্তক ঈশ্বর না পূর্ব্বসংস্কার? এই সন্দেহে অর্জ্জুন এইরূপ প্রশ্ন করিয়াছেন (বলদেব)।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের প্রথমেই প্রশ্ন আছে—

—"কেন সুখেতরেষু
বর্ত্তামহে।" * * * ১।১
"কালঃ স্বভাবো নিয়তির্যদৃচ্ছা
ভূতানি যোনিঃ পুরুষ ইতি চিন্ত্যম্॥" ১।২

চণ্ডীতেও দেখা যায় যে, রাজা সুরথ, মহর্ষি মেধসের নিকট এইরূপ প্রশ্ন করিয়াছিলেন,—

"ভগবংস্ত্বামহং প্রষ্টুমিচ্ছাম্যেকং বদস্ব তৎ।
দুঃখায় যন্মে মনসঃ স্বচিত্তায়ত্ততাং বিনা॥
মমত্বং মম রাজ্যস্য রাজ্যাঙ্গেষ্বখিলেষ্বপি।
জানতোঽপি যথাজ্ঞস্য কিমেতন্মুনিসত্তম॥
* * * *
দৃষ্টদোষেঽপি বিষয়ে মমত্বাকৃষ্টমানসৌ।
তৎ কেনৈতন্মহাভাগ যন্মোহো জ্ঞানিনোরপি।
মমাস্য চ ভবত্যেষা বিবেকান্ধস্য মূঢ়তা॥

(চণ্ডী ১।৩৬-৪০)।

হ'য়ে আকৃষ্ট…পাপ আচরণে—রাজার দ্বারা প্রেরিত ভৃত্যের

ন্যায় বলের দ্বারা নিয়োজিত হইয়া পাপ আচরণ করে (শঙ্কর)। বিষয় অনুভবরূপ পাপে নিয়োজিত হয় (রামানুজ)। কাম ক্রোধ বিবেক-বলে নিরোধ করিতে চেষ্টা করিলেও সবলে পাপাচরণে নিয়োজিত হয় (স্বামী)। পরতন্ত্র হইয়া যে কর্ম্মে ইচ্ছা নাই, তাহার আচরণ করে (মধু)।

এই প্রশ্ন সম্বন্ধে শঙ্কর বলেন যে, পূর্ব্বে ২।৬২-৬৪ শ্লোকে ও ৩।৩৪ শ্লোকে যদিও যাহা অনর্থের মূল তাহা উক্ত হইয়াছে, কিন্তু তাহা অস্পষ্ট, এবং অর্জ্জুন তাহা স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে চাহিতেছেন। স্বামী বলেন, পূর্ব্বে রাগদ্বেষের বশীভূত হইও না, ভগবান্ এই উপদেশ দিয়াছেন (৩।৩৪ শ্লোক), অর্জ্জুন তাহাতে আপনাকে অক্ষম মনে করিয়া এই প্রশ্ন করিয়াছেন। মধুসূদন বলেন, কাম্য ও প্রতিষিদ্ধ কর্ম্মে প্রবৃত্তির কারণ কি, অর্জ্জুন তাহাই জিজ্ঞাসা করিতেছেন। পূর্ব্বে ভগবান্ ইহার কারণ বিষয়-ধ্যান, রাগদ্বেষ, প্রকৃতিজগুণ হেতু মোহ প্রভৃতি বলিয়াছেন। ইহারা কি সকলেই সমানরূপে কারণ, না ইহার কোন এক মুখ্য কারণ আছে, ইহাই জিজ্ঞাসার বিষয়।

শ্রীভগবানুবাচ।

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ।
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্॥ ৩৭

শ্রীভগবান্—
কাম ইহা—ক্রোধ ইহা,—রজোগুণ-জাত
অতি পাপময়—নাহি পূরণ ইহার,
এ সংসারে অরিরূপে জানিও ইহারে॥ ৩৭

(৩৭) কাম ইহা ক্রোধ ইহা—কাম অর্থাৎ কামনা বা বাসনা।

রজোগুণের দ্বারা প্রথমে আমাদের মনে বাসনার উদ্রেক হয়, এবং সেই বাসনাবশে আমাদের কর্ম্মে প্রবৃত্তি হয়। ক্রোধ এই কামনা হইতে জাত। কামনা যখন পূর্ণ করা যায় না, যখন তাহার গতি প্রতিহত হয়, তখনই তাহা ক্রোধরূপে পরিণত হয়। (দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৬২ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য)। প্রাচীন-বাসনা-জনিত শব্দাদিবিষয়ে কামনা (রামানুজ)। কাম ও ক্রোধ একই। কামই ক্রোধের কারণ। সুতরাং এই কাম জয় হইলেই ক্রোধের জয় হয়। কারণ নষ্ট হইলে কার্য্য নষ্ট হয়। দুগ্ধে অম্ল দিলে যেমন দধি হয়, কামনা প্রতিহত হইলে সেইরূপ ক্রোধ উৎপন্ন হয় (বলদেব)। মনু বলিয়াছেন,—

"অকামতঃ ক্রিয়াঃ কাশ্চিৎ দৃশ্যন্তে নেহ কস্যচিৎ।
যদ্‌যদ্ধি কুরুতে জন্তুস্তত্তৎ কামস্য চেষ্টিতম্॥"

মধুসূদন বার্ত্তিককারের "আত্মা এব ইদমগ্র আসীৎ" এই মন্ত্রের সম্বন্ধে যে শ্লোক, তাহা উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহা এই—

"প্রবৃত্তৌ চ নিবৃত্তৌ চ যথোক্তস্যাধিকারিণঃ।
স্বাতন্ত্র্যে সতি সংসারমৃতৌ কস্মাৎ প্রবর্ত্ততে॥
ন তু নিঃশেষ-বিধ্বস্ত-সংসারানর্থবর্ত্মনি।
নিবৃত্তিলক্ষণে বাচ্যং কেনায়ং প্রের্য্যতেঽবশঃ॥
অনর্থপরিপাকত্বমপি জানন্ প্রবর্ত্ততে।
পারতন্ত্র্যমৃতে দৃষ্টা প্রবৃত্তির্নেদৃশী কচিৎ॥
তস্মাৎ শ্রেয়োঽর্থিনঃ পুংসঃ প্রেরকোঽনিষ্টকর্ম্মণি।
বক্তব্যস্তন্নিরাসার্থমিত্যর্থা স্যাৎ পরা শ্রুতিঃ॥
অনাপ্তপুরুষার্থোঽয়ং নিঃশেষানর্থসঙ্কুলঃ।
ইত্যকাময়তানাপ্তান্ পুমর্থান্ সাধনৈর্জ্জড়ঃ॥
জিহাসতি তথানর্থানবিদ্বানাত্মনি শ্রিতান্।
অবিদ্যোদ্ভূতকামঃ সন্নথো খল্বিতি চ শ্রুতিঃ॥

অকামতঃ ক্রিয়াঃ কাশ্চিৎ দৃশ্যতে নেহ কস্যচিৎ।
যদ্‌যদ্ হি কুরুতে জন্তুস্তত্তৎ কামস্য চেষ্টিতম্॥
কাম এষ ক্রোধ এষ ইত্যাদি বচনং স্মৃতেঃ।
প্রবর্ত্তকো নাপরোঽতঃ কামাদন্যঃ প্রতীয়তে॥"

রজোগুণজাত—দুঃখ-প্রবৃত্তি-আত্মক রজোগুণ এই কামনার কারণ। তমোগুণও ইহার কারণ বটে। কিন্তু দুঃখাত্মক বলিয়া ইহাতে রজোগুণের প্রাধান্য আছে (মধুসূদন)। রজোগুণের উল্লেখ করিবার কারণ এই যে, এই রজোগুণ ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে ও সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি হইলে, কামনার শক্তিও প্রশমিত হয় (স্বামী ও মধু)। শঙ্করাচার্য্য বলেন, কামনাকে যেমন রজোগুণ হইতে জাত বলা যায়, তেমনি রজোগুণকেও কাম বা বাসনা হইতে জাত বলা যায়। কেননা, অনাদিকাল-প্রবর্ত্তিত বাসনা-বীজই সৃষ্টি ধারণ করিয়া আছে, এবং তাহাই প্রকৃতিতে রজোগুণ উৎপাদন করে। এস্থলে প্রথম অর্থই গ্রহণ করা হইয়াছে। কিন্তু শেষের অর্থও সঙ্গত হয়।

শঙ্করাচার্য্য আরও বলেন যে, রজোগুণ অর্থে রজঃ ও তাহার গুণ। তাহা হইতেই কামের উৎপত্তি হয়, অথবা 'কাম' হইতেই রজোগুণের উদ্ভব হয়। কারণ কামই প্রথমে উদ্ভূত হইয়া রজোগুণকে প্রবর্ত্তিত করে, এবং এই কামোদ্ভূত রজোগুণ পুরুষকে প্রবর্ত্তিত করে। 'তৃষ্ণাই আমাকে এই কার্য্য করাইতেছে' ইহা লোকে বলিয়া থাকে। মধুসূদনও এই অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন।

কাম বা অনাদি-কাল-প্রবর্ত্তিত বাসনা যে এই প্রবৃত্তির মূল, তাহা শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে। পরের শ্লোকের ব্যাখ্যায় সে শ্রুতি উদ্ধৃত হইয়াছে। পরে এই তত্ত্ব বিশেষভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। রজোগুণ-তত্ত্ব চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে বিবৃত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

অতি পাপময়—নাহি পূরণ ইহার—ইহার অশন (গ্রহণীয় বিষয়)

অনন্ত, এবং কামের দ্বারা জীবগণ প্রেরিত হইয়া পাপাচরণ করে বলিয়া ইহা মহাপাপময় (শঙ্কর)। কাম সর্ব্ববিষয়ে আকর্ষণ করে বলিয়া ইহা মহাশন ; এবং কাম প্রতিহত হইলে ক্রোধের উদ্ভব হেতু ইহা মহাপাপময় (রামানুজ)। যাহার অশন মহৎ তাহা মহাশন। যথা স্মৃতি—

"যৎ পৃথিব্যাং ব্রীহিযবং হিরণ্যং পশবঃ স্ত্রিয়ঃ।
নালমেকস্য তৎ সর্ব্বমিতি মত্বা সমং ব্রজেৎ ॥"

মহাপাপ্মা অর্থাৎ অতি উগ্র, অতি বলে লোককে পাপকর্ম্ম করায়— সে কর্ম্মে অনিষ্ট ফল হইবে জানিয়াও,লোকে কামের প্রেরণায় পাপ করে।

মধুসূদন বলেন, এই কাম ও ক্রোধ কেবল দণ্ড দ্বারাই শাসিত হয়। সাম দান ভেদ এই ত্রিবিধ উপায়ে তাহা সম্ভব নহে।

পরে চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে যে ত্রিগুণতত্ত্ব উক্ত হইয়াছে, তাহা হইতে জানা যাইবে যে, প্রকাশ জ্ঞান ও সুখস্বভাব সত্ত্বগুণের বিশেষ বিকাশ হইলে, এই রজোগুণোদ্ভূত কাম ক্রোধ প্রভৃতি আপনিই অভিভূত হইয়া যায়। অতএব সত্ত্বগুণের উদ্রেক দ্বারা এই কাম ও ক্রোধকে দমন করিতে হয়।

এ সংসারে—মূলে আছে (ইহ), অর্থাৎ এ সংসারে (শঙ্কর, মধু)। এই শরীরে বা মোক্ষমার্গে (স্বামী)।

অরিরূপে জানিও ইহারে—জ্ঞানযোগ-বিরোধিরূপে (রামানুজ)। মোক্ষমার্গে বৈরী (স্বামী)। জ্ঞানযোগে বৈরী (বলদেব)।

নিষ্কাম কর্ম্মাচরণে বা স্বধর্ম্মানুষ্ঠানে বাধা দেয় বলিয়া এই কাম ও কামোদ্ভব ক্রোধকে তাহার বৈরী বলা হইয়াছে।

ধূমেনাব্রিয়তে বহ্নি র্যথা দর্শো মলেন চ।
যথোল্বেনাবৃতো গর্ভ স্তথা তেনেদমাবৃতম্ ॥ ৩৮

ধূমে আবরিত বহ্নি, দর্পণ মলায়—
কিম্বা গর্ভ থাকে যথা জরায়ু-আবৃত—
সেইরূপ আছে ইহা আবৃত তাহাতে ॥ ৩৮

(৩৮) ইহা—জন্তুজ্ঞান (রামানুজ)। জ্ঞান (বলদেব)। শঙ্কর, স্বামী ও মধুসূদন পরের শ্লোক উল্লেখ করিয়া বলেন যে, ইহা (মূলে আছে ইদং) এস্থলে জ্ঞানকে বুঝাইতেছে।

কিন্তু 'ইহা' অর্থে জ্ঞেয় জগৎ বুঝিলেও, এই শ্লোকের অর্থ সঙ্গত হইতে পারে। কেন না, বাসনা-বীজ এই সমস্ত জগৎকে ধারণ করিয়া আছে,— ইহা শাস্ত্রে পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত হইয়াছে। এই বাসনা, কামনা বা সূক্ষ্ম ইচ্ছাশক্তি, জড়ে জীবে সর্ব্বত্র অভিব্যক্ত হয়, এই সৃষ্টিরূপে আমাদের জ্ঞানে বিকশিত হয়, এবং জড়কে ও জীবকে ধারণ করিয়া, সুতরাং তাহা-দিগকে আবৃত করিয়া রাখে। পূর্ব্বে নবম শ্লোকের টীকায় যে ঋগ্বেদ মন্ত্র উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তাহাও এস্থলে পুনরুল্লিখিত হইল। যথা—

"কামস্তদগ্রেসবর্ত্ততাবিমনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ॥"

ইহা হইতে বুঝা যায় যে, কামবীজই সংসারের হেতু, ও কামই সংসারকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। এই একমাত্র তত্ত্ব জর্ম্মান দার্শনিক-শ্রেষ্ঠ সপেন্‌হার তাঁহার "World as Will and Idea" নামক পুস্তকে বিশদ করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। বোধ হয়, এই শ্লোকের উল্লিখিত সাধারণ সত্য, পরের শ্লোকে আলোচিত বিষয়োপযোগী বিশেষ দৃষ্টান্ত দিয়া স্পষ্টীকৃত করা হইয়াছে মাত্র। সেইজন্য পরের শ্লোকে এই কাম দ্বারা জ্ঞানাবরণের কথা উল্লিখিত আছে।

ইদং—এ শব্দের দার্শনিক অর্থ অহং ব্যতীত আর সমুদায়। আমা ব্যতিরিক্ত যাহা কিছু আছে, সমুদায়ই এই 'ইদং' ও 'ত্বম্' শব্দবাচ্য। এইজন্য এস্থলে সাধারণ ভাবে উক্ত অর্থ করা হইল। কিন্তু পরের শ্লোকে যখন

জ্ঞান শব্দের উল্লেখ আছে,তখন ইদং শব্দের অর্থ এই 'জ্ঞান', ইহাও সঙ্গত অর্থ। ইহাই ব্যাখ্যাকারগণের অভিমত। কিন্তু ইহা বলা যায় যে, এই শ্লোকে সাধারণভাবে 'কামে'র আবরণ-শক্তি উক্ত হইয়াছে, এবং পর-শ্লোকে বিশেষভাবে, এই কাম দ্বারা জ্ঞান-আবরণ-তত্ত্ব উক্ত হইয়াছে। আমাদের জ্ঞানস্বরূপ বুদ্ধি ও জ্ঞেয় জগৎ—এ উভয়ের মধ্যে এই কামনা বা বাসনারূপ আবরণ থাকিলে জ্ঞানে জ্ঞেয় জগতের স্বরূপ প্রকাশিত হয় না, আমাদের নিজের বা জ্ঞাতার স্বরূপও প্রকাশিত হয় না। তখন জ্ঞানে কেবল ভোক্তৃস্বরূপে জ্ঞাতা প্রকাশিত হয়, ও ভোগ্যস্বরূপ এজগৎ প্রকাশিত হয়। এই ভোগ্য জগৎ পঞ্চদশী অনুসারে মনঃকল্পিত জগৎ তাহা ঈশ্বরসৃষ্ট জগতের সহিত এক নহে। এইরূপে 'কাম' দ্বারা জ্ঞানের প্রকাশ স্বরূপ আবরিত হয়। এই মূল কাম হইতে রজোগুণের উদ্ভব হইয়া, লোককে কামভোগের জন্য কামার্থ কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করে। যাহা হউক, যদি এই কামকে রজোগুণ হইতে জাত 'কাম' বলা যায়, তবে এ অর্থ করা চলে না সে কাম আমাদের রজোগুণজাত বাসনামাত্র। ইহা কিরূপে জ্ঞানকে আবরিত করিয়া, রাগ দ্বেষ উৎপাদনপূর্ব্বক আমাদের সুখদ বিষয় গ্রহণের ও দুঃখদ বিষয় ত্যাগের জন্য কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করে, তাহা দ্বিতীয় অধ্যায়ের ব্যাখ্যা শেষে বিবৃত হইয়াছে।

আবৃত তাহাতে—এই কামনার আবরণের, মৃদু মধ্য ও তীব্র ভেদে, তিন স্তর আছে। তাহা এই শ্লোকে তিনটি দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝান হইয়াছে। ধূম যে অগ্নিকে আবরণ করে, সে আবরণ সামান্য, তাহাতে অগ্নির তেজ অতি সামান্য ক্ষীণ হয়। দর্পণ মলময় হইলে তাহার প্রতিবিম্ব-গ্রহণ-শক্তি অনেক পরিমাণে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়, এজন্য সে আবরণ অপেক্ষাকৃত অধিক। আর জরায়ুতে ভ্রূণ সম্পূর্ণরূপে আবৃত থাকে, তাহার আদৌ কোন স্বাধীনতা থাকে না (বলদেব)। কাম প্রথমতঃ আমাদের প্রকৃতিতে সূক্ষ্মরূপে থাকে; পরে স্থূল শরীরে বৃত্তিরূপে ইহা আমাদের চিত্তে

অভিব্যক্ত হইয়া স্থূলভাব ধারণ করে; বিষয় চিন্তা করার অবস্থায় ইহা স্থূলতম হয়, (মধুসূদন)।

বলদেব ও মধুসূদনের অর্থ হইতে জানা যায় যে, এই 'কাম' মূল জগৎ-কারণ কাম বা ইচ্ছাশক্তি। ইহাকে জর্ম্মান দার্শনিক সপেনহার "Will" বলিয়াছেন। ইহা জড়ে জড়শক্তিরূপে, (force) উদ্ভিদাদি নিম্নজীবে প্রাণ (stimulus) ক্রিয়ারূপে ও মানুষাদি উচ্চ জীবে ইচ্ছা (will) শক্তিরূপে প্রকটিত হয়। যাহা হউক এই 'কাম' মূল প্রকৃতিতে প্রথমে সূক্ষ্মভাবে থাকে, ইহাই প্রকৃতি হইতে রজঃশক্তিবিকাশের কারণ। তাহার পর প্রকৃতিজাত লিঙ্গশরীরে অর্থাৎ প্রতি জীবের অন্তঃকরণে—বিশেষতঃ মনে ইহার অভিব্যক্তি হয়,এবং শেষে কোন বিষয়ের জ্ঞানকালে অনাদি প্রাক্তন সংস্কারানুসারে চিত্তে সেই বিষয় সম্বন্ধে ইচ্ছা-সংকল্পাদি-রূপে স্বতঃ অভিব্যক্ত হইয়া আমাদের রাগ দ্বেষ উৎপাদনপূর্ব্বক কর্ম্মে প্রবৃত্ত করায়। মধুসূদনের এই অর্থ বেশ সঙ্গত।

আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা।
কামরূপেণ কৌন্তেয় দুষ্পূরেণানলেন চ ॥ ৩৯

ইহারই দ্বারায় হয় জ্ঞান আবরিত,
জ্ঞানীদের চির-অরি ইহা হে অর্জ্জুন,
কামরূপী সে অনল অতৃপ্ত সতত ॥ ৩৯

(৩৯) ইহারই...আবরিত—যাহা কামের দ্বারা আবৃত হয়, সেই পূর্ব্বশ্লোকোক্ত ইদং-শব্দবাচ্য বস্তু কি, তাহাই এস্থলে উক্ত হইয়াছে,—তাহা জ্ঞান (শঙ্কর)। জ্ঞানস্বভাব জ্ঞানীর আত্ম-বিষয়ক জ্ঞান এই কাম

দ্বারা আবৃত হয় (রামানুজ)। এই জ্ঞান বিবেক-জ্ঞান (স্বামী)। অন্তঃ-করণস্থ বিবেক-জ্ঞান (মধু)। জ্ঞানা জীবের জ্ঞান (বলদেব)।

চণ্ডী হইতে জানা যায় যে যাহা বৃত্তিজ্ঞান, তাহা পশু পক্ষী মনুষ্য প্রভৃতি সকলের সমজাতীয়। তবে তাহার তারতম্য আছে, এই মাত্র। কাম বা মোহ দ্বারা যে এই জ্ঞান আবৃত, ইহা সাধারণ সত্য। আহার-নিদ্রা-ভয়-মৈথুনাদি জ্ঞান সকল জীবের সমান, ইহা শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। চণ্ডীতে আছে—

জ্ঞানমস্তি সমস্তস্য জন্তোর্বিষয়গোচরে।

* * *

জ্ঞানিনো মনুজাঃ সত্যং কিন্তু তে ন হি কেবলম্।
যতো হি জ্ঞানিনঃ সর্ব্বে পশুপক্ষি মৃগাদয়ঃ॥
জ্ঞানঞ্চ তন্মনুষ্যাণাং যত্তেষাং মৃগপক্ষিণাম্।
মনুষ্যাণাঞ্চ যত্তেষাং তুল্যমন্যত্তথোভয়োঃ॥

(চণ্ডী ১।৪১-৪৫)।

এই জ্ঞানের আবরক দুই,—রজোগুণোদ্ভব কাম, ও তমোগুণোদ্ভব মোহ ও অজ্ঞান। কাম-হেতুও মোহের ও অজ্ঞানের উদ্ভব হয়। এইজন্য চণ্ডীতে উক্ত হইয়াছে—

"জ্ঞানিনামপি চেতাংসি দেবী ভগবতী হি সা।
বলাদাকৃষ্য মোহায় মহামায়া প্রযচ্ছতি॥ (চণ্ডী ১।৫০)

তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। অতএব কামের এই জ্ঞানাবরক-শক্তি সাধারণ।

জ্ঞানীদের চির-অরি—জ্ঞানী পূর্ব্ব হইতে জানে যে, এই কামের দ্বারা আমি অনর্থে প্রেরিত হইয়া দুঃখ প্রাপ্ত হই। এইজন্য কাম জ্ঞানীর নিকট নিত্য বৈরী,—মূর্খের নিকট নহে। কারণ মূর্খ তৃষ্ণাকালে কামকে প্রিয় বস্তুর ন্যায় দেখে, এবং পরে দুঃখ প্রাপ্ত হইলে, তৃষ্ণাকেই তাহার কারণ মনে করে। (শঙ্কর, গিরি, মধু)। বিষয়-ব্যামোহ উৎপাদন

করিয়া ইহা নিত্য-বৈরী হয় (রামানুজ)। অজ্ঞের নিকট ভোগসময়ে কাম সুখহেতু হয়, কিন্তু পরিণামে তাহা বৈরিরূপে বোধ হয়। কিন্তু জ্ঞানীর নিকট ভোগকালেও তাহার অনর্থ সন্ধান করিয়া ইহা দুঃখহেতু হয়।

কামরূপী সে অনল অতৃপ্ত সতত—এই কামের রূপ ইচ্ছা, ইহাকে দুঃখে পূরণ করা যায়, এবং ইহার 'অলং' বা পর্য্যাপ্তি নাই বলিয়া ইহা অনল (শঙ্কর)। ইহার পর্য্যাপ্তি নাই (রামানুজ)। এই কামের রূপ ইচ্ছা বা তৃষ্ণা। ইহা বহ্নির ন্যায় দুষ্পূর, ইহাতে যত ইন্ধন দেওয়া যায়, ততই ইহা প্রজ্বলিত হয় (মধু, বলদেব)। স্মৃতিতে আছে।—

"ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥" (মনু)

ইন্দ্রিয়াণি মনো বুদ্ধিরস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে।
এতৈর্বিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনম্॥ ৪০

ইন্দ্রিয় ও মন বুদ্ধি অধিষ্ঠান তার
উক্ত হয় এইরূপ ; তাদের আশ্রয়ে
জ্ঞান আবরিয়া করে মুগ্ধ দেহীদের॥ ৪০

(৪০) অধিষ্ঠান তার—যে সকল বিষয় দর্শন শ্রবণাদি ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য হয়, মনে সে বিষয়ভোগের সঙ্কল্প ও বুদ্ধিতে তাহা ভোগের জন্য অধ্যবসায় জন্মে। এই জন্য ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি বা সূক্ষ্ম শরীর কামনার আশ্রয়-স্থান (স্বামী)। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়গণের বৃত্তি শব্দাদি আলোচনা। কিন্তু বুদ্ধির অধ্যবসায়, মনের সঙ্কল্প, অহঙ্কারের অভিমান, দশ ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি-এই চারিটি করণের যুগপৎ বা ক্রমে ক্রমে উত্তেজনা দ্বারা বাহ্য বিষয়

গ্রহণ সম্পূর্ণ হয় (সাংখ্য-কারিকার—২৮, ২৯ ও ৩০ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। এ কারণ বিষয়জ কামনা এই চারি বৃত্তিতে অধিষ্ঠিত।

সাংখ্য দর্শন অনুসারে বুদ্ধি, মন ও অহঙ্কার ইহারা অন্তঃকরণ, আর ইন্দ্রিয়গণ বাহ্যকরণ। ইন্দ্রিয় বিশেষতঃ জ্ঞানেন্দ্রিয় যখন বাহ্য বিষয়ের সহিত সংযুক্ত হয়, তখন তাহারা সেই মাত্রাস্পর্শ হইতে সেই বিষয়ের বা বাহ্যবস্তুর রূপরসাদি গ্রহণ করে। ইন্দ্রিয়ের এই রূপরসাদি সম্বন্ধে যে ভাব হয়, তাহা নির্ব্বিশেষ,অস্পষ্ট। ইংরাজিতে তাহাকে sensation বলে। ইন্দ্রিয়শক্তি মধ্যে উক্ত কামের অধিষ্ঠান থাকায়, এই বিষয়ানুভব (sensation) সুখজনক (pleasant) অথবা দুঃখজনক (unpleasant, painful) হয়। পরে মন যখন ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা সংগৃহীত রূপরসাদি বিষয় গ্রহণ করে, তখন মনে এই কাম বা ইচ্ছার অধিষ্ঠান থাকায়, মন সেই অনুভবের স্বরূপ সম্বন্ধে সংকল্প বিকল্প করে, অর্থাৎ তাহার স্বরূপ কি তাহা বুঝিতে যায় ও সেই অনুভব সুখজনক কি দুঃখজনক, তাহা অনুভব করিয়া, তৎপ্রতি রাগ বা দ্বেষযুক্ত হয়। তাহার পর মন সেই বিষয়ানুভূতি লইয়া বুদ্ধির কাছে অর্পণ করে, অথবা বুদ্ধি তাহা গ্রহণ করিয়া পূর্ব্বানুভূত বিষয় স্মরণপূর্ব্বক, তাহাদের সহিত তখনকার অনুভূত বিষয়ের সাধর্ম্ম্য বৈধর্ম্ম্য বিচার করিয়া, সে বিষয় কি, তাহা নিশ্চয়রূপে অবধারণ করে। কিন্তু কাম এই বুদ্ধিতে অধিষ্ঠিত। এজন্য বুদ্ধি এই কামনা-পরিচালিত হইয়া তাহা হেয় কি উপাদেয় ইহাও স্থির করিয়া লয়। এই-রূপে ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির সাহায্যে যখন আমরা কোন বিষয় জ্ঞানে গ্রহণ করি, তখন সেই সেই বৃত্তিস্থিত কাম বা ইচ্ছা-বশে, সেই জ্ঞেয় বা জ্ঞাত বিষয় হেয় কি উপাদেয়,তাহা স্থির করিয়া, তাহার সম্বন্ধে আমরা রাগ-দ্বেষ-যুক্ত হই। এই রাগদ্বেষ হেতু সেই বিষয় ত্যাগ বা গ্রহণ করিতে আমাদের প্রবৃত্তি হয়; এবং সেই প্রবৃত্তি হেতু বুদ্ধি মন ও ইন্দ্রিয়গণ সেই ত্যাগগ্রহণাত্মক কর্ম্মে রত হয়। এ তত্ত্ব দ্বিতীয় অধ্যায়ের ব্যাখ্যার শেষে

বিবৃত হইয়াছে। আমাদের অন্তঃকরণ তিন শক্তির দ্বারা চালিত,—জ্ঞান-শক্তি, ইচ্ছাশক্তি ও কর্ম্মশক্তি। জ্ঞানশক্তি হেতু আমরা গ্রাহ্য বস্তুর স্বরূপ জানিতে পারি। ইচ্ছাশক্তি কামমূলক। সেই শক্তি হেতু সুখ-দুঃখানুভূতি ও রাগদ্বেষ উৎপন্ন হয়। এই ইচ্ছাশক্তি হেতু জ্ঞেয় বস্তু হেয় কি উপাদেয় এবং ত্যাজ্য কি গ্রাহ্য, তাহা স্থির হয়। তৎপরে এই ইচ্ছাশক্তি দ্বারা আমাদের কর্ম্মশক্তি পরিচালিত হয়, এবং সে বস্তু ত্যাগ বা গ্রহণ জন্য কর্ম্ম করা হয়। অন্তঃকরণে বা বহিঃকরণে যদি এই রাজসিক কামবীজ না থাকিত, তবে জ্ঞেয় বা জ্ঞাত বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞান পূর্ণ প্রকাশিত ও সুখস্বরূপ হইত। জ্ঞান নির্ম্মল শুদ্ধ সাত্ত্বিক হইত। কিন্তু এই জ্ঞানবিকাশ কালে উক্তরূপে চিত্তে কামের বিকাশ হয় বলিয়া সে জ্ঞান আবরিত হইয়া যায়।

জ্ঞান আবরিয়া—এ স্থলে সকল দেহীর জ্ঞানের কথা বলা হইয়াছে। জ্ঞান যে কেবল মানুষেরই আছে, তাহা নহে। পশুপক্ষী সকল দেহীরই জ্ঞান আছে। তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। কাম সকল জীবের জ্ঞানকেই আবৃত করিয়া তাহাদের মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। তবে মানুষের জ্ঞান অপেক্ষাকৃত অল্প আবৃত।

এই জ্ঞান প্রকৃতি-সংসৃষ্ট জ্ঞান (রামানুজ), ইহা বিবেকজ্ঞান (স্বামী, মধু)। এই জ্ঞান নির্ম্মল সাত্ত্বিক বুদ্ধির স্বরূপ, তাহা পরে ১৩।৭-১১ শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে। সেই জ্ঞান অমানিত্বাদিরূপে বিংশতি প্রকার।

মুগ্ধ—বিবিধপ্রকার মোহযুক্ত (শঙ্কর, মধু)। আত্মজ্ঞানবিমুখ ও বিষয়ানুভব-পরায়ণ (রামানুজ)। জ্ঞানের স্বরূপকে মোহ বা অজ্ঞানযুক্ত অথবা অন্যথা জ্ঞানযুক্ত বা মানিত্বাদি-জ্ঞানযুক্ত করে। (১৩।১১ শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

তস্মাৎ ত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ।
পাপ্মানং প্রজহি হ্যেনং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্ ॥৪১

সংযত করিয়া অগ্রে ইন্দ্রিয় সকল,
ত্যজ তবে পাপরূপী ইহারে অর্জ্জুন,—
জ্ঞান বিজ্ঞানের হয় বিনাশ যা হ'তে। ৪১

(৪১) ইন্দ্রিয় সকল—ইন্দ্রিয় প্রথম বশ হইলে মন ও বুদ্ধির বশ ক্রমে আপনি সিদ্ধ হয় (মধুসূদন)। এই ইন্দ্রিয়সংযমের অর্থ ইন্দ্রিয়ের ধ্বংস নহে। বাহ্য ইন্দ্রিয় নষ্ট করার জন্য কৃচ্ছ্র সাধন করা বৃথা। তাহাতে সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়-শক্তি নষ্ট হয় না, বাসনা-বীজ যায় না—মিথ্যাচারী হইতে হয়। চক্ষু নষ্ট করিলে রূপ-লালসা ধ্বংস হয় না। পুরুষাঙ্গ বিকল করিলে কাম ধ্বংস হয় না। এ সকল বাহ্য কৃচ্ছ্র সাধন বৃথা।

এই সম্বন্ধে দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষে স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ দ্রষ্টব্য। যিনি সমুদায় মনোগত কামকে ত্যাগ করিয়া আত্মবলে আত্মাতে তুষ্ট রহেন, তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ। কাম ত্যাগ করিতে পারিলেই স্থিতপ্রজ্ঞ হওয়া যায়। তাহা হইলে দুঃখে উদ্বেগ থাকে না, সুখে স্পৃহা থাকে না, রাগ, ভয়, ক্রোধ সব দূর হয়, শুভাশুভ সম্বন্ধে নিরপেক্ষ হওয়া যায়। এই কাম জয় করিতে হইলে যোগযুক্ত হইয়া ঈশ্বরপরায়ণ হইয়া ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিতে হয় (২।৬১), তাহারা আর যেন স্বতঃ প্রবর্ত্তিত হইয়া বিষয়াভিমুখে আকৃষ্ট হইয়া ধাবিত না হয়, তাহার জন্য সাধনা করিতে হয়। এইরূপে ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিয়া কিরূপে কাম ত্যাগ করিতে হয়, তাহা পূর্ব্বে দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। কাম ও ইন্দ্রিয়ের চাঞ্চল্য রজোগুণ-সমুদ্ভূত। সত্ত্বগুণের বিশেষ উদ্রেক হইলে, রজোগুণ

অভিভূত হয়, ইন্দ্রিয় সংযত হয়। সত্ত্বগুণের উদ্রেক হইতে আরম্ভ হইলে, রজোগুণকে অভিভূত করিবার জন্য সাধনার সময় আসে। যে সাধনার দ্বারা ইন্দ্রিয় সংযত হয় ও কাম ত্যাগ করা যায়, তাহা গীতায় উক্ত হইয়াছে। এস্থলে তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

জ্ঞান-বিজ্ঞান—জ্ঞান, অর্থাৎ শাস্ত্র ও আচার্য্যের উপদেশ হইতে আত্মা সম্বন্ধে পরোক্ষ জ্ঞান। শ্রবণ মনন হইতে এই জ্ঞান হইতে পারে। বিজ্ঞান, অর্থাৎ ধ্যান বা নিদিধ্যাসন দ্বারা আত্মাকে অপরোক্ষরূপে অনুভব করা বা আত্মপ্রত্যক্ষ করা। বিজ্ঞান সাধনা-সাপেক্ষ। (শঙ্কর, মধু)

ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধি র্যো বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ ॥ ৪২

ইন্দ্রিয়েরা হয় শ্রেষ্ঠ আছয়ে কথিত,
তাহা হ'তে শ্রেষ্ঠ মন, বুদ্ধি—মন হ'তে,
বুদ্ধি হ'তে শ্রেষ্ঠ যাহা তাহাই ত সেই ॥ ৪২

(৪২) শ্রেষ্ঠ হয় ইন্দ্রিয়েরা—স্থূল দেহ হইতে সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় শ্রেষ্ঠ (স্বামী, মধুসূদন, শঙ্কর, গিরি, বলদেব)। তাহারা ব্যাপক ও বলবান্ বলিয়া শ্রেষ্ঠ। কেন না, ইন্দ্রিয় সূক্ষ্ম, প্রকাশক, দেহের চালক, ও স্থূল দেহের নাশে ইন্দ্রিয়ের নাশ হয় না। ইন্দ্রিয়—এস্থলে ইন্দ্রিয়শক্তি বুঝাইতেছে। চক্ষুতে কোন বস্তুর প্রতিবিম্ব পড়িলে যে শক্তির দ্বারা আমরা সেই বস্তু দেখিতে পাই, তাহাই চক্ষুরিন্দ্রিয়। তাহা চক্ষুর্গোলক নহে, তাহা চক্ষুরিন্দ্রিয়-ক্রিয়ার স্থূল যন্ত্রমাত্র। এইরূপ অন্যান্য ইন্দ্রিয় সম্বন্ধেও বুঝিতে হইবে।

তাহা হইতে মন শ্রেষ্ঠ—শ্রেষ্ঠ (মূলে আছে 'পর') অর্থাৎ উৎকৃষ্ট

ও অতীত। এই শ্লোক সম্বন্ধে ব্যাখ্যাকারগণ ভিন্ন ভিন্ন অর্থ করেন। শঙ্কর, স্বামী, গিরি ও মধুসূদন বলেন,—ইন্দ্রিয়ের পরিচালক বা প্রবর্ত্তক বলিয়া বিকল্প ও সংকল্পাত্মক মন ইন্দ্রিয় হইতে শ্রেষ্ঠ। আর অধ্যবসায় বা নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি মনের সংকল্পাদি নিয়মিত করে, এই জন্য বুদ্ধি মন হইতে শ্রেষ্ঠ। আর জীবাত্মা বুদ্ধি হইতেও শ্রেষ্ঠ। অর্থাৎ যিনি সাক্ষিরূপে বুদ্ধিকে প্রকাশ করেন, এবং সকলের অন্তরে অবস্থিত হইয়া, মন ইন্দ্রিয় প্রভৃতিকে স্ব স্ব ব্যাপারে বা কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া তাহাদিগকে এই কাম দ্বারা বিমোহিত করেন—তিনি আত্মা।

রামানুজ একেবারে ভিন্ন অর্থ করেন। তিনি বলেন, জ্ঞানীদের চির-শত্রু কে? তাহাই এই শ্লোকে উল্লিখিত হইয়াছে। অর্থাৎ যাহারা জ্ঞানের অবরোধক, তাহাদের মধ্যে ইন্দ্রিয়ই প্রধান, ইন্দ্রিয় অপেক্ষা মন অধিক প্রবল, আর মন অপেক্ষাও বুদ্ধি প্রবল। কেননা, মনকে বিষয়-বিমুখ করিলেও, বুদ্ধি বিপরীত-অধ্যবসায়-বলে আমাদের জ্ঞান-লাভে বাধা দেয়। আর এই বুদ্ধি হইতে শ্রেষ্ঠ বা প্রধান যাহা, অর্থাৎ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক জ্ঞান-বিরোধী যাহা—তাহাই এই কাম।

এই ব্যাখ্যা অনুসারে, এই শ্লোকের "তাহাই ত সেই" অর্থে—তাহাই এই কাম—ইহা রামানুজ বুঝাইয়াছেন।

অন্য টীকাকারগণ বলেন, কি উপায়ে বা কিসের আশ্রয়ে কামকে জয় করা যাইতে পারে, তাহাই এ শ্লোকে দেখান হইয়াছে। (দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৫৮শ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। ইঁহারা বলেন—'তাহাই ত সেই', অর্থাৎ তাহাই ত আত্মা। অর্থাৎ আত্মাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তিনি বুদ্ধির দ্রষ্টা (শঙ্কর)। এই অর্থের প্রমাণস্বরূপ কঠোপনিষদের তৃতীয় বল্লীর ১০,১২ শ্লোক উল্লেখ করা যাইতে পারে। যথা—

"ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ।
মনসশ্চ পরা বুদ্ধির্বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ॥"

"মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ।
পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ॥"
"এষ সর্ব্বেষু ভূতেষু গূঢ়াত্মা ন প্রকাশতে।
দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ॥"

এস্থলে "মহান্ আত্মা" অর্থে হিরণ্যগর্ভাখ্য সমষ্টি-বুদ্ধি। যাহা হউক, রামানুজ যে অর্থ করিয়াছেন, তাহাও সঙ্গত হইতে পারে।

কিন্তু সে অর্থ শ্রুতিবিরুদ্ধ হয়। উক্ত কঠোপনিষদের শ্রুতিই তাহার প্রমাণ। ইহা ব্যতীত সাংখ্যদর্শন হইতে জানা যায় যে, পুরুষের সান্নিধ্যে প্রকৃতি হইতে প্রথমে মহত্তত্ত্বাখ্য বুদ্ধি উৎপন্ন হয়। বুদ্ধি হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে মন ও তাহা হইতে ইন্দ্রিয়। কারণ কার্য্য হইতে শ্রেষ্ঠ। বুদ্ধি মনের কারণ বলিয়া, তাহা মন হইতে শ্রেষ্ঠ, মন ইন্দ্রিয়গণের কারণ বলিয়া তাহা ইন্দ্রিয় হইতে শ্রেষ্ঠ। ইন্দ্রিয় সূক্ষ্ম শরীরের অন্তর্গত বলিয়া তাহা স্থূল শরীর হইতে শ্রেষ্ঠ। বুদ্ধি মন অহঙ্কার ইন্দ্রিয় —ইহারা প্রকৃতিজ। পুরুষ এই প্রকৃতির অতীত ও প্রকৃতি হইতে শ্রেষ্ঠ। এই পুরুষই এস্থানে 'সঃ' শব্দ দ্বারা বাচ্য। ইহাই আত্মা। অতএব সাংখ্যদর্শন অনুসারেও শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতির ব্যাখ্যা সঙ্গত। কাজেই রামানুজের অর্থ গ্রহণ করা যায় না।

কাম—রজোগুণ-সমুদ্ভব, তাহা বুদ্ধি, মন ও ইন্দ্রিয়গণকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে মাত্র। আশ্রিত—আশ্রয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হয় না। বুদ্ধির প্রযত্ন দ্বারা এই কামকে যখন দমন করা যায়, তখন ইহা বুদ্ধি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহে। অবশ্য এ কথা বলা যাইতে পারে যে, জীবের নিম্নাবস্থায় কাম প্রবল থাকে। তখন কাম চিত্তকে জয় করিয়া তাহাকে পরিচালিত করে। কিন্তু জীব যখন মানুষ হইতে পায়, এবং মানুষের উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখন এই কাম আর বুদ্ধি হইতে শ্রেষ্ঠ থাকিতে পারে না। তখন চিত্তে সত্ত্বগুণের বিশেষ স্ফুরণ হইলে 'কাম' অভিভূত

হইয়া আইসে। অতএব এস্থলে কামের শ্রেষ্ঠতা উক্ত হয় নাই।

এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধ্বা সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা।
জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্ ॥ ৪৩

এইরূপে বুদ্ধি হ'তে ইহা শ্রেষ্ঠ জানি,
আত্মবলে আত্মরোধ করি হে অর্জ্জুন!
কর নাশ কামরূপ দুর্জ্জয় রিপুরে ॥ ৪৩

(৪৩) বুদ্ধি হ'তে ইহা শ্রেষ্ঠ—বুদ্ধি হইতে আত্মা শ্রেষ্ঠ। কেন না, বুদ্ধি প্রভৃতি কামনা-চালিত হইতে পারে, কিন্তু আত্মা নির্ব্বিকার ও সাক্ষী (শঙ্কর, স্বামী)। রামানুজ বলেন, বুদ্ধি হইতে কাম প্রধান, অর্থাৎ সর্ব্বাপেক্ষা জ্ঞান-বিরোধী।

আত্মবলে আত্মরোধ করি—নিজ মনের দ্বারা আত্মাকে সম্যক্ স্তম্ভন করিয়া অর্থাৎ সমাহিত করিয়া (শঙ্কর)। মনকে বুদ্ধি দ্বারা কর্ম্মযোগে স্থাপন করিয়া (রামানুজ)। নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি দ্বারা মনকে নিশ্চল করিয়া (স্বামী)। বা স্থিরীকরণ-পূর্ব্বক (মধু)।

কর নাশ কামরূপ রিপুরে—কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য্য ইহাদিগকে রিপু বলে, কেন না ইহারাই আমাদের শত্রু শ্রেয়োমার্গের অন্তরায়। এই ষড়রিপুর মধ্যে কামই মূল, ইহা হইতেই অন্য রিপুর উৎপত্তি। এজন্য কামকে জয় করিলে, আর সব রিপু পরাজিত হয়। কাম বুদ্ধি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইলে, তাহাকে জয় করা সম্ভব হইত না।

দুর্জ্জয়—('দুরাসদ') দুর্দ্দমনীয় বা দুর্ব্বিজ্ঞেয় (শঙ্কর, স্বামী)।

গীতার তৃতীয় অধ্যায়ে যে কর্ম্মতত্ত্ব—বুঝান হইয়াছে, সে সম্বন্ধে অদ্বৈতবাদী শঙ্করাচার্য্য-প্রমুখ টীকাকারগণ বলেন যে, কর্ম্মযোগ উচ্চ জ্ঞানাধিকারীর পক্ষে অবলম্বনীয় নহে। চিত্তশুদ্ধির জন্য সাধনার প্রথম সোপান এই কর্ম্মযোগ। তাহার পর দ্বিতীয় সোপান কর্ম্মসন্ন্যাসযোগ। তৃতীয় সোপান ভক্তিযোগ, ও শেষ সোপান জ্ঞানযোগ। সুতরাং এই প্রথম সোপান উত্তীর্ণ হইলে, আর কর্ম্মযোগের আবশ্যক হয় না। আর কোন কর্ত্তব্য থাকে না। এই অধ্যায়ের বিভিন্ন শ্লোকের ব্যাখ্যায় ইহা বিবৃত হইয়াছে।

কিন্তু রামানুজ এই অধ্যায়ে উল্লিখিত কর্ম্মযোগতত্ত্ব কতকটা ভিন্নরূপে বুঝিয়াছেন। তিনি বলেন, মুক্তির পূর্ব্বে এমন কি মুক্ত হইলেও সকল অবস্থাতেই কর্ম্মযোগ অনুষ্ঠেয়। এ অর্থ ই সঙ্গত বোধ হয়। ইহা যথাস্থানে উল্লেখ করিয়াছি; এক্ষণে তাহা বিস্তারিত ভাবে বুঝিতে চেষ্টা করিব।

এই অধ্যায়ে কর্ম্মযোগ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কয়টি তত্ত্ব উল্লিখিত হইয়াছে,—

(১) কোন অবস্থায় কেহ কখন কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারে না (৫)।

(২) কর্ম্মত্যাগ করিলে শরীরযাত্রা নির্ব্বাহ হয় না (৫)।

(৩) আমাদের শরীর প্রকৃতিজ প্রকৃতির শক্তি বা গুণই আমাদের তদনুরূপ কর্ম্ম করায়। এই কর্ম্মে আমাদের কোন কর্তৃত্ব নাই। সুতরাং কর্ম্মত্যাগ করা একরূপ অসম্ভব। অন্ততঃ তাহা নিতান্ত কষ্টকর-সাধনা-সাধ্য (২৭)।

এই কারণে আমাদের কর্ম্ম করিতে হইবে। তবে কর্ম্মে যাহাতে বন্ধন না হয়, তাহাও করিতে হইবে। তাহার উপায়ও এই অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে। যথা—

(১) কর্ত্তব্য বোধে নিত্য কর্ম্ম করিবে। কর্ম্মযোগ শ্রেষ্ঠ মনে করিবে (৮)।

(২) জগতে প্রবর্ত্তিত কর্ম্মচক্রের অনুবর্ত্তী হইবে, ও তজ্জন্য কর্ত্তব্য বোধে যজ্ঞ করিবে (১৬)।

(৩) সকল প্রাণীর তৃপ্তি ও বর্দ্ধন জন্য পঞ্চ মহাযজ্ঞ কর্ত্তব্য বোধে করিবে (১৩)। কেবল নিজের জন্য অন্ন সংগ্রহ করিবে না। যজ্ঞের জন্য অন্নাদি সংগ্রহ করিবে ও কেবল যজ্ঞাবশিষ্ট ভোজন করিবে। অর্থাৎ অপরের জন্য অর্থাদি সংগ্রহ করিবে। দেব, পিতৃ, মনুষ্য ও ভূতগণকে অগ্রে যজ্ঞ দ্বারা তুষ্ট করিয়া যাহা কিছু অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাই নিজে আহার করিবে।

(৪) কেবল নিজের জন্য কর্ম্ম করিবে না। আসক্তি ত্যাগ করিয়া কর্ম্মযোগ অবলম্বন করিবে (১৭)।

(৫) কেবল কর্ম্মযোগেই সিদ্ধ হওয়া যায়—দৃষ্টান্ত জনকাদি (২০)।

(৬) লোকসংগ্রহ জন্য কর্ম্ম করিবে (২০)।

(৭) ঈশ্বরে সর্ব্ব কর্ম্ম সমর্পণ করিয়া কর্ম্ম করিবে (৩০)। অথবা ঈশ্বরার্থ কর্ম্ম করিবে (৯)।

(৮) কর্ম্মে অনুরাগ, বিরাগ বা আসক্তি ত্যাগ করিবে (৩৪)।

(৯) স্বধর্ম্ম পালন করিবে (৩৫)।

(১০) ইন্দ্রিয়সংযম করিয়া কাম বা বাসনা দমন করিবে (৪১)।

এই কর্ম্মযোগ আমাদের আরও বিশদ ভাবে বুঝিতে হইবে। এই অধ্যায়ে যে কর্ম্মযোগ বিবৃত হইয়াছে। পরে চতুর্থ অধ্যায়ে, তাহা বিস্তারিত হইয়াছে। যাহা হউক, এই তৃতীয় অধ্যায়ে কর্ম্মযোগ সম্বন্ধে যে সকল তত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে, সেই তত্ত্ব সকল প্রথমে সংক্ষেপে পুনরালোচনা করা কর্ত্তব্য।

কর্ম্মযোগের মূল সূত্র যাহা, তাহা পূর্ব্বে দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। ভগবান্ সে স্থলে বলিয়াছেন যে, আসক্তি ত্যাগপূর্ব্বক, অর্থাৎ লাভালাভ জয়াজয় প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগপূর্ব্বক, সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে সম জ্ঞান করিয়া, যোগবুদ্ধিতে অর্থাৎ কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে কর্ম্মানুষ্ঠান

করাই কর্ম্মযোগ। এই কর্ম্মযোগে যুক্ত হইয়া কর্ম্ম করিলে সুকৃত দুষ্কৃত উভয়ই ত্যাগ করা যায়, কর্ম্ম হেতু কোন বন্ধন হয় না। বুদ্ধিযোগে যুক্ত হইয়া কর্ম্ম করিলেই কর্ম্মজ ফল ত্যাগ করা যায়। এই কর্ম্মযোগানুষ্ঠানের প্রধান অন্তরায়—'কাম'। যে 'কাম'কে—সর্ব্বপ্রকার কামনাকে ত্যাগ করিতে পারিয়াছে, যে 'নিষ্কাম' হইয়াছে, সেই কর্ম্মযোগানুষ্ঠানের অধিকারী। যে সমুদয় মনোগত কামনা ত্যাগ করিয়া আত্মা দ্বারা আত্মাতেই তুষ্ট থাকে, যে দুঃখে উদ্বিগ্ন হয় না, যে সুখে স্পৃহাহীন, যাহার রাগ ভয় ক্রোধ দূর হইয়াছে, যাহার বুদ্ধি স্থির হইয়াছে, যে কোন বাসনা দ্বারা বিচলিত হয় না, যে শুভপ্রাপ্তিতে আনন্দিত হয় না, ও অশুভপ্রাপ্তিতে দ্বেষ করে না, যে ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া তাহাদিগকে বিষয় হইতে প্রত্যাহার করিতে পারে, এবং বিষয় ভোগ করিয়াও যাহার চিত্ত অবিচলিত থাকে, যাহার চিত্ত এইরূপে প্রসন্ন ও শান্ত হয়, সেই স্থিতপ্রজ্ঞ মুনিই প্রকৃত কর্ম্মযোগের অধিকারী। সর্ব্বকাম ত্যাগপূর্ব্বক নিস্পৃহ, নির্ম্মম, নিরহঙ্কার হইয়া যে বিচরণ করে, সে কর্ম্মযোগানুষ্ঠান করিয়াও শান্তিলাভ করে, আত্মস্বরূপে অবস্থান করে, সে ব্রহ্মে স্থিতিলাভ করে। ভগবান্ কর্ম্মযোগের এইরূপ উপদেশ দিয়া অর্জ্জুনকেই যোগবুদ্ধিতে ধর্ম্মযুদ্ধ করিবার উপদেশ দিয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত, দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভগবান্ সাংখ্যজ্ঞানের উপদেশ দিয়া, সেই জ্ঞানে অবস্থান পূর্ব্বক, যুদ্ধে যে আত্মীয়স্বজনের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, তাহার জন্য শোক মোহ ও দুঃখে অভিভূত না হইয়া কর্ম্মযোগে যে এই স্বধর্ম্ম-যুদ্ধ অনুষ্ঠেয় তাহা অর্জ্জুনকে বুঝাইয়া ছিলেন।

এ সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ জর্ম্মান-দার্শনিক-শ্রেষ্ঠ সপেনহর বলিয়াছেন,—

"In the Bhagabadgita, Krishna thus raises the mind of his young pupil Arjuna, when seized with the compunction at the sight of the arranged hosts, he loses heart

and desires to give up the battle, in order to avert the death of so many thousands. Krishna leads him to this point of view, * and the death of the thousands could no longer restrain him. He gives the sign for the battle.".

Schopenhauer's World as Will and Idea.—Vol. I. § 54.

যাহা হউক, অর্জ্জুন এই সাংখ্যজ্ঞান ও কর্ম্মযোগ তখন বুঝিতে পারেন নাই বোধ হয়। আর ভগবান্ অর্জ্জুনকে যে ধর্ম্মযুদ্ধ করিবার উপদেশ দিতেছিলেন,সেই যুদ্ধ যে হেয় কর্ম্ম, তাহা বুদ্ধিযোগে অনুষ্ঠিত হইতে পারে না, এবং যে মুমুক্ষু, তাহার পক্ষে জ্ঞানযোগই অনুষ্ঠেয়, কর্ম্মযোগ অনুষ্ঠেয় নহে, তাহাও অর্জ্জুনের মনে হইতেছিল। এইজন্য অর্জ্জুনের প্রশ্নে এই অধ্যায়ে ভগবান্ কর্ম্মযোগ বুঝাইয়া দিয়াছেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ে যাহা সংক্ষেপে উক্ত হইয়াছে, এই অধ্যায়ে ও পরের অধ্যায়ে তাহাই বিস্তারিত ভাবে বিবৃত হইয়াছে।

---

* "The exemption from death, which belongs to the individuals only as thing-in-itself, is for the Phenomenon one with the immortality of the rest of the world. This is expressed in the Vedas by saying that when a man dies, his sight becomes one with the sun, his smell—with the earth, his taste—with water, his hearing—with air, his speech—with fire.................

"What we fear in death, is the end of the Individual, which it openly professes itself to be, and since the individual is a particular objectification of the will to live itself, the whole nature struggles against the death.

This feeling makes man helpless. But reason can step in, and overcome this influence, armed with the knowledge we have given him, he would await death with indifference. He would regard it as false illusion.........He would not be terrified by endless past or future in which he would not be, for this he would regard as the empty delusion of the web of *Maya*. Thus he would no more fear death, than the sun fears night.

Schopenhauer's World as Will and Idea.—Vol. I. § *54*.

কর্ম্মযোগ শ্রেয়ঃ।—ভগবান্ এই অধ্যায়ের আরম্ভে বলিয়াছেন যে এই লোকে সাংখ্যদের জ্ঞানযোগ ও যোগীদের কর্ম্মযোগ—এই দুইরূপ নিষ্ঠা উক্ত হইয়াছে সত্য, কিন্তু ইহাদের মধ্যে কর্ম্মের অনারম্ভ দ্বারাই কেবল নৈষ্কর্ম্ম হয় না, আর সন্ন্যাসের দ্বারাও সিদ্ধিলাভ হয় না। অর্থাৎ কর্ম্মের আরম্ভ ত্যাগ, এমন কি কর্ম্মসন্ন্যাস দ্বারা উক্ত জ্ঞাননিষ্ঠাতে সিদ্ধি হয় না। অতএব এই দুইরূপ নিষ্ঠা থাকিলেও, কর্ম্মযোগ নিষ্ঠাই শ্রেয়ঃ, তাহা দ্বারাই সাংখ্য বা আত্মজ্ঞানও সিদ্ধ হয়। যাহা হউক, এই কর্ম্মযোগ-নিষ্ঠা যে অবলম্বনীয়, তাহার কয়েকটি কারণ ভগবান্ এই অধ্যায়ে উল্লেখ করিয়াছেন। তাহা এস্থলে সংক্ষেপে বুঝিতে হইবে।

প্রথম কারণ।—মানুষ (সাধারণভাবে—জীবমাত্রেই) কর্ম্ম না করিয়া কখন ক্ষণকালও থাকিতে পারে না। আমরা যে কর্ম্ম করি, তাহার মধ্যে কতকগুলি বুদ্ধিচালিত এবং কতকগুলি অবুদ্ধিপূর্ব্বক কৃত। অবুদ্ধিপূর্ব্বক কৃত কর্ম্মকে ইংরাজীতে instinctive, reflex action প্রভৃতি বলে। আমাদের নিঃশ্বাস প্রশ্বাস, আহার-পরিপাক, ফুস্‌ফুস্, হৃৎপিণ্ড প্রভৃতি যন্ত্রের ক্রিয়া শরীরে রক্ত চলাচল প্রভৃতি প্রাণকর্ম্ম স্বতঃই প্রবর্ত্তিত হয়। আমাদের শরীরের গঠন, রক্ষা প্রভৃতি কর্ম্ম প্রকৃতি দ্বারা আপনিই সম্পাদিত হয়। তাহারা আমাদের বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হইবার অপেক্ষা রাখে না।

আমাদের নিদ্রিত অবস্থায়ও সেই সকল প্রাণকর্ম্ম চলিতে থাকে। আমাদের জাগ্রৎ অবস্থায়ও ইন্দ্রিয়ের সহিত সর্ব্বদা বিষয় সংস্পর্শ হেতু সুখ দুঃখ বোধ হয়, এবং তাহা হইতে কামক্রোধ বা রাগদ্বেষ উৎপন্ন হইয়া, তাহারা সর্ব্বদা আমাদিগকে কর্ম্মে নিয়োজিত করে। অতএব আমরা ক্ষণকালও কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারি না। ইহা একরূপ বুঝিতে পারা যায়।

ভগবান্ পরে বলিয়াছেন যে, প্রকৃতিজ গুণের দ্বারা সর্ব্ব কর্ম্ম

আপনিই সম্পাদিত হয়। সেই সকল গুণকৃত কর্ম্মকে নিয়ন্ত্রিত করিবার শক্তি সাধারণতঃ জীবের নাই। এই তত্ত্ব এই অধ্যায়ের শেষে ও পরে ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। পরে আমরা তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিব। এস্থলে তাহা সংক্ষেপে উল্লেখ করিব মাত্র।

এ সংসারে যে কিছু সত্ত্বের উদ্ভব হয়, ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ বা পুরুষ-প্রকৃতি সংযোগই তাহার কারণ। আমরা সকলে প্রকৃতিবদ্ধ পুরুষ। এই প্রকৃতি-পুরুষ সম্বন্ধ গীতায় পরে উক্ত হইয়াছে। যথা—

"কার্য্যকারণকর্ত্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে।
পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে॥
পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্।
কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্‌যোনিজন্মসু॥"

—গীতা, ১৩।২০ ২১।

আরও উক্ত হইয়াছে যে,

"প্রকৃত্যৈব চ কর্ম্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্ব্বশঃ।
যঃ পশ্যতি তথাত্মানমকর্ত্তারং স পশ্যতি॥"

—গীতা, ১৩।২৯।

প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকা—প্রকৃতিজ গুণ তিনটি—সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ। ইহারাই দেহীকে দেহে বদ্ধ করে (১৪।৫)। ইহার মধ্যে সত্ত্ব প্রকাশ-স্বভাব, সুখস্বভাব, জ্ঞানস্বভাব (১৪।৬), আর তমোগুণ মোহনস্বভাব, ইহা প্রমাদালস্য নিদ্রা দ্বারা দেহীকে বদ্ধ করে (১৪।৮)। কেবল প্রকৃতির রজোগুণ হইতে কর্ম্ম হয়। এই রজোগুণ রাগাত্মক, তৃষ্ণা ও আসক্তির উৎপাদন-কারণ, তাহাই দেহীকে কর্ম্মসঙ্গে বদ্ধ করে (১৪।৭,৯)।

প্রতি দেহে প্রকৃতির এই তিনগুণ নিত্য সম্বদ্ধ, তিনই এক সঙ্গে অবস্থান করে। তবে ইহারা পরস্পর পরস্পরকে অভিভূত করিতে চেষ্টা করে। এজন্য যখন সত্ত্ব ও তমোগুণকে অভিভূত করিয়া রজো-

গুণের বিশেষ বৃদ্ধি হয়, তখন লোভ, প্রবৃত্তি, কর্ম্মের আরম্ভ, আসক্তি, স্পৃহা প্রভৃতির বিকাশ হয় (১৪।১২)। এই রজোবৃদ্ধির ফল দুঃখ (১৪।১৬)। এই রজোগুণের বৃদ্ধিকালে মৃত্যু হইলে কর্ম্মসঙ্গী মনুষ্যলোকে জন্ম হয় (১৪।১৫)। দ্বিতীয় অধ্যায়ের ব্যাখ্যার শেষেও আমরা এই সকল তত্ত্ব কতক বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি।

এই প্রকৃতিজ গুণে অবশ হইয়া মানুষ ও অপর জীব সর্ব্বদা কর্ম্ম করে, এবং তাহারা কর্ম্ম না করিয়া ক্ষণকালও থাকিতে পারে না। পুরুষ স্বরূপতঃ অকর্ত্তা, পুরুষ নিজে কোন কর্ম্ম করে না, কিন্তু প্রকৃতিজ অহঙ্কারবশে প্রকৃতির কর্ম্ম সম্বন্ধে সে আপনাকে কর্ত্তা মনে করে। এজন্য প্রকৃতি যে নিত্য কর্ম্ম করে, সে সেই কর্ম্মকে তাহারই কর্ম্ম মনে করে, এবং এই জন্য আপনাকে নিয়ত কর্ম্মকারিরূপে ধারণা করে। ইহাই সাধারণ নিয়ম।

মনুষ্যলোক রজোবিশাল। মানুষ প্রায়শঃ রাজসিক-প্রকৃতিযুক্ত, অর্থাৎ রজোগুণপ্রধান। এজন্য মানুষ এই রজোগুণ দ্বারা নিত্য পরিচালিত হয় বলিয়া ক্ষণকালও কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারে না। অর্থাৎ প্রাকৃতিক রজোগুণ দ্বারা যে নিয়ত কর্ম্ম আচরিত হয়, সেই কর্ম্ম সেই করিতেছে, ইহা মনে না করিয়া থাকিতে পারে না। সাধনা-বলে মানুষের প্রকৃতি রজঃ ও তমোগুণকে অভিভূত করিয়া সত্ত্বপ্রধান হইলেও, এই রজঃ ও তমোগুণ হইতে সে একেবারে অব্যাহতি পায় না। তাহার মধ্যেও এই রজোগুণ ও তমোগুণের কার্য্য চলিতে থাকে। তবে সে কার্য্য তখন সত্ত্বগুণের কার্য্য দ্বারা অভিভূত ও নিয়মিত হয়। সুতরাং যে সাত্ত্বিক-প্রকৃতিসম্পন্ন, যাহার জ্ঞান ও প্রকাশভাব বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছে, সেও এইরূপে প্রকৃতির রজঃ ও তমোগুণ দ্বারা চালিত হইয়া কর্ম্ম করে। তবে প্রভেদ এই যে, সে আপনাকে অকর্ত্তা সুতরাং সেই কর্ম্মে নির্লিপ্ত বলিয়া জানিতে পারে এবং স্বপ্রকৃতিকে বশীভূত করিয়া এই

সকল গুণের বৃত্তিকে নিয়মিত করিতে পারে। কিন্তু সে কর্ম্ম হইতে একেবারে অব্যাহতি পায় না। এইজন্য ভগবান্ এস্থলে এই সাধারণ সত্যের অবতারণা করিয়াছেন যে, কেহই কখন ক্ষণকালও কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারে না, তাহার প্রকৃতি স্বতঃই গুণানুসারে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। তাহার রজোগুণ সত্ত্বগুণের দ্বারা অভিভূত হইলেও তাহার ক্রিয়া একেবারে নিবৃত্ত হয় না। কাজেই তাহার পক্ষে সম্পূর্ণ কর্ম্মসন্ন্যাস বা কর্ম্মত্যাগ ও নৈষ্কর্ম্ম্য সিদ্ধি সম্ভব হয় না।

দ্বিতীয় কারণ—এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে, কর্ম্ম না করিয়া থাকা যাইবে না কেন? যে প্রাণকর্ম্ম প্রভৃতির কথা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, তাহাতে অবশ্য আমাদের হাত নাই। সে কর্ম্মে আমাদের কর্ত্তৃত্বও নাই, সে কর্ম্মে বন্ধনও নাই,—তাহার কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু কর্ম্মেন্দ্রির দ্বারা যে সকল কর্ম্ম হয়, তাহা না করিয়া থাকা যাইবে না কেন? মুখে বাক্য উচ্চারণ করিয়া অপরের নিকট মনের ভাব প্রকাশ করা কর্ম্ম, হাতের দ্বারা কোন বস্তু গ্রহণাদি কর্ম্ম, পদের দ্বারা গমনাদি কর্ম্ম ইত্যাদি যে সকল কর্ম্ম কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা কৃত হয়, তাহা না করিয়া থাকা যাইবে না কেন? মন এই কর্ম্মেন্দ্রিয়গণের নিয়ন্তা। মন যদি এই কর্ম্মেন্দ্রিয়গণকে পরিচালিত না করে, তাহা হইলে ত কর্ম্ম হয় না। এ কথা আংশিক সত্য। এজন্য ভগবান্ বলিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি কর্ম্মেন্দ্রিয়গণকে সংযত করিতে পারে, যাহাদের প্রমাথী ইন্দ্রিয়গণ প্রাক্তন কর্ম্মসংস্কারবশে মনকে বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া আর কর্ম্মে নিয়োজিত করিতে নাও পারে, তাহারাও সেই প্রাক্তন সংস্কারবশে রজোগুণ দ্বারা চালিত হইয়া মনে মনে বিষয় স্মরণ ও চিন্তা করিতে বাধ্য হয়। তাহাদের বিষয়ে রস বা স্পৃহা যায় না, (২।৫৯)। তাহারা মূঢ়চিত্ত, মিথ্যাচারী। এই সকল লোক মানসিক কর্ম্ম ত্যাগ করিতে পারে না। কর্ম্ম,,—কায়িক, বাচিক ও মানসিক ভেদে ত্রিবিধ। গীতায় আছে,—

"শরীরবাঙ্মনোভির্যৎ কর্ম্ম প্রারভতে নরঃ।
ন্যায্যং বা বিপরীতং বা.........॥ (১৮।১৫)

মনুসংহিতায় আছে—

শুভাশুভফলং কর্ম্ম মনোবাগ্‌দেহসম্ভবম্।
কর্ম্মজা গতয়ো নৃণামুত্তমাধমমধ্যমাঃ॥
তস্যেহ ত্রিবিধস্যাপি ত্র্যধিষ্ঠানস্য দেহিনঃ।
দশলক্ষণযুক্তস্য মনো বিদ্যাৎ প্রবর্ত্তকম্॥
পরদ্রব্যেষ্বভিধ্যানং মনসানিষ্টচিন্তনম্।
বিতথাভিনিবেশশ্চ ত্রিবিধং কর্ম্ম মানসম্॥
পারুষ্যমনৃতঞ্চৈব পৈশুন্যঞ্চাপি সর্ব্বশঃ।
অসম্বদ্ধঃ প্রলাপশ্চ বাঙ্ময়ং স্যাচ্চতুর্ব্বিধম্॥
অদত্তানামুপাদানং হিংসা চৈবাবিধানতঃ।
পরদারোপসেবা চ শারীরং ত্রিবিধং স্মৃতম্॥

—মনুসংহিতা, দ্বাদশ অধ্যায়, ৩-৭।

অতএব মনই মনোবাক্‌কায়াশ্রিত উত্তম মধ্যম ও অধম কর্ম্মের প্রবর্ত্তক। কাজেই যাহারা মনের দ্বারা কর্ম্মেন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া বাহ্য কর্ম্ম না করে, মানসিক কর্ম্ম ত্যাগ না করিলে তাহাদিগকে মিথ্যাচারী হইতে হয়।

এইজন্য ভগবান্ উপদেশ দিয়াছেন যে, যখন এই কর্ম্মপ্রবৃত্তি আমাদের স্বাভাবিক, তখন ইহাকে বৃথা সংযত করিতে চেষ্টা না করিয়া, মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে সম্পূর্ণ বশীভূত করিয়া, আসক্তিশূন্য হইয়া কর্ম্মযোগ অবলম্বন পূর্ব্বক সেই কর্ম্মবৃত্তিকে নিয়মিত করিবে। ইহাই কর্ম্মযোগানুষ্ঠানের দ্বিতীয় কারণ।

তৃতীয় কারণ—কর্ম্মযোগানুষ্ঠানের প্রয়োজন সম্বন্ধে তৃতীয় কারণ এই যে, কর্ম্মত্যাগ অপেক্ষা নিত্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান একান্ত কর্ত্তব্য। নিত্যকর্ম্ম

যাহা, তাহা শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে। শাস্ত্রে নিত্য নৈমিত্তিক ভেদে আমাদের 'নিয়ত' কর্ম্ম দ্বিবিধ। ইহার মধ্যে সন্ধ্যা বন্দনাদি দান তপঃ প্রভৃতি কর্ম্ম এই নিত্যকর্ম্মের অন্তর্গত। তাহা কোন বিশেষ বর্ণের বা আশ্রমের বিহিত কর্ম্ম নহে। এই নিত্যকর্ম্ম সকলের অনুষ্ঠেয়। অষ্টাদশ অধ্যায়ের প্রথমে অর্জ্জুন সন্ন্যাসের ও ত্যাগের তত্ত্ব জানিতে চাহিলে, ভগবান্ বলিয়াছেন যে, কাম্য কর্ম্মের ন্যাসই সন্ন্যাস, এবং সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগই ত্যাগ। তখন দুইরূপ মত প্রচলিত ছিল। কাহারও মতে সমুদয় কর্ম্মই দোষযুক্ত, অতএব ত্যাজ্য। কাহারও মতে যজ্ঞ দান তপঃ কর্ম্ম ত্যাজ্য নহে—সর্ব্বথা অনুষ্ঠেয়। এই দুই মতের সমুচ্চয় করিয়া ভগবান্ বলিয়াছেন যে, যজ্ঞ দান তপঃ কর্ম্ম কখনই ত্যাজ্য নহে,—তাহা কার্য্য, কেন না তাহা মানবের চিত্তশুদ্ধিকর। এই সব কর্ম্ম আসক্তি ও ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া কর্ত্তব্য বোধে নিশ্চয় অনুষ্ঠেয়। নিয়ত বা নিত্য কর্ম্মের সন্ন্যাস কখনই কর্ত্তব্য নহে। কেহ মোহবশে তাহা ত্যাগ করে, কেহ বা সে কর্ম্ম দুঃখকর মনে করিয়া কায়ক্লেশভয়ে তাহা ত্যাগ করে। আর যাহারা সাত্ত্বিক-প্রকৃতি-যুক্ত, তাহারা কর্ত্তব্য বোধে আসক্তি ও ফলত্যাগ করিয়া নিত্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করে। তাহাদের এই যে আসক্তি ও ফলত্যাগ, ইহাই সাত্ত্বিক ত্যাগ। এই সকল লোক মেধাবী, ছিন্নসংশয়, সত্ত্বসমাবিষ্ট ও ত্যাগী। ইহারা কর্ত্তব্য বুদ্ধিতে কর্ম্মানুষ্ঠানকালে অকুশল কর্ম্মে দ্বেষ করে না, এবং কুশল বা সুখকর কর্ম্মেও প্রীতিযুক্ত হয় না। (পরে অষ্টাদশ অধ্যায় ২য় হইতে ১০ম শ্লোক দ্রষ্টব্য)। ভগবান্ সে স্থলে উপসংহারে বলিয়াছেন—

নহি দেহভৃতা শক্যং ত্যক্তুং কর্ম্মাণ্যশেষতঃ।
যস্তু কর্ম্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে॥ (১৮।১১)।

অতএব যখন একেবারে কর্ম্মত্যাগ সম্ভব নহে, তখন রাগ দ্বেষ, কাম ক্রোধ, সুখ দুঃখ প্রভৃতি দ্বারা পরিচালিত হইয়া কর্ম্ম করা অপেক্ষা

নিয়ত বা বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানই কর্ত্তব্য। রাগদ্বেষ-পরিচালিত না হইয়া কিরূপে 'নিয়ত' কর্ম্মানুষ্ঠান করা যায়, তাহা ক্রমে বুঝিতে চেষ্টা করিব।

চতুর্থ কারণ।—এই কর্ম্মযোগ যে শ্রেয়, তাহার সম্বন্ধে চতুর্থ কারণ এই যে, যদি কর্ম্ম একেবারে ত্যাগ করা যায়, তবে শরীরযাত্রাও নির্ব্বাহ হয় না। যাঁহারা গৃহী, তাঁহারা এই শরীরযাত্রা নির্ব্বাহ জন্য যেমন কর্ম্ম করিতে বাধ্য, সেইরূপ যাঁহারা সন্ন্যাসী, তাঁহারাও ভিক্ষাদি দ্বারা অন্নাদি সংস্থানপূর্ব্বক শরীরযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে বাধ্য। কর্ম্মদ্বারা শরীরযাত্রা নির্ব্বাহ না করিলে, মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। এ সম্বন্ধে স্থানান্তরে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা উদ্ধৃত হইল।—

"যখন শরীর রক্ষার জন্য আমাদের খাদ্যের প্রয়োজন হয়, তখন প্রকৃতি স্বয়ং ক্ষুধারূপে আমাদের অন্তরে প্রকাশিত হইয়া আমাদিগকে খাদ্য আহরণে প্রেরণ করেন। তিনিই জঠরাগ্নিরূপে আমাদের অন্তরে থাকিয়া ভুক্ত অন্ন পরিপাক করিয়া ল'ন। ভগবান্ বলিয়াছেন 'অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা পচাম্যন্নং পৃথগ্বিধম্' (গীতা, ১৫।১৪)। যখন শরীরের বিশ্রামের প্রয়োজন হয়, তখন তিনি নিদ্রারূপে আমাদিগকে অভিভূত করিয়া, আমাদের বাহ্যজ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তি হরণ করিয়া ল'ন। তিনিই প্রাণরূপে—জীবনীশক্তিরূপে আমাদের শরীরের রক্ষণ ও পোষণ করেন, এবং শরীরের রক্ষণ ও পোষণ জন্য আমাদিগকে বলে আকর্ষণ করিয়া প্রবৃত্ত করান। জ্ঞানী যখন আত্মার নিষ্ক্রিয় অবস্থা স্থির করিয়া অকর্ম্মা হইয়া বসিয়া থাকিতে চাহেন, যখন শরীরকে তাঁহার বন্ধনের কারণ বলিয়া তাহাকে অবজ্ঞা করেন, যখন শোক-বিষাদ-মগ্ন আর্ত্ত শরীরকে কেবল যন্ত্রণাদায়ক মনে করিয়া তাহাকে উপেক্ষা করেন, তখনও প্রকৃতি তাঁহার মধ্যে ক্ষুধা তৃষ্ণা প্রভৃতি রূপে আবির্ভূত হইয়া, তাঁহাকে শরীররক্ষার্থ চেষ্টা বা কর্ম্ম করিতে বাধ্য করান। সুতরাং আমরা যে আহার অন্বেষণ জন্য কর্ম্ম-বা শরীররক্ষার্থ কর্ম্মকে আমাদের নিজের কর্ম্ম—আমাদের নিজের স্বার্থ

মনে করি, বাস্তবিক তাহাও আমরা ঠিক নিজে করি না। তাহাতেও আমরা প্রকৃতির দ্বারা নিয়মিত হই। আমাদের জীবন রক্ষার্থ যে কর্ম্ম, তাহার জন্য আমাদের সহজ জ্ঞান প্রকৃতির দ্বারা পরিচালিত হয়। আহার সংগ্রহে কোন সময়ে অক্ষম হইলে, মানুষ ক্ষুধার জ্বালায় পিশাচ বা রাক্ষসে পরিণত হয়, তাহা আমরা দারুণ দুর্ভিক্ষের বিবরণ হইতে জানিতে পারি।"

* * * *

"প্রকৃতি যেমন প্রাণকর্ম্ম প্রভৃতি দ্বারা আমাদের জ্ঞানের অপেক্ষা না রাখিয়া আপনিই আমাদের সংস্কারোপযোগী শরীর গঠন করেন, তেমনই শরীররক্ষা ও পোষণ জন্য আমাদের জ্ঞানকৃত কর্ম্মেও প্রকৃতি আমাদিগকে নিয়মিত করেন।..... আমাদের অভাব বোধ ও অভাবজন্য দুঃখানুভূতি এবং সেই অভাব দূর হইলে আমাদের সুখানুভূতি—এই সুখদুঃখানুভূতি দ্বারা প্রকৃতি আমাদিগকে কর্ম্মে নিয়োজিত করেন। শরীর পোষণ জন্য যখন আমাদের খাদ্যের প্রয়োজন হয়, তখন প্রকৃতি ক্ষুধাতৃষ্ণারূপ অভাব বোধ বা দুঃখবোধের দ্বারা আমাদের জ্ঞানকে বা ইচ্ছাবৃত্তিকে সেই অভাব দূর করিবার জন্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত করেন।......প্রকৃতি আমাদের শরীর গঠন ও রক্ষার জন্য কি উপকরণ চাহিতেছেন, জানিতে পারিলে, আমরা সে উপকরণ সংগ্রহে ব্যাপৃত হই। সেই অন্ন প্রভৃতি উপকরণের মধ্যে কোন্‌ গুলি গ্রহণীয় বা কোন্‌ গুলি ত্যাজ্য, তাহাও প্রকৃতি সুখদুঃখানুভূতি দ্বারা আমাদিগকে জানাইয়া দেন,—তাহা রসনা ও ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সুখদুঃখানুভূতির দ্বারা আমাদের বাছিয়া লইবার অবকাশ দেন।......আবার যখন রসনা ও ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সাহায্যে আমরা আহার বাছিয়া লইয়া গ্রহণ করি, তখন শরীর রক্ষার জন্য যতদূর পর্য্যন্ত আহারের প্রয়োজন, ততদূর পর্য্যন্ত আমরা আহারে সুখ পাই। তাহার পর রসনার তৃপ্তি হয়—ক্ষুধা ও ক্ষুধানিবৃত্তি-জনিত দুঃখসুখের বিরাম হয়। সে তৃপ্তি হইতে আহারের প্রয়োজন যে শেষ হইয়াছে—প্রকৃতির এই ইঙ্গিত আমরা বুঝিতে পারি।

এইরূপে শরীরের পুষ্টি ও পরিণতির জন্য আমাদের কর্ম্মেন্দ্রিয়-পরিচালনের প্রয়োজন হয়—সমস্ত শরীরের মধ্যে গতি বা ক্রিয়ার প্রয়োজন হয়। এজন্য প্রকৃতিবশে বালক ছুটাছুটি দৌড়াদৌড়ি কাজে বা খেলায় এত উত্তেজনা বা এত সুখবোধ করে। এজন্য যুবক ব্যায়ামে আনন্দ বোধ করে। এজন্য নীরোগ ও কর্ম্মক্ষম শরীরে কর্ম্মের উত্তেজনায় আমরা এত স্ফূর্ত্তি পাই। আবার যখন কর্ম্ম করিয়া শরীর ক্ষয় হয়—শক্তি অবসন্ন হয়, যখন শরীরের বা কর্ম্মবৃত্তির বিশ্রাম ও পুনঃ শক্তিসঞ্চয়ের প্রয়োজন হয়, তখন সেই শ্রান্তিহেতু দুঃখ বা অবসাদজ্ঞান দ্বারা প্রকৃতি আমাদিগকে বিরাম জন্য প্রস্তুত করেন, বা নিদ্রারূপে আবির্ভূতা হইয়া আমাদের বাহ্যজ্ঞান ও কর্ম্মশক্তি হরণ করিয়া ল'ন। এইজন্য পরিমিত নিদ্রায় আমাদের সুখ হয়।”

* * * * * * *

“অতএব শরীরের রক্ষা ও পোষণ জন্য আমাদের শারীরিক সুখদুঃখ জ্ঞানের প্রয়োজন,—ক্ষুধা তৃষ্ণাদি দুঃখ বা অভাববোধের প্রয়োজন,—বাহ্য ও আন্তর দুঃখবোধের প্রয়োজন,—বাহ্য বিষয়ের সহিত আমাদের ইন্দ্রিয়ের সম্পর্কহেতু সেই সম্পর্কজনিত সুখদুঃখজ্ঞানের প্রয়োজন,—আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক দুঃখবোধেরও প্রয়োজন। সে সুখ-দুঃখ জ্ঞান না থাকিলে আমাদের সংস্পৃষ্ট কোন্ বাহ্য বিষয়কে ত্যাগ করিতে হইবে, কাহাকে বা গ্রহণ করিতে হইবে, তাহা আমরা বুঝিতে পারিতাম না। অগ্নির সংস্পর্শে তাপরূপ দুঃখবোধ না হইলে, শরীর ভস্মসাৎ হইয়া গেলেও আমরা ভ্রূক্ষেপ করিতাম না। সেইজন্য আমাদের সংস্পৃষ্ট বাহ্য বিষয়ের মধ্যে কাহাকে ত্যাগ করিতে হইবে, কাহাকে বা গ্রহণ করিতে হইবে, তাহা কেবল সুখদুঃখানুভূতি দ্বারা আমরা বুঝিতে পারি। এইজন্য...... সুখরূপ পারিতোষিক বা পুরস্কার ও দুঃখরূপ দণ্ডের দ্বারা প্রকৃতি আমাদের ত্যাগ-গ্রহণাত্মক কর্ম্মপথ দেখাইয়া দেন, আমাদের ইচ্ছা-

বৃত্তিকে পরিচালিত করেন, আমাদের বিকাশের জন্য—শরীরের রক্ষণ ও পোষণ জন্য, কি গ্রহণ করিতে হইবে বা কি ত্যাগ করিতে হইবে, তাহা বুঝাইয়া দেন। এইজন্য সুখদুঃখবোধের প্রয়োজন। এইজন্য সুখদুঃখ-বোধ অবশ্যম্ভাবী। এই সুখদুঃখানুভূতির প্রয়োজন না থাকিলে, বাহ্য বা আন্তর বিষয়ের সহিত,—শরীর ও তৎসংসৃষ্ট বাহ্য বিষয়ের সহিত সম্পর্ক-জনিত সুখদুঃখানুভূতির জন্য প্রকৃতি আমাদের সংজ্ঞাবাহী নাড়ী সৃষ্টি করিতেন না। যখন উচ্চ শ্রেণীর জীবে চৈতন্য জাগরিত হয়, জ্ঞান বিকসিত হইতে আরম্ভ হয়, যখন প্রকৃতি ইচ্ছাশক্তিরূপে জীবহৃদয়ে বিকসিত হন, যখন প্রকৃতি সেই ব্যক্ত ইচ্ছাশক্তির প্রেরণায় জীবকে কর্ম্মে নিযুক্ত করিতে প্রবৃত্ত হন,—তখন সুখদুঃখানুভূতির বিকাশ হইতে থাকে, তখনই সুখজ কর্ম্মে ইচ্ছা ও দুঃখজ কর্ম্মে অনিচ্ছা জন্মে,—তখনই সুখজ বিষয় গ্রহণে ও দুঃখজ বিষয় ত্যাগে প্রবৃত্তি জন্মে। তখন সুখজ বিষয়ে অনুরাগ ও দুঃখজ বিষয়ে দ্বেষ জন্মে, এই রাগদ্বেষ হইতে কামক্রোধাদি বৃত্তির বিকাশ হওয়ায়, জীব সেই বৃত্তিবশে পরিচালিত হইতে থাকে।”—

সমাজ ও তাহার আদর্শ, ১০৭-৮ এবং ১৫১-২ পৃষ্ঠা।

যাহা হউক এইরূপে আমরা বুঝিতে পারি যে, শরীরযাত্রা নির্ব্বাহ জন্য কর্ম্মের নিতান্ত প্রয়োজন। সাধারণতঃ আমরা সুখ-দুঃখ, রাগ-দ্বেষ, কাম-ক্রোধ প্রভৃতি দ্বারা এই কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত হই। কিন্তু ভগবান্ উপদেশ দিয়াছেন যে, এইরূপে প্রকৃতির প্রেরণায় সুখদুঃখাদি দ্বারা অবশ হইয়া পরিচালিত হইবার পরিবর্ত্তে বুদ্ধিযোগে এই কর্ম্ম অনুষ্ঠেয়। কিরূপে এই সকল কর্ম্ম বুদ্ধিযোগে অনুষ্ঠিত হইতে পারে, তাহার উপায় ভগবান্ বলিয়া দিয়াছেন।

পঞ্চম কারণ—যজ্ঞার্থ কর্ম্মানুষ্ঠানই তাহার উপায়। যজ্ঞার্থ কর্ম্ম না করিয়া যদি শরীরযাত্রা নির্ব্বাহ জন্য স্বার্থবুদ্ধিতে সকামভাবে রাগ-দ্বেষাদি দ্বারা পরিচালিত হইয়া কর্ম্ম করা যায়, তবে তাহা বন্ধনের

কারণ হয়। কিন্তু যজ্ঞার্থ কর্ম্মানুষ্ঠান পূর্ব্বক সেই যজ্ঞাবশেষ ভোজনাদি দ্বারা শরীরযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিলে, আর সে কর্ম্মে বন্ধন হয় না।

এই যজ্ঞার্থ কর্ম্মতত্ত্ব পূর্ব্বে নবম শ্লোক হইতে ষোড়শ শ্লোকের ব্যাখ্যায় বিবৃত হইয়াছে। ভগবান্ সেস্থলে বলিয়াছেন যে, যজ্ঞার্থ কর্ম্ম ব্যতীত অন্যত্র সমুদায় কর্ম্মই বন্ধনের কারণ। কিন্তু পূর্ব্বে (২।৪১-৪৫ শ্লোকে) ভগবান্ বলিয়াছেন যে, যাহারা অজ্ঞানী (অবিপশ্চিৎ) বেদবাদরত, যাহারা কামাত্মা ও স্বর্গই যাহাদের পরম পুরুষার্থ, তাহাদের বুদ্ধি সমাধিতে বিহিত হয় না। তাহারা স্বর্গাদি-কামনায় ক্রিয়া-বিশেষ-বহুল ও জন্ম-কর্ম্ম-ফল-প্রদ বৈদিক যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান করে। অতএব এই বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা কামাত্মাগণ যদিও সেই কর্ম্মফলে স্বর্গে গতি লাভ করে, কিন্তু স্বর্গভোগান্তে আবার পুনর্জন্ম গ্রহণ করে। তবে কিরূপে বলা যায় যে, যজ্ঞার্থ কর্ম্ম বন্ধনের কারণ হয় না? এই প্রশ্নের উত্তরে উক্ত হইয়াছে যে, যজ্ঞ যদি সকামভাবে, নিজের ইহকালে ভোগসুখ-কামনায় ও পরকালে স্বর্গাদিসুখ-কামনায় অনুষ্ঠিত হয়, তবেই তাহা বন্ধনের কারণ হয়। আর যদি কেবল 'যজ্ঞের জন্য', অর্থাৎ যজ্ঞ কর্ত্তব্য ভাবিয়া তাঁহার অনুষ্ঠান জন্য কর্ম্ম করা যায়, তবে তাহা বন্ধনের কারণ হয় না। যজ্ঞের প্রধান প্রয়োজন যাহা, তাহা এই অধ্যায়ে ভগবান্ ইঙ্গিত করিয়াছেন। যজ্ঞের মধ্যে দেবযজ্ঞ দ্বারা দেবগণকে ভাবিত করিলে, তাঁহারা বৃষ্টি দ্বারা শস্য উৎপাদন করেন, ও সেই শস্য দ্বারা প্রজার উৎপত্তি ও বৃদ্ধি হয়। ইহা যজ্ঞের এক প্রয়োজন। যজ্ঞ সাধারণভাবে, মানবসমাজের রক্ষা ও উন্নতির জন্য প্রয়োজন। যাহা হউক, যজ্ঞ দ্বারা যজ্ঞকর্ত্তার গৌণ প্রয়োজনও সিদ্ধ হয়,—যজমানের ইহকালে সুখসমৃদ্ধি-ভোগ হয়, শত্রুজয় প্রভৃতি সিদ্ধি হয় ও পরকালে যজ্ঞকর্ম্মাদিজনিত পুণ্যহেতু স্বর্গভোগ হয়, এবং যজ্ঞাবশিষ্ট ভোজন দ্বারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করায় যজমান ক্রমে সর্ব্বপাপ হইতেও মুক্ত হন। ইহা গৌণ ফল।

যাহারা সকামী যজমান, তাহারা কেবল যজ্ঞের এই গৌণ ফল দেখিতে

পায়। যে প্রকৃতিজ রজোগুণের দ্বারা চালিত হইয়া কামনার বশে, অর্থাৎ ইহপরকালে ভোগসুখের আশায় কর্ম্ম করে, সে কখন নিষ্কামভাবে, কেবল কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে কর্ম্ম করিতে পারে না। তাহারা সুধু স্বার্থ ভাবিয়া কর্ম্ম করে, স্বেচ্ছায় পরার্থ কর্ম্ম করিতে পারে না। যজ্ঞ যখন সমগ্র সমাজের হিতের জন্য সমাজের সকলেরই অনুষ্ঠানের প্রয়োজন ছিল, তখন যাঁহারা সমাজের নেতা, তাঁহাদিগকে সমাজরক্ষার্থ, এই সকল সকাম সাধারণ লোককে যজ্ঞকর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করিতে হইত। দুই রূপে ইহা সম্ভব ছিল। ভগবান্ বলিয়াছেন সমাজের শ্রেষ্ঠ লোক যেরূপ আচরণ করে, সাধারণ লোক তাহার অনুবর্ত্তী হয়। এ তত্ত্ব পরে বিবৃত হইবে। শ্রেষ্ঠ লোক এই যজ্ঞাদি বিহিত কর্ম্ম স্বয়ং অনুষ্ঠান করিয়া সাধারণ লোককে সেই শ্রৌত যজ্ঞাদি কর্ম্মেও স্মার্ত্ত ইষ্টপূর্ত্তাদি কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করেন।

ইহার যাহা দ্বিতীয় উপায়, তাহা ভগবান্ বলেন নাই। বেদেই তাহার ইঙ্গিত আছে। সকাম সাধারণ লোক যখন পরার্থকর্ম্ম, কর্ত্তব্য কর্ম্ম, অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম—এ সব কিছুই বুঝে না, তখন ইহাদিগকে যজ্ঞের এই প্রয়োজন না বুঝাইয়া, তাহাদের যে এই যজ্ঞফলে স্বর্গলাভ হইবে, ইহপরকালে সুখভোগ হইবে, কেবল—যজ্ঞের এই গৌণফল মাত্র উপদেশ দেওয়া কর্ত্তব্য। তাহাদিগকে পুরস্কারের লোভ দেখাইয়া সে কর্ত্তব্য কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করা বিহিত। এই জন্য ব্রাহ্মণে উক্ত হইয়াছে—"স্বর্গকামো যজেত।" শ্রুতির এই বিধিবাদ যজ্ঞের প্ররোচনা মাত্র। যজ্ঞকালেও যজমানের অভিপ্রায়মত হোতা যে ঋগ্‌বেদ মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া দেবতাগণকে আহ্বান করিতেন, তাহাতেও দেবতাদের নিকট এই সকাম প্রার্থনা বেদ-সংহিতায় প্রায় প্রতি সূক্তেই পাওয়া যায়। ইহার প্রকৃত কারণ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া মীমাংসাকারগণ বলিয়াছেন যে, যেমন পীড়িত বালককে ঔষধ খাওয়াইতে হইলে, তাহাকে মিষ্টান্নের লোভ দেখাইতে হয়, ঔষধ সেবনের প্রয়োজন ও কর্ত্তব্য সম্বন্ধে যুক্তিপূর্ণ উপদেশে

কোন ফল হয় না, সেইরূপ সাধারণ সকাম লোককেও বৈদিক কর্ম্মে প্ররোচনার জন্য তাহাদের যজ্ঞফলে ইহপরকালে সুখ, সমৃদ্ধি প্রভৃতির লোভ দেখাইতে হয়, যজ্ঞের কর্ত্তব্য তাহাদিগকে বুঝাইলে কোন ফল হয় না। এইজন্য বেদে দেবতাদের নিকট নানারূপ প্রার্থনা আছে, যজ্ঞের নানারূপ ফলশ্রুতি আছে। যাহা হউক, এই সকল সকাম লোক যজ্ঞ করিয়া তাহাদের বাসনামত স্বর্গাদি ফল লাভ করে মাত্র। তাহাদের বুদ্ধি সমাধিতে বিহিত হয় না। এজন্য তাহাদের এই যজ্ঞকর্ম্মে বন্ধন হয়।

কিন্তু যাহারা নিষ্কাম—যাহারা কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে কর্ম্ম করিতে পারে, যাহাদের চিত্ত সত্ত্ব-বিবৃদ্ধি হেতু নির্ম্মল হওয়ায়, আর কাম-ক্রোধ রাগ-দ্বেষ প্রভৃতি দ্বারা চালিত হয় না, ভগবান্ তাহাদের সম্বন্ধেই বলিয়াছেন যে, যদি তাহারা যজ্ঞার্থ কর্ম্ম করে অর্থাৎ যজ্ঞই কর্ত্তব্য, এই বুদ্ধিতে যজ্ঞার্থ কর্ম্ম করে, তবে তাহাদের আর সে কর্ম্মে বন্ধন হয় না। তাহাদের সম্বন্ধেই ভগবানের এই উপদেশ। তাহারা এই মত অনুসরণ করিয়া যজ্ঞাদি কর্ম্ম করিবে, অথবা যজ্ঞ করিতে হইবে বলিয়া অর্থাদি ও উপকরণাদি সংগ্রহার্থ কর্ম্ম করিবে, তাহাতে কর্ম্মবন্ধন হইবে না। যজ্ঞাবশিষ্টভোজী হইলে শরীরযাত্রারও কোন বাধা হইবে না, অথচ ক্রমে কর্ম্মযোগ অভ্যস্ত হইবে—চিত্ত শুদ্ধ হইবে।

যাহা হউক, যাহাদের চিত্ত শুদ্ধ হয় নাই বা সম্পূর্ণ সাত্ত্বিক হয় নাই, যাহাদের শরীরযাত্রা নির্ব্বাহ জন্য কর্ম্মের প্রয়োজন আছে,—এক কথায় যাহাদের স্বার্থবুদ্ধি আছে, তাহারা এইরূপে যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা ক্রমে চিত্তশুদ্ধি লাভ করে। শরীরযাত্রা নির্ব্বাহ জন্য সকামভাবে যজ্ঞার্থ কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে গিয়াও নিজের স্বার্থ সংকুচিত করিয়া ক্রমে পরার্থ কর্ম্ম করিবার উপযুক্ত হয়। এজন্য তাহাদের পক্ষে এইরূপ কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে যজ্ঞার্থ কর্ম্ম করা প্রয়োজন,—ইহা বুঝিতে পারা যায়।

কিন্তু যাঁহাদের চিত্ত শুদ্ধ, নির্ম্মল, যাঁহারা কাম ত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহারা কি যজ্ঞাদি বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেন না? যাঁহারা "অকাম নিষ্কাম, আপ্তকাম, আত্মকাম" (বৃহদারণ্যক, ৪।৪।৬), যাঁহারা আত্মরত আত্মতৃপ্ত, আত্মাতেই সন্তুষ্ট, তাঁহাদের ইহপরকালের সুখের জন্য, বা শরীরযাত্রা নির্ব্বাহ জন্য কোনরূপ কর্ম্মের প্রয়োজন থাকে না, তাঁহাদের নিজের জন্য—স্বার্থের জন্য কোন কর্ম্ম করিতে হয় না। তাঁহাদের কর্ম্ম দ্বারা বা কর্ম্মত্যাগ দ্বারা কোন অর্থ বা নিজের প্রয়োজন সিদ্ধি হয় না, অর্থাৎ দেব-মনুষ্যাদির মধ্যে স্বার্থ জন্য তাঁহাদের কাহারও আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় না। তাঁহারা নির্যোগক্ষেম অর্থাৎ শরীরযাত্রা নির্ব্বাহ জন্যও কোন বস্তুর সংগ্রহ বা রক্ষা তাঁহাদের প্রয়োজন বোধ হয় না। তাঁহারা সে সম্বন্ধে উদাসীন থাকিলেও এবং কোন চিন্তা না করিলেও, ভগবান্ তাঁহাদের যোগক্ষেম বহন করেন, ইহা ভগবান্ পরে বলিয়াছেন।

তবে কি তাঁহারা যজ্ঞার্থ কর্ম্ম করিবেন না? যাঁহারা উক্তরূপ জ্ঞানী গৃহস্থ, তাঁহারা কি তবে দ্রব্যত্যাগরূপ যজ্ঞ বা কোনরূপ যজ্ঞ করিবেন না? অথবা যাঁহারা গৃহাশ্রমবিহিত কর্ম্ম শেষ করিয়া বানপ্রস্থ বা সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারাও কি তপোযজ্ঞ, যোগযজ্ঞ, জ্ঞানযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবেন না? ইহার উত্তরে ভগবান্ বলিয়াছেন যে, সেই সকল জ্ঞানী আপ্তকাম, আত্মতৃপ্ত ব্যক্তির কোনরূপ স্বার্থ কর্ম্ম না থাকিলেও তাঁহারা অসক্ত হইয়া পরার্থ কর্ত্তব্য কর্ম্মের সতত অনুষ্ঠান করিবেন, এবং তাহা দ্বারাই তাঁহারা পরম শ্রেয় লাভ করিবেন। জ্ঞানযোগীরও কর্ম্মযোগানুষ্ঠান কর্ত্তব্য,—যজ্ঞার্থ কর্ম্মানুষ্ঠান সকলেরই কর্ত্তব্য।

জ্ঞানী যে কেবল যজ্ঞার্থ কর্ম্ম করিবেন, তাহা নহে। যে কর্ম্ম 'কার্য্য' বা কর্ত্তব্য বলিয়া বিহিত, পরহিতার্থ তিনি তাহারই আচরণ করিবেন। সেইরূপ 'কার্য্য' কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারাই সংসিদ্ধি লাভ হয়। রাজর্ষি জনকাদি

ইহার দৃষ্টান্ত। তাঁহারা জ্ঞানী হইয়াও কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠান করিতেন,— 'কার্য্য' কর্ম্ম করিতেন।

ষষ্ঠ কারণ—জ্ঞানীর পক্ষে, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির পক্ষে, সমাজের শীর্ষ-স্থানীয় লোকের পক্ষে লোকসংগ্রহের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান কর্ত্তব্য। ইহা কর্ম্মযোগানুষ্ঠানের ষষ্ঠ কারণ। লোকসংগ্রহ কাহাকে বলে, তাহা আমরা পূর্ব্বে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। এক কথায় লোকসংগ্রহের অর্থ মনুষ্য-সমাজ। সেই সমাজের রক্ষার্থ সকলের— বিশেষতঃ যাঁহারা জ্ঞানী, যাঁহারা সমাজের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও শীর্ষস্থানীয়,— তাঁহাদের কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য। সমাজে সাধারণ লোক সকলেই অজ্ঞান— কর্ম্মসঙ্গী। প্রকৃতি অর্থাৎ প্রকৃতিজ গুণ তাহাদিগকে যেরূপ কর্ম্মে পরিচালিত করে, তাহারা সেইরূপ কর্ম্ম করে। তাহারা প্রায় সকলেই তামসিক বা রাজসিক প্রকৃতি-যুক্ত। এই প্রকৃতির বশে তাহারা কাম ক্রোধ, রাগ দ্বেষ বা মোহ দ্বারা পরিচালিত হইয়া কর্ম্ম করে। বাস্তবিক তাহাদের প্রকৃতিই সর্ব্বরূপে সর্ব্বকর্ম্ম করে, কিন্তু তাহারা অহঙ্কারবশে— আসক্তিবশে মুগ্ধচিত্ত হইয়া আপনাকে সেই প্রকৃতির গুণজ কর্ম্মে কর্ত্তা মনে করে।

কিন্তু এই সকল লোকের বিশেষত্ব এই যে, ইহাদের মধ্যে যাহারা তামস-প্রকৃতি, তাহারা স্থিতিশীল—প্রায়ই অকর্ম্মা বা নিষ্কর্ম্মা। আর যাহারা রাজস প্রকৃতি, তাহারা কর্ম্মী। সমাজের অধিকাংশ লোক এই শ্রেণীর। ইহারা কর্ম্মে প্রবৃত্ত, কিন্তু নিজে বুদ্ধিপূর্ব্বক, বিচার করিয়া কর্ত্তব্য-অকর্ত্তব্য স্থির করিতে পারে না,—কোন্ কর্ম্ম শুভ, কোন্ কর্ম্ম অশুভ, তাহা তাহারা নিজ বুদ্ধিতে বুঝিতে পারে না। তাহারা শাস্ত্রবিধিও বড় জানে না ও মানে না। কিন্তু তাহারা অনুকরণপ্রিয় হয়। তাহারা যাঁহাকে মান্য করে, তাঁহারই অনুবর্ত্তন করে। তাহারা যাঁহাকে আদর্শ মনে করে, তাঁহারই অনুকরণ করে। ইহা তাহাদের স্বভাব। এই

সাধারণ লোক সমাজের মধ্যে যাঁহাদিগকে অনুসরণ করে, তাঁহাদিগকে এক অর্থে শ্রেষ্ঠ বলা যায়। এই শ্রেষ্ঠ লোক দুই শ্রেণীর। এক শ্রেণী কর্ম্মী, আর এক শ্রেণী জ্ঞানী। যাঁহারা কর্ম্মী বা কর্ম্মযোগী, তাঁহারা যেরূপ কর্ম্ম করেন, সাধারণ লোক তাহারই অনুকরণ করিয়া কর্ম্ম করে। আর যাঁহারা জ্ঞানী, তাঁহারা যাহা কর্ত্তব্য বা অকর্ত্তব্য বলিয়া প্রমাণ করেন বা উপদেশ দেন, সাধারণ লোক তাহাই আপ্ত বাক্যের ন্যায় প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করে।

ইংরাজীতে এক প্রবাদ আছে যে, উপদেশ অপেক্ষা দৃষ্টান্ত অধিক ফলপ্রদ। এজন্য শ্রেষ্ঠ লোক যেরূপ আচরণ করেন, সাধারণ লোক তাহা দৃষ্টান্তস্বরূপ গ্রহণ করে। তাঁহাদের আচার ব্যবহার দ্বারাই সমাজের সাধারণ লোক পরিচালিত হয়। বাস্তবিক সাধুগণের সদাচার ধর্ম্মের এক লক্ষণ ও ধর্ম্মের মূল। মনু বলিয়াছেন—

"বেদোঽখিলো ধর্ম্মমূলং স্মৃতিশীলে চ তদ্‌বিদাম্।
আচারশ্চৈব সাধূনামাত্মনস্তুষ্টিরেব চ॥

* * *

বেদঃ স্মৃতিঃ সদাচারঃ স্বস্য চ প্রিয়মাত্মনঃ।
এতচ্চতুর্বিধং প্রাহুঃ সাক্ষাদ্ধর্ম্মস্য লক্ষণম্॥"

—মনুসংহিতা, দ্বিতীয় অধ্যায়, ৬, ১২ শ্লোক।

এইজন্য ভগবান্ বলিয়াছেন যে, শ্রেষ্ঠগণের মধ্যে যাঁহারা জ্ঞানী-বিদ্বান্, তাঁহারা লোকসংগ্রহের অভিপ্রায়ে, অর্থাৎ সমাজের সাধারণ লোককে স্বধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত রাখিবার জন্য অসক্তভাবে স্ব স্ব কর্ম্মানুষ্ঠান করিবেন, তাঁহারা কোনরূপে অজ্ঞান কর্ম্মসঙ্গী লোকদের 'বুদ্ধিভেদ' করিবেন না, এবং নিজে কর্ম্ম করিয়া দৃষ্টান্ত দিয়া ও উপদেশ দ্বারা তাহাদিগকে সর্ব্বকর্ম্মে যোজনা করিবেন। যাঁহারা গুণ ও কর্ম্মের বিভাগ-তত্ত্বজ্ঞ, এবং প্রকৃতির গুণই গুণে প্রবর্ত্তিত হয়—ইহা জানেন, অর্থাৎ প্রকৃতিজ গুণ দ্বারাই সর্ব্ব-

রূপে সর্ব্বকর্ম্ম কৃত হয়—ইহা জানেন, তাঁহারা কোন্ শ্রেণীর লোক, কোন্ গুণপ্রধান এবং সেই গুণানুসারে তাহাদের কোন্ কর্ম্ম স্বাভাবিক, তাহা জানিয়া লোকদের সেই স্বাভাবিক কর্ম্ম নিয়মিত করেন, এবং নিজেও আত্মরত হইয়া, আপনার অকর্তৃত্ব ও প্রকৃতির গুণের কর্তৃত্ব জানিয়াও নিজে বিহিত কর্ম্ম করেন, অর্থাৎ স্বপ্রকৃতিকে সেই কর্ম্মে নিয়মিত করিয়া সাধারণ লোকের নিয়ন্তা হন। ইহাতেই সমাজ বিধৃত হয়। অতএব লোকসংগ্রহের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া যাঁহারা সাংখ্যজ্ঞানী, তাঁহাদেরও বিহিত কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য।

সপ্তম কারণ—ভগবানের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়াও জ্ঞানীর কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য। লোকসংগ্রহার্থ অর্থাৎ মনুষ্যসমাজের রক্ষার্থ কর্ম্ম যে কর্ত্তব্য, তাহা ভগবান্ নিজের দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়াছেন। ভগবান্ পূর্ণ,—আপ্তকাম। ত্রিলোকে তাঁহার কোন কর্ত্তব্য নাই, কেন না তাঁহার নিজের কিছুই অপ্রাপ্ত বা প্রাপ্তব্য নাই, অথচ তিনি সমাজধর্ম্মরক্ষার্থ কর্ম্মনিরত। তিনিই সমাজাত্মা, সমাজ তাঁহাতেই প্রতিষ্ঠিত। তিনি সেই মানবসমাজরক্ষার্থ নিয়ত কর্ম্মে নিরত। মানুষ সর্ব্বরূপে তাঁহারই নির্দ্দিষ্ট পথ অনুসরণ করে। তিনি অন্তর্যামিরূপে সর্ব্বজীবহৃদয়ে অবস্থিত থাকিয়া, সকলকে সেই নির্দ্দিষ্ট পথ দেখাইয়া দিয়া, সেই পথে পরিচালিত করেন। যখন সে পথ লোকে দেখিতে পায় না, অন্তর্যামী ভগবানের নিয়ন্তৃত্ব বুঝিতে পারে না, যখন লোকে উন্মার্গগামী হয়, সমাজের বিশৃঙ্খলা হয়, ধর্ম্মের গ্লানি হয়, তখন তিনি স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া মানুষকে সেই কর্ম্মপথ দেখাইয়া দেন।

ভগবান্ যদি আপ্তকাম বলিয়া, এবং তাঁহার নিজের কোন কর্ত্তব্য নাই বলিয়া, লোকসংগ্রহার্থ কর্ম্ম না করিতেন, এবং স্বীয় কর্ম্মশক্তি সংবরণ করিতেন, তবে লোকেরাও কর্ম্মশক্তিহীন হইয়া কর্ম্মপথ হইতে বিচ্যুত হইত। ভগবান্ যদি ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থানকালে ধর্ম্ম-

সংস্থাপন জন্য অবতীর্ণ না হইতেন, অথবা অবতীর্ণ হইয়াও যদি কর্ম্মপথ না দেখাইতেন, তবে লোক আরও উন্মার্গগামী হইত, অথবা তাঁহারই কর্ম্ম-সন্ন্যাসের পথ অনুবর্ত্তন করিত, কিংবা স্বধর্ম্মাচরণ না করিয়া যথেচ্ছা-চরণ করিত। তাহার ফলে কর্ম্ম-সাংকর্য্য হেতু এই লোকসমাজ উৎ-সন্ন যাইত, ও ধ্বংসের পথে নীত হইত। তাই ভগবান্ প্রয়োজন মত অবতীর্ণ হইয়া নিজে বর্ণ ও আশ্রমোচিত কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া, লোককে দৃষ্টান্ত ও উপদেশ দিয়া, তাহাদের স্বধর্ম্মাচরণ-প্রবৃত্তি রক্ষা করিয়া, আবার ধর্ম্ম সংস্থাপন করেন। ভগবান্ এইজন্য অর্জ্জুনকে তাঁহার নিজের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া লোকসংগ্রহার্থ কর্ম্ম করিতে উপদেশ দিয়াছেন। এ দৃষ্টান্ত আমাদের সকলেরই অনুসরণীয়। যিনি জ্ঞানী, বা সাংখ্যযোগী, যিনি স্থিতপ্রজ্ঞ, আত্মসংস্থ, তাঁহার কোন কর্ম্ম না থাকিলেও, ভগবানের এই দৃষ্টান্ত ও উপদেশ অনুসারে তাঁহারও লোকহিতার্থ কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য। তিনি নিষ্কামভাবে অনাসক্ত হইয়া পরার্থ কর্ম্ম করিবেন। তাঁহার কোন স্বার্থ, কোন কামনা, কোনরূপ নিজের প্রয়োজন না থাকিলেও, তিনি কর্ম্মত্যাগ না করিয়া সমাজের হিতের জন্য, এবং পারেন ত জগতের হিতের জন্য, ভগবানের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া অবশ্য কর্ম্ম করিবেন, ভগবানের কর্ম্মে সহায় হইবেন,—ঈশ্বরার্থ কর্ম্ম করিবেন।

পরে ভগবান্ তাঁহার স্বরূপ ও ভক্তিযোগের কথা বুঝাইয়াছেন। যিনি ভগবদ্ভক্ত ঈশ্বরে পরানুরক্ত, তিনি অবশ্য ভগবানের এই দৃষ্টান্ত ও উপদেশ গ্রহণ করেন। তিনি অবশ্য ভগবানের এই লোকসংগ্রহার্থ কর্ম্মে ভগবানের যন্ত্রস্বরূপে, নিমিত্তস্বরূপে বা সহায়স্বরূপে ব্রতী হন। তিনি স্বধর্ম্মাচরণ করিয়া সাধারণ লোককে স্বধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত করান। যাঁহা হইতে ভূতগণের প্রবৃত্তি, সেই ভগবান্‌কে স্বকর্ম্ম দ্বারাই তিনি অর্চ্চনা করেন (১৮।৪৬)। সেই অর্চ্চনাই ভগবানের প্রকৃত অর্চ্চনা। তাহার দ্বারাই মানব পরিণামে সিদ্ধি লাভ করে।

এইজন্য ভগবান্ তাঁহার ভক্তদিগকে এই মত অনুসরণ করিতে উপদেশ দিয়াছেন, এবং বলিয়াছেন যে, তাঁহার প্রতি অসূয়াবশে যে এই মতকে অবজ্ঞা করে ও ইহার অনুবর্ত্তী না হয়, সে সর্ব্বজ্ঞানবিমূঢ় ও নষ্টচিত্ত। অতএব যিনি সাংখ্যযোগী, যিনি সন্ন্যাসী, তিনি যদি ভ্রমবশে কর্ম্মযোগ নিম্নাধিকারীর কর্ত্তব্য মনে করিয়া, ও আপনাকে উচ্চাধিকারী ভাবিয়া কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠান না করেন, এবং ভগবানের এই মত সম্বন্ধে অসূয়াযুক্ত হন, তবে তিনিও সর্ব্বজ্ঞানবিমূঢ় হইয়া নষ্টচিত্ত হইবেন. ইহাই ভগবানের উপদেশ। জ্ঞানীর পক্ষে কর্ম্মত্যাগ না করার ইহাই সপ্তম কারণ।

অষ্টম কারণ—যিনি জ্ঞানী তত্ত্বদর্শী, তিনি ত অহঙ্কারবশে আপনাকে কর্ত্তা মনে করিয়া অভিমানযুক্ত হন না। তিনি জানেন যে, তাঁহার সহিত সংযুক্ত প্রকৃতির গুণ দ্বারাই কর্ম্ম হইয়া থাকে। তাঁহার সেই প্রকৃতিই তাঁহার হৃদয়াধিষ্ঠিত ভগবানের নিয়ন্তৃত্বে কর্ম্ম করে। সুতরাং অন্তর্যামী ঈশ্বরের অভিপ্রায় বুঝিয়া, তিনি যদি সেই প্রকৃতিকে নিয়মিত করিয়া, কর্ম্ম করিবার জন্য ঈশ্বরের সহায় হন, তাঁহার স্ব-প্রকৃতিকে বশীভূত করিয়া তাহাকে বিহিত ও কর্ত্তব্য কর্ম্মে নিয়মিত করেন, তবে তাহাতে তাঁহার স্বরূপে বা আত্মস্বরূপে অবস্থান হইতে প্রচ্যুতি হয় না, এবং প্রকৃতি তাঁহার বশীভূত হইয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত থাকায়, আর উন্মার্গগামী হইতে পারে না। তিনি প্রকৃতিজ গুণ সকলকে তাহাদের স্বীয় স্বীয় বৃত্তিতে নিয়মিত করিলে, তাঁহার অকর্ত্তা—বা প্রকৃতির কর্ম্মে আপনার নির্লিপ্ত ভাবের বাধা হয় না। তিনি সে কর্ম্মে আসক্ত হন না।

আমরা এস্থলে বলিতে পারি যে, প্রকৃতিকে বশীভূত করিয়া উপযুক্ত রূপে পরিচালিত করিয়াই মুক্তির পথে অগ্রসর হইতে হয়। প্রকৃতিকে ত্যাগ করিতে গিয়া প্রকৃতির স্বাভাবিক কুকর্ম্মে বা সুকর্ম্মে উদাসীন থাকিলে মুক্তি লাভ করা যায় না। অবশ্য যিনি স্বপ্রকৃতির ক্রম অপূরণে

ও সাধনা বলে সত্ত্বগুণপ্রধান হইয়াছেন, তাঁহার পক্ষেই সাধনা বলে স্বপ্রকৃতিকে বশীভূত করিয়া, তাহাকে পরিচালিত করা সম্ভব। কিন্তু যিনি রজঃ বা তমোগুণ-প্রধান, তিনি তাহা পারেন না। তিনি জ্ঞানী হইতে পারেন না,—কর্ত্তব্য বুদ্ধি দ্বারা রজোগুণজ কর্ম্মকে পরিচালিত করিতে পারেন না। যিনি সত্ত্বপ্রধান তিনিই তাহা পারেন। অর্থাৎ যখন তাঁহার প্রকৃতিতে রজোগুণের বিকাশ হইয়া কর্ম্ম হয়, তখন তাহা নিয়মিত করিতে পারেন, আর যখন তমোগুণের সমুদ্রেক হয়, তখন তাহাকেও নিয়মিত করিতে পারেন।

আমরা আরও বলিতে পারি যে, যাহাদের সত্ত্ববৃদ্ধি হেতু চিত্ত নির্ম্মল হইয়াছে, সেই চিত্তে সচ্চিদানন্দঘন আত্মা প্রতিবিম্বিত হইয়া, তাহাতে তিনটি রূপ বৃত্তির বিকাশ হয়,—জ্ঞানবৃত্তি, কর্ম্মবৃত্তি ও সুখ ভোগের জন্য ইচ্ছাবৃত্তি। সকলের এই তিন বৃত্তির সমান বিকাশ হয় না। এজন্য এই বৃত্তি হেতু কেহ জ্ঞানী, কেহ কর্ম্মী, কেহ ভোগী হয়। অর্থাৎ কেহ জ্ঞান-প্রধান, কেহ কর্ম্ম-প্রধান, কেহ বা ভোগ-প্রধান হয়। জ্ঞানযোগ দ্বারা এই জ্ঞানকে নিয়মিত করিতে হয়, কর্ম্মযোগ দ্বারা কর্ম্মকে নিয়মিত করিতে হয় এবং ভক্তিযোগ দ্বারা ভোগবৃত্তিকে নিয়মিত করিতে হয়। প্রকৃতিপুরুষ বিবেক-জ্ঞান দ্বারা এই নিয়মন সম্ভব হয়। ইহার ফলেই জ্ঞানের পূর্ণ স্ফূর্ত্তি ও পরিণতি হয়, কর্ম্মের পূর্ণ স্ফূর্ত্তিও পরিণতি হয় এবং আনন্দের পূর্ণ স্ফূর্ত্তি ও পরিণতি হয়। মানুষ এই জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তি-বৃত্তির সাধনা বলে ক্রমে জ্ঞান কর্ম্ম ও আনন্দের পূর্ণরূপ বা সচ্চিদানন্দ স্বরূপ পূর্ণাদর্শের দিকে অগ্রসর হইতে পারে। যাউক, সে তত্ত্ব এস্থলে বুঝিবার আবশ্যক নাই। কিন্তু ইহাই গীতার মূল সূত্র। পরে ইহা বিবৃত হইবে।

যাহা হউক, এস্থলে কেবল কর্ম্মবৃত্তির কথা উক্ত হইতেছে। এই কর্ম্মবৃত্তির বিকাশ ও পরিণতির জন্য, কর্ম্মীর পূর্ণাদর্শ যে ভগবান্‌, তাঁহার

স্বরূপত্ব লাভ করিবার জন্য কিরূপে কর্ম্মযোগ সাধনা করিতে হয়, এস্থলে তাহাই উপদিষ্ট হইয়াছে। আমাদের কর্ম্মবৃত্তিকে রাগ-দ্বেষ, সুখ দুঃখ কাম-ক্রোধাদির বন্ধন হইতে মুক্ত করিতে পারিলে, তবে প্রকৃত কর্ম্ম শক্তির বিকাশ হয় ও তাহার উপযুক্ত পরিণতি হয়। নিজের উদর পূরণ জন্য যে কর্ম্মশক্তির প্রয়োজন, যে ব্যক্তি তাহারও অভাব বোধ করে, সেও এই সাধনা বলে ক্রমে আপনার লোকের জন্য, সমাজের জন্য, দেশের জন্য, সমগ্র মানব জাতির জন্য কর্ম্ম করিবার শক্তি লাভ করে। সে এই কর্ম্মযোগ সাধনা করিয়া ঐশ্বরীয় কর্ম্মশক্তি লাভ করিতে পারে। ভগবান্ নিজের দৃষ্টান্ত দিয়া তাহা বুঝাইয়াছেন।

নবম কারণ—ভগবান্ আরও বলিয়াছেন যে, যাঁহারা জ্ঞানী. তাঁহারা সাংখ্যবুদ্ধিতে আপনাকে প্রকৃতি হইতে ভিন্ন জানিয়া নির্লিপ্ত ভাবে থাকিলেও, তাঁহাদের প্রকৃতি স্বতঃই তাহার (প্রকৃতির) অনুরূপ কর্ম্মাদি চেষ্টা করে। প্রকৃতির যাহা ধর্ম্ম, তাহা রুদ্ধ করা যায় না। প্রকৃতির কর্ম্মচেষ্টা স্বাভাবিক বলিয়া, তাহা একেবারে সংযত করা যায় না। ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সম্পর্ক হইলে, সেই বিষয় সম্বন্ধে যেমন জ্ঞান উৎপন্ন হয়, সেইরূপ সেই বিষয় সম্বন্ধে রাগ বা দ্বেষ উৎপন্ন হয়। ইহা আমাদের প্রকৃতির স্বভাবিক ধর্ম্ম। যিনি জ্ঞানী, তিনি এই রাগদ্বেষকে বশীভূত করিতে পারেন, যাহাতে তাহাদের বশীভূত না হইতে হয়, সাধনা-বলে তাহাতে সমর্থ হইতে পারেন বটে, কিন্তু প্রকৃতির স্বাভাবিক কর্ম্মপ্রবৃত্তিকে একেবারে দমন করিতে পারেন না। সুতরাং জ্ঞানী এই রাগদ্বেষকে সম্পূর্ণ বশীভূত করিয়া প্রকৃতির কর্ম্মপ্রবৃত্তিকে নিয়মিত করিবেন।

প্রকৃতির যে কর্ম্ম স্বাভাবিক, সেই বিহিত কর্ম্মেই জ্ঞানী তাঁহার প্রকৃতিকে নিয়মিত করিবেন। এই কর্ম্মের নাম স্বধর্ম্ম। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, প্রকৃতি সত্ত্বরজস্তমোময়ী। কোন ব্যক্তির প্রকৃতি সত্ত্বপ্রধান, তাহার রজস্তমোগুণ অভিভূত। কোন ব্যক্তি রজঃপ্রধান, তাহার সত্ত্বতমোগুণ

অভিভূত ও কোন ব্যক্তি তমঃপ্রধান, তাহার সত্ত্বরজোগুণ অভিভূত। যে সাত্ত্বিক প্রকৃতিযুক্ত, তাহার সেই প্রকৃতির অনুযায়ী গুণ ও কর্ম্মে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হয়, যে রাজসিকপ্রকৃতিযুক্ত, তাহার সেই প্রকৃতির অনুযায়ী গুণ ও কর্ম্মে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হয়, এবং যে তমোগুণপ্রধান, তাহারও তদনুযায়ী গুণ ও কর্ম্মে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হয়। তাহা পরে চতুর্দ্দশ, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। যিনি সত্ত্বগুণপ্রধান, তাঁহার রজঃ ও তমোগুণ একেবারে নিঃশেষে অভিভূত হইতে পারে না, তবে সত্ত্বগুণের প্রাধান্য হেতু তাহাদের বৃত্তি ও কার্য্য নিয়মিত হইতে পারে।

যাহার যে গুণের প্রাধান্য, সেই গুণের অনুযায়ী কর্ম্ম তাহার পক্ষে স্বাভাবিক ও সহজ। তদনুসারে শাস্ত্রে তাহার বর্ণবিভাগ হইয়াছে ও বর্ণানুযায়ী কর্ম্মবিভাগ হইয়াছে। শাস্ত্রে বিহিত সেই বর্ণানুযায়ী কর্ম্ম আচরণ করা তাহার পক্ষে স্বাভাবিক ও সহজ। অতএব যিনি জ্ঞানী বা বিদ্বান্, তিনি রাগদ্বেষবিযুক্ত হইয়া তাঁহার প্রকৃতিকে সেই শাস্ত্রবিহিত স্বাভাবিক কর্ম্মে নিয়মিত করিবেন। ইহাই স্বধর্ম্মাচরণ। এইজন্য ভগবান্ স্বধর্ম্ম আচরণের উপদেশ দিয়াছেন ও পরধর্ম্ম—অর্থাৎ স্বপ্রকৃতির প্রতিকূল পরধর্ম্ম আচরণকে ভয়াবহ বলিয়াছেন।

যাহা হউক, এই স্বধর্ম্মাচরণেও বিঘ্ন আছে। অনেক সময় সে কর্ম্ম বিগুণ বোধ হয়। অর্জ্জুনের এই ধর্ম্মযুদ্ধ স্বধর্ম্ম হইলেও, তাহা অর্জ্জুনের নিকট বিগুণ ঘোর ও ভয়াবহ বোধ হইয়াছিল। আমাদের সকলের পক্ষেই অনেক সময় অনেক স্বধর্ম্মাচরণ—অনেক কর্ত্তব্যকর্ম্মানুষ্ঠান এইরূপ বিগুণ ও দুঃখকর বোধ হয়, এবং এজন্য অনেক সময় তাহাতে অপ্রবৃত্তিও উপস্থিত হয়। এই অপ্রবৃত্তি নিবারণ জন্য ভগবান্ অর্জ্জুনকে উপদেশ দিয়াছেন যে, স্বধর্ম্ম বিগুণ হইলেও, তাহা দ্বারা ঈশ্বরকে অর্চ্চনা করিতেছি—এই বুদ্ধিতে পরমেশ্বরে সর্ব্ব কর্ম্ম অধ্যাত্মচিত্তে সংন্যাস-পূর্ব্বক সর্ব্বরূপ ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া ও নির্ম্মম হইয়া তাহা আচরণ

কর ও এই উপস্থিত স্বধর্ম্ম যুদ্ধ কর। ইহা হইতে আমরাও উপদেশ পাই যে, সর্ব্ব কর্ম্ম ঈশ্বরে সমর্পণপূর্ব্বক তাঁহার অর্চ্চনার্থ ও তোষণার্থ নিষ্কাম, নির্ম্মম ও আত্মসংস্থ হইয়া, স্বধর্ম্মানুষ্ঠানরূপ কর্ম্মযোগ বিগুণ ও আপাত-দুঃখকর হইলেও আমাদের কর্ত্তব্য। এই ঈশ্বরে অর্পণ-বুদ্ধিতে স্বধর্ম্মাচরণ করিতে শিক্ষা করিলে, মানুষ ক্রমে চিত্তশুদ্ধি দ্বারা ঈশ্বরে ভক্তিমান্ হইয়া তত্ত্বজ্ঞান লাভপূর্ব্বক শ্রেয়োলাভ করে। এইজন্য ঈশ্বরার্পণ-বুদ্ধিতে কর্ম্মযোগে স্বধর্ম্ম অনুষ্ঠেয়। কর্ম্মযোগানুষ্ঠানের ইহাই নবম কারণ।

এইরূপে উক্ত কয়েকটি কারণ প্রদর্শনপূর্ব্বক কর্ম্মযোগানুষ্ঠান যে কর্ত্তব্য, তাহা ভগবান্ অর্জ্জুনকে বুঝাইয়াছেন। যাঁহাদের প্রকৃতি অনেকটা সাত্ত্বিক হইয়াছে, যাঁহাদের রজস্তমঃপ্রকৃতি—প্রকৃতিরই সত্ত্ব-গুণ দ্বারা অনেকটা অভিভূত হইয়াছে, যাঁহাদের মধ্যে প্রকৃতির সত্ত্ব-গুণ রজস্তমোগুণের সহিত সংগ্রাম করিয়া, তাহাদিগকে কতক পরিমাণে পরাভূত করিতে পারিয়াছে, যাঁহাদের চিত্তের রজস্তমোমলা অনেক পরিমাণে দূর হওয়ায় চিত্ত নির্ম্মল ও শুদ্ধ হইয়াছে, যাঁহাদের বুদ্ধি সাত্ত্বিক হইয়া জ্ঞান, ঐশ্বর্য্য, ধর্ম্ম ও বৈরাগ্যস্বরূপে প্রকাশিত হইয়াছে, যাঁহারা স্বর্গাদি সমুদায় কামনা ত্যাগ করিয়া জ্ঞানার্থী, মোক্ষার্থী হইয়াছেন, তাঁহা-দের পক্ষে জ্ঞাননিষ্ঠায় স্থিতির জন্য কর্ম্মযোগানুষ্ঠান কর্ত্তব্য। সেইরূপ যাঁহারা প্রকৃতি ও প্রকৃতিজ গুণের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া স্থিত-প্রজ্ঞ ও ত্রিগুণাতীত হইয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষেও লোকসংগ্রহার্থ, জগচ্চক্র-প্রবর্ত্তনার্থ, জগৎ রক্ষার্থ সমাজের ধর্ম্মরক্ষার্থ ঈশ্বরের কর্ম্মের সহায় হইবার জন্য, তাঁহার নিমিত্তমাত্র হইবার জন্য, ভগবানের দৃষ্টান্তে কর্ম্ম করা আবশ্যক। যিনি সাংখ্যজ্ঞানী, যিনি যোগারূঢ়, তাঁহারও কর্ম্মযোগ-নিষ্ঠা ত্যাগ করিতে নাই।

গীতোক্ত দুই নিষ্ঠা —যোগশাস্ত্র গীতায় যোগীদিগকে সাধারণতঃ

দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে—বলিতে পারা যায়। এই দুই শ্রেণীর যোগীদের নিষ্ঠাও দুইরূপ,—সাংখ্যযোগীদের জ্ঞানযোগে নিষ্ঠা ও কর্ম্মযোগীদের কর্ম্মযোগে নিষ্ঠা। ইহা ভগবান্ এই অধ্যায়ের প্রথমেই বলিয়াছেন। সাংখ্যযোগীদের আত্মযোগী বলা যায়, এবং কর্ম্মযোগীদের ঈশ্বরযোগী বলা যায়। সাংখ্যজ্ঞানীদেব মধ্যে যাঁহারা নিরীশ্বর, তাঁহারা ত ঈশ্বর স্বীকার করেন না। আর যাঁহারা সেশ্বর, তাঁহারা নিত্য ঈশ্বর স্বীকার করেন। পাতঞ্জল দর্শনকে সেশ্বর সাংখ্যদর্শন বলে। যাহা হউক, এই উভয় শ্রেণীর সাংখ্যজ্ঞানীই প্রধানতঃ আত্মযোগী। তাঁহারা মুক্তির জন্য নিজের জ্ঞান ও সাধনার উপর নির্ভর করেন, ভগবানের উপর নির্ভর করেন না। আর যাঁহারা ঈশ্বরযোগী, তাঁহারা ঈশ্বরের উপরেই মুক্তির জন্য সম্পূর্ণ নির্ভর করেন। আত্মযোগীদের সম্বন্ধে আত্মতত্ত্ব ও আত্মজ্ঞান-সাধন বিবিধযোগ বা সাধনোপায়, গীতার প্রথম ছয় অধ্যায়ে প্রধানতঃ বিবৃত হইয়াছে। আর ঈশ্বরযোগীদের সম্বন্ধে ঈশ্বর-তত্ত্ব ও ঈশ্বর-প্রাপ্তির উপায়ভূত ভক্তিযোগ প্রভৃতির সাধন গীতার দ্বিতীয় ষট্‌কে উক্ত হইয়াছে। ভগবান্ এই দুই শ্রেণীর যোগীদের মধ্যে ঈশ্বরযোগীদিগকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন।

কর্ম্মযোগ সকলের অনুষ্ঠেয় —যাহা হউক, যাঁহারা সাংখ্যজ্ঞানী আত্মযোগী, ভগবান্ তাঁহাদিগকে কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে পরহিতার্থ কর্ম্মযোগানুষ্ঠানের উপদেশ দিয়াছেন, আর যাঁহারা ঈশ্বরযোগী, তাঁহাদিগকে ঈশ্বরার্পণ-বুদ্ধিতে ঈশ্বরার্থ কর্ম্মযোগ সাধন করিবার উপদেশ দিয়াছেন। কর্ম্মযোগ সকলের পক্ষেই বিহিত।

ভগবান্ যে যে কারণে এই কর্ম্মযোগানুষ্ঠানের উপদেশ দিয়াছেন, তাহা এস্থলে বিবৃত হইল। পূর্ব্বে তাহা সংক্ষেপে উক্ত হইয়াছে। আমরা বলিতে পারি যে, সে কারণ প্রধানতঃ পাঁচটি। যথা,—

১। কর্ম্ম না করিয়া কেহ ক্ষণকাল থাকিতে পারে না। প্রকৃতির

গুণ দ্বারাই কর্ম্ম হয়। প্রকৃতির রজোগুণ চঞ্চল, নিয়ত কর্ম্মে প্রবৃত্ত। আমরা যখন এই প্রকৃতিসংযুক্ত, তখন আমরা ক্ষণকালও কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারি না।

২। কর্ম্ম না করিলে শরীরযাত্রা নির্ব্বাহ হয় না।

৩। কর্ম্ম কৌশলপূর্ব্বক করিলে, তাহাতে চিত্তশুদ্ধি দ্বারা সংসিদ্ধি লাভ হয়।

৪। কর্ম্ম না করিলে জগচ্চক্র প্রবর্ত্তিত হয় না। যজ্ঞ দ্বারা, আমাদের অন্ন ও প্রজা সৃষ্টির সহায়তা করিতে হয়, না করিলে নানা প্রত্যবায় হয়।

৫। লোকসংগ্রহার্থ বা সমাজরক্ষার্থ স্বধর্ম্মাচরণাদি কর্ম্ম করিতে হয়। লোকসংগ্রহার্থ কর্ম্ম না করিলে সমাজে নানা বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়, সমাজ ক্রমে ধ্বংসের মুখে নীত হয়।

ইহার মধ্যে প্রথমটি কর্ম্ম করিবার সাধারণ কারণ। দ্বিতীয় ও তৃতীয় কারণে কর্ম্মানুষ্ঠান—নিজের স্বার্থ সাধন জন্য। চতুর্থ ও পঞ্চম কারণে কর্ম্মানুষ্ঠান—পরের হিত সাধন জন্য।

কর্ম্মযোগ-তত্ত্ব—ভগবান্ বলিয়াছেন, কেহ ক্ষণকালও কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারে না। প্রত্যেক মানুষের সংশ্লিষ্ট যে ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি, তাহা দ্বারাই কর্ম্ম কৃত হয়। এই কর্ম্মের প্রবর্ত্তক বা পরিচালক আমাদের প্রকৃতিজ অন্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয়গণ। ইহাদের মধ্যে মন ও ইন্দ্রিয়গণ আমাদিগকে কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করিয়া থাকে, এবং মন ও ইন্দ্রিয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যে বুদ্ধি, তাহাও আমাদিগকে কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করিতে পারে। মনের স্বরূপ দুই—শুদ্ধ ও অশুদ্ধ। কাম, সঙ্কল্প, বিচিকিৎসা, শ্রদ্ধা, অশ্রদ্ধা, ধৃতি, অধৃতি, হ্রী, ধী ভী—ইহারা মনের ধর্ম্ম বা মনের স্বরূপ (বৃহদারণ্যক, ১।৫।৩)। মন শুদ্ধ সাত্ত্বিক হইলে,—মনের কাম সংকল্প শুদ্ধ হইলে, সেই মনের দ্বারা কৃত কর্ম্ম স্বভাবতঃই শুভকর হয়। আর

মন অশুদ্ধ কামময় হইলে, তাহা দ্বারা কৃত কর্ম্ম অশুদ্ধ অশুভ হয়। কিন্তু সকল অবস্থায়ই মনের দ্বারা কৃত কর্ম্ম কামমূলক। মন—রাগ-দ্বেষ, কাম-ক্রোধ, সুখ-দুঃখ দ্বারা পরিচালিত হইয়া কর্ম্মে রত হয়। অবশ্য মন শুদ্ধ সাত্ত্বিক হইলে শুভ বিষয়ের প্রতি রাগ বা অনুরাগ হয়, তাহা প্রাপ্তির জন্য কামনা হয় এবং তাহা পাইলে সুখ বোধ হয়, আর অশুভ বিষয়ের প্রতি দ্বেষ, ক্রোধ ও তাহার প্রাপ্তিতে দুঃখ হয়। আর মন যদি অশুদ্ধ রজস্তমোমলযুক্ত হয়, তবে অশুভ বিষয়ের প্রতি অনুরাগ, কামনা, ও তাহার প্রাপ্তিতে সুখ হয়, এবং শুভ বিষয়ের প্রতি দ্বেষ, ক্রোধ ও দুঃখ হয়।

সাধারণতঃ এই কামক্রোধকে রজোগুণসমুদ্ভব এবং তাহাদের দ্বারা প্রযুক্ত হইয়া লোকে পাপাচরণ করে, ইহা ভগবান্ বলিয়াছেন। ভগবান্ কাম-ক্রোধ-লোভকে ত্রিবিধ নরকদ্বারও বলিয়াছেন (১৬।২১ শ্লোক)। অতএব সাধারণতঃ মন ও ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা প্রবর্ত্তিত যে কর্ম্ম, তাহা অশুভ, পাপকর ও আত্মনাশকর। এই জন্য ভগবান্ বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত যে কর্ম্ম, তাহারই প্রশংসা করিয়াছেন। বুদ্ধিযুক্ত হইয়া কর্ম্ম করিলে, কর্ম্মে বন্ধন হয় না (২।৩৯)। বুদ্ধিযোগস্থ হইয়া কর্ম্ম করিলে, তাহার মূলে কাম-সংকল্প থাকে না, রাগদ্বেষ থাকে না, সুখদুঃখ বোধ থাকে না, তাহাতে কর্ম্মে আসক্তি থাকে না, সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে, লাভালাভে সম জ্ঞান হয়, কর্ম্মজ ফলে আকাঙ্ক্ষা থাকে না, সুতরাং তাহা দ্বারা জন্মবন্ধন হইতে মুক্ত হওয়া যায়। দ্বিতীয় অধ্যায়ে এই সকল তত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে।

এই বুদ্ধিতে অবস্থিত হইয়া এই বুদ্ধির পরিচালনে যে কর্ম্ম করা যায়, —তাহাকেই ভগবান্ কর্ম্মযোগ বলিয়াছেন। শুদ্ধ সাত্ত্বিক, রজস্তমো-মলহীন বুদ্ধির স্বরূপ যে জ্ঞান ধর্ম্ম ঐশ্বর্য্য ও বৈরাগ্য, তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। অতএব এই বুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্ম—জ্ঞানপূর্ব্বক কর্ম্ম বা জ্ঞানের

দ্বারা পরিচালিত কর্ম্ম, ধর্ম্মবুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত কর্ম্ম, বৈরাগ্যবুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত কর্ম্ম, এবং ঐশ্বর্য্যবুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত কর্ম্ম। কর্ম্ম জ্ঞানের দ্বারা পরিচালিত হইলে, জ্ঞানে যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির হয়, সেই কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে কর্ম্ম করা যায়। কর্ম্ম ধর্ম্মবুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হইয়া কৃত হইলে, যাহা ধর্ম্মকর্ম্ম বলিয়া বুদ্ধিতে ধারণা হয়, তদনুসারে কর্ম্ম করা হয়। বৈরাগ্যবুদ্ধিতে কর্ম্ম করিলে, কর্ম্মে কোনরূপ আসক্তি থাকে না। এবং ঐশ্বর্য্যবুদ্ধিতে কর্ম্ম করিলে সমাজের নেতা নিয়ন্তা ও রক্ষক ভাবে সেই সমাজরক্ষার্থ, লোকসংগ্রহার্থ কর্ম্ম করা যায়। এইরূপে যে কর্ম্ম করা যায়—এইরূপে শুদ্ধ সাত্ত্বিক নির্ম্মল বুদ্ধিতে অবস্থানপূর্ব্বক যে কর্ম্ম করা যায়, তাহাই কর্ম্মযোগের অন্তর্গত।

বুদ্ধি শুদ্ধ সাত্ত্বিক নির্ম্মল ও রজস্তমোমলহীন হইলে, বুদ্ধিতত্ত্ব হইতে উৎপন্ন মনও শুদ্ধ সাত্ত্বিক নির্ম্মল হয়। তখন এই বুদ্ধি কর্ম্মের জন্য সেই মনকে পরিচালিত করে, এবং সেই শুদ্ধ মনও ইন্দ্রিয়গণকে পরিচালিত করে। এইরূপে যে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহাতে কাম, ক্রোধ, রাগ, দ্বেষ প্রভৃতির বিশেষ সংস্পর্শ থাকে না। ভগবান্ বলিয়াছেন যে, যতক্ষণ রজোগুণসম্ভব কাম-ক্রোধ দ্বারা এই বুদ্ধি বা জ্ঞান আবৃত থাকে, যতক্ষণ বুদ্ধিতে বা জ্ঞানে কামমল থাকে, ততক্ষণ বুদ্ধি বা জ্ঞান নিষ্কামভাবে কর্ম্মযোগে প্রবর্ত্তিত হইতে পারে না। এইজন্য কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠান করিতে হইলে—কর্ম্মকে শুদ্ধ সাত্ত্বিক বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত করিতে হইলে,—এই কামক্রোধকে প্রথমে দূর করিতে হয়। আর যখন ইন্দ্রিয় হইতে মন শ্রেষ্ঠ, তখন মন তাহার অধিকার স্থাপন করিলেই, ইন্দ্রিয়গণকে নিয়মিত ও সংযত করিতে পারে। সেইরূপ যখন বুদ্ধি মন হইতেও শ্রেষ্ঠ, তখন বুদ্ধিও তাহার অধিকার স্থাপন করিলে, মন ও ইন্দ্রিয়গণকে সংযত ও নিয়মিত করিতে পারে। ভগবান্ আরও বলিয়াছেন যে, বুদ্ধিতত্ত্ব হইতেও আত্মা শ্রেষ্ঠ, তাহা বুদ্ধির অতীত তত্ত্ব। অতএব আত্মার

প্রযত্ন থাকিলে আত্মা বুদ্ধিতত্ত্বকেও নিয়মিত করিতে পারে, এবং মন ও বুদ্ধিতে অধিষ্ঠিত কামকেও আত্মবলে জয় করিতে পারে, এবং বুদ্ধির রজস্তমোমল দূর করিয়া, তাহাকে শুদ্ধ সাত্ত্বিকরূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে (৩।৪২,৪৩ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। বুদ্ধি স্বভাবতঃ সাত্ত্বিক, তাহা আদিতে প্রকৃতির সত্ত্বগুণ হইতে উদ্ভূত। বুদ্ধিতত্ত্ব হইতে উৎপন্ন অহঙ্কার মন ইন্দ্রিয়গণের রজস্তমোমল দ্বারা বুদ্ধির এই স্বাভাবিক সাত্ত্বিক রূপ আবরিত থাকে মাত্র। আত্মার প্রযত্নে বুদ্ধিকে তাহার স্বাভাবিক স্বরূপে অবস্থান করান যায়, এবং নিষ্কাম হইয়া সেই বুদ্ধির দ্বারা কর্ম্ম-যোগানুষ্ঠান করা যায়।

কর্ম্ম সাধারণতঃ দুইরূপ—সকাম ও নিষ্কাম কর্ম্ম; অথবা স্বার্থ ও পরার্থ কর্ম্ম। এই উভয়বিধ কর্ম্ম আবার লৌকিক ও শাস্ত্রীয় ভেদে দুইরূপ হইতে পারে। বুদ্ধি দ্বারা সর্ব্ব প্রকার কর্ম্মই অনুষ্ঠিত হইতে পারে। তবে প্রকৃত সাত্ত্বিক ব্যবসায়াত্মিকা জ্ঞান ধর্ম্ম বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্যরূপ বুদ্ধি দ্বারা যে কর্ম্ম অনুষ্ঠান করা যায়, কেবল তাহাই কর্ম্মযোগে অনুষ্ঠিত হয় বলা যায়। এই বুদ্ধিযোগ ব্যতিরেকে যে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহা প্রায়ই স্বার্থ কর্ম্ম। আমার নিজের ভোগসুখের জন্য ও আমার আত্মীয় স্বজনের ভোগসুখের জন্য যে অর্থোপার্জ্জনাদি কর্ম্ম করা হয়, তাহা স্বার্থ কর্ম্ম। কামই সে কর্ম্মের মূল। সে স্বার্থ কর্ম্ম প্রায়ই অপরের উদ্বেগকর। আমার নিকট যাহা সুখকর ও উপাদেয়, অপরের নিকটও তাহা সাধারণতঃ সুখকর ও উপাদেয়। অতএব আমাকে তাহা গ্রহণ করিতে হইলে, অনেক সময় অন্যের ক্ষতি করিয়া, অন্যকে দুঃখ দিয়া তাহা গ্রহণ করিতে হয়। এইরূপে স্বার্থ কর্ম্ম প্রায়ই পাপ কর্ম্ম হইয়া পড়ে। এজন্য শাস্ত্রে এই স্বার্থ কর্ম্ম মধ্যে যাহা বিহিত, যাহা পরের ক্ষতিকর নহে বা উদ্বেগপ্রদ নহে তাহা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। স্বার্থ কর্ম্ম মধ্যে তাহাই ধর্ম্ম-কর্ম্ম হইতে পারে এই বিহিত স্বার্থ কর্ম্ম বুদ্ধিযোগে অনুষ্ঠেয় হইতে পারে। এইরূপে শাস্ত্র

বিহিত স্বার্থ কর্ম্ম কর্ম্মযোগের অন্তর্গত করা যাইতে পারে এবং তাহা ক্রমে নিষ্কামভাবে অনুষ্ঠিত হইতে পারে।

পরার্থ কর্ম্মও অনেক স্থলে স্বার্থ বুদ্ধিতে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। পরকে দান করিলে আমার পরকালে ভাল হইবে, যজ্ঞফলে স্বর্গে গতি হইবে, ইহকালে সুখ-সমৃদ্ধি হইবে, ইষ্টপূর্ত্তাদি কর্ম্ম করিলে পরলোকে সুখ-সমৃদ্ধি ভোগ হইবে,—এইরূপ কামনা করিয়া সে সব পরার্থ কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিলে, সে পরার্থ কর্ম্মও স্বার্থ কর্ম্ম মধ্যে পরিগণিত হয়। নিষ্কাম ভাবে পরহিতার্থ কর্ম্ম না করিলে, ফলকামনা না করিয়া কর্ত্তব্য বুদ্ধিতে পরার্থ কর্ম্ম না করিলে, তাহাকে কর্ম্মযোগে অনুষ্ঠিত নিষ্কাম কর্ম্ম বলা যায় না।

সেইরূপ স্বার্থ কর্ম্মও নিষ্কামভাবে কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে কর্ম্মযোগে অনুষ্ঠান করা যাইতে পারে। স্বধর্ম্ম পালনে আমার যেমন স্বার্থ আছে, তাহাতে যেমন আমার লোকযাত্রা সহজে নির্ব্বাহ হইতে পারে, এজন্য তাহা স্বার্থ বুদ্ধিতে আচরিত হইতে পারে,—সেইরূপ লোকসংগ্রহার্থ সমাজরক্ষার্থ কর্ত্তব্যবুদ্ধিতেও অনুষ্ঠিত হইতে পারে। এইরূপে স্বার্থ কর্ম্ম পরার্থ কর্ম্ম উভয়ই কর্ম্মযোগে কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে অনুষ্ঠিত হইতে পারে।

অতএব কর্ম্মযোগে অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম দুইরূপ,—স্বার্থ কর্ম্ম ও পরার্থ কর্ম্ম। চিত্তমল সম্পূর্ণ দূর করিবার জন্য,—বুদ্ধিকে সম্পূর্ণ শুদ্ধ সাত্ত্বিক ও নির্ম্মল করিবার জন্য, তাহাতে প্রকৃত জ্ঞানের (১৩।৭-১১ শ্লোকোক্ত জ্ঞানের) প্রতিষ্ঠার জন্য যে কর্ম্মযোগ অনুষ্ঠেয়, তাহা এক অর্থে স্বার্থ কর্ম্ম। সে কর্ম্ম দুইভাগে বিভক্ত করা যায়। এক—'নিয়ত' কর্ম্ম, আর এক—স্বধর্ম্মাচরণ। সেইরূপ পরার্থ কর্ম্মও দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। এক—যজ্ঞার্থ কর্ম্ম, আর এক—লোকসংগ্রহার্থ বা সমাজরক্ষার্থ কর্ম্ম। যজ্ঞার্থ কর্ম্ম ও স্বধর্ম্মাচরণ উভয়ই স্বার্থ ও পরার্থ কর্ম্ম হইতে পারে। কেন না যজ্ঞার্থ কর্ম্ম দ্বারা শরীরযাত্রা নির্ব্বাহ হয়, এবং অন্ন ও প্রজার উদ্ভবকর যে ত্যাগ

(বিসর্গ) তাহাও সিদ্ধ হয়। স্বধর্ম্মাচরণ দ্বারাও শ্রেষ্ঠ লোক যেমন নিজের শরীরযাত্রা নির্ব্বাহ করেন ও চিত্তশুদ্ধি করেন, সেইরূপ সাধারণ লোককে দৃষ্টান্ত দ্বারা স্বধর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করিয়া সমাজ রক্ষা করেন। নির্ম্মল সাত্ত্বিক শুদ্ধ বুদ্ধি যে ভাবে অবস্থিত হইয়া কর্ম্মকে নিয়মিত করে, সেই ভাবানুসারে এই সকল বিহিত কর্ম্ম স্বার্থ কর্ম্ম বা পরার্থ কর্ম্ম হইতে পারে।

স্বধর্ম্ম—স্বধর্ম্ম কাহাকে বলে, তাহা পূর্ব্বে (দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৩১ শ্লোকের ব্যাখ্যায়) উক্ত হইয়াছে। তাহা পরেও অষ্টাদশ অধ্যায়ের ৪১-৪৪ শ্লোকের ব্যাখ্যায় বিবৃত হইবে। সমাজস্থ সকলে স্ব স্ব ধর্ম্ম আচরণ করিলে তবে সমাজ রক্ষা হয়। নতুবা সমাজের কর্ম্মবিভাগ স্থির থাকে না, কর্ম্ম-সাংকর্য্য উপস্থিত হইয়া সমাজ উৎসন্ন যায়—ইহা ভগবান্‌ বলিয়াছেন। সমাজ উৎসন্ন যাইলে, মানুষ ক্রমে বিনষ্ট হয়। সমাজের সহায়েই মানুষের মনুষ্যত্বের বিকাশ হয়—মানুষের অভ্যুদয় ও মুক্তিপথ উন্মুক্ত হয়। সমাজের সহায়তা না পাইলে মানুষ পশু হইয়া যায়। আমরা 'সমাজ ও তাহার আদর্শ' নামক গ্রন্থে এ সকল তত্ত্ব বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। এ স্থলে তাহার বিশেষ উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। আমরা সে গ্রন্থে দেখাইয়াছি যে, সমাজ ভগবানেরই শরীর। ঋগ্বেদের পূর্ব্বোদ্ধৃত পুরুষ-সূক্তে আছে যে, সেই আদি পুরুষ যজ্ঞে আপনাকে আহুতি বা বলি দিলে, তাঁহার দেহ যেমন এই জগৎরূপে পরিণত হইল, সেইরূপ মনুষ্যাদি সমাজরূপেও পরিণত হইয়া, তাঁহার মুখ ব্রাহ্মণ হইল, দুই বাহু ক্ষত্রিয় হইল, বৈশ্য উরু হইল এবং শূদ্র তাঁহার পদদ্বয় হইতে উৎপন্ন হইল। এইরূপে ভগবানের সমাজরূপ শরীরে বর্ণ ও কর্ম্ম-বিভাগ হইল। অতএব সমাজ ভগবানেরই শরীর, ভগবান্‌ সমাজের আত্মা, আর তাঁহার পরাশক্তি দেবী ভগবতীই সমাজের শক্তি। ভগবান্‌ই সমাজরক্ষার্থ ও সমাজদেহের মধ্য দিয়া প্রত্যেক ব্যক্তির অভ্যুদয় ও বিকাশের জন্ত, সমাজশরীরস্থ তাহার স্থান ও ভাগ অনুসারে কর্ম্ম করাইয়া,—স্বার্থ ও পরার্থ কর্ম্মের মধ্য দিয়া তাহাকে

পরিচালিত করেন। যেমন যুদ্ধক্ষেত্রে প্রত্যেক সেনার ও সেনাপতির যথাভাগ নির্দ্দিষ্ট স্থান থাকে, ও প্রত্যেক স্থানোপযোগী কার্য্যবিভাগ থাকে, সেইরূপ সমাজের মধ্যে আমাদের এই কর্ম্মভূমিতেও প্রত্যেক ব্যক্তির বিশেষ স্থান আছে, এবং সেই স্থানোপযোগী বিশেষ কার্য্য আছে। আমাদের শরীরের মধ্যে যেমন প্রত্যেক যন্ত্রের—এমন কি সামান্য লোমটিরও বিশেষ স্থান ও সেই সংস্থানোপযোগী কর্ম্ম আছে, সেইরূপ সমাজশরীরেও প্রত্যেক ব্যক্তির নিজ স্থান ও সেই স্থানোপযোগী কার্য্য আছে। ভগবানের কাছে—সেই কার্য্যের মধ্যে ছোট বড় নাই, হেয় উপাদেয় নাই, সকল কার্য্যই প্রয়োজনীয়। ইহার মধ্যে কোন একটি কাজও না চলিলে সমাজ চলে না। আমার শরীরের এই ক্ষুদ্র কনিষ্ঠ অঙ্গুলিটি যদি ক্ষুদ্র থাকিতে না চাহে ও তাহার স্থানোপযোগী কার্য্য করিতে না চাহে, তবে শরীর অঙ্গহীন—বিকল হয়। সমাজ সম্বন্ধেও সেই কথা। সমাজের অধিকাংশ লোক যদি তাহার স্থানোচিত কর্ম্ম করিতে না চাহে, বা না পারে, তবে আর সমাজ থাকে না। সমাজে কর্ম্মবিভাগ অবশ্যম্ভাবী। কর্ম্ম-সাংকর্য্য সমাজের ধ্বংসের এক কারণ। এইজন্য সকল সমাজেই গুণানুসারে বর্ণবিভাগ ও বর্ণানুসারে কর্ম্মবিভাগ অবশ্যম্ভাবী। কোন সমাজে বর্ণবিভাগ বংশানুযায়ী, কোন সমাজে অন্য স্বাভাবিক নিয়মানুসারে তাহা সংসাধিত হয়। 'গুণ' অনুসারে আপনিই অর্থাৎ প্রাকৃতিক নিয়মে বর্ণবিভাগ ও কর্ম্মবিভাগ হইয়া পড়ে। শাস্ত্রে আছে যে, এইরূপ গুণানুসারে স্বাভাবিক বর্ণবিভাগ ও কর্ম্মবিভাগ সকল মানবসমাজেই প্রবর্ত্তিত আছে। না থাকিলে সমাজ থাকে না, আর সমাজ থাকিলেও, সমাজের উন্নতি ও পরিণতি হয় না। তবে আমাদের শাস্ত্রের বিশেষত্ব এই যে, এই গুণানুসারে স্বাভাবিক বর্ণবিভাগ ও বর্ণবিভাগানুসারে কর্ম্মবিভাগ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বিষ্ণুসংহিতায় আছে—

বিষ্ণু পৃথিবীকে রসাতল হইতে উদ্ধৃত করিলে, পৃথিবী ভগবান্

বিষ্ণুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এক্ষণে আমার অবস্থিতির উপায় কি?" ভগবান্ বলিলেন,—

"বর্ণাশ্রমাচাররতাঃ শাস্ত্রৈকতৎপরায়ণাঃ।
ত্বাং ধরে! ধারয়িষ্যন্তি তেষাং ত্বদ্ভার আহিতঃ॥"
(বিষ্ণুসংহিতা, ১।৪৫)

অর্থাৎ "বর্ণাশ্রমবিহিত আচার পালনে নিরত শাস্ত্রনিষ্ঠ ব্যক্তিগণ, হে ধরণি! তোমায় ধারণ করিবেন। তাহাদের উপরই তোমার ভার ন্যস্ত হইল।"

এইরূপে আমাদের সমাজে গুণ, বর্ণ ও গুণোচিত স্বাভাবিক কর্ম্মানুসারে, প্রত্যেক ব্যক্তির স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে, এবং সেই স্থানোচিত কর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ঋষিগণ শাস্ত্রদৃষ্টিতে সেই স্থানোপযোগী বিহিত কর্ম্ম কি, তাহা লোকশিক্ষার্থ ও সমাজরক্ষার্থ স্থির করিয়া দিয়াছেন। সমাজস্থ প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে তাহার স্থানানুযায়ী বিহিত কর্ম্মই তাহার স্বধর্ম্ম। ভগবান্ বলিয়াছেন যে, প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার স্বধর্ম্মাচরণ দ্বারা সমাজরূপী তাঁহাকেই অর্চ্চনা করিয়া থাকে (১৮।৪৬), এবং তাহা দ্বারাই সে ক্রমে সংসিদ্ধি লাভ করে। মহাভারতে ধর্ম্মব্যাধের উপাখ্যানে সাধারণ দৃষ্টিতে অতি হেয় স্বধর্ম্মাচরণ দ্বারাও যে সংসিদ্ধি লাভ করা যায়, ও জ্ঞানী হইলেও তাহা ত্যাজ্য নহে, তাহা দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝান আছে। অনাসক্ত হইয়া কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে সুখদুঃখ লাভালাভ প্রভৃতি গণনা না করিয়া কর্ম্মযোগে স্বধর্ম্মাচরণ করিলে, সমাজের হিতার্থ—ভগবানের অর্চ্চনার্থ—নিজের কর্ত্তব্যপালন জন্য পরম তপোরূপ * এই স্বধর্ম্মাচরণ করিলে, তাহা দ্বারা পরিণামে সংসিদ্ধি অবশ্যম্ভাবিনী, ইহাই ভগবানের

---

* শাস্ত্রে আছে,—
"ব্রাহ্মণস্য তপো জ্ঞানং তপঃ ক্ষত্রস্য রক্ষণম্।
বৈশ্যস্য তু তপো বার্ত্তা তপঃ শূদ্রস্য সেবনম্।"—মনুসংহিতা, ১১।২৩৫।

উপদেশ। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, এই স্বধর্ম্মাচরণ স্বার্থ ও পরার্থ উভয়ই হইতে পারে। স্বধর্ম্মাচরণ দ্বারা ক্রমে চিত্তশুদ্ধি হয়। চিত্ত শুদ্ধ হইয়া গেলেও, সমাজের হিতার্থ এই স্বধর্ম্মাচরণ করিতে হয়। নিজে স্বধর্ম্মাচরণ করিয়া অপরকে দৃষ্টান্ত দ্বারা স্বধর্ম্মে প্রবর্তিত করিতে হয়। অতএব স্বধর্ম্মাচরণ জ্ঞানীরও কর্ত্তব্য। *

যজ্ঞার্থ কর্ম্ম—যেমন বুদ্ধিযোগে স্বধর্ম্ম অনুষ্ঠেয়, সেইরূপ যজ্ঞার্থ কর্ম্মও অনুষ্ঠেয়, তাহা বলিয়াছি। কিন্তু এখন বেদোক্ত যজ্ঞযুগ চলিয়া গিয়াছে। বৈদিক যজ্ঞ উঠিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু যজ্ঞ একেবারে উঠিয়া যায় নাই। বৈদিক দেবযজ্ঞের পরিবর্ত্তে এখন পৌরাণিক ও তান্ত্রিক দেবাদি পূজা ব্রতনিয়মাদি প্রচলিত আছে। পিতৃযজ্ঞ—শ্রাদ্ধ তর্পণ প্রভৃতি এখনও হিন্দুর অনুষ্ঠেয়। স্মৃতি-শ্রুতিতে উক্ত নিত্যকর্ম্ম এখনও অনেক নিষ্ঠাবান্ হিন্দু অনুষ্ঠান করেন। তাঁহারা অনেক শাস্ত্রবিহিত নৈমিত্তিক কর্ম্মও করিয়া থাকেন। অনেক ধনবান্ ব্যক্তি এখনও স্মার্ত্ত কর্ম্ম বা ইষ্টপূর্ত্তাদি কর্ম্ম করেন,—দেবালয়, অতিথিশালা, পান্থশালা, ধর্ম্মশালা, বিদ্যালয়,

* এই সম্বন্ধে জর্ম্মাণ দার্শনিক পণ্ডিত পল ডুসেন, তাঁহার "Elements of Metaphysics পুস্তকে (৩০৪ পৃঃ) বলিয়াছেন, —Hence it is not our work that we must change, but rather the spirit from which it springs. It is not to idle quietism that we must flee, rather must we persevere in the battle of life, conscious that the labour of existence is laid upon us to purify us from egoism, and the sinfulness arising from it. For the rest we may with the Brahmans take upon us hard and painful penances, or with Buddha restrict the claims of asceticism to poverty and chastity ... . The question is not *what* we do, but *how* we do it. Thus we shall rather ask, 'how in what spirit, shall I live and work —As an interpretation of the mythical part of this the following sloka may serve —

"তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর।
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ॥" (গীতা, ৩।১৯।)

চিকিৎসালয়, জলাশয় প্রভৃতি স্থাপন করিয়া লোকহিতকর কর্ম্ম করেন। অনেকে এখনও অতিথি অভ্যাগতকে, ভিক্ষুককে, সাধুকে অন্ন দিয়া, বস্ত্র দিয়া,পীড়িতকে শুশ্রূষা করিয়া,আর্ত্তের আর্ত্তি দূর করিয়া,—নৃযজ্ঞ করিয়া থাকেন। অনেকে পশুপক্ষীকেও আহার দিয়া, পিঁজরাপোল প্রভৃতি সংস্থাপন করিয়া ভূতযজ্ঞ করিয়া থাকেন। অনেকে নিঃস্বার্থভাবে শাস্ত্র অধ্যয়ন ও অধ্যাপন করিয়া, লোককে জ্ঞানোপদেশ দিয়া ও ধর্ম্মকর্ম্মে প্রবৃত্ত করাইয়া ঋষিঋণ শোধ করিতে যত্ন করেন। অতএব বৈদিক যজ্ঞযুগ চলিয়া গেলেও 'যজ্ঞ'কর্ম্ম লোপ পায় নাই। ভগবান্ পরে চতুর্থ অধ্যায়ে নানারূপ যজ্ঞের কথা—দ্রব্যযজ্ঞ, তপোযজ্ঞ, স্বাধ্যায়যজ্ঞ, জ্ঞান-যজ্ঞের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। সে সকল যজ্ঞও একেবারে লোপ পায় নাই। অতএব ভগবানের এই যজ্ঞ সম্বন্ধে উপদেশ ব্যর্থ নহে।

পঞ্চমহাযজ্ঞ—পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, ঋণশোধার্থ আমাদের পঞ্চ মহা-যজ্ঞ অবশ্য কর্ত্তব্য। শাস্ত্রানুসারে আমরা নিম্ন যোনি হইতে কত জন্ম ভ্রমণ করিয়া তবে মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়াছি। পরে কত তামসিক ও রাজসিক-প্রকৃতি-প্রধান নিম্ন মনুষ্যজন্ম ভ্রমণ করিয়া, তবে সত্ত্ব-প্রকৃতি-প্রধান মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়াছি। আর আমরা এই শ্রেষ্ঠ মনুষ্যজন্ম লাভ করিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত প্রতি জন্মে কেবল 'গ্রহণ' করিয়াই আসিয়াছি। ইচ্ছা করিয়া কখন ত্যাগাত্মক কর্ম্ম করি নাই। অর্থাৎ যে জন্মে যাহা উপাদেয়, সুখদ ও শরীরযাত্রা নির্ব্বাহার্থ প্রয়োজন, তাহা অপরের নিকট —অন্য ভূতের নিকট গ্রহণ করিয়াই আসিয়াছি; আমাদের যাহা উপাদেয়, সুখকর ও প্রয়োজনীয়, কখন তাহা অপরকে দিই নাই। যদি কখন দিয়া থাকি, তবে অনিচ্ছাক্রমে প্রকৃতির বা অপরের দ্বারা বাধ্য হইয়া দান করিয়াছি। এখন শ্রেষ্ঠ মানবজন্ম লাভ করিয়া, আমাদের এই ঋণ শোধের সময় আসিয়াছে। এখন হইতে—জন্মজন্ম ধরিয়া যে গ্রহণ করি-য়াছি, যে ঋণ করিয়াছি, তাহা শোধ করিতে হইবে। যাহা লইয়াছি,

তাহা দিতে হইবে। এই ঋণশোধের জন্য আমাদের এই পরার্থ বা পরের তৃপ্তি জন্য ত্যাগাত্মক পঞ্চ মহাযজ্ঞ করিতে হইবে। *

ত্যাগাত্মক কর্ম্ম,—যদি কখন সে ঋণশোধের সম্ভবও হয়, তখনও এ ত্যাগাত্মক পরার্থ কর্ম্মের শেষ হয় না। তখনও আমাদের নিষ্কামভাবে ত্যাগাত্মক কর্ম্ম করিতে হইবে। এই দুঃখময়—এই তাপময় জগতে ভূতগণের এই আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক, আধিভৌতিক দুঃখ তাপ

---

* পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, এই পঞ্চ মহাযজ্ঞ দ্বারা প্রধানতঃ আমাদের দেবঋণ, ঋষিঋণ, পিতৃঋণ, মনুষ্যঋণ ও ভূতঋণ শোধ করিবার চেষ্টা করিতে হয়। আমরা জন্মজন্ম ধরিয়া এই দেবতাদি সকলের নিকট ঋণী। এক কথায় আমরা সর্ব্বভূতের নিকট কোন না কোন প্রকারে ঋণী। সে ঋণের তত্ত্ব এস্থলে বুঝিবার প্রয়োজন নাই। সেই ঋণ কিরূপে শোধ করিতে হয়, কিরূপে সকলকে তৃপ্ত করিতে হয়, তাহাই এস্থলে সংক্ষেপে বুঝিতে হইবে।

শ্রুতিতে এই মহাযজ্ঞের কথা উক্ত হইয়াছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে—"অথো অয়ং বা আত্মা সর্ব্বেষাং ভূতানাং লোকঃ। স যজ্জুহোতি যদ্ যজতে তেন দেবানাং লোকঃ। অথ যদনুব্রূতে তেন ঋষীণাম। অথ যৎ পিতৃভ্যো নিপৃণাতি যৎ প্রজাম্ ইচ্ছতে, তেন পিতৃণাম্। অথ যন্মনুষ্যান্ বাসয়তে যদেভ্যোঽশনং দদাতি তেন মনুষ্যাণাম্। অথ যৎ পশুভ্যঃ তৃণোদকং বিন্দতি তেন পশূনাম। যদস্য গৃহেষু শ্বাপদা বয়াংস্যাপিপীলিকাভ্য উপজীবন্তি তেন তেষাং লোকঃ।" (বৃহদারণ্যক, ১।৪।১৬)।

ইহার সংক্ষিপ্ত অর্থ এই যে, এই আত্মা (গৃহাশ্রমী পুরুষ) সর্ব্বভূতের লোক (যজ্ঞাদি স্বীয়বর্ণ ও আশ্রমবিহিত কর্ম্ম দ্বারা) সকলের তৃপ্তি সাধন করেন। তিনি যে হোম ও যাগ করেন, তাহাতে দেবগণের ভোগ বা তৃপ্তিসাধন হয়। তিনি প্রতিদিন অনু বচন(স্বাধ্যায়) দ্বারা ঋষিদের তৃপ্তি সাধন করেন, তিনি যে পিণ্ডোদকাদি দান করেন, ও প্রজা উৎপাদন করেন, তাহাতে পিতৃগণ তৃপ্ত হন। তিনি যে মনুষ্যগণকে বাস ও অন্ন দেন, তাহাতে মনুষ্যগণ তৃপ্ত হয়। তিনি যে পশুদের তৃণোদক দেন, তাহাতে পশুলোক তৃপ্ত হয়। তিনি যে গৃহপালিত পশুপক্ষী এবং যে কীট পতঙ্গদিগকে পিপীলিকাদের পর্য্যন্ত পোষণ করেন, তাহাতে সেই সেই লোক তৃপ্ত হয়। মানব-ধর্ম্মশাস্ত্রে এই পঞ্চ মহাযজ্ঞের মধ্যে স্বাধ্যায়কে ব্রহ্মযজ্ঞ বলা হইয়াছে। যথা—

"অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণম্।
হোমো দৈবো বলির্ভৌতো নৃযজ্ঞোঽতিথিপূজনম্।"—মনুসংহিতা, ৩।৭০

এই পঞ্চ মহাযজ্ঞের কথা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। এস্থলে তাহার আর উল্লেখের প্রয়োজন নাই।

যথাসাধ্য দূর করিবার জন্য—অলৌকিক দয়া বা অনুকম্পাবশে তাঁহাদের পরহিতার্থ কর্ম্ম করিতে হয়,—প্রতিদানের বা কোনরূপ ফলের অপেক্ষা না রাখিয়া এই পরার্থ কর্ম্ম করিতে হয়। এই লোকহিতার্থ কর্ম্ম —স্থান, কাল ও পাত্র অনুসারে যেরূপ প্রয়োজন হয়, তদনুরূপ করিতে হয়। তাঁহারা তখন ভগবানের দিব্য জন্ম ও কর্ম্ম সম্মুখে আদর্শ রাখিয়া, লোকসংগ্রহার্থ, সমাজরক্ষার্থ বিহিত কর্ম্ম করেন। তাঁহারা লোকসংগ্রহার্থ কর্ম্মে, সমাজরক্ষার্থ কর্ম্মে, সমাজের ধর্ম্ম-সংস্থাপনার্থ কর্ম্মে, এই জগৎচক্র-প্রবর্ত্তনরূপ কর্ম্মে ভগবানের সহায় হইয়া—নিমিত্ত হইয়া, ভগবান্‌কে অনুসরণ করিয়া, লোক-প্রয়োজনার্থ কর্ম্ম করেন।

এইরূপে সকলের পক্ষেই কর্ম্মযোগ অনুষ্ঠেয়। যাঁহারা যোগারূঢ় হইতে চাহেন, তাঁহাদের পক্ষে যেমন কর্ম্মযোগ অবলম্বনীয়, সেইরূপ যাঁহারা যোগারূঢ় অথবা আত্মাতে বা ঈশ্বরে যোগস্থ হইয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষেও পরহিতার্থ এই কর্ম্মযোগ অনুষ্ঠেয়। কর্ম্মযোগ সর্ব্বথা অবলম্বনীয়, ইহাই ভগবানের উপদেশ।

মুমুক্ষু ও মুক্ত মহাত্মা—সকলের পক্ষেই যে এই নিষ্কাম লোকহিতার্থ কর্ম্ম অনুষ্ঠেয়, তাহার অন্য কারণও আছে। তাহার উল্লেখ করিবার পূর্ব্বে এই কর্ম্মযোগ সম্বন্ধে যে কয়েকটি আপত্তি হইতে পারে, এস্থলে তাহার মধ্যে যাহা প্রধান, তাহার আলোচনা করা কর্ত্তব্য।

কর্ম্মযোগ সম্বন্ধে প্রথম আপত্তি।—শঙ্করাচার্য্য-প্রমুখ পণ্ডিতগণের মতে কর্ম্মযোগ—চিত্তশুদ্ধির জন্য নিম্নাধিকারীরই অনুষ্ঠেয়। চিত্ত শুদ্ধ হইলে, নির্ম্মল চিত্তে জ্ঞানসূর্য্য প্রকাশিত হইলে, আর কর্ম্মযোগানুষ্ঠানের প্রয়োজন থাকে না। শঙ্করাচার্য্য যে অদ্বৈতবাদ স্থাপন করিয়াছেন, তদনুসারে অবশ্য এই মতই সঙ্গত। ব্রহ্ম সত্য—একমাত্র অদ্বিতীয় তত্ত্ব। জীব ব্রহ্মই। জীবে ও ব্রহ্মে স্বরূপতঃ কোন ভেদ নাই। এই জগৎ ব্যব-

হারিক ভাবে সত্য হইলেও, ইহা মায়া-কল্পিত, ইন্দ্রজালবৎ, গন্ধর্ব্বনগরবৎ মিথ্যা—স্বপ্নময়। রজ্জু যেমন সর্প-ভ্রমের উপাদান-কারণ, ব্রহ্মও সেইরূপ এ জগতের উপাদান-কারণ। জীব অজ্ঞানবশতঃ বা অবিদ্যা-হেতু আপনার ব্রহ্মস্বরূপ না জানিয়া দুঃখ পায় ও মুগ্ধ হয়। ব্রহ্মই অবিদ্যা-হেতু জীবরূপ হইয়া অজ্ঞান দ্বারা এই সংসার ভোগ করেন। অবিদ্যাবশে জীব অনাত্ম দেহাদিতে আত্মাধ্যাস করিয়া দুঃখ পায়। সুতরাং জ্ঞানী যখন এই তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া আপনার প্রকৃত স্বরূপ জানিতে পারেন, তখন তিনি এ জগৎকে স্বপ্নময় দেখেন। তাঁহার নিকট জগতের হিতার্থ কর্ম্ম, জীবের হিতার্থ কর্ম্ম, সমাজের হিতার্থ কর্ম্ম, শাস্ত্রবিহিত স্বধর্ম্মানুযায়ী কর্ম্ম—সমুদায় অবিদ্যামূলক। শঙ্কর বলেন,—বেদ প্রভৃতি শাস্ত্র সমুদায়ই অবিদ্যামূলক ভেদ-প্রতিষ্ঠাপক। অতএব যিনি বিদ্বান্, তিনি দ্রষ্টৃস্বরূপে এই অবিদ্যার লীলা দর্শন করিবেন মাত্র—তিনি তাহাতে যোগ দিবেন কেন? শঙ্করের এই মতানুসারে অহন্তা মমতা অজ্ঞানমূলক, সংসারে স্ত্রী-পুত্রাদি সম্বন্ধ অবিদ্যামূলক, তাহাদের সুখ-দুঃখাদিতে আমার সুখ-দুঃখ বোধ অবিদ্যামূলক। অতএব অপরের প্রতি মমতা ও মমতাবশে কর্ম্ম সমুদায়ই অজ্ঞানকৃত। যে ব্যক্তি সত্য সত্য এই মতের অনুসরণ করে, সে ব্যক্তি তাহার সম্মুখে যদি কোন ক্ষুধার্ত্ত অন্নাভাবে মরিয়া যাইতে বসিয়াছে, সামর্থ্য থাকিলেও, তাহাকে, এক মুষ্টি অন্ন দিয়া রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইতে পারে না। তাহা ব্যবহারিক ভাবে সত্য হইলেও প্রকৃত পক্ষে ভ্রম মাত্র মনে করিয়া সে বিচলিত হইবে না। আরও, সে আপনাকে অকর্ত্তা জানিয়া নিশ্চেষ্ট থাকিবে। তাহার কাছে পরার্থ কর্ম্ম, লোকসংগ্রহার্থ কর্ম্ম, সমাজরক্ষার্থ কর্ম্ম—এ সমুদায়ই ভ্রম,—মায়ার খেলা। আচার্য্য শঙ্করের এ মত যদি সত্য হয়, তবে স্বয়ং ভগবান্ লোকসংগ্রহার্থ, ধর্ম্ম-সংস্থাপনার্থ, জগতের রক্ষার্থ কর্ম্ম করেন কেন? এবং সে কর্ম্ম করিতে সকলকে উপদেশই বা দিয়াছেন কেন? ইহার অর্থ কি? শঙ্করাচার্য্যের

মতানুসারে ইহার একমাত্র উত্তর, পরমেশ্বরও এই মায়াযুক্ত। পারমার্থিক অর্থে সগুণ ব্রহ্মের বা পরমেশ্বরের এই জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ে যে কর্তৃত্ব, তাহাও মায়াময়—অবিদ্যামূলক। ভগবানের এ উপদেশ ব্যবহারিক।

শঙ্করাচার্য্য শুদ্ধ অদ্বৈত মত প্রতিষ্ঠা করিয়া, তন্মূলে কঠোর ন্যায়-শাস্ত্র-সঙ্গত যুক্তি অবলম্বন করিয়া (by rigorous logic), তাহা হইতে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহা অপরিহার্য্য। সে সিদ্ধান্ত অখণ্ডনীয়। ইহা অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিতও স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। কিন্তু ইহা অবশ্য বলিতে হইবে যে, তাঁহার এই মত অনুসরণ করিলে সমাজ থাকে না, মনুষ্যত্ব থাকে না,—সর্ব্বত্র বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়,—ভগবান্ গীতায় যে উপদেশ দিয়াছেন, তাহা মিথ্যা হইয়া যায়, অথবা তাহার কেবল ব্যবহারিক সত্যতা থাকে মাত্র। শঙ্করাচার্য্য গীতায় উপদেশের এই ব্যবহারিক সত্যতাই স্বীকার করিয়াছেন। গীতা ভাষ্যের প্রথমেই তিনি বলিয়াছেন যে, ভগবান্ এই জগৎ সৃষ্টি করিয়া জগতের রক্ষার্থ সনক-সনন্দনাদি ঋষিদিগকে নিবৃত্তিধর্ম্ম গ্রহণ করাইয়াছিলেন, এবং মনু দক্ষ প্রভৃতি প্রজাপতিদিগকে প্রবৃত্তিধর্ম্ম গ্রহণ করাইয়াছিলেন। তিনি গীতা-ব্যাখ্যায় আর কোন কথা বলেন নাই বটে, কিন্তু বেদান্ত-দর্শনের ব্যাখ্যায় এই প্রপঞ্চ মিথ্যা ও ব্রহ্মের সগুণ ভাব পারমার্থিক অর্থে অসত্য, এ কথা বলিয়াছেন।

আমরা তাঁহার এই অভিমত সত্ত্বেও বলিতে বাধ্য যে, ভগবান্ গীতায় যে উপদেশ দিয়াছেন, তাহা পারমার্থিক সত্য। যিনি ভগবানে বিশ্বাসবান্, ঈশ্বরে ভক্তিমান্—তিনি ইহা স্বীকার করিতে বাধ্য। শ্রুতি অনুসারেও ইহাই সিদ্ধান্ত হয়। এ তত্ত্ব আমরা পরে ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ব্যাখ্যায় বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। শঙ্কর যে বিশুদ্ধাদ্বৈতবাদ স্বতঃসিদ্ধরূপে গ্রহণ করিয়া ও তন্মূলে তাঁহার মত স্থাপন করিয়া, তাহার উপর গীতা ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সে স্বতঃসিদ্ধ গ্রাহ্য নহে। গীতার আরম্ভ উপসংহার প্রভৃতি

সামঞ্জস্য করিলে দ্বৈতাদ্বৈতবাদই গ্রাহ্য ও প্রকৃত তত্ত্ব বলিয়া মনে হয়। তাহাতে অদ্বৈত ও দ্বৈত এই দুই পরস্পর-বিরোধী মতের সামঞ্জস্য (synthesis) হয়। এই দ্বৈতাদ্বৈতবাদ অনুসরণ করিয়া আমরা গীতা বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। তাহাতে গীতার আদ্যন্ত কোথাও বিরোধ থাকে না। এই দ্বৈতাদ্বৈতবাদানুসারে ব্রহ্মের সগুণ ও নির্গুণ ভাব উভয়ই সত্য। ব্রহ্ম মায়াশক্তিযুক্ত। মায়া মিথ্যা বা অবস্তু নহে। মায়া ব্রহ্মেরই পরা শক্তি। মায়াযুক্ত ব্রহ্ম সগুণ। শক্তি ও শক্তিমানে ভেদ নাই। শক্তিমান্ হইতে শক্তির পৃথক্ সত্তা নাই। সেই মায়াশক্তির কার্য্য জীব ও জগৎ যাহা ব্রহ্মেই বিবর্ত্তিত, তাহা সত্য—পারমার্থিক সত্য। এ জগৎ সত্য, এ মনুষ্যসমাজ সত্য, মানুষ তাহাতে অজ্ঞানবশে সুখ দুঃখ ভোগ করে, পাপ পুণ্য কর্ম্ম করে ও কর্ম্মফলে স্বর্গ নরক ভোগ করে—ইহা সত্য। অবশ্য অজ্ঞান হেতু মানুষের এবং জীব-সাধারণের এই ভোগ হয়। সেই অজ্ঞান দূর করিয়া মানুষকে মুক্ত হইতে হয়। যিনি জ্ঞানী, তিনি মুমুক্ষুকে সেই মুক্তির পথে সাহায্য করেন, তিনি জগতের রক্ষার্থ—জীবরক্ষার্থ সেই শিবময় মঙ্গলময়ের মঙ্গল অভিপ্রায়ানুসারে কর্ম্ম করেন,—এ তত্ত্বও সত্য। যিনি জ্ঞানী, তিনি অবিদ্যাবশে বা অজ্ঞানবশে এই পরার্থ কর্ম্ম করেন না। তিনি আত্মসংস্থ হইয়া—আপনার স্বরূপে অবস্থিত হইয়া—শুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপে থাকিয়া, এবং সেই জ্ঞানহেতু বাসুদেবই সব—এই বিজ্ঞানে অবস্থিত হইয়া, সর্ব্বভূতকে আপনাতে ও সকলকে বাসুদেবে দর্শন করিয়া, এই আত্মস্বরূপ সকলের হিতার্থ—স্বপ্রকৃতিকে নিয়মিত করিয়া কর্ত্তব্য কর্ম্ম করেন। আমরা এই তত্ত্বই গীতা হইতে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি।

দ্বিতীয় আপত্তি—ইহার দ্বিতীয় আপত্তি এই যে, পুরুষ যদি স্বরূপতঃ অকর্ত্তা ও প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্র হয়, তবে জ্ঞানীর প্রতি কর্ম্মযোগের উপদেশ কিরূপে সম্ভব? সাংখ্য জ্ঞান-লাভ হইলে ত পুরুষ আপনার স্বরূপ জানিতে পারিয়া প্রকৃতির বন্ধন হইতে মুক্ত হয়। যদি সে প্রকৃতি

হইতে মুক্ত হয়, তবে মুক্ত পুরুষ কর্ম্ম করিবে কিরূপে? ভগবান্ ত বলিয়াছেন,—

"প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥
তত্ত্ববিত্তু মহাবাহো গুণকর্ম্মবিভাগয়োঃ।
গুণা গুণেষু বর্ত্তন্ত ইতি মত্বা ন সজ্জতে॥" (৩.২৭-২৮)

পরে ত্রয়োদশ অধ্যায়ে এই কথাই বিবৃত হইয়াছে,—

"কার্য্যকারণকর্ত্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে।
পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে॥
পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্।
কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্‌যোনিজন্মসু॥" (১৩।২০-২১)

পুরুষ যে অকর্ত্তা—কেবল ভোক্তা মাত্র, তাহা আরও স্পষ্ট করিয়া উক্ত হইয়াছে,—

"প্রকৃত্যৈব চ কর্ম্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্ব্বশঃ।
যঃ পশ্যতি তথাত্মানমকর্ত্তারং স পশ্যতি॥" (১৩।২৯)

এই প্রকৃতি ও প্রকৃতিজ ত্রিগুণের স্বরূপ ও বৃত্তি চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে ৫ম হইতে ১৮শ শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে, এবং তাহার পর উক্ত হইয়াছে যে,—

"নান্যং গুণেভ্যঃ কর্ত্তারং যদা দ্রষ্টানুপশ্যতি।
গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি মদ্ভাবং সোঽধিগচ্ছতি॥" (১৪।১৯)

অতএব ইহা হইতে অবশ্য বলিতে হয় যে, পুরুষ স্বরূপতঃ কেবল দ্রষ্টা, সে কখনও কর্ত্তা নহে। সে অজ্ঞানবশে, গুণসঙ্গ হেতু ভোক্তা হয় মাত্র। নতুবা পুরুষ স্বরূপতঃ ভোক্তাও নহে। অতএব এই গীতা অনুসারেই বলিতে পারা যায় যে, পুরুষ অকর্ত্তা। তবে ভগবানের এই নিষ্কাম কর্ম্মের উপদেশ কিরূপে সম্ভব? শঙ্করাচার্য্য বেদান্তদর্শনের

অদ্বৈতবাদ অনুসারে যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, সাংখ্যদর্শনেরও ত সেই সিদ্ধান্ত। কেন না, সাংখ্যদর্শন অনুসারে পুরুষ 'জ্ঞ'স্বরূপ বুদ্ধস্বভাব ; পুরুষ কর্ত্তা নহে, কর্ত্তৃ-ভাবের ন্যায় ভোক্তৃ-ভাবও তাহার অজ্ঞানমূলক। অতএব গীতায় পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য করিয়া বুঝিতে হইলে, অবশ্য বলিতে হইবে যে, কর্ম্মযোগ নিম্নাধিকারী দেহীর জন্যই উপদিষ্ট হইয়াছে। সাংখ্য জ্ঞানীর বা আত্মদর্শীর কর্ম্মযোগে অধিকার নাই। এ সম্বন্ধে বেদান্ত ও সাংখ্যদর্শনের যাহা সিদ্ধান্ত, গীতারও তাহাই সিদ্ধান্ত, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে।

এই আপত্তি গুরুতর। প্রথমে গীতা হইতেই আমরা ইহার উত্তর দিতে চেষ্টা করিব। ভগবান্ বলিয়াছেন,--ত্রিলোকে তাঁহার কোন কর্ম্ম নাই, অথচ তিনি কর্ম্মে প্রবৃত্ত। তিনি ধর্ম্মরক্ষার্থ অবতীর্ণ হন, এবং অবতীর্ণ হইয়া কর্ম্ম করেন। তিনি অজ, অব্যয়াত্মা, এবং ভূতগণের ঈশ্বর হইয়াও ধর্ম্ম স্থাপন, সাধুদের পরিত্রাণ ও দুষ্কৃতের বিনাশজন্য যুগে যুগে যখন যে স্থানে ও যে কালে ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন তথায় অবতীর্ণ হন। কিরূপে তিনি অবতীর্ণ হন ও কর্ম্ম করেন, ইহার উত্তর স্বরূপে ভগবান্ বলিয়াছেন—

"প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া। (গীতা,—৪।৬)

ইহা ভগবানের অবতারের কথা। ভগবান্ এই জগতের স্রষ্টা ও সংহর্ত্তা। কিরূপে তিনি এই জগতের সৃষ্টি লয় করেন, সে সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

"ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।" (৯।১০)।

এবং "প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ।

ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্বশাৎ॥"

ভূতগণ কাল্পিক প্রলয়ে অবশ হইয়া প্রকৃতিতে লীন থাকে, ভগবান্ কল্পারম্ভে পুনর্ব্বার সেই প্রকৃতি হইতে তাহাদিগকে সৃষ্টি (বিসৃষ্টি বা বিসর্জ্জন করেন)।

অতএব ভগবান্ স্বয়ং অকর্ত্তা হইয়াও কর্ম্ম করেন। পরমাত্ম-স্বরূপে তিনি অকর্ত্তা হইলেও তাঁহার স্বপ্রকৃতিতে তিনি অধিষ্ঠিত থাকিয়া প্রকৃতির কর্ম্মে অধ্যক্ষতা করেন। এই অধ্যক্ষতাতেই ভগবানের কর্ত্তৃত্ব। অতএব ভগবান্ যদি অকর্ত্তা হইয়াও এইরূপে কর্ম্ম করিতে পারেন,—নিজ প্রকৃতিকে নিয়মিত করিয়া নিজ কল্পনানুসারে জগতের সৃষ্টি ও লয় করিতে পারেন, অবতীর্ণ হইয়া লোকসংগ্রহার্থ কর্ম্ম করিতে পারেন, তবে যে জ্ঞানী আত্মস্বরূপে অবস্থান করেন, নিজের অকর্ত্তৃত্ব ভাব জানেন, যিনি অকর্ম্মে কর্ম্ম দর্শন করেন, ও কর্ম্মে অকর্ম্ম দর্শন করেন (৪।১৮), তিনিও প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত থাকিয়া,—প্রকৃতিকে নিজের অধ্যক্ষতায় নিয়মিত করিয়া—পরিচালিত করিয়া, ও নিজে অকর্ত্তা স্বরূপে থাকিয়া কর্ম্ম করিতে পারিবেন না কেন ?

ভগবান্ পরে বলিয়াছেন,—প্রকৃতি পুরুষ উভয়েই অনাদি (১৩।১৯)। পুরুষ ক্ষেত্ররূপ দেহে অবস্থিত হইয়া দেহী হন। সেই ক্ষেত্র প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন। পুরুষ সেই ক্ষেত্রস্থ হইয়া ক্ষেত্রজ্ঞ হন। এই ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-সংযোগে স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমুদয় সত্ত্বের উদ্ভব হয় (১৩।২৬)। এই ক্ষেত্রজ্ঞরূপে পুরুষ, ক্ষেত্ররূপ প্রকৃতির সহিত নিত্যসম্বদ্ধ। যখন সাংখ্যজ্ঞান হয়, প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেক-জ্ঞান হয়, তখন পুরুষ প্রকৃতি হইতে আপনার পার্থক্য জানিতে পারেন,—প্রকৃতিস্থ ত্রিগুণের অতীত হইতে পারেন। কিন্তু এই জ্ঞান হইলেই পুরুষ প্রকৃতি হইতে বিযুক্ত হন না। ভগবান্ স্বয়ং তাঁহার স্বপ্রকৃতিতে যুক্ত। ব্রহ্ম মায়াখ্য পরা-শক্তি-যুক্ত। ব্রহ্মের নির্গুণভাবেও এই শক্তি বীজরূপে থাকে মাত্র, তাহার ধ্বংস হয় না। শক্তির ধ্বংস নাই। শক্তি ও শক্তিমানে প্রভেদও নাই। সগুণ ভাবে ব্রহ্মের এই জ্ঞানবলক্রিয়াত্মিকা পরাশক্তি কার্য্যোন্মুখী হইয়া এই জগৎ রূপে পরিণত হয় মাত্র। জীব যদি ব্রহ্মস্বরূপ হয়, তবে জীব কখন এই শক্তি ছাড়া থাকিতে পারে না। প্রকৃতি সেই পরমা মায়া-শক্তিরই

কার্য্যরূপ। এজন্য ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-যোগে বা পুরুষ-প্রকৃতি-যোগে এই জড়-জীবময় জগতের বিকাশ ও স্থিতি হয়।

অতএব যিনি সাংখ্যজ্ঞানে বা আত্মজ্ঞানে সিদ্ধ হন, তিনি প্রকৃতির বন্ধন হইতে মুক্ত হন মাত্র—প্রকৃতিকে ত্যাগ করেন না, ত্যাগ করিতেও পারেন না। তিনি প্রকৃতির বন্ধন হইতে মুক্ত হইলে প্রকৃতিকে বশীভূত করেন, আর প্রকৃতির বশ থাকেন না। এজন্য যিনি স্থিতপ্রজ্ঞ, যিনি ত্রিগুণাতীত, তিনিও প্রকৃতিযুক্ত,—তিনি ভগবানের ন্যায় স্বপ্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত থাকিয়া, তাহাকে নিয়মিত করেন। তাঁহারই অধ্যক্ষতায় প্রকৃতি কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত হয়। এই অধ্যক্ষতা হেতু তাঁহাকে তখন প্রকৃতিকৃত কর্ম্মের কর্ত্তা বলা যায়।

বাস্তবিক তখনই তিনি কর্ত্তা হন। যতক্ষণ তিনি প্রকৃতির বা প্রকৃতিজ ত্রিগুণের বশীভূত থাকেন, ততক্ষণ প্রকৃতি আপনার স্বভাবানুসারে কর্ম্মে স্বতঃ প্রবর্ত্তিত হয়। তখন পুরুষ প্রকৃতিকে নিয়মিত করিতে পারেন না, অথচ অহঙ্কারবশে আপনাকে কর্ত্তা মনে করেন। বাস্তবিক তখন পুরুষ অকর্ত্তা বটে। কিন্তু যখন সেনাপতির সৈন্য-চালনার ন্যায় পুরুষ স্বপ্রকৃতিকে বিহিত ও কর্ত্তব্য কর্ম্মে নিয়মিত করিতে পারেন, প্রকৃতিজ কামক্রোধের বশীভূত হন না, তখনই তাঁহাকে সেই প্রকৃতির কর্ম্মে প্রকৃত কর্ত্তা বলা যায়।

এস্থলে যে কথা বলা হইল, তাহা আপাততঃ সাংখ্যদর্শনের সিদ্ধান্তের বিরোধী বোধ হয়। সাংখ্যদর্শনে আছে যে, প্রকৃতি পুরুষকর্তৃক একবার দৃষ্ট হইয়া পুনর্ব্বার দর্শনের বিষয় হয় না (কারিকা, ৬১)। এবং প্রকৃতিও, 'আমি দৃষ্ট হইয়াছি' বুঝিয়া, কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হয় (কারিকা, ৬৬)। অতএব এই মতানুসারে পুরুষের স্বরূপ জ্ঞান হইলে অর্থাৎ প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেক-জ্ঞান হইলে, পুরুষ মুক্ত হন, তখন আর তাঁহার কোন কার্য্য থাকে না।

পারেন, তাহাকে নিজ জ্ঞানানুসারে কর্ত্তব্য কর্ম্মে নিয়মিত ও পরিচালিত করিতে পারেন।

তৃতীয় আপত্তি।—এই নিষ্কাম কর্ম্মযোগ যে উচ্চাধিকারী জ্ঞান-যোগীরও বিহিত, এস্থলে সেই সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে আর একটি মাত্র আপত্তি উল্লেখ করা আবশ্যক। কর্ম্মমাত্রেই কাম-মূলক। যেখানে কোন 'কাম' নাই, সেখানে কোনরূপ কর্ম্মপ্রবৃত্তি থাকিতে পারে না। স্বার্থ কর্ম্ম হউক, পরার্থ কর্ম্ম হউক, সকল কর্ম্মের মূলে এই 'কাম' থাকে। অতএব নিষ্কাম কর্ম্ম অসম্ভব। একথা এক অর্থে সত্য। শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, ব্রহ্মই বহু হইবার কামনা করিয়া এই জগৎ সৃষ্টি করেন।—

"সোঽকাময়ত বহুস্যাং প্রজায়েয়।" (তৈত্তিরীয়, উপ, ২।৬।১)।

এই কাম হইতে সংকল্পের উৎপত্তি। ('সংকল্পপ্রভাবান্ কামান্' —ইতি গীতা, ৬।২৪)। ব্রহ্ম বহু হইবার কামনা করিয়া ঈক্ষণ-পূর্ব্বক সংকল্প করিয়া জগৎ সৃষ্টি করেন।

শ্রুতিতে আছে পুরুষও মনোময়। মনের ধর্ম্ম বা স্বরূপ কামসঙ্কল্প প্রভৃতি। এজন্য পুরুষও কামময়। (বৃহদারণ্যক, ১।৯।১১ ; ৪।৪।৫)। এই আত্মাই—

"সত্যকামঃ সত্যসংকল্পঃ" (ছান্দোগ্য উপ, ৮।১।৫)। যিনি আত্মাকে জানিয়া এ লোক হইতে প্রয়াণ করেন, তিনিও সর্ব্বলোকে কামচারী হন,—

"য ইহ আত্মানমনুবিদ্য ব্রজন্তি এতাংশ্চ সত্যান্ কামাং স্তেষাং সর্ব্বেষু লোকেষু কামচরো ভবতি।" (ছান্দোগ্য উপ, ৮।১।৬)।

এই মূল 'কাম'-তত্ত্ব আমরা পরে বিবৃত করিব। কিন্তু ভগবান্ এ স্থলে সে 'কামের' কথা ঠিক বলেন নাই। আমরা পূর্ব্বে ৩৭, ৩৮ শ্লোকের ব্যাখ্যায় ইহা দেখিয়াছি। গীতায় যে কামের কথা উক্ত হইয়াছে, তাহা রজোগুণসমুদ্ভব (৩।৩৭)। এ কাম মনোগত (২।৫৫)।

বিষয়ভোগ-নিবন্ধন বিষয়ে যে আসক্তি বা সঙ্গ হয়, তাহা হইতেই এই কামের উৎপত্তি (২।৬২)। সুখজ বিষয়ের প্রতি অনুরাগই এই কামের উৎপত্তি-হেতু। সেই অনুরাগ হইতে কাম, কাম হইতে সেই বিষয়-গ্রহণেচ্ছা ও সেই বিষয়-লাভ হইলে তাহা ভোগের ইচ্ছা হয়। এবং এই ইচ্ছা হইতেই আমাদের কর্ম্মে প্রবৃত্তি হয়। এই কাম, এবং কাম প্রতিহত হইলে যে ক্রোধ তাহা, আমাদের স্বার্থ কর্ম্মে প্রণোদিত করে। ইহা সর্ব্বরূপ পরার্থ কর্ম্মের অন্তরায়,—কর্ম্মযোগের অন্তরায়। ইহা হইতেই লোকে পাপাচরণ করে (৩।৩৬,৩৭), এই কাম দুষ্পূর (৩।৩৯; ১৬।১০), ইহা মহাশন মহাপাপ্মা (৩।৩৭), এই কাম ক্রোধ আর লোভই ত্রিবিধ নরকের দ্বার (১৬।২১)। এই কাম, ক্রোধ ও কাম-মূল 'রাগ'কে ভগবান্ ত্যাগ করিবার উপদেশ দিয়াছেন (২।৭১; ৭।১১)। ভগবান্ এই রজোগুণ-সমুদ্ভব কামকে ত্যাগ করিয়া নিষ্কাম হইবার উপদেশ দিয়াছেন। এই কাম ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধিকে আশ্রয় করিয়া জ্ঞানকে আবরিত করিয়া দেয় (৩।৩৯; ৭।২০)। এই কাম আমাদের জ্ঞান বিজ্ঞানকে নষ্ট করে (৩।৪১)। ইহা আমাদের হিতাহিত জ্ঞান, কর্ত্তব্যা-কর্ত্তব্য জ্ঞানকে হরণ করে,—আমাদিগকে পরহিতার্থ কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে দেয় না, স্বধর্ম্মাচরণে বাধা দেয়। অতএব এই রজোগুণজ কামকে ত্যাগ করিয়া নিষ্কামভাবে কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠানে কোনরূপ আপত্তি হইতে পারে না। আত্মার শুদ্ধ 'কাম' দ্বারা সেই নিষ্কাম কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠানে কোন বাধা হয় না। অতএব রজোগুণোদ্ভব কাম ত্যাগ করিয়া সর্ব্বাবস্থায় জ্ঞানার্থীর ও জ্ঞানীর কর্ম্মযোগ অনুষ্ঠেয়। ইহাই ভগবানের উপদেশ।

কর্ম্মযোগ তত্ত্ব—উচ্চাধিকারীর পক্ষেও যে কর্ম্মযোগ অনুষ্ঠেয়, সে সম্বন্ধে যাহা প্রধান আপত্তি, তাহা উক্ত হইল। এক্ষণে এই কর্ম্মযোগ সম্বন্ধে যাহা শেষ কথা, তাহার উল্লেখ করিব এবং জ্ঞানযোগীর পক্ষে

এই কর্ম্মযোগ কেন অনুষ্ঠেয়, তাহার প্রধান কারণ বুঝিয়া দেখিব। ভগবান্ পরে জ্ঞানযোগীর লক্ষণ বলিয়াছেন। সে লক্ষণ বুঝিতে হইলে, নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকগুলি স্মরণ করিতে হইবে।

"সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ॥
"যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।"

* * *

"সর্ব্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।"

* * *

"আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জ্জুন।" (গীতা, ৬।২৯-৩২)
"বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥" (গীতা, ৫।১৮)

এবং ভগবান্ ব্রহ্ম ও ঈশ্বর সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহাও মনে করিতে হইবে। ব্রহ্ম—

"অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্।" (১৩।১৬)

আর পরমেশ্বর—

"সমং সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্।"

যে জ্ঞানী ভক্ত পরমেশ্বরকে এইরূপে জানেন, যিনি আত্মতত্ত্ব, ব্রহ্মতত্ত্ব ও ঈশ্বরতত্ত্ব এইরূপে জানেন, তিনি পরাগতি লাভ করেন।—

"সমং পশ্যন্ হি সর্ব্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্।
ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিম্॥"
(গীতা, ১৩।২৭-২৮)।

অতএব যিনি জ্ঞানে অবস্থিত হইতে চাহেন, অমানিত্বাদি (১৩।৭-১১ শ্লোকোক্ত) জ্ঞানলাভ করিয়া তাহাতে প্রতিষ্ঠিত হইতে চাহেন, তাঁহাকে আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র সমদর্শন করিতে হইবে। কীট পতঙ্গ, পশু

পক্ষী, স্ত্রী শূদ্র সকলের মধ্যে আপনার আত্মাকে, ব্রহ্মকে, পরমেশ্বরকে দর্শন করিয়া সকলই যে সেই আত্মা সেই ব্রহ্ম, তাহা ধারণা করিতে হইবে। কিন্তু আমাদের অজ্ঞান এতই প্রবল যে, এই তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিলেও সেই একত্বজ্ঞানে স্থিত হইতে পারি না। আমাদের ভেদজ্ঞান যায় না। আমার এই ভৃত্যটি, বা ওই কুক্কুরটি—ইহারা যে এক, সকলেই যে আমার আত্মা, সকলের মধ্যে যে ব্রহ্ম—পরমেশ্বর সমভাবে স্থিত ইহা জানিয়াও ব্যবহার অবস্থায় সে জ্ঞানানুসারে আমরা কার্য্য করিতে পারি না। শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন যে জ্ঞান সাধনার উপায়, তাহা দ্বারা এই জ্ঞানলাভ হইলেও ব্যুত্থিত অবস্থায় এই জ্ঞানে স্থিতি লাভ করা সহজ হয় না, প্রকৃত জ্ঞাননিষ্ঠ হওয়া যায় না।

এই জ্ঞাননিষ্ঠার একমাত্র উপায় 'কর্ম্মযোগ'। এ তত্ত্ব ভগবান্ উপদেশ দিয়াছেন। এই কর্ম্মযোগ দ্বারা স্বার্থ ভুলিয়া কামক্রোধাদি দূর করিয়া কর্ত্তব্য বোধে পরার্থ কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা ক্রমে পরকে আপনার করিয়া লওয়া যায়, ক্রমে আমাতে তোমাতে তাহাতে যে প্রভেদ জ্ঞান, তাহা দূর হইয়া গিয়া সকলকে এক—সেই ব্রহ্মে স্থিত বলিয়া অনুভব হয়, সকলের মধ্যে সেই পরমেশ্বরের দর্শন লাভ হয়, সেই ভূমা একত্বের জ্ঞানে অবস্থান সিদ্ধ হয়। অতএব বলিতে পারা যায় যে, কর্ম্মযোগই জ্ঞানযোগীর মুখ্য সাধন। কর্ম্মযোগ ব্যতীত অপরোক্ষ জ্ঞান বা বিজ্ঞান-লাভ হয় না। বসিয়া বসিয়া কর্ম্ম না করিয়া আমি ব্রহ্ম, তুমি ব্রহ্ম, এই অস্পৃশ্য কুক্কুরটাও স্বরূপতঃ ব্রহ্ম, এইরূপ চিন্তা করিলেই অমানিত্বাদি (১৩।৭-১১ শ্লোকোক্ত) জ্ঞান সাধন হয় না, এবং সে জ্ঞাননিষ্ঠায় স্থিতিও হয় না। যেমন সর্ব্বত্র ব্রহ্ম চিন্তা ও ভাবনা করিতে হইবে, সেইরূপ কর্ম্ম দ্বারা তদনুরূপ আচরণ করিতে হইবে। ইহা দ্বারাই সে জ্ঞানের 'পরা নিষ্ঠা' লাভ হয়, এজন্য সাংখ্যজ্ঞানীর পক্ষেও কর্ম্মযোগ বিহিত।

জ্ঞাননিষ্ঠার জন্য যে কর্ম্মযোগের প্রয়োজন, তাহার আরও এক মুখ্য

কারণ উল্লেখ করা যাইতে পারে। কেবল জ্ঞান-সাধনার দ্বারা আমাদের তত্ত্ব-জিজ্ঞাসার নিবৃত্তি হয় না। আমি কি, এ জগৎ কি, ব্রহ্ম কি, ঈশ্বর কি—ইহা জ্ঞানের মূল জিজ্ঞাসার বিষয়, ইহা শুদ্ধ জ্ঞানের চিরন্তন প্রশ্ন (ideals of reason)। কেবল জ্ঞানের দ্বারা সে প্রশ্নের মীমাংসা হয় না। আমরা যতই আমাদের জ্ঞানের দ্বারা এই সকল প্রশ্নের মীমাংসা করিতে চেষ্টা করি, ততই সন্দেহ আসিয়া নানা বিরোধী বাদ (antinomy) আসিয়া আমাদের জ্ঞানকে মোহযুক্ত অজ্ঞানাবরিত করিয়া দেয়। আমরা আর সে প্রশ্নের সর্ব্বসংশয়চ্ছেদক উত্তর পাই না। এ তত্ত্ব জর্ম্মাণ দার্শনিক-পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ ক্যাণ্ট (Kant) তাঁহার প্রসিদ্ধ (Critique of Pure Reason) নামক পুস্তকে বিশেষভাবে বুঝাইয়াছেন।

তবে আমাদের উপায় কি ? আমাদের জ্ঞানসিদ্ধির কি কোন উপায় নাই ? আমরা কি চিরকাল সন্দেহান্ধকারে—অজ্ঞান-মোহে আবৃত থাকিব ? আত্মতত্ত্ব, ঈশ্বরতত্ত্ব, ব্রহ্মতত্ত্ব জগত্তত্ত্ব কিছুই কি জ্ঞানসাধনার দ্বারা সিদ্ধান্ত করিতে পারিব না ? চিরকালই কি আমরা সন্দেহ দোলায় দুলিতে থাকিব ? জিজ্ঞাসার কি নিবৃত্তি নাই ? না তাহা নহে। যেখানে আকাঙ্ক্ষা আছে—সেখানে অবশ্য সে আকাঙ্ক্ষা-পূরণের উপায় আছে। ইহার একই উপায়—কর্ম্মযোগ। ক্যাণ্ট সে কথা তাঁহার (Critique of Practical Reason) নামক পুস্তকে বুঝাইয়াছেন। তিনি সাংখ্যবুদ্ধি-তত্ত্ব অনুসন্ধান করিয়া যে প্রশ্নের সিদ্ধান্ত করিতে পারেন নাই, যোগ-বুদ্ধিতত্ত্ব অনুসন্ধান করিয়া তাহার উত্তর পাইয়াছেন। তাঁহার এই পুস্তক হইতে আমরা জানিতে পারি যে, আমাদের অন্তরে যে কর্ত্তব্যের আদেশ বাণী—(যে I ought এই জ্ঞান) পরিস্ফুট হয়, সেই বাণী (categorical imparative) অনুসরণ করিলে, তাহা হইতেই পরিণামে সকল সন্দেহ দূর হয়, আমাদের আত্মস্বরূপ, ঈশ্বরের স্বরূপ, এ জগতের স্বরূপ সমুদায় জ্ঞানে প্রকাশিত হয়। এই কর্ত্তব্যকর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা যতই চিত্তমলা

দূর হইতে থাকে, ততই এই জ্ঞানসূর্য্য স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইয়া প্রকাশিত হয়। এই কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে কর্ম্মযোগ বা নিষ্কাম কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিতে করিতে 'তুমি' 'আমি' 'তিনি'—এ ভেদজ্ঞান ক্রমে দূর হইয়া থাকে। সকল মানুষকে—সর্ব্বভূতকে—এবং সমস্ত জগৎকে ক্রমে আপনার করিয়া লওয়া যায়, সর্ব্বত্র একত্বদর্শন সিদ্ধ হয়, সর্ব্বত্র আত্মদর্শন, ঈশ্বরদর্শন, ব্রহ্মদর্শন সিদ্ধ হয়, এই জগৎ যে ব্রহ্ম—তাঁহারই প্রকট রূপ, সে ধারণা বদ্ধমূল হয়। ভগবান্ যে তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ দিয়াছেন, সে তত্ত্বজ্ঞানার্থ দর্শন সিদ্ধ হয়। তখন আর কোন সন্দেহ থাকে না, তখন কাম রাগ দ্বেষ প্রভৃতি সংযত হইয়া যায়, আর তাহারা জ্ঞানকে আবরিত করিতে পারে না। তখন কাহারও প্রতি রাগ বা দ্বেষ থাকে না, কাহারও প্রতি ক্রোধ হয় না। তখন ভেদদর্শন দূর হইয়া অদ্বৈতজ্ঞানসিদ্ধি হয়। ভগবান্ গীতায় সেই উপদেশ দিয়াছেন। কর্ম্মযোগ যে জ্ঞানের প্রধান সাধন, কর্ম্মযোগানুষ্ঠান হইতেই যে সিদ্ধি হয়, তাহা ভগবান্ বার বার উপদেশ দিয়াছেন। গীতা হইতে আমাদের এই তত্ত্ব বুঝিতে হইবে।

গীতোক্ত কর্ম্মযোগের বিশেষত্ব—এই কর্ম্মযোগ গীতায় বিশেষভাবে বিবৃত হইয়াছে। ইহা গীতার এক বিশেষত্ব। সমস্ত প্রামাণ্য উপনিষদের মধ্যে কেবল ঈশোপনিষদে ইহার ইঙ্গিত আছে, তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। তাহাতে আছে—

> ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
> তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্। ১
> কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ।
> এবং ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি ন কর্ম্ম লিপ্যতে নরে॥ ২

এই মন্ত্রের ভাষ্যেও শঙ্করাচার্য্য 'ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা' অর্থে সর্ব্বকর্ম্ম ত্যাগ করিয়া জ্ঞানী—সন্ন্যাসী হইবেন বুঝিয়াছেন। এবং যাহারা অজ্ঞানী, শত বর্ষ বাঁচিয়া থাকিতে ইচ্ছা করে, তাহাদের পক্ষে অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম বিহিত

হইয়াছে—উক্ত দ্বিতীয় শ্লোক সম্বন্ধে তিনি এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। এ সিদ্ধান্ত যে সঙ্গত নহে, তাহা আমরা গীতাব্যাখ্যায় বুঝিতে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছি। এ স্থলে এই অর্থ বুঝিতে হইবে যে, যিনি এই জগৎকে ঈশ্বরের দ্বারা ব্রহ্মের নিয়ন্তৃত্ব ঈশিত্বাদি দ্বারা আচ্ছাদিত এই জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তিনি সেই জ্ঞানে স্থিত হইয়া ত্যাগ-বুদ্ধিতে কর্ম্ম করিবেন ও ভোগ করিবেন। অতএব এই মন্ত্রকে নিষ্কাম কর্ম্মের মূলসূত্র বলিতে পারা যায়।

বেদোক্ত কর্ম্মকাণ্ডে কোথাও নিষ্কামভাবে যোগবুদ্ধিতে কর্ম্ম করিবার স্পষ্ট বিধান নাই। কিন্তু মনু বলিয়াছেন যে, বৈদিক কর্ম্ম দ্বিবিধ ও [illegible] মূলক ও নিবৃত্তি-মূলক। তন্মধ্যে—

ইহ চামুত্র বা কাম্যং প্রবৃত্তং কর্ম্ম উচ্যতে। [illegible]ায়
নিষ্কামং জ্ঞানপূর্ব্বং তু নিবৃত্তমুপদিশ্যতে॥ (মনু, [illegible] বৃত্ত[illegible]

পূর্ব্বমীমাংসা দর্শন অনুসারে কর্ম্ম ত্রিবিধ—নিত্য, [illegible]মার কাম্য। কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে প্রতিদিন অনুষ্ঠেয় অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম [illegible]লায় [illegible] সারে নিত্য কর্ম্ম, এবং অমাবস্যা পূর্ণিমা প্রভৃতি বিশেষ কা[illegible] কর্ম্ম নৈমিত্তিক। কোন কোন মীমাংসাকারের মতে নিত্য ও নৈমি[illegible] অনুষ্ঠানে কোন ফল লাভ হয় না, কিন্তু অকরণে পাপ আ[illegible] কেহ বলেন, নিত্য নৈমিত্তিক বিহিত কর্ম্ম পাপক্ষয়কর, তাহাতে কো[illegible] ফল পাওয়া যায় না। তাহা কোন ফলকামনা করিয়াও অনুষ্ঠিত হ[illegible]। তাহার কোন ফলশ্রুতি নাই। কাম্য কর্ম্ম ত্রিবিধ। ইহকালে ফল[illegible]দ, পরকালে ফলপ্রদ ও উভয়কালে ফলপ্রদ। (মীমাংসা-পরিভাষা দ্রষ্টব্য)

অতএব বলিতে হইবে যে, শ্রুতি-স্মৃতি-বিহিত নিত্য ও নৈমিত্তিক ক[illegible] —নিষ্কাম কর্ম্ম। কিন্তু এই কর্ম্ম গীতোক্ত নিষ্কামকর্ম্মের অন্তর্গত হইলে গীতোক্ত নিষ্কাম কর্ম্ম সমুদায় ইহার অন্তর্গত নহে। তাহা আরও ব্যাপক তাহা আমরা পূর্ব্বে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। বিশেষতঃ গীতায় এ

নিষ্কাম কর্ম্মতত্ত্ব ও প্রয়োজন যে ভাবে উপদিষ্ট হইয়াছে, সে ভাবে আর কোথাও উপদিষ্ট হয় নাই।

দর্শনশাস্ত্রের মধ্যে ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনে কর্ম্মের কোন কথা নাই। বৈশেষিক দর্শনে ধর্ম্মের কথা উক্ত হইয়াছে। এই ধর্ম্ম—অভ্যুদয় নিঃশ্রেয়স-সিদ্ধিকর। কিন্তু এ ধর্ম্ম যে বেদবিহিত কর্ম্ম, তাহা উক্ত হয় নাই। বস্তুর সাধর্ম্ম্য বৈধর্ম্ম্য বিচার দ্বারা যে বস্তুজ্ঞান হয়, সেই ধর্ম্মই উক্ত হইয়াছে। বৈশেষিক দর্শনে আছে—

"ধর্ম্মবিশেষপ্রসূতাদ্ দ্রব্যগুণকর্ম্ম-সামান্য-বিশেষ-সমবায়ানাং পদার্থানাং সাধর্ম্ম্যবৈধর্ম্ম্যাভ্যাং তত্ত্বজ্ঞানান্নিঃশ্রেয়সম্।" (১।৪ সূত্র।)

ন্যায়দর্শনানুসারেও প্রমাণ-প্রমেয়াদি ষোড়শ পদার্থের "তত্ত্বজ্ঞানাৎ নিঃশ্রেয়সাধিগমঃ।" (ন্যায়দর্শন, ১।১।১ সূত্র)।

সাংখ্যদর্শন অনুসারে ধ্যানই আত্মজ্ঞান সাধন,—রাগোপহতির উপায়। ধারণা ও আসনাদি যেমন ধ্যানসিদ্ধির উপায়, স্বকর্ম্মও সেইরূপ ধ্যান-সিদ্ধির উপায়। (৩।৩০)। এই স্বকর্ম্ম কাহাকে বলে, সে সম্বন্ধে সাংখ্যদর্শনে আছে—

"স্বকর্ম্ম স্বাশ্রমবিহিতকর্ম্মানুষ্ঠানম্।" (৩।৩৩)।

এই আশ্রমবিহিত কর্ম্ম অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস—এই চারি আশ্রমবিহিত কর্ম্মের মধ্যে বর্ণানুযায়ী কর্ম্মও বুঝিতে হইবে। অতএব সাংখ্যদর্শনানুসারে এই কর্ম্ম সাংখ্যজ্ঞান-সাধনের গৌণ উপায় হইলেও (৩।২৫ সূত্র), ইহা একটি উপায় বটে।

পাতঞ্জল দর্শন অনুসারে কর্ম্মমাত্রই ক্লেশমূল, দৃষ্টাদৃষ্ট জন্মবেদনীয় এবং জাতি আয়ু ও ভোগের কারণ (পাতঞ্জল সূত্র, ২।১২-১৩)। যাহা হউক, এই দর্শনানুসারে যে অষ্টাঙ্গ যোগের কথা উক্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে নিয়ম এক অঙ্গ। তপঃ, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বরপ্রণিধান—এই নিয়মের অন্তর্গত (২।৩২ সূত্র)। এই তপঃ স্বাধ্যায় ও ঈশ্বরপ্রণিধানকে ক্রিয়াযোগ বলা

হইয়াছে (২৷১ সূত্র)। সমাধি ভাবনার জন্য ও ক্লেশ ক্ষীণ করিবার জন্য এই ক্রিয়াযোগের প্রয়োজন (২৷২ সূত্র)। অতএব পাতঞ্জল দর্শনানুসারে ঈশ্বরোপাসনা, তপঃ ও স্বাধ্যায়ই কেবল কর্ম্মযোগের অন্তর্গত হইয়াছে। নিত্য কর্ম্ম, স্বধর্ম্মাচরণের কথা ইহাতে উল্লিখিত হয় নাই।

বেদান্ত দর্শন ব্রহ্মজ্ঞান-প্রতিপাদক। তাহাতে কর্ম্মযোগের কথা থাকিতে পারে না। তাহাতে ব্রহ্মের প্রতীকোপাসনারূপ কর্ম্মের কথা মাত্র।

অতএব আমরা বলিতে পারি যে, শ্রুতি স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রে ও দর্শনে কোথাও গীতোক্ত কর্ম্মযোগ এইভাবে বিস্তারিতরূপে বিবৃত হয় নাই। কর্ম্মযোগ কেন অনুষ্ঠেয়, কিরূপে অনুষ্ঠেয়, কর্ম্মযোগে কি কি কর্ম্ম অনুষ্ঠেয়, কিরূপ বুদ্ধিতে কর্ম্মযোগ অনুষ্ঠেয়, তাহার প্রয়োজন কি, তাহার অনুষ্ঠানের উপায় কি, সে অনুষ্ঠানের পরিণাম কি, জ্ঞানযোগ, ধ্যানযোগ বা ভক্তিযোগের সহিত তাহার সম্বন্ধ কি, ইত্যাদি তত্ত্ব আমাদের সমুদায় শাস্ত্রের মধ্যে কেবল গীতারই বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে। ইংরাজীতে যাহাকে Ethics বলে, সেই কর্ম্মতত্ত্বের মীমাংসা গীতা ব্যতীত আমাদের আর কোন শাস্ত্রে পাওয়া যায় না। ইংরাজীতে যাহাকে rational basis বলে, সেই জ্ঞানভিত্তির উপর আর কোথাও কর্ম্মযোগতত্ত্ব স্থাপিত হয় নাই। আমাদের শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মকে আর কোথাও rationalize করা হয় নাই। এইজন্য আমরা এই ব্যাখ্যায় ইহা বিস্তারিতরূপে বুঝিতে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছি।